বাংলাদেশের নির্যাতিত হিন্দু সম্প্রদায় প্রেক্ষাপট মুক্তিযুদ্ধ

সম্পাদক : সালাম আজাদ

বাংলাদেশের নির্যাতিত
হিন্দু সম্প্রদায় : প্রেক্ষাপট মুক্তিযুদ্ধ

বাংলাদেশের নির্যাতিত
হিন্দু সম্প্রদায় : প্রেক্ষাপট মুক্তিযুদ্ধ

সম্পাদক : সালাম আজাদ

অভিযান পাবলিশার্স

বনমালীপুর বারাসাত কলকাতা ১২৪

উৎসর্গ

শ্রী প্রণব কুমার ব্যানার্জী

শ্রী অজয় দত্ত

শ্রী জওহর চ্যাটার্জী

ডাঃ গৌতম মজুমদার

আমার চার সুহৃদের করকমলে

ভূমিকা

অম্বিকাচরণ সাহার বাড়িতে কাঠের কারুকার্য করা একটি সুন্দর দোতলা ঘর ছিল। এত সুন্দর ঘর আজ অব্দি আর কোথাও দেখিনি। সেই ঘরটি মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ১১মে ১৯৭১ সকালে। চারিদিকে বারান্দা ঘেরা, দোতলায় ঝুল-বারান্দা দেওয়া। শুধু এই ঘরটিই নয় পুরো বাড়িটা লুট হয়ে যায় সেদিন। কেন হয়েছিল? বাড়িটির মালিকদের নাম অম্বিকাচরণ সাহা বলেই। এই যে ঘরটি, যার বাঁধানো মেঝে অর্ধভগ্ন অবস্থায় এখনো পড়ে আছে। কাঠের থামের পোড়া অংশ তাও মেঝের কোথাও কোথাও অবশিষ্ট রয়েছে। এই পোড়া থামের অংশগুলি আজ ইতিহাসের নির্মম সাক্ষী। শুধু এই ঘরটি নয়। অম্বিকাচরণ সাহার মূল বাড়িটি ছিল চারদিকে ঘোরানো দালান, মধ্যে উঠান। ইমারতের ঘরগুলির মেঝেতে ঢাকনা দেওয়া বড়ো বড়ো এক একটা গর্ত ছিল। সে সব গর্তে কাঁসা-পিতলের বাসনপত্র, হাঁড়ি-পাতিল রাখা হতো। বছরের বিভিন্ন সময়, পারিবারিক উৎসবে এসব তৈজসপত্রের ব্যবহার হতো। এসব ছাড়াও প্রতিটি রুমের দেয়ালে ছোটো বড়ো বিভিন্ন সাইজের আলমারি ছিল। সে সব আলমারিতে রাখা থাকতো প্রতিদিনের ব্যবহারের তৈজসপত্র, কাপড়, স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ টাকা। ১১মে ১৯৭১ তা সব লুট হয়ে যায়। এমনকি বাড়ির দরজা জানালা চৌকাঠও রক্ষা পায়নি আসবাবপত্রের মতো।

বিক্রমপুরের রাড়িখাল গ্রামে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর যে বাড়ি, তার গা ঘেষে পূর্বদিকের এই অম্বিকাচরণ সাহার বাড়িটি। তার অপর ভাই রাজমোহন সাহার প্রায় একই রকম বাড়ি একটু দূরে, উত্তর দিকে সে বাড়িটি এবং সঙ্গে রাড়িখাল স্যার জগদীশচন্দ্র বসু উচ্চ বিদ্যালয়ের কিংবদন্তী শিক্ষক বিষ্ণুপদ সেনের বাড়ি, অসীম সাহসী ও প্রবাদতুল্য পুরুষ শিবদাস মিত্র এবং পাশের গ্রাম মাইজপাড়ার বাবুর বাড়ি বলে খ্যাত, গিরীন্দ্রবিহারী ও ইন্দ্রবিহারী রায়দের বাড়ি একই দিনে পাক হানাদার বাহিনী আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। স্থানীয় লোভী মুসলমানরা মুহূর্ত বিলম্ব না করে এসব বাড়ির আসবাবপত্র, তৈজসপত্র, সোনাদানা, টাকা-পয়সা এমনকি গাছের ফল ও সবজি, গৃহপালিত হাঁস-মুরগি ও গরু লুট করে নিয়ে যায়। এসব লোভী মুসলমানদের উৎসাহিত ও সহযোগিতা করে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের দোসর রাজকার। শ্রীনগর থানা সদর থেকে পাক হানাদারদের মাইজপাড়া, রাড়িখাল গ্রামে যারা নিয়ে এসেছিল তাদের মধ্যে মুসলিম লিগের তৎকালীন এম এন এ এডভোকেট মাহতাব উদ্দিন, শ্রীনগর সদরের মুসলিম লিগের নেতা আবদুল আউয়াল, মাইজপাড়া ফরিদ মিয়াদের মতো নরপশুরা ছিল অন্যতম।

মাইজপাড়া ও রাড়িখালের যে চিত্র তা আমার স্বচক্ষে দেখা। উনিশশো একাত্তরে এক স্কুলের ছাত্রের প্রত্যক্ষ করা এবং আজ সেই মর্মবেদনার প্রকাশ। কিন্তু এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। একাত্তরে পুরো বাংলাদেশের গ্রাম কিংবা শহরের প্রতিটি হিন্দু বাড়িতে এভাবে বর্বরতা চালিয়েছে পাক হানাদার বাহিনী। মাইজপাড়ার প্রয়াত ইন্দ্রবিহারী রায়ের বড়ো পুত্র সমর রায় সেদিন স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বললেন, "চারশো বছরের পুরোনো আমাদের বাড়ি। জমিদার বাড়ি। কিন্তু পাকিস্তানী সেনারা গান পাউডার ছিটিয়ে আগুন দেওয়ার পরে লুট করা হয়। আমরা পরিবারের সকলেই পালিয়ে প্রাণে বেঁচে ছিলাম বটে। কিন্তু যখন বাড়িতে ফিরে এসেছিলাম, এক কাপ চা পান করার মতো একটি কাপও বাড়িতে অবশিষ্ট ছিল না। হয় পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, নয় তো লুট করে নিয়ে গেছে। জল পানের প্রবল তৃষ্ণা নিবৃত্ত করতে হয়েছিল পায়খানায় ব্যবহার করা মগ দিয়ে।"

শুধু সম্পত্তির উপর হামলা নয়। জীবন ও সম্ভ্রমের উপর এমনকি ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর পর্যন্ত সরাসরি হামলা করেছিল পাক হানাদার বাহিনী। মাইজপাড়ার জীবন দাসকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ছত্রিশ বছর পরে আজ পর্যন্ত তার পরিবারের সদস্যরা জানে না তাকে কি পরিণতি বরণ করতে হয়েছিল পাক সেনাদের হাতে। রাড়িখাল স্যার জে সি বোস ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক, আমাদের পণ্ডিত মহাশয় সুধাংশুভূষণ চক্রবর্তীকে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তার রাড়িখালের বাড়ি থেকে। বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয় শুধু আমাদের শিক্ষকই ছিলেন না। স্থানীয় হিন্দু নরনারীদের ধর্মগুরুও ছিলেন। তাকে শ্রীনগর ডাকবাংলোয় নিয়ে গরুর মাংস খাইয়ে ছেড়ে দিয়েছিল হানাদার বাহিনী। ধর্মপ্রাণ এই পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে এই নিষিদ্ধ মাংস খাওয়ার চেয়ে মৃত্যু অনেক বেশি সহজ ছিল। কিন্তু তারা তা না করে গরুর মাংস খেতে বাধ্য করেছিল। দোগাছি নামে একটি গ্রাম থেকে কিছু পরিবার এসেছিল আমার মায়ের কাছে আশ্রয় চাইতে। মা তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু খুব বেশি দিন রাখতে পারেননি। নয় মাসের দীর্ঘস্থায়ী নিরাপত্তা দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আশ্রয় যারা নিয়েছিলেন তাদের সকলেই মেয়ে ও নারী। পাকিস্তানি হায়েনাদের হাত থেকে সম্ভ্রম বাঁচাতে তাদেরকে আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হতে হয়েছিল। যাদের বেশিরভাগ ছিলেন হিন্দু পরিবারের গৃহবধু ও যুবতী মেয়ে। কিছুদিন পরে একদিন গভীর রাতে তারা সকলে আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যান। পরে শুনেছি তারা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছে গেছেন। তাদের নিরাপদে পৌঁছানোর সংবাদ পেয়ে মা তার সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। শোকরিয়া জানিয়েছিলেন।

ব্যক্তিগত স্মৃতি থেকে, বিশেষ করে একটি স্কুলেপড়া ছেলের দেখা ও অনুভব করা মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের যে অভিজ্ঞতা সেই নির্মমতা আমাকে এখনও তাড়িত করে।

ক্ষতবিক্ষত করে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র হিন্দু অধ্যুষিত বিক্রমপুরের দু'তিনটি গ্রামকে কেন্দ্র করে। এর বাইরে রয়েছে বিশাল বাংলাদেশের অসংখ্য গ্রাম জনপদ শহর এবং রাজধানী ঢাকা। সেই বাংলাদেশের অত্যাচারিত, নির্যাতিত, ধর্ষিত হিন্দু নারী-পুরুষের আর্তনাদের চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে যারা সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তারা হিন্দু নরনারী। ভারতের ত্রিপুরা, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশের শরণার্থী শিবিরে যে আটানব্বই লক্ষাধিক শরণার্থী ছিলেন তাঁদের প্রায় আশি ভাগ হচ্ছেন হিন্দু নারী-পুরুষ ও শিশু। ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে এই সব হিন্দু নরনারী যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, অবদান রেখেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের ইতিহাসে তা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অংশ। কিন্তু নয় মাসের এই উল্লেখযোগ্য ইতিহাস নিয়ে তেমন কোন কাজ আমাদের দেশে হয়নি। উপেক্ষিত থেকে গেছে। কিন্তু কেন? তবে অধ্যাপক রতনলাল চক্রবর্তী জগন্নাথ হলের উপর যে কাজটি করেছেন তা ব্যতিক্রম ও ধন্যবাদের। কিন্তু তা পুরো বাংলাদেশের চিত্র নয়। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটিমাত্র ছাত্রাবাসের উপরে অধ্যাপক চক্রবর্তীর এই কাজটি। বলা নিষ্প্রয়োজন বাংলাদেশের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোনো ছাত্রাবাসে জগন্নাথ হলের মতো এতো ব্যাপক নির্মমতা চালায়নি পাক হানাদার বাহিনী। অধ্যাপক রতনলাল চক্রবর্তীর উক্ত বইটি আমাকে বর্তমান কাজটি করতে সাহায্য করেছে, অনুপ্রেরণা দিয়েছে। তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তার বইটি থেকে আমি বর্তমান গ্রন্থে সাহায্য নিয়েছি। আমার নির্বাসিত জীবনে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে উনিশশো একাত্তরে যে সব হিন্দু নারীপুরুষ নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন তাদের সঙ্গে কথা বলা, সাক্ষাৎকার নেওয়া এবং এ পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের জন্য পত্রপত্রিকা, জার্নাল রিপোর্ট ও বই ঢাকা থেকে যে সব বন্ধুবর্গ পাঠিয়ে সাহায্য করেছেন তাদের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। আমার পরম হিতৈষী এই বন্ধুবর্গের সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পান্ডুলিপি অদৌ সম্ভব হতো কিনা তা প্রশ্নসাপেক্ষ। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ শ্রী পবিত্র চৌধুরীর কাছে।

এই গ্রন্থভুক্ত রচনাগুলি যে সব আকর থেকে সংগৃহীত তার বানানরীতিই বজায় রাখা হল।

আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাসে একটি বিশেষ অধ্যায়— ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে হিন্দু নরনারী ও শিশুদের উপরে পাকিস্তানিদের বর্বরতা। এর বাইরেও আরও একটি বিষয় বর্তমান কাজটি প্রণয়ন করতে আমাকে তাড়িত করেছে। কী সে বিষয়?

হিন্দু নাগরিকদের একটি বড়ো প্রত্যশা, আরও পরিষ্কার করে যদি বলা যায়, তাদের একমাত্র প্রত্যাশা ছিল পাকিস্তানের শাসনাধীন তেইশ বছরে তাদের প্রতি যে বৈষম্য করা হয়েছে, যে নির্যাতন ও অত্যাচারের শিকার তারা হয়েছেন, তাদের সম্পত্তি দখলের জন্য শত্রু সম্পত্তি নামে যে কালো আইনের খড়গ তাদের উপর আরোপ করেছিল পাকিস্তান সরকার, তা থেকে মুক্তি। একজন আব্দুল্লাহ মিয়া যে নাগরিক অধিকার ভোগ করবে, একজন হরিপদ দত্ত তার নাগরিক অধিকারও সমান ভাবে ভোগ করার নিশ্চয়তা পাবে। কোনো সরকার বা গোষ্ঠী যেন হরিপদ দত্তের প্রতি বৈষম্য না করে। যোগ্যতা অনুযায়ী আসন দেওয়া হবে। কিন্তু তাদের সেই প্রত্যশা পূরণ হয়নি। শত্রুসম্পত্তি আইনের মতো বৈষম্যমূলক আইন বাতিল করা হয়নি। জন্মভূমিতেই বাংলাদেশের হিন্দুরা আজ পর্যন্ত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কাছে শত্রু থেকে গেছে। রাষ্ট্র তাদের শত্রু করে রেখেছে। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা শুধু সংবিধান থেকে বাতিল করা হয়নি— রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করে বাংলাদেশের হিন্দুদের নাগরিক অধিকার হরণ করা হয়েছে। তাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করা হয়েছে— যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের সাড়ে তিন বছরের সরকার এবং ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনার সরকারকে বাংলাদেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা, বিশেষ করে হিন্দুরা নিজেদের সরকার ভাবতে পেরেছে। এই দুটি সরকার দেশের সংখ্যালঘুদের মানসিক নিরাপত্তা দিতে সচেষ্ট ছিল বলেই সংখ্যালঘুরা নিজেদের নিরাপদ ভাবতে পেরেছে। তাছাড়া শেখ হাসিনার সরকার বেশ কিছু সরকারি কর্মকর্তাকে সচিব করেছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করেছেন, রাষ্ট্রদূত করেছেন, পাবলিক সার্ভিস কমিশনে সদস্য করেছেন। তখন হিন্দু বাবা-মাদের মধ্যে এই প্রত্যাশা জাগরূক হয়েছিল তার সন্তান দেশের শীর্ষপদগুলিতে যাওয়ার ব্যপারে অতীতের মতো আর কোনো বৈষম্যের শিকার হবে না। স্বাধীনতার ছত্রিশ বছরের ইতিহাসে সাড়ে আট বছর বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা নিজেদের কম বেশি নিরাপদ ভাবতে পেরেছেন। বাকি প্রায় আঠাশ বছর তাদের প্রতি যে আচরণ করা হয়েছে তা স্বাধীনতাপূর্ব পাকিস্তান সরকারের আচরণ থেকে কোনো অংশে ভিন্ন নয়। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য আঠাশ বছর বাংলাদেশ নিষ্পেষিত, লুণ্ঠিত হয়েছে স্বাধীনতাবিরোধী ও সামরিকজান্তাদের হাতে, দেশে গণতন্ত্র শব্দটি অভিধানে ছিল বাস্তবে ছিল, না। আর সেকুলারিজমকে বাক্সবন্দী করে সম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের চাষ করা হয়েছে। যদিও বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনার উপর ভিত্তি করে স্বাধীন হয়েছিল তার প্রধান দু'টি শর্ত ছিল গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। যে শব্দ দু'টি শুধুই আভিধানিক নয়, যা একটি দেশের নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত করে আর সংখ্যালঘুদের জন্য তা হচ্ছে রক্ষাকবচ।

মুষ্টিমেয় কিছু রাজাকার, আল বদর, আল সামস বাদ দিলে একাত্তরে সাড়ে সাত কোটি মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে। নয় মাসের যুদ্ধে স্বাধীনতাকামী প্রতিটি মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। বলাবাহুল্য সমগ্র বাংলাদেশে একজন হিন্দু খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি রাজাকার ছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করেছেন— অথচ বাংলাদেশের আঠাশ বছরের বাস্তবতা হচ্ছে রাজাকার পুনর্বাসিত হয়েছে। যুদ্ধাপরাধের জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার যাদের নাগরিকত্ব বাতিল করেছিল তাদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের পুনর্বাসিত করা হয়েছে, ক্ষমতার কাছাকাছি যেতে সহযোগিতা করা হয়েছে। এমনকি রাজাকার আর বীরাঙ্গনা জোট পর্যন্ত গঠন করে ক্ষমতা ভাগাভাগি করেছে। অর্থাৎ ধর্ষক আর ধর্ষিতা এক জোট হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত ও আমাদের সবচেয়ে বড়ো অর্জনের ইতিহাসকে বিকৃত করার উদ্দেশ্যে। যাদের হাতে এখনো শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ত লেগে রয়েছে যারা স্বাধীন বাংলাদেশকে আজও স্বীকার করে না। যারা সবুজ জমিনে লাল সূর্যের পতাকাকে এখনো নিজের দেশের পতাকা বলে মেনে নেয়নি। তাদের সেই পতাকাবাহী গাড়ি উপহার দিয়ে বীরাঙ্গনা ধন্য হন।

পক্ষান্তরে মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধ, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা দীর্ঘ আঠাশ বছর ধরে উপেক্ষিত, অবহেলিত, নির্বাসিত। আর ধর্মীয় কারণে বিপরীত যে নাগরিকরা অর্থাৎ হিন্দুরা হয়েছেন বৈষম্যের শিকার, অত্যাচারিত, নির্যাতিত, ধর্ষিত, সম্পত্তি দখলের শিকার— যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী।

যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যার যা অবদান ও ভূমিকা তার স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠা বোধ করে, তাদের বিবেকে এই গ্রন্থের প্রতিটি শব্দ প্রতিটি হিন্দু নারীপুরুষের মুক্তিযুদ্ধের অবদান রাখতে গিয়ে কী মূল্য দিতে হয়েছে তা গিয়ে আঘাত করবে এই আমার প্রত্যাশা। আর মুক্তিযুদ্ধে হিন্দু নারীপুরুষ তাদের আত্মত্যাগের স্বীকৃতি পাবে। ফিরে পাবে নিজ দেশে তাদের নাগরিক অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা।

সালাম আজাদ
Email : salamazad@yahoo.com

হানাদারদের কবলে জগন্নাথ হল-১

পঁচিশের সেই ভয়ঙ্কর রাতে তিনি একটানা ১৯ ঘণ্টা ম্যানহোলে ছিলেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। জগন্নাথ হল। সার্ভেন্টস কোয়ার্টার। পাশেই গোয়াল। এর নিকটের ম্যানহোলে একটানা ১৯ ঘণ্টা আত্মগোপন করে থেকে তিনি আত্মরক্ষা করেছেন। নিজেকে রক্ষা করেছেন হানাদার বাহিনীর অতর্কিত হামলা থেকে। ম্যানহোল পুতিগন্ধময়। মাঝে মাঝে তার দম বন্ধ হয়ে যেত। মাথা ঝিম্ ঝিম্, পা রি রি করত। উপায় নেই বেরুবার। অবিরাম গোলাগুলির শব্দ। মানুষের আর্তনাদ, কান্নার শব্দ, সবই তার কানে ভেসে আসছিল।

একটু পর পর কিছু সময় অন্তর অন্তর ম্যানহোল থেকে কোনোরকমে গলাটুকু পর্যন্ত বের করে তিনি শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়েছেন। এক পলক দেখে নিতে চেষ্টা করেছেন ম্যানহোলের বাহিরের দুনিয়াটাকে, যখন তখন বীভৎস হত্যালীলা চলছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীপরিমল গুহ আমার কাছে ২৫ মার্চের ভয়াল ভয়ংকর রাত্রের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন।

তিনি এই দুঃস্বপ্নের রাতের একজন সাক্ষী হয়েছিলেন। ম্যানহোলে কোনোরকমে ঢুকে পড়ে মৃত্যুপুরীর নিশ্চিত পরিণাম থেকে নিজেকে অনেকটা আলৌকিকভাবে রক্ষা করেছেন। তিনি বলেছেন— ২৫ মার্চ রাতে প্রায় ১১টার দিকে আমি প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী রথীন রায়ের লক্ষীবাজারস্থ বাসা থেকে হলে ফিরি। তখনও হানাদার সামরিক বাহিনীর লোকেরা হামলা শুরু করেনি। রাস্তায় রাস্তায় মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যারিকেড তৈরি করছেন। গাড়িগুলো ক্ষিপ্র গতিতে চলাচল করছে। রথীনদার বাসা থেকে রাস্তায় পা বাড়াতেই লোকজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি কোথায় যাবেন। আমি জগন্নাথ হলে যাব শুনে সবাই আমাকে যেতে নিষেধ করলেন। বললেন, শহরের অবস্থা খুব উত্তপ্ত, যে-কোনো সময় সামরিক বাহিনী নামতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাই হবে এদের প্রধান লক্ষ্যস্থল।

আপনি যাবেন না। শ্রীপরিমল গুহ বলেছেন, লোকজনের কথা শুনে আমি বেশ ভয় পেয়ে যাই; ভাবলাম রাত্রে হলে ফিরব না, হলে তখন অনেক ছাত্র। হলে অবস্থানরত ৬০/৭০ জন ছাত্রের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। তাদের কথা ভেবে আমি হলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। মরলে সবাই একসঙ্গে মরব আর বাঁচলে সবাই একসঙ্গে বাঁচব। ওদেরকে ওভাবে ফেলে আমি নিজের প্রাণরক্ষার বিরোধী ভেবে হলে ফিরি।

রাত্রি তখন পুরো ১১টা। চারিদিকে থমথমে ভাব। গাড়ি-ঘোড়া চলাচল বন্ধ। নীরব নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে কানে ভেসে আসছে দূর থেকে গগনবিদারী স্লোগান "জয় বাংলা,

বাঙালি জেগেছে— বাঙালি জেগেছে।" হলের ছাত্ররা হলের গেটে দাঁড়িয়ে আছেন। সবাই ভীতসন্ত্রস্ত! কারও মুখে কোনো কথা নেই। সবাই অজানা আশঙ্কায় শঙ্কাগ্রস্ত।

আমি তাদেরকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে বললাম। আমার কথায় কেউ বিশ্বাস করল না। কেউ বললেন আমাদের উপর হামলা করার কোনো কারণ নেই। এর পর প্রায় ২৫ জন ছাত্র হলের বাইরে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবার জন্য তৎক্ষণাৎ হল ত্যাগ করলেন। জানি না তারা এখন কোথায়? সত্যিই কি নিরাপদ হতে পেরেছিলেন, না হানাদারদের লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন। আমাদের হলে পাকবাহিনী আক্রমণ করে রাত সাড়ে বারোটায়। এর আগেই আমরা চারিদিকে গোলাগুলির আওয়াজ পাচ্ছিলাম।

সেদিন আমরা রাইফেলের গুলির শব্দ শুনিনি। শুনেছিলাম মেশিনগান, মর্টার শেলিং ও মাঝে মধ্যে ট্যাংকের প্রচণ্ড শব্দ। আমাদের হলে সৈন্য প্রবেশের আগে আমরা যারা হলে ছিলাম তাদের মধ্যে কেউ কেউ হলের ছাদে উঠল, কেউ কেউ সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে, আবার কেউ কেউ নিজেদের রুমেই আত্মগোপন করার চেষ্টা করল। আমি পিছনের দিকের ড্রেনের মধ্য দিয়ে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের দিকে গেলাম।

হানাদার সৈন্যরা তখন হলে ঢুকে পড়েছে। আমি দেখলাম তারা প্রতিটি রুম তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। আমার কানে গুলির শব্দ পৌঁছাচ্ছিল। আমি পিছনের দিক দিয়ে বেরুলাম। ধীরে ধীরে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের ড্রেনের দিকে এগিয়ে গেলাম। হানাদার সৈন্যরা হলে ঢুকে পড়েছে। আমি তখনও ম্যানহোলে ঢুকে পড়িনি। দেখলাম সৈন্যরা তন্ন তন্ন প্রতিটি রুম খুঁজছে।

হলে বাতি নেই। হল আক্রমণের আগেই বিদ্যুৎ যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়েছিল ওরা। তবুও দেখছিলাম ছাত্রদের ধরে ওরা বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়ত, কখনও বেদম প্রহার করত, আবার কখনও ধরে নিয়ে আসত। এর মাঝেই কাছ থেকে গুলির শব্দ কানে আসল। গুলির শব্দে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। এরপরে আমি ম্যানহোলে ঢুকি। তখন রাত প্রায় ১টা।

২৬ মার্চ। সকালে ভোরের সূর্য উঠল। আমি ম্যানহোলে। সারাদিন ম্যানহোলে থাকলাম। সারাদিন আমার কানে শুধু গোলাগুলি আর মানুষের আর্তকান্না ভেসে আসছে বা এসেছে। দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। আর পারা যায় না। ১৯ ঘণ্টা পর আমি প্রাণ হাতে নিয়ে রাস্তায় গুনে গুনে পা বাড়াই। দেওয়াল টপকিয়ে নিকটবর্তী স্টাফ কোয়ার্টারে যাই। প্রফেসর সন্তোষ ভট্টাচার্যের বাসায় আশ্রয় নেই।

— দৈনিক পূর্বদেশ, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

হানাদারদের কবলে জগন্নাথ হল-২

হোসেন তওফিক

জগন্নাথ হলে পাকিস্তানী হানাদার সৈন্যদের অতর্কিত আক্রমণ শুরু হয় ২৫ মার্চ রাত্রি সাড়ে বারোটায়। ছাত্ররা দিশেহারা হয়ে যে যেদিকে পারলেন আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করলেন। ক'জন দল বেঁধে ছাদে উঠলেন, কেউ কেউ নিজের কক্ষেই আত্মগোপন করার চেষ্টা করলেন, দু'একজন সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের দিকে গেলেন। জগন্নাথ হল, নর্থ হাউজ, ২৯ নং কক্ষ। কক্ষে দুজন ছাত্র থাকতেন। হরিধর ও সুনীল দাস। ২৫ মার্চ সুনীলের একজন অতিথি এসেছিলেন। পরিমল বলল পাকিস্তানী হিংস্র হানাদারেরা নর্থ হাউজে আক্রমণ চালিয়ে প্রথমে ঢুকল ২৯নং কক্ষে।

তিনজনই তখন রুমে উপস্থিত। পাকিস্তানী সৈন্যরা এত হিংস্র হতে পারে তারা তা ধারণা করেননি। তাই সরল বিশ্বাসে তারা নিজেদের রুমটাকেই সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় ভেবেছিলেন। সৈন্যরা তিনজনকে পেয়ে গেল। শিকার ধরতে পেরে এই পশু সৈন্যদের সে কী উল্লাস, সে কী আনন্দ! পরিমল গুহ বললেন, হলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ। সৈন্যরা সার্চ লাইট সঙ্গে এনেছিল। তিনজনকে একত্রে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ করল তারা। একত্রে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। এরপর সৈন্যরা রুমে একটা গ্রেনেড ছুঁড়ে মারল। পাছে যদি কেউ বেঁচে যায়। ব্রাশে সুনীল ও তার অতিথি মারা গেলেন। সুনীলের খবর নিতে এসে তিনি নিজেই নরপশুদের থাবায় প্রাণ বিসর্জন দিলেন। হরিধরের গায়ে গুলি লাগেনি। মেশিনগানের গুলির শব্দে তিনিও অপর দুজনের সঙ্গে পড়ে গিয়েছিলেন মেঝেতে, কিন্তু গ্রেনেড লাগল তার পায়ে। তিনি মারাত্মকভাবে আহত হলেন। পরিমল গুহ বললেন, গ্রেনেড ছুঁড়েই হানাদার সৈন্যরা কক্ষ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, তারা ভেবেছিল সবাই শেষ। কেউ মেশিনগানের গুলি এবং এরপরই গ্রেনেড চার্জে বাঁচতে পারে না। কিন্তু অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন হরিধর। তার পা দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছিল। নিজের তাজা টকটকে লাল রক্তের ধারা নিজেই চেপে ধরে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি রক্ত বন্ধ করতে পারেননি।

হরিধর কক্ষে বসে পাহারা দিচ্ছিলেন তার বন্ধু সুনীল আর তার অতিথির মৃতদেহ। কক্ষে রক্তের স্রোত। বেরোবার উপায় নাই। হিংস্র হায়েনার দল তখন এ কক্ষে সে কক্ষে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যাদেরকে পেয়েছে তাদেরকেই হত্যা করেছে। হরিধর বিস্ময়ে বিমূঢ়। তার চেতনা শক্তি লোপ পাবার উপক্রম। হতবাক হয়ে বসে রয়েছেন। চিন্তা করছেন হরিধর, সুনীল ও তার অতিথি এবং অপরাপর ছাত্রদের শোচনীয় পরিণতির কথা। তিনি চিন্তা করছেন। খেই হারিয়ে যাচ্ছেন তবুও চিন্তা করছেন। হঠাৎ মনে পড়ল তার জানালার কয়টি শিক ভাঙা। চেষ্টা করলে হয়তো বেরোনো যাবে মৃত্যুপুরী থেকে এ পথে।

তখন শেষ রাত। হলের ভিতরে গোলাগুলির আওয়াজ কমে গেছে। হরিধর চেষ্টা করলেন। পাইপ বেয়ে নীচে নামলেন। কিন্তু নিরাপদ স্থান কোথায়। ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে এগুলেন তিনি পুকুরে দিকে। তখনও তার পা দিয়ে রক্ত ঝরছে। তবে রক্তের বেগ কমে গেছে। প্রায় জলের সাথে মিশে তিনি পুকুরের পারে ঘাসের মধ্যে আশ্রয় নিলেন। এরপর এখান থেকে তিনি আর সরেননি। ২৭ মার্চ সকাল পর্যন্ত হরিধর এ অবস্থাই কাটিয়েছিলেন।

সকালে কারফিউ তুলে নেওয়া হল। জনৈক দোকানি এ পথে যাবার সময় অর্ধমৃত হরিধরকে দেখতে পায়। তিনি হরিধরকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। বেশ কয়েকদিনের চিকিৎসার পর হরিধর সুস্থ হয়ে ওঠেন।

— দৈনিক পূর্বদেশ ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

হানাদারদের কবলে জগন্নাথ হল-৩

২৫ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র একজন ছাড়া আর কেউ এদের ক্রুদ্ধ ছোবল থেকে রক্ষা পাননি—

হলের ছাদে লাল টুকটুকে রক্তের স্রোত

তাদের বুকের সাইজ মিলিয়ে দাঁড় করানো হল। কয়েকটা লাইন। প্রতি লাইনে তিনজন। তারপর "ড্রিম ড্রিম" শব্দ। মেশিনগানের গুলি। সবাই একসঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। তারপর একটু নড়াচড়া করে মহান মৃত্যুর হিম শীতল স্পর্শে নীরব হয়ে গেলেন। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাদের কথা বলছি। হানাদার পাকিস্তানী হায়েনার দল ২৫ মার্চে শেষ রাতে হলের ছাদে আশ্রয়গ্রহণকারী বেশ কয়জন ছাত্রকে এমনিভাবে গুলি করে হত্যা করে।

শ্রীপরিমল গুহ বলেন : পাকিস্তানী নরপশুদের তাণ্ডবনৃত্য দেখে সত্য দাস, রবীন ও সুরেশ দাস সহ প্রায় জনা পঁচিশেক ছাত্র হলের ছাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন আত্মরক্ষার জন্য। একমাত্র সুরেশ ছাড়া আর কেউ ওদের ক্রুদ্ধ ছোবল থেকে রক্ষা পাননি। তিনি বলেছেন সুরেশ একটু বেঁটে-খাঁটো। বুকের সাইজ অন্যান্যদের সঙ্গে তার মিলছিল না। তাকে সবার পিছনে দাঁড় করানো হল। তারপর গর্জে উঠল মেশিনগান। সকলের বুক হানাদারদের মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল। হলের ছাদে লাল টুকটুকে রক্তের স্রোত বইল। সুরেশ বেঁটে-খাঁটো, তার বুকে গুলি লাগেনি। লেগেছিল তার ডান কাঁধে। তিনিও সকলের সাথে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন ঠিক মৃতের মতো।

মৃতের মিছিলে জীবন্ত

মৃতের মিছিলে জীবন্ত সুরেশ। আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় নিতে গিয়েও সবাই মৃত্যুর কোলে আত্মসমর্পণ করলেন; মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পারলেন না। কিন্তু শুধুমাত্র বেঁচে রয়েছেন তিনি। বেঁচে রয়েছেন তিনি এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের জীবন্ত সাক্ষী ও প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে। পরিমল বললেন, সুরেশের কাঁধের মাংস উড়ে গেছে মেশিনগানের শক্তিশালী গুলিতে। অবিরাম ধারায় রক্ত ঝরছিল ক্ষতস্থান থেকে। ক্ষতস্থান গায়ের জোরে চেপে ধরেও তিনি রক্ত বন্ধ করতে পারছিলেন না। নিজের শরীরের উষ্ণ রক্তে তিনি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন।

নিজের গায়ের টকটকে তাজা রক্ত অবিরাম ধারায় ঝরছে তো ঝরছেই। কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না তার রক্তপাত, রক্তের বেগ কমছে না। ব্যান্ডেজ করা দরকার, কিন্তু ব্যান্ডেজ করবেন কী দিয়ে। পরনের লুঙ্গি আর গায়ের গেঞ্জি ছাড়া তো আর কিছুই নেই। লুঙ্গি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে লুঙ্গির ছেঁড়া টুকরো দিয়েই তিনি তৈরি করলেন ব্যান্ডেজ। ছাদের উপর সারিবদ্ধ তরুণদের মৃতদেহ। প্রহরীর মতো তিনি জেগে আছেন একা। রক্তের স্রোত। হলের ছাদ লাল রক্তে ভেসে গেছে। চারিদিক নীরব নিঝুম। শুধু গোলাগুলির শব্দ ও মানুষের আর্তকান্না ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। পরিমল বলেই চলেছেন— মৃত্যুর পাশে বসে রয়েছেন সুরেশ। বসে রয়েছেন সুরেশ হতবাক হয়ে। মাঝে মাঝে তিনি চেতনা হারাচ্ছিলেন। নিজের বেঁচে থাকার উপর তার ধিক্কার আসছিল, আবার কখনও তার চোখের সামনে ভেসে উঠত ভিড় জমানো ফেলে আসা স্বপ্নরঙিন মধুময় হাজারো দিনের স্মৃতি।

আছড়ে আছড়ে কেঁদে কেঁদে সেসব স্মৃতি ফরিয়াদ জানাত। স্মৃতির মিছিলে সুরেশ নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন। হলের ছাদের উপর পানির ট্যাংক। হঠাৎ তার চেতনার উদয় হল। সুরেশ আর দেরি না করে পানির ট্যাংকে ঢুকলেন। ২৬ মার্চ পুরোদিন ও সারারাত তিনি পানির ট্যাংকেই কাটালেন আত্মগোপন করে। ২৭ তারিখে পানির ট্যাংকে আর থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। ২৭ তারিখে ভোরের দিকে হাতে প্রাণ নিয়ে তিনি ভয়ে ভয়ে নামলেন ছাদ থেকে।

এগিয়ে গেলেন জগন্নাথ হলের উত্তর পার্শ্বের রাস্তার দিকে। সুরেশ ভয়ে সোজা হননি। হামাগুড়ি গিয়ে এগুচ্ছিলেন। পরিমল গুহ তখন কারফিউ তুলে নেবার পর স্টাফ কোয়ার্টার থেকে এদিকের রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। সুরেশের সঙ্গে পরিমলের দেখা হওয়ায় সুরেশ প্রাণ ফিরে পেলেন। পরিমল গুহ পরে সুরেশকে নিয়ে চিকিৎসার

জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দিয়ে আসেন। পরিমল ছাদের নারকীয় হত্যালীলার কাহিনী সুরেশের কাছ থেকে শুনেছেন।

— দৈনিক পূর্বদেশ ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

হানাদারদের কবলে জগন্নাথ হল-৪

অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিল নরপশুরা। অমানুষিক প্রহারের ফলে তারা তিনজন যখন প্রায় আধমরা তখন তাদের লাইন বেঁধে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হল—

২৬ মার্চ সকাল ১১টা। হানাদার সৈন্যরা ৫ জনকে ধরে নিয়ে এল হলের ভিতরে। তাদের দিয়ে বিভিন্ন কক্ষ, হলের ছাদ, বারান্দা থেকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লাশগুলো নিয়ে ট্রাকে তুলল। হলের মাঠের মাঝখানে আগে থেকেই একটি বিরাট গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়েছিল। লাশগুলো সেখানে নিয়ে এল মাটিচাপা দেওয়ার জন্য। এই ৫ জনকেও সেখানে নিয়ে গেল। তারপর ঠিক গর্তের পারে তাদেরকে দাঁড় করিয়ে গুলি করল। সবাই সঙ্গে সঙ্গেই লুটিয়ে পড়ল।

শ্রীপরিমল গুহ বললেন ২৬ মার্চ সকালের কথা। তিনি তখনও ম্যানহোলে। স্বচক্ষে দেখেছেন এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, বীভৎস দৃশ্য। তিনি বলেছেন, এই ৫ জনের মধ্যে তিনি স্পষ্টভাবে কালীরঞ্জন শীলকে চিনতে পেরেছেন। আর কাউকে চেনা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাদের একত্রে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ করার পর হানাদার খুনিরা সবাই চলে গেল গাড়ি হাঁকিয়ে।

হয়তো তারা আরও শিকার ধরার জন্যেই গেল। মাঠের গর্তে আর গর্তের পারে পড়ে রইল অগণিত প্রাণের নিষ্প্রাণ দেহ। হঠাৎ এই মৃতের স্তূপ থেকে একজন লোক উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালাল। পরিমল গুহ বললেন, আমি স্পষ্ট দেখলাম এই ভাগ্যবান ব্যক্তি কালীরঞ্জন শীল।

জনৈক ইঞ্জিনিয়ারের স্যালুলয়েড ক্যামেরায় যার ছবি ধরা পড়েছে তিনি কালীরঞ্জন শীল। তিনি আবার ২৬ মার্চ ভোরের কথা বললেন। খুব ভোরে হানাদার সৈন্যরা অধ্যাপক অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যকে ধরে নিয়ে আসে মাঠে। শ্রীভট্টাচার্য হলেন একজন হাউজ টিউটর। এসেম্বলি বিল্ডিংয়ের একটি কক্ষে থাকতেন। পরিমল গুহ দেখেছেন হলের ছাত্র বিধান রায় এবং অপর একজন লোককে তারা ধরে নিয়ে আসল। শেষোক্ত ব্যক্তির বেশভূষায় তাকে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী বলে মনে হল।

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের পরনে ধুতি। তিনজনকে একত্র করা হল। প্রহারের পালা। তারা তাদেরকে বুট দিয়ে লাথি দিচ্ছিল, রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারছিল। বেদম প্রহার। তারা

চিৎকার করছিল, বিধান প্রহারের তীব্রতার সহ্য করতে না পেরে ছেড়ে দেবার জন্য কাকুতি মিনতি করছিলেন। বার বার প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন তাদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য। বিধানের কথাতে তারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিল। নরপশু সৈন্যরা প্রহারের তীব্রতা আরও বাড়িয়ে দিল।

অমানুষিক প্রহারের ফলে তারা যখন তিনজন প্রায় আধমরা হয়ে গিয়েছিলেন তখন তাদেরকে লাইন করে দাঁড় করানো হল। তারপর সেই পরিচিত মেশিনগানের শব্দ। তারা তিনজন এলিয়ে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। পরিমল গুহ বললেন, তিনি ২৬ মার্চ মাঠে মানবতার পূজারী প্রখ্যাত দার্শনিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেবের মৃতদেহ দেখেছেন। তার গা খালি ছিল। সৈন্যরা তাঁকে উপুড় করে শুইয়ে রেখেছিল মাটি চাপা দেবার জন্য।

— দৈনিক পূর্বদেশ ২৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

‘‘জগন্নাথ হলের মাঠে ২৬ মার্চের সকালে যে মর্মস্পর্শী দৃশ্য দেখেছি আমরা, জানালা থেকে টেলিস্কোপ লাগিয়ে মুভি ক্যামেরায় তা ধরে রেখেছি’’—

যিনি টেলিভিশন ক্যামেরায় ধরে রেখেছেন ২৫ মার্চের হত্যাকাণ্ডের হৃদয়বিদারক দৃশ্য সেই বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎকৌশলের অধ্যাপক ড. নুরুলউল্লার সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকার।

প্রশ্ন : আপনি কি ২৫ মার্চের হত্যাকাণ্ডের ছবি নিজ হাতে তুলেছেন?

উত্তর : হ্যাঁ আমি জগন্নাথ হলের মাঠে ২৬ মার্চের সকালবেলা যে মর্মস্পর্শী দৃশ্য ঘটেছিল তার ছবি আমার বাসার জানালা থেকে টেলিস্কোপ লাগিয়ে মুভি ক্যামেরায় তুলেছিলাম।

প্রশ্ন : এ ছবি তোলার জন্য কি আপনার কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছিল, না এমনি হঠাৎ করে মনে হওয়াতে তুলে নিয়েছেন?

উত্তর : ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের ভাষণের পর থেকেই আমার একটা ধারণা হয়েছিল, যে এবার একটা বিরাট কিছু পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে। তাই তখন থেকেই বিভিন্ন সভা, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ মিছিল, মশাল মিছিল, ব্যারিকেড ইত্যাদির ছবি আমি তুলতে আরম্ভ করি।

প্রশ্ন : ক্যামেরাটি কি আপনার নিজস্ব?

উত্তর : না, ওটা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিভিশন ভিডিয়ো টেপ ক্যামেরা।

ছাত্রদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনি ধরনের আরও বহু ক্যামেরা ও জটিল যন্ত্রপাতি রয়েছে।

প্রশ্ন : ক্যামেরাটি আপনার কাছে রেখেছিলেন কেন?

উত্তর : এর জবাব দিতে গেলে আমাকে আরও একটু পেছনের ইতিহাস বলতে হয়। ইতিহাস কথাটা বলছি এ জন্য, যে এগুলো ইতিহাসের পাতায় লিখে রাখা উচিত। ৭ মার্চের পরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের কিছু ছেলে এসে আমাকে ধরল, "স্যার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের যন্ত্রপাতি দিয়ে একটি অয়্যারলেস স্টেশন তৈরি করতে হবে।" আমি ওদের কথা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। এরপরে ওরা একদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কথা ঠিক করে আমাকে তার ধানমণ্ডির বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আমাকে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির একেবারে ভিতরের এক প্রকোষ্ঠে নিয়ে যাওয়া হল। আমি প্রথমে ব্যাপারটার গুরুত্ব অতটা উপলব্ধি করতে পারিনি। অনেক ভিতরের একটা কক্ষে নিয়ে যাওয়ার পরে আমি দেখলাম সেখানে সোফার উপরে তিনজন বসে রয়েছেন। মাঝখানে বঙ্গবন্ধু। তার ডানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব ও বাঁ পাশে তাজউদ্দিন সাহেব।

আমি ঢুকে বঙ্গবন্ধুকে সালাম করলাম। ছাত্ররা আমাকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। যদিও আগেও অনেকবার তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি সোফা থেকে উঠে এসে আমাকে ঘরের এককোণে নিয়ে গেলেন। আমার কাঁধে হাত রেখে অত্যন্ত সন্তর্পণে বললেন, "নুরুলউল্লা, আমাকে ট্রান্সমিটার তৈরি করে দিতে হবে। আমি যাবার বেলায় শুধু একবার আমার দেশবাসীর কাছে কিছু বলে যেতে চাই। তুমি আমায় কথা দাও, যেভাবেই হোক একটা ট্রান্সমিটার আমার জন্য তৈরি রাখবে। আমি শেষবারের ভাষণ দিয়ে যাব।" বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ তখন আমার কাছে বাচ্চা শিশুর আবদারের আবেগময় কণ্ঠের মতো মনে হচ্ছিল। এর পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আমাদের তড়িৎকৌশল বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকদের কাছে সব কথা খুলে বললাম। শুরু হল আমাদের কাজ। বিভাগীয় প্রধান ড. জহুরুল হক সহ প্রায় সকল শিক্ষকই আমাকে সহযোগিতা করতে লাগলেন। ৯ দিন কাজ করার পর শেষ হল আমাদের ট্রান্সমিটার। এর ক্ষমতা বা শক্তি ছিল প্রায় সারা বাংলাদেশব্যাপী। শর্ট ওয়েভে এর শব্দ ধরা যেত। যাহোক পরবর্তী সময়ে এর ব্যবহার আসেনি। এই সঙ্গেই আমার মাথায় ধারণা এল, যদি কোনো হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ বা গোলাগুলি হয় তা হলে তা আমি ক্যামেরায় তুলে ফেলব এবং সে থেকেই ক্যামেরাটি আমার সঙ্গে রাখতাম।

প্রশ্ন : আপনি কখন ছবি তোলা শুরু করেন?

উত্তর : রাত্রে ঘুমের মাঝে হঠাৎ বিকট শব্দ শুনে আমাদের সকলের ঘুম ভেঙে যায়। অবশ্য আমরা তখন অতটা গুরুত্ব দিইনি। আমি ভেবেছিলাম যে আগের মতোই হয়তো

ছাত্রদেরকে ভয় দেখাবার জন্যে ফাঁকা গুলি করা হচ্ছে। অথবা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা আমাদের নির্দেশ ও সহযোগিতায় যে সমস্ত হাত বোমা তৈরি করছিল তারই দু'একটা হয়তো বিস্ফোরিত হয়েছে। সারা রাতটা একটা আতঙ্কের মধ্যে কাটালাম। জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে জগন্নাথ হলের দিকে তাকালাম। কিন্তু সমগ্র এলাকাটা আগে থেকেই বিদ্যুৎ লাইন কেটে দেওয়াতে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। রাতে জগন্নাথ হলের এলাকায় কী হচ্ছিল কিছুই দেখতে পারলাম না। শুধু গোলাগুলির শব্দ শুনছিলাম। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে ওখানে দুপক্ষেই একটা ছোটোখাটো লড়াই হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্যামেরাটার কথা মনে পড়ে গেল। অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন সকাল হবে আর দিবালোকে আমি ছবি তুলতে পারব।

প্রশ্ন : আপনি যে ক্যামেরা বসিয়েছিলেন তা কি বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল না?

উত্তর : এমনভাবে ক্যামেরা বসানো হয়েছিল যে বাইরে থেকে বোঝার কোনো উপায় নেই। কারণ পর্দার আড়ালে এমনভাবে বসানো হয়েছিল যে শুধু ক্যামেরার মুখ বের করা ছিল। পুরো ক্যামেরাটা কালো কাপড় দিয়ে মোড়ানো ছিল। আমাদের জানালাগুলো এমনভাবে তৈরি যে বন্ধ করার পরেও ধাক্কা দিলে কিছুটা ছোটো ফাঁক থেকে যায়। ওই ফাঁক দিয়ে ক্যামেরার মুখটা বাইরে বের করে রাখলাম।

প্রশ্ন : ক্যামেরা চালু করেন কখন?

উত্তর : সকাল ৭টা থেকে ৮টার মধ্যবর্তী সময়ে। জানালা দিয়ে লক্ষ্য করলাম যে জগন্নাথ হলের সামনের মাঠে কিছু ছেলেকে ধরে বাইরে আনা হচ্ছে এবং তাদেরকে লাইনে দাঁড় করানো হয়েছে, তখনই আমার সন্দেহ জেগে যায় এবং আমি ক্যামেরা অন করি। আমাদের ক্যামেরাটির একটা বিশেষ গুণ এই যে, এতে মাইক্রোফোন দিয়ে একই সঙ্গে শব্দ তুলে রাখা যায়। তাই আমি টেপের সঙ্গে মাইক্রোফোন যোগ করিয়ে ক্যামেরা চালু করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম যে ছেলেগুলোকে এক ধারসে গুলি করা হচ্ছে ও একজন করে পড়ে যাচ্ছে। পাক সেনারা আবার হলের ভিতরে চলে গেল। আমি ভাবলাম আবার বেরিয়ে আসতে হয়তো কিছু সময় লাগবে। তাই এই ফাঁকে আমি টেপটা ঘুরিয়ে আমার টেলিভিশন সেটের সঙ্গে লাগিয়ে ছবি দেখতে লাগলাম যে, ঠিকভাবে উঠেছে কি না। এটা শেষ করতেই আবার জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম যে, আবার কিছুসংখ্যক লোককে ধরে নিয়ে এসেছে। আবার লাইন করে দাঁড় করানো হয়েছে। আমি তখন পূর্বের তোলা টেপটা মুছে ফেলে তার উপর আবার ছবি তোলা শুরু করলাম।

প্রশ্ন : আপনি পূর্বের তোলা ছবিটার টেপ কেন মুছে ফেললেন?

উত্তর : আমার মনে হচ্ছিল আমার আগের ছবিতে সবকিছু ভালোভাবে আসেনি। আর নতুন ছবি তুলতে গিয়ে আমি হয়তো আরও হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য ধরে রাখতে পারব।

আর হাতের কাছে আমার টেপ ছিল না। মোট কথা আমি ওই সমস্ত দৃশ্য দেখে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে পাগলের মতো হয়ে গেলাম। আজও আমি দুঃখ করি যদি, আমি নতুন টেপে ছবি তুলতে পারতাম তাহলে কত ভালো হত। দুটো দৃশ্য মিলে আমার টেপের দৈর্ঘ্য বেড়ে যেত। কিন্তু তখন এত কিছু চিন্তা করার সময় ছিল না। যা হোক, দ্বিতীয়বারের লাইনে দেখলাম একজন বুড়ো দাড়িওয়ালা লোক রয়েছে। সে বসে পড়ে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছে। আমার মনে হচ্ছিল সে তার দাড়ি দেখিয়ে বোঝাতে চেয়েছিল যে সে মুসলমান। কিন্তু বর্বর পাকবাহিনী তার কোনো কথাই শুনতে চায়নি। তাকে গুলি করে মারা হল। মাঠের অপর অর্থাৎ পূর্বপার্শ্বে পাকবাহিনী একটা তাঁবু বানিয়ে ছাউনি করেছিল। সেখানে দেখছিলাম, ওরা চেয়ারে বসে বেশ কয়েকজন চা খাচ্ছে আর হাসি-তামাশা ও আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়ছে।

প্রশ্ন : লোকগুলোকে হলের ভিতর থেকে কীভাবে আনা হচ্ছিল?

উত্তর : যাদেরকে আমার চোখের সামনে মারা হয়েছে ও যাদের মারার ছবি আমার ক্যামেরায় রয়েছে তাদের দিয়ে প্রথমে হলের ভিতর থেকে মৃতদেহ বের করে আনা হচ্ছিল। মৃতদেহগুলি এনে সব এক জায়গায় জমা করা হচ্ছিল এবং ওদেরকে দিয়ে লেবারের কাজ করাবার পরে আবার ওদেরকেই লাইনে দাঁড় করিয়ে এক সারিতে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। মনে হচ্ছিল একটা করে পড়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন : জমা করা মৃতদেহের সংখ্যা দেখে আপনার ধারণায় কতগুলো হবে বলে মনে হয়েছিল?

উত্তর : আমার মনে হয় প্রায় ৭০/৮০ জনের মৃতদেহ এক জায়গায় জমা করা হয়েছিল।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় যে ওগুলো সবই ছাত্রদের মৃতদেহ?

উত্তর : আমার মনে হয় ছাত্র ছাড়াও হলের মালি, দারোয়ান, বাবুর্চি এদেরকেও একই সঙ্গে গুলি করা হয়েছে। তবে অনেক ভালো কাপড়চোপড় পরা অল্পবয়সী দেখে আমার মনে হয়, তারা ছাত্রদের গেস্ট হিসাবে হলে থাকছিল।

প্রশ্ন : আপনি কি দেখেছেন যে কাউকে গুলি না করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে?

উত্তর : না, তবে লাইনে দাঁড় করাবার পরে যে খান সেনাটিকে গুলি করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছিল সে যখন পিছনে তার অফিসারের দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়েছিল এই ফাঁকে দু'জন লোক সামনে স্তূপ করা মৃতদেহগুলির মধ্যে শুয়ে পড়ল। আর বাকিগুলোকে গুলি করে মারা হল। গুলি করে যখন খানসেনারা সবাই কয়েক ঘণ্টার জন্য এই এলাকা ছেড়ে চলে গেল সেই ফাঁকে ওই দু'জন উঠে প্রাণ ভয়ে পালাতে লাগল। পরবর্তীকালে তাদের একজন আমার বাসায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সে একজন ছাত্রের অতিথি হিসাবে হলে থাকছিল। ঢাকায় এসেছিল চাকরির ইন্টারভিউ দিতে।

প্রশ্ন : আপনি কি আপনার ইচ্ছামতো সব ছবি তুলতে পেরেছিলেন?

উত্তর : না, আমি আগেই বলেছি যে আমি থেমে থেমে তুলছিলাম, পাছে টেপ ফুরিয়ে যায়। তাই আমি সব ছবি তুলতে পারিনি বলে আমারও ভীষণ দুঃখ হচ্ছে। কারণ পরে যখন বুলডোজার দিয়ে সব লাশগুলোকে ঠেলে গর্তে ফেলা হচ্ছিল সে ছবি আমি তুলতে পারিনি। কারণ ওরা কিছুক্ষণের জন্যে চলে যাবার পরপরই আমার পরিবারের সদস্যদের জীবনের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে আমাকে বাসা ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল।

প্রশ্ন : আপনি কি টেপ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন?

উত্তর : না, আমি সঙ্গে নেওয়াটা আরও বিপদের ঝুঁকি বলে মনে করে বাসায়ই যত্ন সহকারে রেখে যাই। আর এ ঘটনা আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ জানত না। বাইরে নিয়ে গেলে হয়তো অনেকেই জেনে ফেলত এবং আজকে এই মূল্যবান দলিল আমি দেশবাসীর সামনে পেশ করতে পারতাম না।

প্রশ্ন : আপনি কখন এই টেপ সবার সামনে প্রকাশ করলেন?

উত্তর : যুদ্ধচলাকালীন নয় মাস প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত আমার আতঙ্কের মধ্যে কেটেছে। কখন কে জেনে ফেলে। কখন আমি ধরা পড়ে যাই বা কখন এটা এসে নিয়ে যায়। এমনি মানসিক যন্ত্রণায় আমি ভুগছিলাম। যাহোক, দেশ স্বাধীন হবার পরে ১৭ ডিসেম্বর-এর দিকে আমি আস্তে আস্তে প্রকাশ করলাম আমার এই গোপন দলিলের কথা এবং ২/৩ দিন পরেই এটা আমি সবাইকে জানালাম ও কয়েকদিন পরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও অন্যান্যদের এটা দেখালাম। এ খবর শুনে অনেক বিদেশি সাংবাদিক আমার কাছে বহু টাকার বিনিময়ে এই দলিলের অরজিনাল কপি অর্থাৎ আসল টেপ কিনতে চাইলেন।

প্রশ্ন : আপনি কি রাজি হলেন?

উত্তর : আমার রাজি হবার প্রশ্নই ওঠে না। অরিজিনাল কপি আমি হারালে সেটা আমার দেশের জন্য বিরাট ক্ষতি হবে।

To
The Chairman
Human Rights Commission
Geneva
Switzerland
Europe

Sir,

I was a court Sub-Inspector of police at Sadar Noakhali, Maijdee having residence at Govt. Flat No. 9/B. Owing to the atrocities committed by the Pakistani troops at Maijdee we took shelter in my daughter's house at Bartali, within P.S. Lakshipur in the district of Noakhali.

On 7-5-71 the Pakistani troops came and burnt the house of my daughter. Those Pak forces burnt the Hindu houses including that of Dhirendra Nath Dutt.

Tha Pak forces fired indiscriminately on paddy fields killing both the Hindu and Muslim cultivators. On 7-5-71 the Pak troops burnt 21 houses of both communities and killed 30/32 Hindus and Muslims. On 9-5-71 the Pak troops burnt one washerman's house and shot dead three persons there. On the same day the house of Niranjan Banarjee of Mandari Bazar and that of Advocate M. Ahmed Ullah were burnt and one Barek Majhi was killed. On the same day the Pak troops killed a sweeper when on physical examination, he was found to have been a Hindu.

On 7-5-71 the Pak troops entered into Battali village and raped four Muslim women.

Sd/- Ranendra Chandra Dey
3.6.71

To
The Chairman
Human Rights Commission
Geneva

Sir,

I was a permanent resident of village Ulwon P.S. Tejgaon, Dacca in Bangaladesh formerly known as East Pakistan.

On 11-5-71 three armed soldiers of Pakistan Army entered into the house of my neighbour Mr. Kader and two of them forcibly dragged away his young daughter. On hearing the cries of his daughter Mr. Kader rushed to her rescue and grappled with the other armed soldier. But he was also forcibly taken out and the Pakistan troops assaulted him mercilessly and wounded him by Bayonets. They assaulted the daughter and left her.

One Peace Committee member Mr. Golam Azam in vain complained to the Millitary Authorities.

The Pak troops entered into shops, lifted goods but did not pay except for occasional small payments.

One Awal who is lamed and the Union Committee Chairman invited the Pakistani troops to village Baira P.S. Tejgaon alleging presence of Mukti Fouj there. The Pakistani Troops came and killed about 500 to 600 persons all Namasudras (Scheduled Cast) and the other collaborators of the Pakistani troops caught hold of passers by, took away all their money and assaulted them.

These are for your information and action.

Yours Sincerely,
Sd/- Supal Chandra Das
10-6-71

N.B. To save my life I escaped to Agartala in India and I am posting this letter.

To
The Chairman
Human Rights Commission
Geneva
Switzerland
Europe

Sir,

I am a 19 year old B. Sc. Examinee from Tularam College Narayangonj, Dacca. On 27-3-71 the Pakistani soldiers launched attack on Narayanganj with heavy weapons destroying whatever fell on their path. Like others I also left my permanent residence at Nayamati, in Narayanganj Twon and came to Gopchar.As a result of indiscriminate firing from heavy weapons two young girls were lying dead on Gopchar field. I crossed Dhaleswari river and saw fleeing people including many injured. At last I could find my family menbers. After three days I went back to Narayanganj undertaking very risk and found our house completely looted even my books not excluded. I saw the Awami League Office at Narayanganj severely damaged and many houses burnt to ashes. I saw a good number of dead bodies lying- at the railway crossing. I also saw all the houses of Palpara and Debagram burnt and destroyed. I saw dead bodies which like the other ones but the result of indiscriminate shooting by the Pakistani soldiers at Baburail. At Sreenagar Police Station through which I retreated I saw all the Hindu houses burnt and all the Hindus available there' killed by the Pakistani soldiers.

The Pakistani soldiers oppressed and killed whomsoever they consider Awami League supporter.

The Pak troops looted the houses of Jogesh Doctor at Singpara and got the adjacent houses by the local miscreants. The Pak soldiers also looted the Dispensary of Dr. Jogesh.

I Solicit prompt action to stop the unprecedented genocide.
Yours Sincerely,

Sree Gopal Krishna Guha
22-6-71
S/o. Monoranjan Guha,
Nayamati, Narayanganj Town. Dacca.

To
The Chairman
Human Rights Commission
Geneva

Sir,

I used to live with my husband Amal Kanti Sarkar at No. 4/ B-L, Dacca, Sahajahanpur Rly. Colony, Dacca.

Two days back I crossed into Tripura border. After 25-3-71 we continued to stay at our Dacca residence. In the very early part of April at about 8/9 A. M. my husband went out and I went to my neighbour Mr. Idris Ali's house. The Pakistani troops looted our house. It was then 10 A.M. my husband did not return. My host Mr. Idris Ali arranged to send me to the Indian border. In June last the Pak troops came in jeeps raided Demra area set fire to the houses, killed people by gun fire and took away women and girls of both communities. The people did no more return. The Pak troops drew out blood from young men who were killed in the process. The Pak troops collected girls and kept them confined in a building in Demra. The Pak troops killed 7 persons and burnt houses in Sadarghat area.

Sd/- Dipali Rani Sarker
24-7-71

To
The Chairman
Human Rights Commission
Geneva

Sir,

I was a permanent resident of P.O. & village Narsingdi, Dacca. After the bombing of Narsingdi on 28th March, 1971 from Air I crossed into Agartala in India and have been residing in the care of Gouranga Chandra Saha of Nazirpukurpar, Agartala. Entire Narsingdi Bazar have burnt in course of bombing 28-3-71 and 29th March, 1971 as a result at least 100 people were killed. Following these actions by the Pak Armed forces we moved 5 miles away but had to leave the place for fear of the anti-social elements who were engaged by the Pak troops of perpetrate all sorts of crimes. In course of time we reached Bazidpur from where we had to move again for the same reason. We reached Halajia where also the Pak troops came and killed 5 persons and looted the houses. We hided ourselves in the Jute field. 35 girls were taken away by the Pakistani troops from Bazidpur. Those unfortunate girls did no more return. The same story was to be witnessed almost every where.

I may mention that I was a student of Narsingdi College. I am 22 year old. These are for your information and action.

sd/–
Swapan Kumar Saha
18-6-71

To
The Chairman
Human Rights Commission
Geneva

Sir,

My name in Kalimuddin Mia S/o. Salim Ali, age 35, vllage Jinjira, Dist. Dacca.

Our house was on the other side of Buriganga near the river. On April 2, at night, all on a sudden Pakistan troops started shelling our village from the city side of the river. Some of them crossed the river and by that time many of us started fleeing. I had my old mother and my wife and children to look after. By the time the army arrived I could not manage to get everybody out. Six army men entered our house, shot to death without saying anything my children and my mother and took away my wife Amina Bibi. When they entered the house I was just outside packing up some belongings to take with us when we decided to leave. This all happened in 2/3 minutes. When I looked though the window I saw the army men were taking away my wife.

Sd/- Kalimuddin Mia
4-8-71

বদলু ডোম

ওয়ারি সুইপার কলোনি, ঢাকা

আমি ১৯৭১ সনের ২৮ মার্চ আমাদের সুইপার সুপারভাইজার পঞ্চমের দলে মিটফোর্ড হাসপাতালের লাশঘর থেকে লাশ তুলেছি। কয়েকদিন পর আমি সুপারভাইজার সাহেব আলির দলে মিলব্যারাক পুলিশ লাইনের নদীর পাড় থেকে পনেরো জন যুবক, একজন

সাধু ও বৃদ্ধার ক্ষতবিক্ষত, ফুলা, পচা লাশ তুলেছি। প্রতিটি লাশ চোখ ও হাত-পা বাঁধা ছিল। এরপর আমরা বাবুবাজার পুলের উপর থেকে এক অন্ধ ফকিরের লাশ পেয়েছি। আমরা সেইদিন সদরঘাট নদীর পাড় থেকে জলে ভাসতে থাকা হাত-পা বাঁধা ফুলা লাশ তুলেছি। সদরঘাট, শ্যামবাজার, ওয়াইজঘাট, বাদামতলী এলাকায় আমরা নদীর পাড় ও জল থেকে বৃদ্ধ, যুবা ও শিশুর লাশ তুলেছি। কয়েকদিন পর আমরা মন্দিরের সামনে থেকে দুধওয়ালা সাধুর লাশ তুলেছি, শাঁখারিবাজারে প্রবেশ করে মন্দিরের সামনের বাড়ির ভিতর থেকে শিশু-কিশোর, বৃদ্ধ-যুবা, যুবক-যুবতীর দশটি পোকায় খাওয়া গলিত লাশ নিয়ে এসেছি। কয়েকদিন পর আমি রমনা কালীবাড়ি থেকে— মন্দিরের ভিতর থেকে পাঁচটি এবং কালীবাড়ির প্রবেশপথে দুটি চোখ ও হাত-পা বাঁধা পচা লাশ তুলেছি। গোয়ালঘরে তিনটি গোরু গুলিতে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলাম। এরপর পাকসেনারা আমাদের নির্মমভাবে মারপিট করায় আমরা আর লাশ তুলতে যাই নাই।

স্বাক্ষর
বদলু ডোম
১১-৫-৭৪

চুনু ডোম

ঢাকা পৌরসভা, রেলওয়ে সুইপার কলোনি

২২৩ নং ব্লক, ৩ নং রেল গেট, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা

১৯৭১ সনের ২৮ মার্চ সকালে আমাদের পৌরসভার সুইপার ইন্সপেক্টর ইদ্রিস সাহেব আমাকে লাশ উঠাবার জন্য ডেকে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিতে নিয়ে যান। সেখান থেকে আমাকে, বদলু ডোম, রঞ্জিত লাল বাহাদুর, গণেশ ডোম ও কানাইকে একটি ট্রাকে করে প্রথম শাঁখারিবাজারের কোর্টের প্রবেশপথের সম্মুখে নামিয়ে দেয়। আমরা উক্ত পাঁচজন দেখলাম, ঢাকা জজকোর্টের দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথের যে রাজপথ শাঁখারিবাজারের দিকে চলে গেছে সেই রাস্তার দু'ধারে ড্রেনের পাশে যুবক-যুবতীর, নারী-পুরুষের, কিশোর-শিশুর বহু পচা লাশ। দেখতে পেলাম, বহু লাশ পচে ফুলে বীভৎস হয়ে আছে, দেখলাম শাঁখারিবাজারের দুদিকের ঘর-বাড়িতে আগুন জ্বলছে, অনেক লোকের অর্ধপোড়া লাশ পড়ে থাকতে দেখলাম, দুই পার্শ্বে অদূরে সশস্ত্র পাঞ্জাবী সৈন্যদের প্রহরা মোতায়েন দেখলাম। প্রতিটি ঘরে দেখলাম মানুষ, আসবাবপত্র জ্বলছে। একটি ঘরে প্রবেশ করে একজন মেয়ে, একজন শিশুসহ বারোজন যুবকের লাশ উঠিয়েছি। শাঁখারিবাজারের প্রতিটি ঘর থেকে যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা, কিশোর-শিশু ও বৃদ্ধের লাশ তুলেছি। পাঞ্জাবীরা প্রহরায় থাকাকালে সেই মানুষের অসংখ্য লাশের উপর বিহারীদের উচ্ছৃঙ্খল

উল্লাসে ফেটে পড়ে লুট করতে দেখলাম। প্রতিটি ঘর থেকে বিহারী জনতাকে মূল্যবানসামগ্রী, দরজা-জানালা, সোনাদানা সবকিছু লুটে নিয়ে যেতে দেখলাম। লাশ উঠাতে উঠাতে এক ঘরে প্রবেশ করে এক অসহায়া বৃদ্ধাকে দেখলাম— বৃদ্ধা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে জল-জল করে চিৎকার করছিল, তাকে আমি জল দিতে পারি নাই ভয়ে, বৃদ্ধাকে দেখে আমি আরও ভীত হয়ে পালিয়ে এসেছি। আমি জল দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমাদের পিছনে সশস্ত্র পাঞ্জাবী সেনা প্রহরায় থাকায় আমি সেই বৃদ্ধাকে জল দিয়ে সাহায্য করতে পারি নাই। আমরা ১৯৭১ সনের ২৮ মার্চ শাঁখারিবাজার থেকে প্রতিবারে একশত লাশ উঠিয়ে তৃতীয়বার ট্রাক বোঝাই করে তিনশত লাশ ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি। ১৯৭১ সনের ২৯ মার্চ সকাল থেকে আমরা মিটফোর্ড হাসপাতালের লাশঘর ও প্রবেশপথের দুপার্শ্ব থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিববাড়ি, রমনা কালীবাড়ি, রোকেয়া হল, মুসলিম হল, ঢাকা হল থেকে লাশ উঠিয়েছি। ২৯ মার্চ আমাদের ট্রাক প্রথম ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের প্রবেশপথে যায়। আমরা উক্ত পাঁচজন ডোম হাসপাতালের প্রবেশপথে নেমে একটি বাঙালি যুবকের পচা, ফুলা, বিকৃত লাশ দেখতে পেলাম। লাশ গলে যাওয়ায় লোহার কাঁটার সঙ্গে গেঁথে লাশ ট্রাকে তুলেছি। আমাদের ইন্সপেক্টর পঞ্চম আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এরপর আমরা লাশঘরে প্রবেশ করে বহু যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-কিশোর ও শিশুর স্তূপীকৃত লাশ দেখলাম। আমি এবং বদলু ডোম লাশঘর থেকে লাশের পা ধরে টেনে ট্রাকের সামনে জমা করেছি, আর গণেশ, রঞ্জিত (লালবাহাদুর) এবং কানাই লোহার কাঁটা দিয়ে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে পচা, গলিত লাশ ট্রাকে তুলেছে। প্রতিটি লাশ গুলিতে ঝাঁজরা দেখেছি। মেয়েদের লাশ দেখে মনে হয়েছে, তাদের হত্যা করার পূর্বে তাদের স্তন সজোরে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, যোনিপথে লোহার রড কিংবা বন্দুকের নল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যুবতী মেয়েদের যোনিপথের এবং পিছনের মাংস যেন ধারালো চাকু দিয়ে কেটে অ্যাসিড দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি যুবতী মেয়ের মাথায় খোঁপা খোঁপা চুল দেখলাম। মিটফোর্ড থেকে আমরা প্রতিবারে একশত লাশ নিয়ে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি।

ছোটন ডোম (৭০)

রেলওয়ে সুইপার কলোনি
২২৩ নং ব্লক, ৩ নং রেল গেট
ফুলবাড়িয়া, ঢাকা

১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ সকাল আটটায় ঢাকা পৌরসভার সুইপার সুপারভাইজার পঞ্চম আমাদের নিতে আসেন। পাকসেনারা রাজধানী ঢাকার বহু লোককে নির্বিচারে

হত্যা করার ফলে বিভিন্ন এলাকায় যে সকল লাশ পচে ফুলে রাস্তায় পড়ে আছে তা তুলে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলার জন্য রেলওয়ে কলোনি থেকে আমাকে ও দুখীলালকে ডেকে নিয়ে যায়। আমরা ঢাকা পৌরসভায় গিয়ে সেখানে আমার ভাতিজা ডোম গাংওয়া, আমার মেয়ের জামাই হরি ডোম, সন্টু, ফেকু ডোম, দরবারি, গণেশ, লেমু, লালবাহাদুর, খুবী, পরদেশি, অর্জুন সবাইকে হাজির দেখেছি। আমার দলে আমরা— আমি, দরবারি, মহেশ, কানহাই, হরি, ফেকওয়া এই ছয়জন ছিলাম। সুইপার সুপারভাইজার পঞ্চম আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমাদের ট্রাক ইংলিশ রোডের মুখের রায়সাহেব বাজারের প্রবেশপথ দিয়ে গোয়ালনগরের স্কুল ও মন্দিরের সম্মুখে যেয়ে থামানো হয়। মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করে হাফ শার্ট ও হাফ প্যান্ট পরা এক চৌদ্দো বছরের সুন্দর ফুটফুটে ছেলের সদ্য মৃত লাশ দেওয়ালে ঠেশ দিয়ে পড়ে থাকতে দেখলাম— ছেলেটিকে রাস্তা থেকে তাড়িয়ে নিয়ে পিছন দিক থেকে হাত বেঁধে মাথার পিছন দিক থেকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। মাথার পিছন দিক দিয়ে অঝোরে তাজা রক্ত ঝরতে দেখলাম— সদ্য মৃত তাজা লাশ, হাত দিয়ে বড়ো আদরের সঙ্গে ট্রাকে তুলে দিলাম। কচি ছেলের তুলতুলে লাশ তুলতে গিয়ে আমার হৃদয় যেন কেঁপে উঠল, হাহাকার করে উঠল। হায়, না জানি কোন্ মায়ের আদরের দুলাল, চোখের মণিকে পশুরা তাড়িয়ে এনে এভাবে হত্যা করে রেখে গেছে। লাশের ডাগর ডোগর চোখের দিকে তাকাতেই আমার চোখ বেয়ে পানি ঝরতে লাগল অঝোরে, আমি কিছুতেই আমার চোখের পানি আটকে রাখতে পারলাম না। পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে রাস্তার উপর আরও একটি যুবকের তাজা লাশ দেখলাম— উভয়ই মুসলমান যুবকের লাশ। গোয়ালনগরের দক্ষিণ দিকের রাস্তা দিয়ে আমরা অগ্রসর হয়ে দুর্গা মায়ের মন্দিরের নিকটবর্তী বাড়ির অভ্যন্তরে রান্নাঘরে প্রবেশ করে সেখানে একঘরেই এগারোটি পচা ফুলা লাশ দেখলাম— তিনজন বাইরে— অবশিষ্টগুলি পালং-এর নীচে। একজন অর্ধ বয়সের রূপসি মহিলা মাথায় কোমর পর্যন্ত লম্বা চুল, হরিণের মতো মায়াময় চোখ, লাবণ্যময় দেহ, সারা দেহের উপর যেন ভগবান দুধের সর বিছিয়ে দিয়েছিলেন। প্রবেশপথে দুটি যুবক ও একজন কিশোরের লাশ দেখলাম— ঘরের ভিতরে পালং-এর নীচে থেকে আরও ছয়জন যুবক ছেলের লাশ তুলে আনলাম। পাশের ঘরে প্রবেশ করে দু'জন যুবক ছেলে ও একজন মধ্যবয়সি লোকের পচা লাশ তুলেছি। উপরোক্ত সমস্ত লাশ আমি ধলপুর ময়লার ডিপোতে নিয়ে গিয়ে দেখলাম— বড়ো বড়ো গর্ত করে কুলিরা বসে আছে— ট্রাক থামিয়ে আমরা সব লাশ গর্তে ঢেলে দিলে কুলিরা মাটি ফেলে গর্ত বন্ধ করে দিল। লাশ উঠাবার জন্য আমাদের প্রত্যেককে মাত্র তিন টাকা করে দিলে আমি সারাদিন না খেয়ে লাশ তুলতে অস্বীকার করে চলে আসি। সারাদিন লাশ তুলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। পরেরদিন থেকে আমি আর লাশ তুলতে যাই নাই।

পঞ্চম

সুইপার সুপারভাইজার

ঢাকা পৌরসভা, সুইপার কলোনি,
গণকটুলী নওয়াবগঞ্জ, ঢাকা

আমি ১৯৭১ সনের ২৫ মার্চ কালরাতে গণকটুলী পৌরসভার সুইপার কলোনিতে ছিলাম। এখানে আমাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আমার সঙ্গে অবস্থান করছিল। সেইদিন রাত থেকে আমাদের কলোনির চারিদিকে সান্ধ্য আইন জারি করে বর্বর পাকসেনারা ই.পি.আর, হেড কোয়ার্টারে বাঙালি জোয়ানদের নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে। আমরা কলোনিতে সকল সুইপার দরজা-জানালা বন্ধ করে মৃত্যুর প্রহর গুনছিলাম। বাইরে চলছিল চারিদিকে বৃষ্টির মতো গোলাবর্ষণ। ২৭ মার্চ সকাল নয়টায় পাকসেনারা সান্ধ্য আইন কিছুক্ষণের জন্য উঠিয়ে নিলে আমরা সবাই সপরিবারে ঢাকার বাংলাদেশ মাঠ (পূর্বের নাম পাকিস্তান মাঠ- আগা সাদেক রোড) সংলগ্ন সুইপার বস্তিতে আশ্রয় গ্রহণ করি। গণকটুলীর আমাদের সুইপার কলোনিতে একজন পুরুষ সুইপারকে মুখ ধোয়ার সময় এবং কাউসিলা দেবী নামে একজন হিন্দু সুইপারকে পাকসেনারা গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে। "পৌরসভার সকল কর্মচারীকে অবিলম্বে কাজে যোগদান করতে হবে"— রেডিয়ো মারফত আমি এ ঘোষণা শুনে চাকুরির স্বার্থে পৌরসভায় এসে রিপোর্ট করি। অফিসে এসে দেখলাম, পৌরসভার তৎকালীন কনসারভেন্সি অফিসার ইদ্রিস সাহেব ক্রোধান্ধ হয়ে ডোমদের ডাকছেন। তার নির্দেশে আমি, সুইপার ইন্সপেক্টর রামদীন, ডোম পরদেশি, লেমু, গণেশ এবং লালবাহাদুর— আমরা সবাই প্রথমে ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের লাশ তুলতে যাই। আমরা সেদিন মিটফোর্ড থেকে দু'ট্রাক লাশ তুলেছি— সকল লাশ আমরা ওয়ারি আউটকলে ফেলেছি। সেখানে পূর্বেই শ্রমিকদের দ্বারা বিরাট বিরাট লম্বা লম্বা গর্ত করে রাখা হয়েছিল। আমরা লাশ নিয়ে সেই সব গর্তে ফেলেছি। পরের দিন আমার দল আবার মিটফোর্ডে লাশ তুলতে যায়। আমরা ২৯ মার্চ মিটফোর্ড লাশ ঘর থেকে দু'ট্রাক লাশ তুলেছি। পরদেশি এবং তার ভাই চুন্নু নীচে দাঁড়িয়ে পচা, ফুলা, গুলিতে ক্ষতবিক্ষত লাশ তুলে ট্রাকের সম্মুখে এনেছে— রঞ্জিত (লালবাহাদুর) ও গণেশ দু'জন ট্রাকের উপরে ছিল। অধিকাংশ লাশ খাকি শার্ট পরা পুলিশের ছিল। আমরা সকল লাশ ওয়ারি আউটকলে ফেলেছি। পরের দিন আমার দল বুড়ীগঙ্গা নদীর পাড় ও শ্যামবাজার থেকে লাশ তুলেছে। তিনদিন পর আমার দল রমনা কালীবাড়িতে লাশ তুলেছে। ডোম রঞ্জিত, গণেশ ও বদলু ছয়টি দগ্ধ পোড়া লাশ তুলেছে। ইহা ছাড়া আমার দল রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন রাস্তা থেকে বহু লাশ তুলেছে। বুড়ীগঙ্গা নদী থেকে আমার দল আমার উপস্থিতিতে যেসব বাঙালি যুবকের লাশ তুলেছে তার প্রায় সবই

চোখ ও হাত-পা বাঁধা ছিল। আমার দল বেশ কয়েকদিন পরে ঢাকা হলের ভিতর থেকে তিনজন যুবকের পচা লাশ তুলেছে।

পরদেশি

পিতা-ছোটন ডোম

সুইপার, সরকারি পশু হাসপাতাল, ঢাকা

১৯৭১ সনের ২৭ মার্চ সকালে রাজধানী ঢাকায় পাকসেনাদের বীভৎস হত্যাকাণ্ডের পর ঢাকা পৌরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান মেজর সালামত আলি খান শূরের প্রশাসনিক অফিসার মি. ইদ্রিস পৌরসভার আরও কয়েকজন অফিসার সঙ্গে নিয়ে একটি মিউনিসিপ্যাল ট্রাকে পশু হাসপাতালের গেটে এসে বাঘের মতো "পরদেশি পরদেশি" বলে গর্জন করতে থাকলে আমি ভীত-সন্ত্রস্তভাবে আমার কোয়ার্টার থেকে বের হয়ে আসি। ইদ্রিস সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে কর্কশস্বরে বলতে থাকেন, "তোমরা সব সুইপার ডোম বের হও, যদি বাঁচতে চাও অবিলম্বে সবাই মিলে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় স্তূপীকৃত লাশ উঠিয়ে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলে দাও। নইলে কাউকে বাঁচানো হবে না, কেউ বাঁচতে পারবে না।" পৌরসভার সেই ট্রাকে নিম্নবর্ণিত সুইপাররা বসা ছিল : ১. ভারত ২. লাড়ু ৩. কিষণ।

আমি তার নির্দেশ অমান্য করার কোনো উপায় না দেখে ট্রাকে উঠে বসলাম। সেই ট্রাকে করে ঢাকা পৌরসভা অফিসে আমাদের প্রায় আঠারোজন সুইপার ও ডোমকে একত্রিত করে প্রতি ছয়জনের সঙ্গে দুইজন করে সুইপার ইন্সপেক্টর আমাদের সুপারভাইজার নিয়োজিত করে তিন ট্রাকে তিনদলকে বাংলাবাজার, মিটফোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রেরণ করা হয়। আমি মিটফোর্ডের ট্রাকে ছিলাম। সকাল নয়টার সময় আমাদের ট্রাক মিটফোর্ড হাসপাতালের লাশঘরের সম্মুখে উপস্থিত হলে আমরা ট্রাক থেকে নেমে লাশঘরের ভিতরে প্রবেশ করে বুকে এবং পিঠে মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা করা প্রায় একশত যুবক বাঙালির বীভৎস লাশ দেখলাম। আমি আমার সুপারভাইজারের নির্দেশে লাশঘরের ভিতরে প্রবেশ করে প্রতিটি লাশের পায়ে ধরে টেনে বের করে বাইরে দাঁড়ানো অন্যান্য সুইপারের হাতে তুলে দিয়েছি ট্রাকে উঠাবার জন্য। আমি দেখেছি প্রতিটি লাশের বুক ও পিঠ মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা। সব লাশ তুলে দিয়ে একপাশে একটা লম্বা টেবিলের উপর চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া একটি লাশের উপর থেকে চাদর টেনে উঠিয়ে দেখলাম একটি রূপসী ষোড়শী যুবতীর উলঙ্গ লাশ— লাশের বক্ষ, যোনিপথ ক্ষতবিক্ষত, কোমরের পিছনের মাংস কেটে তুলে নেওয়া হয়েছে, বুকের স্তন থেতলে গেছে, কোমর

পর্যন্ত লম্বা কালো চুল, হরিণের মতো মায়াময় চোখ দেখে আমার চোখ বেয়ে জল পড়তে থাকল, আমি কিছুতেই চোখের জল রাখতে পারলাম না। আমি আমার সুপারভাইজারের ভয়াল এবং ভয়ংকর কর্কশ গর্জনের মুখে সেই সুন্দরীর পবিত্র দেহ অত্যন্ত যত্ন সম্ভ্রমের সাথে ট্রাকে উঠিয়ে দিলাম। মিটফোর্ডের লাশঘরের সকল লাশ ট্রাকে উঠিয়ে আমরা ধলপুরের ময়লা ডিপোতে নিয়ে গিয়ে বিরাট গর্তের মধ্যে ঢেলে দিলাম। দেখলাম বিরাট বিরাট গর্তের মধ্যে সুইপার ও ডোমেরা রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন স্থান থেকে নিয়ে আসা লাশ ট্রাক থেকে গর্তের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। আমি অধিকাংশ লাশের দেহে কোনো কাপড় দেখি নাই, যে সমস্ত যুবতী মেয়ে ও রমণীদের লাশ গর্তের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল তার কোনো লাশের দেহেই আমি কোনো আবরণ দেখি নাই। তাদের সকল দেহ দেখেছি ক্ষতবিক্ষত, তাদের যোনিপথ পিছন দিক সহ আঘাতে বীভৎস হয়ে আছে। দুপুর প্রায় দু'টার সময় আমরা রমনা কালীবাড়িতে চলে আসি পৌরসভার ট্রাক নিয়ে। লাশ উঠাবার জন্য ট্রাক রমনা কালীবাড়ির দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখে, দুজন ট্রাকে দাঁড় করিয়ে রেখে আমরা চারজন কালিবাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখি সবকিছু পুড়ে ভস্ম হয়ে আছে। কালীবাড়ির ভিতরে বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো ৪১টি পোড়া লাশ আমি ট্রাকে তুলেছি। কালীবাড়ির এ সকল লাশ আমরা ধলপুরের ময়লার ডিপোতে গর্তের মধ্যে ফেলেছি। লাশ তুলে তুলে মানুষের পচা চর্বির গন্ধে আমার পাকস্থলী বের হতে চাচ্ছিল। পরের দিন আমি আর লাশ তুলতে যাই নাই, যেতে পারি নাই, সারাদিন ভাত খেতে পারি নাই, ঘৃণায় কোনোকিছু স্পর্শ করতে পারি নাই। পরের দিন ২৯ মার্চ সকালে আমি আবার ঢাকা পৌরসভা অফিসে হাজির হলে আমাকে ট্রাক দিয়ে লাশ তোলার জন্য আরও কয়েকজন সুইপারের সঙ্গে ঢাকা শাঁখারিবাজারে যেতে বলা হয়। জজকোর্টের সম্মুখে আগুনের লেলিহান শিখা তখনও জ্বলছিল, আর পাক সেনারা টহলে মোতায়েন ছিল বলে শাঁখারিবাজারের পশ্চিম দিকে প্রবেশ করে পাটুয়াটুলি ফাঁড়ি পার হয়ে আমাদের ট্রাক শাঁখারিবাজারের মধ্যে প্রবেশ করল। ট্রাক থেকে নেমে আমরা শাঁখারিবাজারের প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রবেশ করলাম— দেখলাম মানুষের লাশ নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বালক-বালিকা, কিশোর-শিশুর বীভৎস পচা লাশ, চারদিকে ইমারতসমূহ পুড়ে পড়ে আছে, মেয়েদের অধিকাংশ লাশ আমি সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেখলাম, দেখলাম তাদের বুক থেকে স্তন তুলে নেওয়া হয়েছে। কারও কারও যোনিপথে লাঠি ঢুকানো আছে। বহু পোড়া, ভস্ম লাশ দেখেছি। পাঞ্জাবী সেনারা পাষণ্ডের মতো লাফাতে লাফাতে গুলিবর্ষণ করছিল, বিহারী জনতা শাঁখারিবাজারের প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করে মূল্যবান আসবাবপত্র, সোনা-দানা লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছিল, আমরা অবিরাম গুলিবর্ষণের মুখে প্রাণের ভয়ে দুই ট্রাক লাশ তুলে লাশ তোলার জন্য সেদিন আর শাঁখারিবাজারে প্রবেশ করার সাহস পাই নাই। ৩০ মার্চ সকালে আমার দলকে মিলব্যারাক থেকে লাশ তুলতে

বলা হয়। আমি মিলব্যারাক ঘাটে পৌরসভার ট্রাক নিয়ে গিয়ে দেখলাম নদীর ঘাটে অসংখ্য মানুষের লাশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, বহু লাশ রশি দিয়ে বাঁধা— দেখলাম, প্রতিটি রশির বন্ধন খুলে প্রতি দলে দশজন পনেরোজনের লাশ বের করলাম, সব যুবক ছেলে ও স্বাস্থ্যবান বালকদের লাশ দেখলাম। প্রতিটি লাশের চোখ বাঁধা, হাত বাঁধা, শক্ত করে পিছন দিক থেকে। প্রতিটি লাশের মুখমণ্ডল কালো, দেখলাম অ্যাসিডে জ্বলে বিকৃত ও বিকট হয়ে আছে। লাশের সামনে গিয়ে ঔষধের অসহ্য গন্ধ পেলাম। লাশের কোনো দলকে দেখলাম মেশিনগানের গুলিতে বুক ও পিঠ ঝাঁঝরা হয়ে আছে, অনেক লাশ দেখলাম বেটন ও বেয়নেটের আঘাতে বীভৎস হয়ে আছে, কারও মাথা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে মগজ বের হয়ে আছে, কারও কাটা হৃৎপিণ্ড বের হয়ে আছে। নদীর পাড়ে ছয়জন রূপসী যুবতীর বীভৎস ক্ষতবিক্ষত, উলঙ্গ লাশ দেখলাম। চোখ বাঁধা, হাত, পা, শক্ত করে বাঁধা প্রতিটি লাশ গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা, মুখমণ্ডল, বক্ষ ও যোনিপথ রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত ও বীভৎস দেখলাম। দুইবারে দুই ট্রাকে আমি সত্তরটি লাশ উঠিয়ে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি। এরপর আমাকে সদরঘাট, শ্যামবাজার, বাদামতলী ঘাট থেকে লাশ তুলতে বলা হয়। আমি উপরোক্ত এলাকার নদীর ঘাট থেকে পচা লাশ তুলে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি। আমি যেদিন কালীবাড়ি লাশ তুলেছি, সেদিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের পিছনে স্টাফ কোয়ার্টার, রোকেয়া হলের পশ্চিম দিকে জনৈক অধ্যাপকের বাসা থেকে আমি লাশ তুলেছি। রোকেয়া হলের পিছনের স্টাফ কোয়ার্টারের ভিতর থেকে আমি যেয়ে পুরুষ ও শিশুসমেত নয়টি লাশ তুলেছি। আর অধ্যাপকের বাসা থেকে সিঁড়ির সামনে লেপের ভিতর পেঁচানো জনৈক অধ্যাপকের লাশ আমি তুলে নিয়ে গেছি।

কামিনীকুমার দাস

সার্কেল অফিসার (ডেভেলপমেন্ট)

রায়পুরা, ঢাকা

আমার রায়পুরা থানায় তখন ২২টি ইউনিয়ন ছিল। বর্তমানে এখানে ২৮টি ইউনিয়ন। এখানে ৪ লাখ লোকের বাস। রায়পুরা থানার ২২টি ইউনিয়নের মধ্যে মেঘনা নদীর দ্বীপ চরে ৫টি ইউনিয়ন (বর্তমানে ৬টি অবস্থিত)। এলাকা ১৫৪ বর্গমাইল। অত্র থানার পরিধির মধ্যে ৫টি রেলওয়ে স্টেশন আছে। আমার প্রশিক্ষণকেন্দ্রে পাকবাহিনীর হেড কোয়ার্টার ছিল। তখন হেড কোয়ার্টার হতে হানাদারদের পৈশাচিক কার্যকলাপ পরিচালনা করত। চর এলাকার দু'টি ইউনিয়ন ও বাকি ইউনিয়নের মধ্যে ১৫টি ইউনিয়নে প্রজ্বলন

কার্য চালায় হানাদাররা। যেহেতু রায়পুরা থানার মধ্যভাগ দিয়ে রেল রাস্তা অবস্থিত। ফলে রেল রাস্তার উভয় দিকের গ্রাম ও অভ্যন্তরে পাক হানাদাররা বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয় ও নৃশংসভাবে জনসাধারণকে হত্যা করে। অত্র থানায় বেলাব ইউনিয়নে মুক্তিযোদ্ধাদের সহিত পাকবাহিনীর প্রচণ্ড সংগ্রাম চলে। ইহা ব্যতীত মীর্জানগর ইউনিয়নের হাঁটুভাঙ্গা ও মোছাপুর ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে কয়েকবার পাক বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের খণ্ডযুদ্ধ হয়। পাকবাহিনীকে ঘায়েল করা হয় এবং কয়েকজন পাকবাহিনী নিরস্ত্র জনতার হাতে মোছাপুর ইউনিয়ন ও মির্জানগর ইউনিয়নে ধরা পড়ে। তাদের পরে হত্যা করা হয়। থানা প্রশিক্ষণকেন্দ্রে পাকবাহিনীরা ছাউনি খুলে থানাব্যাপী জনসাধারণের মাঝে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে এবং নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করে প্রশিক্ষণকেন্দ্রে কবরস্থ করে। গণকবর এখনও বিদ্যমান রয়েছে। কয়েকজনকে জোরপূর্বক ধর্মান্তর করে। ধর্মান্তরিত লোককেও বেদম প্রহার করে অত্যাচার করে এবং একজনকে হত্যা করে থানার প্রত্যেকটি বাজার ওরা লুট করে। এ ছাড়াও গ্রামে গ্রামে ঢুকে হানাদাররা রাজাকারদের সহায়তায় লুটতরাজ করেছে। থানা পুলিশ স্টেশনও হানাদারদের প্রজ্বলন থেকে বাদ পড়েনি।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ পোদ্দার

গ্রাম-জামুর্কী
থানা-মীর্জাপুর
জেলা-টাঙ্গাইল

১৯৭১ সালে ১০ নভেম্বর পাকবাহিনী আমাদের গ্রামে আসে। আমি পালাতে চেষ্টা করছি। এমন সময় একজন পাক দস্যু আমাকে ডেকে তার সামনে হাজির করল। আমাকে বলল, "চল বেটা আমাদের শিবিরে" পাক শিবিরে নিয়ে পাকবাহিনীর গাড়িতে করে আমাকে অন্য এক শিবিরে পাঠিয়ে দিল। শিবিরে নিয়ে আমাকে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল। আমাকে বলে, "তোদের গ্রামে কি কোনো মুক্তিবাহিনী হ্যায় ?" তখন উত্তর দিই, আমাদের গ্রামে কোনো মুক্তিবাহিনী নেই। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে লাঠি দিয়ে বেদমভাবে প্রহার করল। তারপর অন্য একজন রাজাকার এসে আমাকে বলে, বেটা মালাউন হ্যায়। বেটাকে নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়া দেখাচ্ছি। এই বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বেতের লাঠি দিয়ে ভীষণভাবে প্রহার করল। আমি তখন অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে রইলাম। তারপর আমার যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন আমাকে একটি নদীর ধারে নিয়ে গেল, আমি মনে করলাম আমার জীবনের শেষ লীলা এখানে বুঝি শেষ হবে।

আমাকে প্রথম মাটির উপর চিত করে শুইয়ে রাখল। কিছু পর একজন পাক দস্যু এসে আমাকে ভীষণভাবে লাথি মারল এবং বেয়নেট দিয়ে আমাকে পেটের উপর আঘাত করল। এই আঘাতে আমার জীবন শেষ হয়ে যায় যায়। তখন আমি কোনো রকমে জল টেনে মাটির উপর ভর করে থাকি। কোনো রকমে আমি সাঁতার কেটে নদীর ও পাড়ে যেয়ে আমার আঘাত স্থানে গেঞ্জি দিয়ে বেঁধে বহু কষ্ট করে নদীর জল হতে উঠে কোনো রকমে আমার বাড়িতে চলে আসি।

বাড়িতে ডাক্তার এসে ভালো করে ব্যান্ডেজ করে দিল।

আজ পর্যন্ত আমার ক্ষতস্থানে তার চিহ্ন রয়েছে।

শ্রীমনোরঞ্জন দত্ত

গ্রাম-সরিষাবাড়ি, ডাকঘর-সরিষাবাড়ি
থানা-সরিষাবাড়ি, ময়মনসিংহ

বর্বর পাক ফৌজের অত্যাচারের কাহিনী বাংলার জনসাধারণ চিরদিন ঘৃণার সঙ্গে স্মরণ করবে। মানুষ ক্ষমতা এবং স্বার্থের মোহে কেমন ব্যবহার করতে পারে— সেই দৃষ্টান্ত সামনে রেখে— শোষিত, অত্যাচারিত, ভদ্র বাঙালী উদারনৈতিক মনুষ্যত্বের পথকে খুঁজে নেবার সুযোগ পাবে এবং তারা স্বাধীনতার সুবর্ণ স্বাদকে সুমধুর করে উপভোগ করাব যোগ্যতা অর্জন করবে। আমার মনে পড়ে শহীদ আবদুল হামিদ মোক্তার, শহীদ হাসান খান, শহীদ সুরেন দত্ত, শহীদ ধীরেনবাবু এবং সমাজসেবক ওয়াছিমউদ্দিন সাহেব এবং সাব-রেজিস্ট্রার আবদুর হাই সাহেব ও আমি নিজে অমানুষিক নিপীড়নের ইতিহাস। তখনও থানা পর্যায়ে পশ্চিমা অত্যাচারের কসাইখানা খোলেনি। একদিন আমাদের থানার দারোগা আমাকে অ্যারেস্ট করে জামালপুর হাজতে চালান দিল। অপরাধ আমরা হিন্দু তার উপর ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামীদের সহায়তা করছে— গুরুতর অপরাধ, সুতরাং শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। হাজত থেকে আমাকে মিলিটারি ক্যাম্পে চালান দেয়। আমি ভাঙা উর্দু বলতে পারি। পশ্চিমা জল্লাদরা তাই আমাকে মেরে ফেলার আগে আমাকে দিয়ে কিছু কাজ করিয়ে নেবার ফন্দি আঁটল। আমার আয়ু বাড়িয়ে দিল কয়েকদিন। ওরা আমাকে দোস্ত বলে। আমি কোনো ভরসা পাই না— আমার আত্মারাম তো খাঁচা ছাড়া। আমাকে বলে শুধু আল্লাহকে ডাক, ইত্যাদি আশ্বাস দিয়ে আশ্বস্ত করে এবং দোভাষীর কাজ আদায় করে। যে সমস্ত স্বাধীনতাকামী বাঙালীদের তারা একদিক থেকে হত্যা করাবার জন্যে বন্দী করছিল তাদের জবানবন্দীকে কোনো রকমে উর্দু করে বুঝিয়ে দিতে হত আমাকে। দাসত্বের এতটুক স্বাধীনতার কিছু কিছু ভালো আচার-ব্যবহার পেতাম

আমি। এই করে আমি সুষ্ঠুভাবে ভাবনাচিন্তার সহজ মানসিকতা খুঁজে পাই। কীভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে এবং এই মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে সে কথা মনে মনে সারাক্ষণ ভাবি।

দিন যেতে থাকে। আমি দিনের পর দিন অত্যাচার ও অবিচারের অমানুষিকতা প্রত্যক্ষ করতে থাকি। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, আবাল-বৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে সে কী মার, সে কী অত্যাচার— ভাষা দিয়ে সে বর্বরতা প্রকাশ সম্ভব নয়। চড়, ঘুষি, বুটের লাথি, গায়ে জ্বলন্ত সিগারেট গুঁজে দেওয়া, উপরে পা বেঁধে মাথা নীচের দিকে ঘুরিয়ে রাইফেলের বাঁট দিয়ে বেদম প্রহার... সে ইতিহাস নাকে, মুখে রক্ত ঝরার ইতিহাস, বর্বরতার ইতিহাস তার বর্ণনা হয় না। এই অবস্থা দেখে আমার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়।

অবশেষে একদিন আমাকে ও আরও কয়েকজনকে বলল যে, তোমাদের ময়মনসিংহ পাঠানো হবে। আমাদেরকে ট্রাকে উঠতে বলল, ট্রাক চলতে থাকে কিন্তু আমি তখন দেখলাম ট্রাক ময়মনসিংহের পথে না যেয়ে উপস্থিত হল শ্মশানঘাটে। তখন আমার আত্মা উড়ে গেল। স্মৃতির পটে পৃথিবীর আলো, মা, বাবা, জন্মভূমি, ভিটে, স্ত্রী, সন্তানের মুখ ছায়ায় মতো কাঁপতে কাঁপতে ভেসে উঠল, তারপর দুঃখের যবনিকায় হাবুডুবু খেলো সব। সবাইকে লাইনবন্দী করে দাঁড় করানো হলো— সামনে ধীরেনবাবু, তাঁর পিছনে আমি নিজে, আমার পিছনে আরও বেশ কয়েকজন। ঠিক ভরা ব্রহ্মপুত্রের তীর বেয়ে লাইনটি। ধীরেনবাবুর বুকের সঙ্গে সংলগ্ন মেশিনগানের নাল। মেশিনগানধারী একজন পাক সৈনিক। প্রভুভক্ত মানুষ নামধারী হিংস্র জানোয়ার।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়

রানীবাজার, ঘোড়ামারা
জেলা-রাজশাহী

জুন মাসের ১৩ তারিখে পাক দালালরা ষড়যন্ত্রমূলক আমার শ্বশুরবাড়ির একস্থানে গুলিসহ চাইনিজ রাইফেল রেখে ঐ রাতে তারা আমাদের সঙ্গে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে তোলে। তখন আমাকে আমার দুই ছেলে, আমার সম্বন্ধী ক্ষীতিশচন্দ্র রায় ও নিরোদ কুমারকে থানাতে নিয়ে যায়। ওদের ধারণা ছিল আমাদের কাছে প্রচুর টাকা-পয়সা সোনা আছে। বন্দী করে সেগুলি আদায় করার পরে হত্যা করবে। রাত ১/১-৩০ দিকে আমাদের থানাতে নিয়ে যায়। ৫ জনের স্টেটমেন্ট নেবে বলে। আমাদের পাঁচজনকে চালাকি করে হাজতখানায় বন্দী করে। সারারাত কিছু খেতে দেয়নি। তার পরদিনও না। বিকালে আমার বাড়ি থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসে। ওইদিন শেষ রাতের দিকে আমার

স্ত্রী দারোগাকে বহু অনুরোধ উপরোধ করে গায়ের সমস্ত গয়না খুলে দিয়ে নগদ কয়েক শত টাকা দিয়ে বলল যেন সামরিক আইনে তার ভাই, স্বামী ছেলেকে না দেয়। দারোগাকে টাকা ঘুষ দিলে আমাদের সবাইকে হাজত থেকে বাইরে এনে রাখার ব্যবস্থা করেছিল। হঠাৎ করে একদিন আবার হাজতে পুরতে বলে। আমার দুই ছেলে আমার সঙ্গে কোনো কথা না বলে পাশের নদীতে ঝাঁপ দেয় বাঁচবার জন্য। পিছু পিছু পুলিশ ছোটে। ওদের চিৎকারে গ্রামের লোকজন ধরে ফেলে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। থানায় নিয়ে এসে অকথ্য অত্যাচার চালায় আমার দুই ছেলের উপর। একজন কৃষক সে আমার ছেলেদের ধরেনি বলে পুলিশ তাকে থানায় ধরে এনে ভীষণভাবে মারধর করে। এখনই ছেলেদেরকে হত্যা করবে বলে কিন্তু টাকার বিনিময়ে নিরস্ত হয়। চার্জশিটের মধ্যেও পালানোর কথা উল্লেখ করেনি।

১৫ জুন আমাদের সবাইকে নাটোর চালান দেয়। হাশেম দারোগা চাইনিজ রাইফেল সহ চলল। টাকা-পয়সা নেওয়া সত্ত্বেও আমাদের হাঁটিয়ে নিয়ে যায়। পথে পাক বাহিনীর সাথে দেখা হলেই সালাম আলায়কুম জানিয়ে বলে— দেখিয়ে কেয়া চিজ লেআয়া হ্যায়। দারোগা বার বার আমাদের দেখিয়ে দেয় মুক্তিফৌজ হিসাবে। থানার ও,সি, হাশেমকে নিষেধ করেছিল অস্ত্র ওইভাবে খোলা নিয়ে যেতে কিন্তু হাশেম এ, এস, আই, তা শোনেনি।

নাটোরে কোর্টে নিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় ইন্সপেক্টর (পুলিশ) জাফর সাহেবের সাথে আমাদের দেখা। জাফর সাহেব আমার ছেলের এবং শালার বিশেষ বন্ধু ছিল। সে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে হাশেমকে। সামরিক কোর্টে নিয়ে যেতে বলে উনি জামাকাপড় পরে তাড়াতাড়ি কোর্টে আসেন। সামরিক কোর্টের সামনের মাঠে আমাদের বসিয়ে রাখে। পাকসেনারা আসে নাম শোনে আর সবাইকে লাথি চড় মেরে চলে যায়। সামরিক কোর্টে ক্যাপটেন ও মেজর আসেন। আমরা ২৫ গজ মতো দূরে বসে চাইনিজ রাইফেলের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপটেন খতম করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু পুলিশ ইন্সপেক্টর অনুরোধ করে একটি ইনকোয়ারি করার জন্য, কারণ ওরা ভালোমানুষ। মেজর বলেন, কেমন করে চিনলে ওদের। ঐ থানাতে আমি থানা ইনচার্জ ছিলাম বহুদিন— ইন্সপেক্টর বলেন। মেজর আমাদের ডাকেন, আমাদের বক্তব্য আমরা বলি। মেজর সব শুনে কোর্টে পাঠাতে বলে ইনকোয়ারির ভার দিলেন।

এস,ডি, ও, জেলহাজতে পাঠিয়ে দিলেন। সামান্য একটু ঘরে আমাদের রাখল। আমরা ৩০/৩৫ জন ছিলাম, শোয়া তো চিন্তা করা যায় না, ভালো করে বসারও উপায় ছিল না। জেল ওয়ার্ডার মোজাফফর খাঁ (বিহারী) বাঁশের লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করে বাইরে এম,পি, (মিলিটারি পুলিশ) ছিল, সেও রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারতে লাগল। আমাদের মধ্যে কয়েকজন কয়েদী ছিল যারা স্বাধীনতার প্রথম ক্ষণে জেল ভেঙে পালিয়েছিল। তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালায়। চিৎ করে শুইয়ে দুই হাতে লাঠি তুলে শরীরে

যত শক্তি আছে তা দিয়ে ঘন ঘন আঘাত করতে থাকে। লোকজন পরে শুধু আল্লাহর নাম করতে থাকে। তারপর দিনও ওইভাবে সবাইকে মারতে থাকে।

সারারাত শুনলাম মানুষের অসহ্য যন্ত্রণার চিৎকার। আমার মতো এমনি বহু অধ্যাপক, ছাত্র, অ্যাডভোকেট ইত্যাদিকে সারারাত ধরে নির্যাতন চালায়। কান্না, চিৎকারে জেল প্রকম্পিত হচ্ছিল। পাকসেনারা মারত আর হাসত। লোকজনের উপর অত্যাচারের জন্য একটি স্কোয়াড থাকত, যাদের কালো ব্যাজ থাকত। জেল ওয়ার্ডার হরমুজ আমাদের উপর অত্যাচার চালাতে থাকে। ১৬/১৭ জুন আমাদের ১৬ জনকে একসঙ্গে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেয়।

রাজশাহী জেলে বহু রকমের লোকদের দেখলাম। যাদের আনত তাদের অধিকাংশের কারও চোখ নাই, কারও হাত-পা ভাঙা। বিশেষ করে পাকসেনারা যাদের পাঠাত তারা প্রায় মৃত বা অর্ধমৃত হয়ে আসত। জেলে যাদেরকে দেখেছি বেশিরভাগ শান্তিকমিটির লোকেরা তাদের ধরিয়ে দিয়েছে। শান্তিকমিটির লোকেরাই ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। একজন কৃষক কয়েদীর সঙ্গে আলাপ করলাম। সে এসেছিল শহরে জমি বিক্রি করতে। মুহুরির সঙ্গে বাজারে বেরিয়েছে এমন সময় কিছু লোক কৃষকটিকে জোর ক-রে এক বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে তোর ছেলে মুক্তিফৌজ, সে বলে আমার বড়ো ছেলেই নেই। তারপর মারধোর করে জেলে পাঠিয়ে দেয়।

আমাদের কেস ইনকোয়ারির জন্য ইন্সপেক্টর গ্রামে যান এবং আমাদের পক্ষে রিপোর্ট দেন। বর্তমান বরিশালের এস,পি, গোলাম মোর্শেদ তখন রাজশাহি এস, পি, ছিলেন। তিনি আমাদের ধরিয়ে দেবার জন্য এ, এস, আই, হাশেমকে প্রমোশন দিয়ে থানার ও,সি, করে দেন। নাটোর শান্তি কমিটি জাফর ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে পাকসেনাদের কাছে অভিযোগ করে। জাফর (ইন্সপেক্টর) সাহেবের চাকরি যাবার মতো। আমার ছেলে আইনুদ্দিনকে (এম,এন,এ, মুসলিম লিগ) বহু টাকার বিনিময়ে তার তদ্বিরে আমাদের জামিন হয় ২৮ সেপ্টেম্বর। পরে ইন্সপেক্টর আকবর ইনকোয়ারি করে নভেম্বর মাসে আমাদের বিরুদ্ধে কিছু না পেয়ে মুক্তি দেয়। আমরা আবার গ্রামে চলে যাই (গালিমপুর)। আমাদের বাড়ি জামাতে ইসলামির সভাপতি দখল করে নেয়, সমস্ত কিছু লুট করে রাজাকারের ক্যাম্প করে। আর একটি কক্ষে জামাতে ইসলামের সভাপতি থাকত। আমরা আবার গ্রাম থেকে গ্রামে পালিয়ে বেড়াতে লাগলাম।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে পাকসেনারা আমাদের গ্রামে আবার হামলা চালায়। সমস্ত গ্রাম লুট করে বহুজনকে ভীষণভাবে মারধোর করে, কিছু লোকজনকে হত্যা করে। আমাদের সব লুট করে নেয়।

তারপর দেশ মুক্ত হয়। মালঞ্চ এবং নদীর অপর পাড়ে সকল গ্রামে তখন এমন কোনো বাড়ি ছিল না যে বাড়ির মেয়ে ধর্ষিতা না হয়েছে। পাকসেনাদের চাইতে রাজাকার,

আল বদর এরাই বেশি অত্যাচার চালিয়ে ছিল। দালালরা এবং তাদের সহযোগীরা গ্রামকে গ্রাম লুট করেছে, ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে।

ডিসেম্বরে যুদ্ধ বাঁধলে আমরা সবাই উল্লসিত হয়ে উঠি। একদিন গোলাগুলির শব্দ না পেলে আমাদের মন খারাপ হয়ে যেত।

১৬ ডিসেম্বর যখন শুনলাম পাক বর্বরবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে তখন সেই রাতে আমার এই বৃদ্ধ বয়সে সারা গ্রাম হেঁকে বেড়াই। পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করেছে। মানুষজন গ্রামকে মাতিয়ে তোলে। স্বাধীনতার আনন্দে সবাই 'জয়বাংলা' ধ্বনিতে গ্রাম মুখরিত করে তোলে।

হরিদাসী

গ্রাম-রামজীবনপুর
থানা-পুটিয়া, জেলা-রাজশাহী

৮ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার পাকসৈন্যরা ভোর ৪টায় ৮০/৯০জনে সমস্ত রামজীবনপুর ঘিরে ফেলে। এই সময় আমার সেজো ছেলে কানাইলাল হেমন্ত ঘুমিয়ে ছিল। ওদের সাড়া পেয়েই ও চেতন পায়। ইতিমধ্যে পাকসৈন্যরা দরজায় রাইফেলের গুঁতো এবং পায়ের লাথি মারে এবং ঘর থেকে বেরোবার নির্দেশ দেয়। আমার ছেলে যখন দরজা খুলে বেরোয় তখন তাকে এবং তার ছেলে-মেয়েকেও ঘরের বারান্দায় বসায়। আমি এবং আমার স্বামী তখন পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে কান্নাকাটি ও তাদের অনুরোধ করতে থাকি। তারা আমাকে "আন্দর যাও" বলে শাসাতে থাকে।

অতঃপর আমার ছেলের কাছে রাইফেল, বন্দুক, সোনা, সাইকেল, ঘড়ি, টাকা-পয়সা চাইতে থাকে।

তারপর আমার উক্ত ছেলেকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে রশি দুই দূরে জমির মধ্যে নিয়ে যায়। তার পাশের বাড়ি থেকে আরও দুজনকেও (পিতা-পুত্র) ধরে নিয়ে যায় এবং সেখানে তাদের গুলি করে হত্যা করে।

গুলি করে হত্যা করার পর তারা আবার আমার বাড়ি আসে এবং আমার বেটার বউ-এর কাছে বলে যে, তোমার স্বামীকে শেষ করে দিয়েছি। এখন তোমরা বাড়ি থেকে বেরোও। বাধ্য হয়ে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে তারা বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। তারা আগুন লাগানোর আগে আমার গোরুগুলি ছেড়ে দেয়। অতঃপর তারা চলে যায়। এদিন সমস্ত পাড়ায় তারা আগুন লাগিয়ে পুড়ায় এবং অন্যান্য ৮ জন লোককে হত্যা করে। এর দুই দিন পর আমি ভারতে চলে যাই। আমার চলে যাবার পর আমার বাড়ির অবশিষ্ট সম্পদ লুন্ঠিত হয়।

এল. পাইনস্
বনপাড়া মিশন
থানা-বড়াইগ্রাম, জেলা-রাজশাহী

২০ এপ্রিল, ১৯৭১ সাল। মিলিটারিরা বনপাড়ার আশেপাশে আসে এবং বিক্ষিপ্তভাবে গোলাগুলি চালালে ছারোয়াতে চারজন লোক মারা যায়। তারপর থেকে মাঝে মাঝে পাক নরপশুরা অপারেশন চালাতে থাকে। তার প্রতিক্রিয়ায় বনপাড়া এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে অমুসলমানরা পালিয়ে আসে মিশন হাসপাতালে। মিশন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের খাওয়া এবং তাদের থাকার ব্যবস্থা যত্নসহকারে করতে থাকেন। তখন অবশ্য পাকসৈন্যরা নাটোর ও রাজশাহীতে চলে গিয়েছিল। তখন স্থানীয় দুষ্কৃতীকারীরা হিন্দুদের অন্যায় ও ক্ষতিসাধন করে। তাদের পরিত্যক্ত বাড়ি-ঘর লুট করে। তখন থেকেই ২/১ জন করে অমুসলমান ওপার বাংলায় পালিয়ে যেতে থাকে।

২ মে রাতে অমুসলমানরা ওপার বাংলায় চলে যাবে বলে স্থির করেছিল। কিন্তু অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের দরুন সেদিন যেতে পারেনি।

৩ মে, বিকাল সাড়ে তিনটার সময় মিশনের ফাদার লক্ষ্য করলেন যে, মিশন হাসপাতালের চারিদিকে মিলিটারিরা ঘিরে নিয়েছে। তার কিছুক্ষণ আগে বনপাড়া সংলগ্ন অন্যান্য গ্রাম থেকে খ্রিস্টান পুরুষদেরকে ধরে নিয়ে এসেছে। সে ধরার অভিযান পরিচালনা করেছিল মেজর শেরওয়ান। পরে ফাদারের সুপারিশে সমস্ত খ্রিস্টানদেরকে নরপশুরা ছেড়ে দেয়।

তারপর নরপশুরা মিশনের অফিস, স্কুলঘর, মহিলা হোস্টেল তল্লাশি করে আওয়ামি লীগ সমর্থক ও হিন্দুদেরকে খুঁজতে থাকে। খোঁজাখুঁজির পর সর্বমোট ৮৬ জন মানুষকে বের করে এবং বন্দী করে। অবশ্য অল্পবয়সের ছেলেরা ও বৃদ্ধেরা রেহাই পেয়েছিল তাদের মনোভাবের উপর নির্ভর করে। তারপর বন্দি লোকদেরকে ধরে নিয়ে পথের মোড়ে ট্রাকের অপেক্ষায় পথ পানে চেয়ে থাকে। সত্যি সত্যিই যখন সামরিক ট্রাক এসে হাজির হল, তখন ট্রাকে তুলে ৮৬ জন মানুষকে নিয়ে যায় হত্যা করার জন্য। পথিমধ্যে একজন বৃদ্ধকে রেহাই দিয়ে অন্যান্য বন্দীদেরকে নির্মমভাবে প্রহার করতে করতে নিয়ে যায় তাদের নির্দিষ্ট স্থানে। ৮৫ জনকে ট্রাকে করে নিয়ে হত্যা করা হয়। তাদের মধ্যে অনিল নামক একজন ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায়। এ ঘটনা অবশ্য ফাদারের শোনা। দোয়াদপাড়া ব্রিজে নিয়ে হত্যা করা হয়। অনিল ফাদারকে বলে যে, এখান থেকে মাইল দুই নিয়ে যেয়ে রাইফেলের গাদা দিয়ে অমানুষিকভাবে ট্রাকের উপরেই প্রহার শুরু করে। দোয়াদপাড়া ব্রিজের কাছে একটি জলাশয়ে নিয়ে যেয়ে উপরে উল্লিখিত মানুষগুলোকে ২/৩ জন

করে ধরে নিয়ে গুলি করতে থাকে। অনিলকে গুলি করে কিন্তু সে আঘাতে মরেনি। নাটোরের হাফিজ আবদুর রহমান অন্যান্য অপারেশনের মতো এখানেও উপস্থিত ছিল। সবশেষে আহত লোকজনদের উপর মেশিনগানের স্প্রে শুরু করে। অনিলের উরুতে মেশিনগানের একটি গুলি লাগে। এতেও সে খুব বেশি আহত হয় না। ফলে রাতে বর্বররা সরে গেলে সে আস্তে আস্তে স্বগ্রামে ফিরে আসে।

পাকবাহিনী যাবার আগে গ্রামবাসী মুসলমানদের ডেকে এনে এই স্তূপীকৃত মানুষগুলির উপর মাটিচাপা নিতে নির্দেশ দেয়। পরবর্তীকালে রাজাকার ও আলবদর বাহিনী অত্যাচার করতে সুযোগ পায়নি এই কারণে যে পাক সৈন্যদের সঙ্গে একজন খ্রিস্টান মেজর ছিলেন যিনি প্রায়ই আসতেন। গির্জায় ফাদারের অনুরোধে মেজরের সক্রিয় হস্তক্ষেপে অত্র এলাকার মানুষ যথেষ্ট রক্ষা পেয়েছে। একবার ৬ জনকে এ এলাকা থেকে নাটোরে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তারা আর ফিরে আসেনি। পরবর্তীকালে তিনজনকে ধরে নিয়ে যাবার পর ফাদারের সুপারিশে তারা রেহাই পায়। পরবর্তীকালে আবার পাঁচজনের উপরে গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি হলে ফাদারের সুপারিশে তারাও মুক্তি পায়।

জয় মণ্ডল

নওগাঁ

রাজশাহী

২৫ মার্চের ঘটনাপ্রবাহ অত্র গ্রামের জনগণের জীবনে হতাশা এনে দিয়েছিল। শান্তাহারে সাম্প্রদায়িক ঘটনার ফলে অত্র গ্রামটিকে পাক বর্বররা ক্ষতি করতে দ্বিধা করেনি। ৯ বৈশাখ থেকে রোজ শান্তাহার রোড হয়ে চকরামপুর গ্রামে পাক বর্বররা প্রবেশ করে। প্রবেশ করার আগে বিক্ষিপ্তভাবে চারিদিকে গোলাগুলি চালাতে থাকে। এতে জনগণের জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। ফলে ধন, মাল রেখে পাইকারি হারে অত্র গ্রামের জনসাধারণ অন্যত্র পালাতে থাকে। অতঃপর পাক বর্বররা চকরামপুরের অধিকাংশ বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে ও লুটতরাজ চালায়। বলা প্রয়োজন অত্র গ্রামের সংলগ্ন খ্রিস্টান মিশনের সাহেবের বাড়িতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে। উক্ত ঘাঁটি থেকে পাক বর্বররা অন্য জায়গা হতে সুন্দরী মেয়েদেরকে ধরে এনে মিশনের সাহেবের বাসার উপরতলাতে আটকে রাখত। পাশবিক অত্যাচার ও ধর্ষণ করার পরে গলা কেটে হত্যা করত। হত্যার পরে তাদের রক্ত চৌবাচ্চার নল দিয়ে স্থানীয় তুলসীগঙ্গা নদীতে পড়ত। তা ছাড়া অত্র চকরামপুর গ্রামে প্রায় ৪০ জন লোককে গুলি করে হত্যা করেছে। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে গলা কেটে হত্যা করেছে এবং বহুসংখ্যক আহত অবস্থায় এখনও বেঁচে আছে। এক মাস

অবস্থানকালে অত্র গ্রাম হতে পাক বর্বররা গোরু, খাসি, হাঁস, মুরগী, যাবতীয় তরিতরকারি লুট করে খেয়েছে।

স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে অত্র গ্রামের জনসাধারণ মুক্তিবাহিনীকে খাদ্যদ্রব্য ও সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে।

শ্যামল রায়

মালতীনগর, থানা-সদর

জেলা-বগুড়া

প্রবল গুলি ও গোলাবর্ষণের ভেতর দিয়ে বর্বর পাকবাহিনী ট্যাংক সহকারে বগুড়ায় প্রবেশ করে। শুরু হল নরপিশাচদের 'বাঙালি চোষা' বিহারী বেইমান সহযোগে শহরের বুকে তাণ্ডব নৃত্য। লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, খুন, তৎসহ ধর্মীয় স্থান কলুষিত ও বিধ্বস্ত করায় মত্ত হয় তারা।

২৫ এপ্রিল, রবিবার হঠাৎ করেই গ্রামের বাসা হতে গুলি ও ব্রাশফায়ারের শব্দ শুনে বুঝতে দেরি হয়নি যে, পাকবাহিনী বগুড়া হতে বড় রাস্তা ধরে এদিকে এগিয়ে আসছে (সিরাজগঞ্জ ও উল্লাপাড়ার দিকে)। কিছুক্ষণ পর দক্ষিণ-পূর্ব কোণ হতে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে উত্থিত হতে দেখা গেল। অনেকে বললেন কুমারেরা হাঁড়ি পোড়াচ্ছে। কিন্তু সব ধারণার অবসান হল তখনই, যখন শুধু এক জায়গাতে নয়, সমস্ত পশ্চিম দিক হতে ধোঁয়া আর আগুনের লাল আভা দেখা যেতে লাগল। যতই আঁধার নামছিল আগুনের লেলিহান শিখা ততই প্রকট হয়ে ফুটে উঠছিল চোখের সামনে। আগুনের সঙ্গে সঙ্গে গুলির আওয়াজ ভেসে আসছিল উল্লাপাড়ার দিক হতে।

পরের দিন শুনলাম চান্দাইকোনার প্রত্যক্ষদর্শীর এক বিবরণ। তারা লোকজন ডেকে এনে লুট করিয়েছে বাজার এলাকা। অনেকে স্বেচ্ছায় এসেছে লুট করার লোভে! লুট করার সময় তারা ছবি তুলেছে। লুটপাট হয়ে গেলে আগুন ধরানোর পালা। আগুনও দিয়েছে লোকজনের সহায়তায়। আগুন ধরানোর সময় তারা ছবি তুলেছে। আর সব কাজ হাসিল করার পর বিক্ষিপ্তভাবে গুলিবর্ষণ করে জনসাধারণকে করা হয়েছে হত্যা। এরকম আরও ঘটনা। খাওয়ানোর নাম করে ডেকে এনে লাইন করে গরিব গ্রামবাসী নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।

পরের দিন শুরু হল সিরাজগঞ্জে ওই একই দৃশ্যের অবতারণা। ৩-৪ দিন ধরে চলে অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, খুন ইত্যাদি। বাসার এত কাছে ওই সব হচ্ছিল যে, ছাই এসে পড়ছিল বাসার মধ্যে। গ্রামের আশেপাশের অনেক লোক শহরে গিয়ে আর ফিরে আসতে

পারেনি। এর সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ডাকাতি, লুটতরাজ, রাহাজানি প্রকটভাবে দেখা দেয়। দিনে মিলিটারির ভয়, রাত্রে ডাকাতের ভয়ে সবসময় তটস্থ থাকতে হয়েছে। দিনে গ্রামছাড়া আর রাত্রে পাটের খেত—এভাবে প্রতিটি ক্ষণ কেটেছে। দৌড়ানোর জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতে হয়েছে।

একদিন শুনলাম মিলিটারি আসছে। তবুও থাকলাম বাসায় কিছুক্ষণ, পরে দেখলাম, কাছের এক হাট হতে আগুন আর ধোঁয়া। অনেকে পালিয়ে যেতে লাগল। গ্রামের কিছু দূর দিয়ে উঁচু মাটির রাস্তা। দাঁড়িয়েছিলাম মিলিটারিদেরকে দেখবার জন্য। দেখলামও, আমার কাছে ছোটো একটা দূরবীন ছিল। তাই স্পষ্ট দেখলাম, একে একে ৭৯ জন সৈন্য পার হয়ে গেল। আমের সময় গাছে কাঁচা আম ছিল। তাই তারা খেতে খেতে চলছে। কী তাদের উল্লাস, এতটুকুও অনুশোচনা নেই মনে তাদের, এই ধ্বংসলীলার জন্য।

অবশেষে নানান কারণে সে গ্রাম আমাদের ছাড়তে হল ২৬ মে, বুধবার। নৌকায় চললাম উল্লাপাড়ার অভিমুখে। দুপুর ২টার দিকে বুধগাছা নামক গ্রামে আশ্রয় নিলাম। যে বাড়িতে ছিলাম, সে বাড়ির এক ছেলে সৈন্য বিভাগে কাজ করত। শুনলাম সে ছুটি নিয়ে এসেছিল। মার্চের পর পাকবাহিনীর পক্ষ হতে কাজে যোগ দেবার জন্য আবেদন আসে। কিন্তু বর্বর বাহিনীর সঙ্গে সে যোগ দেয়নি। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাকে বাংলা মাকে উদ্ধার করবার জন্য সে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেনি। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সে যোগ দিয়েছিল। ওই বাড়ির ধারেই রাস্তা (বগুড়া-উল্লাপাড়া)। সাহস করে বসলাম এক গাছের ধারে। কিছুক্ষণের মধ্যে মোটরের শব্দ পেলাম। বুঝতে দেরি হল না, মিলিটারিদের গাড়ি আসছে। দেখলাম এক এক করে নয়খানা গাড়ি পার হয়ে গেল। কোনো গাড়িতে শুধু দু-একটা পেট্রোলের ড্রাম। আবার কোনো গাড়িতে মিলিটারি ও গোলাগুলির বাক্স। হাটের দিন দু'একজন করে পাকা আম, কলা এসব নিয়ে যেত হাটে। ওরা জোর করে কেড়ে নিত আম, কলা ইত্যাদি, পয়সা চাইলে মারার ভয় দেখাত।

পরের দিন ২৭ মে দুপুরের পর আর এক গ্রামে পৌঁছলাম। সেখানে গিয়ে শুনলাম, যুবক ছেলেদের জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলছে। ভয় পেলাম শুনে। এ গ্রামে আসার পথে কিছুক্ষণ বড়ো রাস্তার উপর দিয়ে হাঁটলাম খুব ভোরের দিকে। দেখলাম জ্বালিয়ে দেওয়া বহু গাড়ি। রাস্তা থেকে নেমে আধ মাইলের মতো হেঁটে এসে বর্বরেরা পুড়িয়ে দিয়েছে। বহু গ্রাম। রাস্তায় শুনলাম বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার কাহিনী। প্রথমে তারা নাকি কী একটা তরল পদার্থ "স্প্রে" করত। তারপর একটা সাদা কাঠির মতো জিনিসে আগুন ধরিয়ে ফিকে মারত ঘরের মধ্যে। আগুন ধরে যেত সমস্ত ঘরে। খেয়াল-খুশি মতো দু-একটা বাড়িও তারা বাদ দিয়েছে। মনে হয় খেলেছে তারা, আগুন আগুন খেলা।

যে গ্রামে আমরা থাকতাম, তার আশেপাশের গ্রাম হতে ছেলেদেরকে ধরে নিয়ে গেছে। ধরে নিয়ে গিয়ে উল্লাপাড়া বাজারে খালের মধ্যে বুকজলে দাঁড় করিয়ে হত্যা করা

হয়েছে তাদেরকে। ট্রেনে করে যাতে মিলিটারিরা না আসতে পারে সে জন্য গ্রামের লোকজন লাইন তুলে ফেলেছে। ফলে তাদেরকে হারাতে হয়েছে ঘরবাড়ি।

মুক্তিবাহিনীর লোকেরা মাঝে মধ্যেই রেললাইন, ব্রিজ উড়িয়ে দিত। একদিন মোহনপুরের কাছে এক গ্রামে, রাত্রিবেলা দুজন দালালকে মুক্তিবাহিনীর লোকেরা মেরে ফেলে। পরের দিন পাকসৈন্যরা সে গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়।

২৬ জুন শনিবার আমি ও একজন লোক বগুড়ার বাড়ি দেখবার জন্য রওনা হই। একটা বাস রাজশাহীর ও একটা বাস বগুড়ার ছিল। একটা পাঠান ব্যক্তি বাসের সমস্ত পয়সা নিত। কন্ডাক্টরের হাতে লাগানো ছিল শান্তি কমিটির লাল ব্যাচ। পথে মিলিটারির যাতায়াত চোখে পড়ল।

১-৪৫ মি. বগুড়ার পুলিশ লাইনে গাড়ি সার্চ করবার জন্য থামানো হয়। অনেকের সঙ্গে আমাকেও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কী করি, কোথায় থাকি ইত্যাদি। দেখলাম, পুলিশেরা রাইফেলের বাঁট (দুইজন) উপর দিয়ে ও নল নীচের দিকে দিয়ে পাহারা দিচ্ছে। 'বগুড়া কারিগরি মহাবিদ্যালয়কে' তারা ঘাঁটি বানিয়েছিল। শহরে ১৮% জনসাধারণ তখন এসেছে। দোকানপাট বন্ধ। রাস্তার দুপাশের দোকান, বাড়িঘর পোড়ানো। যারা বাইরে থেকে শহরে আসে, তখনই কিছু জিনিসপত্র কিনে নিয়ে তারা চলে যায়। বগুড়া জেলা স্কুলও হয়েছিল তাদের ঘাঁটি। ওই স্কুলের হোস্টেল-বারান্দায় ব্যাটারি চার্জ দেওয়া হত। স্টেশনে কোনো বাঙালিকে যেতে দেওয়া হত না।

বগুড়া পিটি স্কুলের কাছে নামলাম ২-১০ মি.। নেমে হেঁটে বাড়ির দিকে আসছি। বাড়িঘর পোড়া। রাস্তা জনমানবশূন্য। প্রায় ১ মাইল রাস্তার মধ্যে মাত্র ৪ জন লোকের সঙ্গে দেখা হয়। রাস্তা চলতে ভয় ভয় হচ্ছিল। যেখানে একদিন ছিল উৎফুল্ল প্রাণের স্পন্দন, আজ সেখানে শুধু পোড়া মাটির স্তূপ। দেখে কান্না এসে যাচ্ছিল। বাড়ির কাছে আসলাম, একই অবস্থায় আমাদের বাড়িও, তবে সম্পূর্ণ নয়। কেন না জামায়াতে ইসলামির এক লোক বেদখল করার জন্য বর্বরদের কাছে অনুরোধ জানালে তারা সম্পূর্ণ বাড়ি ধ্বংস করেনি। প্রতিটি মন্দির, ধর্মীয় স্থান তারা হয় ধ্বংস, নয় ক্ষতিগ্রস্ত করে। আমি একটুর জন্য প্রাণে রক্ষা পাই। বিহারীদের হাত হতে, এক মুসলমান ভাইয়ের সহায়তায়। প্রাণ নিয়ে ফিরি ঐ গ্রামে।

কিছুদিন পর দালালদের ভয়ে ও নানান কারণে কোনো গ্রামেই থাকা সম্ভবপর না হওয়ার জন্য ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ ভারত অভিমুখে নৌকায় রওনা হই। মাঝেমধ্যেই সিরাজগঞ্জ, পাবনার দিক হতে গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে আসত।

৩ সেপ্টেম্বর নৌকা থেকে দেখলাম কাজিপুর এলাকায় অগ্নিসংযোগের দৃশ্য। ৪ দিন পর মানকর চরে (আসাম) পৌঁছাই যমুনা পথে।

নারায়ণ প্রসাদ

সৈয়দপুর বাজার

জেলা-রংপুর

২৭ মার্চ, আমার বাবাকে বাড়ি থেকে ধরে, কারফিউ চলাকালে সকালবেলা। একটি সামরিক জিপে করে ৪ জন সামরিক লোক এবং ২ জন স্থানীয় অবাঙালি অস্ত্রশস্ত্রসহ এসে নক করে। দরজা খুললে তারা বাড়িতে ঢুকে সিন্দুক খুলে সমস্ত সোনাদানা, টাকা-পয়সা নেয় এবং বাড়িতে অথবা দোকানে ওয়্যারলেস আছে বলে অভিযোগ করে। তাদের অভিযোগের সত্যতা প্রমাণের জন্য দোকান খুলেও দেখানো হয়। পরিশেষে আমাকে একটি লাথি মেরে ফেলে দিয়ে আমার বাবাকে জিপে করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়।

৯ এপ্রিল বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে জনৈক অবাঙালি এসে আমাকে টেলিগ্রাফ অফিসে সামরিক কর্তৃপক্ষ ডাকছে বলে জানায়। সঙ্গে আমার ছোটো ভাইকেও নেবার নির্দেশ দেয়। ধৃত অবস্থায় আমার ছোটো ভাই এবং আমাদেরই ভাড়াটে একজন স্বর্ণকারকে উল্লিখিত স্থানে জনৈক মেজরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করার পর মেজর আমাদেরকে বন্দী করার নির্দেশ দেয়। তারপর থানায় নেওয়া হয়। সেখানে কিছুক্ষণ পর ওই টেলিগ্রাফ অফিসের সুপারিনটেনডেন্ট (টি এন্ড টি) হাতিম আলি খলিফাকে ধরে আনে। রেলওয়ে ওয়ার্কশপ থেকে শ্রমিক ও চার্জম্যানসহ কিছু লোককে ধরে আনে। সর্বমোট ২৪-২৫ জনকে একত্রে বন্ধ ওয়াগনে করে কড়া সামরিক পাহারায় ক্যান্টনমেন্টে নামানোর সঙ্গে সঙ্গে সকলের এক হাত করে বেঁধে দাউন গেঁথে স্থানীয় অবাঙালি ও পাকসৈন্যরা বেদম প্রহার করা শুরু করে। বেল্ট, বেত, লাথি, চড়, কিল, ঘুষি এবং রাইফেলের বাঁট, বৈদ্যুতিক তার দিয়ে প্রহার করতে থাকে এবং বলতে থাকে "আচ্ছা চিজ মিলা"। মারের পর্ব শেষ হলে ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে ছোটো ছোটো ঘরে ১০-১২ জনকে একই ঘরে ঢুকায়।

তারপর সকলকে আবার বারান্দায় বের করে দেয়ালের দিকে মুখ করে হাত দেয়ালের সঙ্গে ফাঁক করে রেখে দাঁড় করায় এবং ওই অবস্থায় ওয়াপদার মোটা বৈদ্যুতিক তার দিয়ে প্রহার করতে থাকে। এ অবস্থায় অত্যাচার চলার পর প্রাচীরের সঙ্গে যে বাঁশ টাঙানো ছিল সে বাঁশের সঙ্গে কোমরে দড়ি বেঁধে উলটো অবস্থায় টাঙিয়ে দেয় এবং পিঠে প্রহার করতে থাকে। প্রহারের ফলে অজ্ঞান হলে অথবা অজ্ঞান হবার উপক্রম হলে ছেড়ে দেয়।

এ সময় টিএন্ডটি ডিপার্টমেন্টের ওই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসাবাদ করে যে, এখানে আমার

কে কে আছে। আমি আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যুবতী মেয়ের কথাও বলি। তখন ওই পশুরা বলে যে তোমার সেই ১৫-১৬ বছরের মেয়েকে এখনই এখানে নিয়ে আসা হচ্ছে এবং এদের সামনে তোমাকে তোমার মেয়েদের সঙ্গে "সহবাস" করতে হবে। অস্বীকৃতি জানালে আমার উপর এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অত্যাচার করে। শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। সন্ধ্যা পর্যন্ত ওইখানেই সকলে ছিলাম। যে আসত সে-ই মারত এবং কাফের লোককে খতম করো— বলে গাল দিত। এ সময় কয়েকজন দাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমরা মুসলমান কিনা এবং নামাজ পড় কিনা? হ্যাঁ-বাচক উত্তর দিলে তাদেরকে কলেমা পড়তে বলে। কলেমা পড়তে থাকলে তাদেরকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয় এবং বলে যে, 'তোম লোগ কাফের হ্যায়, তুম ঝুটা বলতা হ্যায়।'

সন্ধ্যার পর একটি ঘরে সকলকে বসায় এবং শুকনো রুটি ও ডাল এনে দেয়। খাওয়ার পর মুসলমানেরা নামাজ পড়তে চাইলে তাদেরকে মসজিদে না যেতে দিয়ে সেখানেই নামাজ পড়তে নির্দেশ দেয়। নামাজ পড়া যেই শেষ হয়েছে, অমনি জনৈক কোয়ার্টার মাস্টার বেত হাতে এসে প্রহার শুরু করে— তোম লোগ নামাজ পড়তা হায়। তোম লোগ বাঙালি মুসলমান, তোম লোগ কাফের হ্যায়।

অতঃপর আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অনেকগুলো বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্য বন্দী অবস্থায় ছিল। সেখানে দরজা খুলে সকলকে ঢুকিয়ে দেয়। সেখানে বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোকদের মুখে জানতে পারি, তারা সীমান্তবর্তী এলাকায় ছিলেন। ডিউটি অন্যত্র দেওয়া হবে বলে নিয়ে এসে বন্দী করে। তারা সংখ্যায় প্রায় ৫০-৬০ জন ছিলেন। ঘণ্টা খানেক পর উল্লেখিত কোয়ার্টার মাস্টার দরজা খুলে সিভিলিয়নদের বেরিয়ে আসতে নির্দেশ দেয় এবং বেরিয়ে আসলে অন্য আর একটি ছোটো ঘরে নিয়ে যায়। ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ ছিল এবং ঘরের ভেতর কোন আলো ছিল না। কেউ যেন না বসে এমন নির্দেশ দিয়ে সে চলে যায়। তার কিছুক্ষণ পর ওই ব্যক্তি এক এক করে ঘরের সবাইকে বাইরে ডেকে নেয় এবং আমার প্রতি অকথ্য অত্যাচার করতে থাকে। যখন আমার পালা আসে তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, শহরে কে কে বাংলাদেশের পতাকা তুলছিল, কে কে মুজিব ত্রাণ ফান্ডে চাঁদা দিয়েছে এবং কে কে নেতা?

পরের দিন সকালে আমাদের দিয়ে একটি পুকুরের বাঁশ উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং মাঠের ঘাস পরিস্কার করে নেওয়া হয়। তারপর একজন এসে আমাদেরকে বন্দী করতে নির্দেশ দেয়। তখন আমার পূর্বের ধৃত আমার বাবার খবর জানতে চাইলে তাদের সকলকে যে ঘরে আমার বাবা এবং স্থানীয় এমসিএ জিকরুল হকসহ ১৫-১৬ জন বন্দী ছিলেন সেখানে বন্দী করে রাখে।

কিছুক্ষণ পরে মেজর জাবেদ এসে সকলকে একদিক থেকে ওই ঘরেই প্রহার করে। ড.

জিকরুল হককে প্রহার করার সময় সে বলে, 'ড. জিকরুল হক তোম বলতা হ্যায় মিলিটারি ফাঁকা ফায়ার করতা হ্যায়। তোম হিয়াসে মব লাগাতা হ্যায়? বানচোত, তোম সবকো গুলি কর দিয়ে গা।' তারপর ক্যাপটেন বখতিয়ার লাল আসে এবং একই প্রক্রিয়ায় অত্যাচার করে।

পরদিন সন্ধ্যায় ক্যাপটেন গুল এসে তার মাথার শিরস্ত্রাণ খুলে তা দিয়ে সকলকে প্রহার করে। মারের চোটে কেউ চিৎকার করতে চাইলে সে বলত, চিৎকার মাত করো। এদিন ডাক্তার সাহেবকে বেশি অত্যাচার করে ও অকথ্য অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করে। তাকে লাথি দিয়ে বাইরে ফেলে দেয় এবং সেখানে তার প্রতি গুল ও অন্যান্য মিলিটারিরা হৃদয়হীনভাবে অত্যাচার করে। এতে তার চশমা ভেঙে যায়; মাথা ফেটে যায় এবং শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। অতঃপর তার মাথা ব্যান্ডেজ করে লাথি মেরে ঘরে ঢুকিয়ে দেয়।

ডাক্তার সাহেব ঘরে ঢুকলে সকলে কান্নায় ভেঙে পড়েন। ডাক্তার সাহেব সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন— ওরা অত্যাচার করুক না। আজ না হয় কাল দিন আসবে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবে।

১২ তারিখ সকালে সেন্ট্রি এসে জানায় যে, আপনাদের যা খাবার খেয়ে নেবেন, আপনাদের আজ কোথাও যেতে হবে। ১২টার দিকে দরজা খুলে বাইরে বেরোলেই উল্লেখিত কোয়ার্টার মাস্টার সকলকে একটি-দুটি করে লাথি মেরে ট্রাকে উঠতে নির্দেশ দেয়। ট্রাকে উঠতেই তিনজন করে একত্রে পেছনে শক্ত করে হাত বেঁধে দেয়। তিনটি ট্রাকে বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোক সহ প্রায় ১৫০ জনকে উঠায়। ট্রাক রংপুরের রাস্তা ধরে আস্তে আস্তে যাচ্ছিল। যাবার পথে পাহারারত সামরিক লোকেরা বেল্ট দিয়ে, রাইফেলের বাঁট দিয়ে অথবা বুট দিয়ে খুঁচিয়ে অত্যাচার চালাতে থাকে। শেষাবধি রংপুর ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়। সেখানে পৌঁছানোর পরই সকলের উপর অকথ্য অত্যাচার করে। তারপর অফিসার এসে নামের তালিকা বের করে সকলের নাম মিলিয়ে নেয়। তারপর রংপুর উপশহরের দিকে অফিসাররা জিপে যাত্রা করে এবং পিছনে পিছনে ট্রাকগুলোও যেতে থাকে। উপশহরের পাশে বালি তোলা খাদের কাছে নিয়ে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করায় এবং সেখানে প্রথমে বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোকদের ছয়জন ছয়জন করে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। তারপর সিভিলিয়ানদের এক-একজন করে পাশাপাশি একবারে ছয়জন করে দাঁড় করায়। তাদের সামনে খুব নিকটে ছয়জন বন্দুকধারী সিপাই থাকে এবং পাশে জোড়া লাগানো কালো প্যান্ট-শার্ট পরিহিত একজন সিপাই। দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলে ওই কালো কাপড় পরিহিত লোক বলত 'সিঙ্গল ফায়ার' বলে রাইফেল উপরে তুলে গুলি করত আর গুলি করার সঙ্গে বলত 'স্টার্ট ফায়ার'। সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিত ছ'জনকে দাঁড় করানো হত।

আমি ও আমার ছোটো ভাই কমলাপ্রসাদ ওইরূপ তৃতীয় গ্রুপে ছিলাম। আমরা নিজেদের কিছু সলাপরামর্শ করে গুলি করার পূর্বমুহূর্তেই ইচ্ছাকৃতভাবে পড়ে যাই। ফলে গুলি লক্ষ্যভেদ হয়ে আমার হিপে (উরুর উপরে) এবং আমার ছোটো ভাইয়ের হাঁটুর উপরে উরুতে লাগে। আমরা মরার ভান করে পড়ে থাকি এবং সমস্ত লক্ষ্য করতে থাকি।

এ হত্যাযজ্ঞের মাঝামাঝি সময়ে ড. জিকরুল হককে একাই দাঁড় করায় এবং জিজ্ঞাসা করে যে, 'অ্যাই তোমহারা জিন্দেগি আওর মউত কা স্যোয়াল হ্যায়। হাম জানতা হ্যায় তোমস্যে মুজিবরসে ফোন মে বাত হোয়া।' তিনি উত্তর দিলেন আমি মরার সময় মিথ্যা কথা বলে গোনাহগার হব না। আর এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পড়ে যান এবং বলেন 'আল্লাহ তোমার এখানে বিচার নেই, বিচার করো।' এটাই তার শেষ কথা। শেষের দিকে স্থানীয় প্রভাবশালী ডা. শামসুল হককেও ওই একা দাঁড় করিয়ে হত্যা করে।

এ অবস্থায় সকলকে হত্যা করতে করতে প্রায় ঘনিয়ে অন্ধকার হয়ে যায় এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ও মেঘ ডাকতে থাকে। হত্যাপর্ব শেষ হলে সকল মৃত ব্যক্তিকে ৫-৭ জনে পা ধরে টেনে উল্লিখিত খাদে ফেলে দেয় এবং আর ১০-১২ জনে উপর থেকে মাটিচাপা দিচ্ছিল। সে সময় অনেকে জীবিত ছিল। তারা গগনবিদারী করুণ চিৎকার করে আর্তনাদ করছিল। কেউ বা শেষবারের মতো এক গ্লাস পানি পান করতে চাইছিল। আবার কেউ বা এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য আর একটা গুলি ভিক্ষা করছিল।

মাটি চাপা দিতে দিতে ভীষণ বৃষ্টি শুরু হয়। ফলে তারা আমার শরীরের অর্ধাংশ মাটি চাপা দিয়েই পরবর্তী সময়ে মাটি চাপা দেওয়া হবে বলে চলে যায়।

ওরা চলে যাবার পর আমি ওই গর্ত থেকে একজনকে উঠে দৌড়ে পালাতে দেখি। সে সময় আমার ভাই উক্ত পলায়নরত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলে যে, মিঠু আমাকে বাঁচা। আমার কেউ নেই এখানে। কিন্তু ওই ব্যক্তি শুনতে না পেয়ে চলে যায়।

এদিকে আমি যেখানে ছিলাম সেখান থেকে উঠবার চেষ্টা করছিলাম। আমার নড়াচড়াতে আমার দেহের উপর থেকে বেশ ক'টি লাশ গড়িয়ে পড়ে যায়। সে সময় আমার পাশেই এক বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোক জীবিত ছিলেন। তার একটি হাত ছিল না। তিনি আমাকে পালিয়ে যেতে বলেন এবং অপর হাত দিয়ে আমার হাতের বাঁধন খুলে দেওয়ার শেষ চেষ্টা করেন; কিন্তু তিনি তা পারেন না। কারণ তার হাত অবশ হয়ে যাওয়ায় তা সামনে আসেনি। আমি নিজে নিজে বহু চেষ্টা করে হাতের বাঁধন খুলে ফেলি এবং আমার ভাইকে সঙ্গে করে নিয়ে গর্তের উপরে উঠতে চেষ্টা করি। উপরে ওঠার পর হঠাৎ পা পিছলে নীচে পড়ে যাই। গর্ত থেকে আমি ভাইকে গ্রামে আশ্রয় নেবার নির্দেশ দিই।

গর্ত থেকে উঠে আমার ভাইকে আর পাই না। অতি কষ্টে কিছু দূরের গ্রামে একটি

বাড়িতে আশ্রয় নিই। সেখানে থাকা নিরাপদ নয় ভেবে আরও দূরে এক গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিই। উক্ত গ্রামের জনৈক মহিউদ্দিনের আন্তরিক সেবা-যত্নে কিছুটা সুস্থ হই। তারপর সেখান থেকে উক্ত ব্যক্তির সাহায্যে প্রথমে তার এক আত্মীয়ের বাড়ি এবং পরবর্তীকালে জলঢাকা (নীলফামারি) যাই এবং সেখান থেকে মুক্তিবাহিনীর গাড়িতে করে ভারতের জলপাইগুড়ি পৌঁছোই।

অপর পক্ষে আমার ভাই উক্ত ব্যক্তির অক্লান্ত সেবাযত্নের ফলে সুস্থ হয়ে ওঠে। রংপুর হাসপাতালে চিকিৎসার পর তাকেও ভারতে পাঠানো হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত গর্ত থেকে সেদিন মাত্র চার ব্যক্তি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল।

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী

গ্রাম-সোনাপুকুর , থানা-পার্বতীপুর

জেলা-দিনাজপুর

চৈত্র মাসে সামরিক তৎপরতা শুরু হলে অত্র গ্রামের প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই আত্মরক্ষার জন্য বাংকার করে। এই সময় একদিন পাকবাহিনী ও অবাঙালীদের দল সৈয়দপুর থেকে দিনাজপুর যাবার পথে আমাদের গ্রামের সমস্ত বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়। প্রাণ ভয়ে যারা পালিয়ে গিয়েছিল তারাই শুধু বেঁচেছে কিন্তু যারা সাহসে ভর করে জরুরি আত্মরক্ষার তাগিদে উল্লিখিত বাংকারগুলির মধ্যে আত্মগোপন করেছিল তাদের কেউই বেঁচে নেই। ওই দিন আমাদের পাড়ায় অন্যান্য ৭ জন পুরুষ এবং মহিলা মারা যান।

এমনি একটি গর্ত ছিল আমাদের বাড়িতেও। আমি এবং আমার দুই দেবর ও একজন ভাগিনেয়কে নিয়ে সেই গর্তে আত্মগোপন করি। অতি অল্প দূর থেকে খান সেনারা আমাদের লক্ষ্য করে গুলি করে। ওই গুলিতে ওই গর্তেই তিনজন মারা যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় আমি বেঁচে গেছি।

শ্রীমতী পদ্মমণি

গ্রাম-সোনাপুকুর , থানা-পার্বতীপুর

জেলা-দিনাজপুর

চৈত্র মাসের একটি দিনে আমি ভাতিজা সহ বাড়ির গর্তে আশ্রয় নিয়েছিলাম। সামরিক পশুরা যখন আমাদের গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে লোক খুঁজতে খুঁজতে আসছিল তখন তারা আমাদের দেখতে পেয়েই কোনো রকম সময়ক্ষেপণ না করে অথবা কোনো বাক্যব্যয়

না করেই গুলি করে। পরপর চারটি গুলি করে গর্তের সকলকে হত্যা করে। ভাগ্যক্রমে গর্তের আর সকলে মারা গেলেও গুরুতরভাবে আহত হয়ে বেঁচে গেছি। পরবর্তী সময় অনেক কষ্ট করে ভারতে আশ্রয় নিই এবং দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই ছিলাম।

শ্রী তারাপদ কুণ্ডু

গ্রাম-আগ মোহনপুর, থানা-উল্লাপাড়া
জেলা-পাবনা

জুন মাসের মাঝামাঝি একদিন ভোর ৬টার সময় আগ মোহনপুর গ্রামে পাক বর্বরবাহিনী ঘেরাও করে। তারা প্রথমে লুটতরাজ ও পরে অগ্নিসংযোগ করে। এই সময় আগ মোহনপুর গ্রাম হতে ৮/৯ জন লোক পাকবাহিনী আটক করে তার মধ্যে আমি ছিলাম একজন। আমার একমাত্র অপরাধ আমি তাদের কথায় "মালাউন"। আমাকে প্রথমে লাহেড়ি মোহনপুর দুধের মিলের নিকট যে আর্মি ক্যাম্প ছিল সেখানে নিয়ে যায়। সেখানে আমাকে হাত-পা বেঁধে দুপুরে রোদের ভিতর চিত করে শুইয়ে রাখে এবং পরে আমাকে চাবুক দ্বারা প্রহার করে। আমাকে যখন প্রহার করে তখন আমি মাঝে মাঝে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। সবার ভিতর হতে একজন বর্বর আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, ম্যায় জান্তা হু তোমহারা বড়া বড়া দো লাড়কি হ্যায়। যদি আমি তাদের এখানে আনতে পারো তবে তোমাকে ছেড়ে দেব।

দুইদিন আমাকে এইভাবে পিঠমোড়া করে বেঁধে রাখে। এই দুইদিন আমাকে কিছুই খেতে দেয় নাই। আমি তাদেরকে অনেক অনুনয়-বিনয় করেছি যে আমি বৃদ্ধ মানুষ আমাকে এইভাবে কষ্ট দিলে ভগবান নারাজ হবে। তবুও আমাকে খেতে দেয় নাই। দুইদিন পর আমাকে একটা রুটি খেতে দেয়।

তিনদিন পর আমাকে সিরাজগঞ্জ চালান করে দেয়। সিরাজগঞ্জ যাবার পর আমার উপর পর্যায়ক্রমে অমানুষিক অত্যাচার চলতে থাকে। আমার মতো বৃদ্ধ মানুষও ওই পাক বর্বরদের হাত থেকে রেহাই পায় নাই। সিরাজগঞ্জ জেলে থাকা অবস্থায় আমি অনেক লোককে শুধু পিটিয়ে মেরে ফেলতে দেখেছি। চাকু দিয়ে সারা শরীর ফেঁড়ে লবণ লাগিয়ে দিতেও আমি দেখেছি।

দুই মাস আমি জেলে ছিলাম। এই সময় আমাকে যখন তখন পিটাত। দুই মাস পরে যখন আমি ধীরে ধীরে পীড়িত হয়ে পড়ি তখন আমাকে ছেড়ে দেয়। আমার সারা শরীরে এখনও ক্ষতের চিহ্ন বর্তমান।

দীপকপ্রসাদ গুপ্ত

গ্রাম-পশ্চিম টেংরী, থানা-ঈশ্বরদী

জেলা-পাবনা

পাক মিলিটারী এবং অবাঙালীদের অত্যাচারে অত্র এলাকার নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, শিশুরা দেশ ত্যাগ করে বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে ভারতে চলে যায়। ১লা বৈশাখ তারিখে পাকসেনারা এখানে প্রবেশ করে। তারা আসার পরই এলাকায় বাড়ীঘর পুড়িয়ে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে। অবাঙালীরাও এ সময় রীতিমত লুটপাট শুরু করে। অবস্থার প্রেক্ষিতে বাধ্য হয়ে জনগণ এলাকা ত্যাগ করেন। পলায়নপর লোকদের উপর হানা দিয়ে লুটপাট করে ঘরের শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নেয় এবং অনেককে হত্যা করে।

এর দু'মাসের মধ্যে শান্তি কমিটি গঠিত হয়। তারা মিলিটারীদের সাথে যোগাযোগ করত। তারা উৎসাহ দিয়ে রাজাকার তৈরী করেছিল।

রাজাকাররা গ্রামে গিয়ে লুটপাট করেছে, লোক ধরে মিলিটারীদের দিত। মারধর করত। গরু-বাছুর, হাঁস-মুরগী ধরে নিয়ে যেত।

মুক্তিবাহিনীদের লোকেরা গ্রাম এলাকায় থাকত। জনগণ তাদের থাকতে দিত।

মিলিটারীরা গ্রামে গ্রামে এবং বিভিন্ন এলাকায় অপারেশন করত, মানুষ হত্যা করত; মেয়েদের উপর অত্যাচার করেছে।

অবাঙালীরা যে সমস্ত অমুসলিম পরিবার ছিল তাদের জোর করে ভয় দেখিয়ে মুসলমান করেছিল। আমি নিজেও উক্ত শিকারে পরিণত হয়েছিলাম। এমনি ১২/১৩ ঘরে ৮০/৯০ জনকে মুসলমান করেছিল। বিহারীরা মন্দির ভেঙে ফেলেছিল এবং মন্দিরের ইট দিয়ে রাস্তা তৈরী করেছিল। মন্দিরের বিগ্রহগুলি হৃদয়হীনভাবে ভেঙে ফেলেছিল।

ডিসেম্বরের যুদ্ধকে মানুষ স্বাগত জানিয়েছেন। এই যুদ্ধ স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করবে এই বিশ্বাস সকলের মনে ছিল।

নীলিমারাণী দাস

সাউথ সেন্ট্রাল রোড

যুদ্ধ বাধলের আমরা সবাই খুলনাতেই আছি। সান্ধ্য আইন চলছে, ঘরের বের হবার উপায় নেই। ৩রা চৈত্র, রাত ১০-৩০টায় ৬জন পাক সেনা আমাদের বাড়ী ঢোকে।

আমরা তখন আকাশবাণীর খবর শুনছি। পাকসেনারা ঢুকে আমার স্বামীকে ডাকে, তারপর ঘরে ঢুকে আমার সকল গহনা খুলে দিতে বলে। আমি সকল গহনা খুলে দিই আর যা টাকা-পয়সা ছিল সব নিয়ে আমার স্বামীকে নিয়ে চলে যায়। রাত ১১-৩০টায় গুলির আওয়াজ পেলাম। পরে শুনলাম আলতাফ গলির মোড়ে ৮ জনকে গুলি করে, ৬ জন মারা যায়, ২ জন বেঁচে যায়—একজন চিত্ত অপরজন রবি। আমায় স্বামী ওই দিন মারা যায় পাকসেনাদের গুলিতে।

তারপর আমি আমার ৪ মাসের বাচ্চা নিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে আমার গ্রামের বাড়ী যাই। ওখান থেকে কয়েকদিন হেঁটে বহু লাঞ্ছনা সয়ে ভারতে যেতে পারি। দেশ স্বাধীন হলে দেশে আসি, আমার কেউ দেখার নেই, বাড়ীঘর নেই।

সম্পূর্ণ অসহায়, নিঃসহায়, শুধু ভাবছি এমনি যন্ত্রণা নিয়ে আর ক'দিন বাঁচবো।

শ্রী শক্তিপদ সেন

গ্রাম-আজদিয়া, ডাকঘর-আলাইপুর
থানা ও জেলা-খুলনা

১৯৭১ সালের ১৯ শে এপ্রিল বুধবার বেলা ১১টায় সময় খুলনা ট্রেজারীতে চাকুরীতে কর্মরত অবস্থায় একজন পাক মিলিটারী আমাদের অফিসে আসে এবং আমাকে ডাকে। আমি তার নিকটে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে আমার পিছে রাইফেল ধরে সঙ্গে করে তাদের ক্যাম্প, সার্কিট হাউজে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে আমাকে বেশ কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। যেমন, (ক) কাকে ভোট দিয়েছ? (খ) কতজন বিহারী মেরেছ? (গ) এম এম দাস কোথায়?

আমাকে নিয়ে যাওয়ার পর আমার দু'হাত পিছনে দিয়ে বেঁধে ফেলে। তারপর প্রশ্নবাদ করতে থাকে আর কাঠের রুলার, লোহার রড দিয়ে শরীরের সমস্ত জয়েন্টে প্রহার করতে থাকে। প্রহার করার মাঝে বুট দিয়ে লাথির পর লাথি মারতে থাকে। প্রহার করার পর সিগারেটে আগুন ধরিয়ে আমার সমস্ত শরীর চেপে ধরে পুড়িয়ে দিতে থাকে। একটু এদিক ওদিক ব্যথার যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলে আবার মার শুরু করে দিত। এইভাবে সন্ধ্যা ৮-৩০ পর্যন্ত অত্যাচার করার পর তিনজন মিলিটারী আমাকে হাত খুলে দিয়ে বলে, চল শালা তোকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি। এই বলে আমাকে সামনে রেখে একজন পিছে আর দু'জন পার্শ্বে রাইফেল ধরে ১ নং ফরেষ্ট গেটে নিয়ে যায়। তারা সেখানে নিয়ে দু'হাত পিছে দিয়ে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলে। আর দু'পা এক সঙ্গে

করে বেঁধে ভৈরব নদীতে পিছন হতে লাথি মেরে ফেলে দেয়। ফেলে দেওয়ার পর আমি ভাসতে ভাসতে ২০০/৩০০ গজ যাওয়ার পর আমার পায়ের রশিটা খুলে যায়। তারপর আমি পায়ের তলায় মাটি পাই। সেখানে আশ্রয় নিয়ে হাতের রশিটা খুলে ফেলি। এবং সেখানে আত্মরক্ষার জন্য পানির নীচে সমস্ত শরীর ডুবিয়ে কোনরকম প্রাণ বাঁচিয়ে প্রায় ৩/৪ ঘন্টা সেখানে কাটাই। তারপর নদী হতে উঠে পালিয়ে খুলনা টাউন মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে মসজিদ প্রাঙ্গণে আমার দেখা হয়। মসজিদের ইমাম সাহেব আমাকে বাড়ী পর্যন্ত পৌছে দেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তারপর পালিয়ে পালিয়ে আমার নিজ বাড়ী গিয়ে আশ্রয় নেই এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পূর্ব পর্যন্ত আমি বাড়ীতে থেকে যাই।

রেবারাণী নাথ

ডাক ও থানা-ডুমুরিয়া
জেলা-খুলনা

জুন মাসের শেষের দিকে আমরা পাথরঘাটা হয়ে ভারতে যাচ্ছিলাম। দলে ছিলাম প্রায় ৮/১০ হাজার লোক, সবাই আমরা ভারতে যাব। রাত থেকে সকালে ৮/৯টার দিকে আমরা যাহোক কিছু রান্নাবান্না করছি এমন সময় ৩/৪ গাড়ি মিলিটারী আসে। সঙ্গে সঙ্গে পাকসেনারা গুলি চালিয়ে বহু লোককে হত্যা করে। এবং বহু লোককে ধরে গাড়িতে তোলে। প্রত্যেক গাড়ীতে ১৫/২০ জন করে মেয়েদের তুলে নেয়। ওখানেই অনেকের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। পাকঘাঁটি ঝাউডাঙ্গাতে আমাদের নিয়ে যায়। ছেলেগুলিকে একজায়গা করে গুলি করে সবাইকে হত্যা করে, শুধু আমাদেরকে নিয়ে যায়। ওখানে গিয়ে ৫০/৬০ জন মেয়েকে দেখলাম বিভিন্ন জায়গার, ঝাউডাঙ্গারও অনেক মেয়ে দেখলাম। অনেক কলেজ পড়া-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া মেয়েকে দেখলাম।

পাকসেনারা আমাদের ৪/৫ দিন রাখে। ওখানে ৩/৪টি তাঁবু ছিল। এক একটি সীটের কাছে ২/৩টি মেয়ে নিয়ে এসে রাখতো। পাকসেনারা জোর করে ধরলে দুটি মেয়ে কিছুতেই তাদের শিকার হতে চায় না। তখন পাকসেনারা ভীষণভাবে দৈহিক পীড়ন করে গুলি করে হত্যা করে। পাকসেনারা একদল সবসময় ঘরে থাকতো, অপরদল আসা পর্যন্ত আমাদের উপর অত্যাচার চালাতো।

আমি যে তাঁবুতে ছিলাম সেখানে ২৫/২৬টি মেয়ে ছিল। সীট ছিল ৮/১০টি। পাকসেনারা যখন তখন আমাদের উপর দৈহিক পীড়ন চালাতো। প্রায় সবসময় বিভিন্ন

স্থান থেকে পাকসেনারা আসতো আর আমাদের উপর অত্যাচার চালাতো। পাকসেনারা বলতো বাংলাদেশ হবে না, তোমাদের আমাদের সঙ্গেই থাকতে হবে, জোর করলে গুলি। আমাদের উপর একই সময় ৫/৭টি করে পাকসেনা অত্যাচার চালাতো। বিভিন্নভাবে তারা তাদের যৌনক্ষুধা নিবৃত্ত করতো। আমাদের ৪ দিনের মধ্যে ১ দিন ভাত দিয়েছিলো। একজনের সাথে অপরজনের কথা বলতে দিত না। আমরা ওখানে হিন্দু মেয়ে বেশী ছিলাম কিন্তু সবাই আমরা মুসলমান বলে পরিচয়ই দিই। আমাদের গায়ে ব্লাউজ রাখতে দিত না। সবাইকে কেবল শাড়ী পরিয়ে রাখতো।

আমরা থাকতে আরও প্রচুর মেয়েকে ধরে আনে। পাকসেনারা তখন আমাদের রাজাকারদের হাতে তুলে দেয়। প্রত্যেক রাজাকার এক একজনকে নিয়ে যায়। আমাকে এক রাজাকার তার বাড়ীতে নিয়ে যায়।

৩/৪ দিন রাজাকারটি আমার উপর অত্যাচার চালায়। রাজাকারটির বৌ এবং মা নিষেধ করলে গুলি করতে যেতো। এরপর এখান থেকে রাজাকারের মা এবং বৌয়ের সহায়তায় পালিয়ে ভারতে চলে যাই। সেখানে গোলপুকুর ক্যাম্পে থাকতাম। দেশ স্বাধীন হলে দেশে ফিরে আসি। আমি তখন ৭/৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলাম।

আমি নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রে আবেদন করি সমাজকল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে। ওরাই আমার চিকিৎসা এবং কাজের ব্যবস্থা করেন।

শ্রী নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ষষ্ঠীতলা, যশোর

আমার বর্তমান বয়স ৯৮ বছর। ১৯৭১ সালের ৪ঠা এপ্রিলে সকাল ৮-৩০ মিনিটে ভারত ও তথাকথিত পাকিস্তানের খবর রেডিওর মাধ্যমে শুনছি এমন সময় দু'জন বিহারী ও তিনজন পাঞ্জাবী আমার বাড়ি চলে আসে। বিহারী দুজন আমার পাড়া-প্রতিবেশী। তারা আসার সাথে সাথে আমি রেডিও বন্ধ করে দেই। তারা সোজাসুজি আমার নিকট চলে আসে এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তোমার টাকা-পয়সা কোথায় রেখেছ? আমি জবাব দেই— আমার কোন গচ্ছিত টাকা পয়সা নাই। আমি আবার ত্রিশ বছর চাঁচরা রাজ ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলাম। তারা সেই জন্য মনে করতো আমার নিকট প্রচুর টাকা পাওয়া যাবে। তারপর তাদের মধ্যে থেকে একজন মিলিটারী আমার পাশের ঘর হতে আমার চাকর কালিপদ দাসকে আমার নিকটে নিয়ে আসে। তারপর আমাকে এবং তাকে ভয় দেখায়— টাকা কোথায় রেখেছ? যদি না বলে দাও তাহলে তোমাদের

দু'জনকেই গুলি করে মারা হবে। আমরা জবাব দিলাম, টাকা আমরা কোথায় পাবো? তখন আমাদের দু'জনকে পাশাপাশি দাঁড় করায়। তারপর একজন মিলিটারী কালিপদকে লক্ষ্য করে গুলি করে। সঙ্গে সঙ্গে তার বুক ভেদ করে গুলি বেরিয়ে যায়। তার পরক্ষণেই সে মারা যায়। তারপর আমাকে লক্ষ্য করে দ্বিতীয় গুলি ছোঁড়ে, গুলিটি আমার একহাতে লাগে। গুলি লেগে আমার বাম হাতটা প্রায় শরীর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারপর আবার আরেকটা গুলি আমাকে করে। কিন্তু আল্লাহর অশেষ করুণায় গুলিটি আমার ডান হাতের একপাশে লাগে। সাথে সাথে আমি ঘরের মেঝেতে পড়ে যাই। গুলির আঘাতে আমার ক্ষতবিক্ষত জায়গা দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। তারা আমাকে অমনি ফেলে রেখে চলে যায়। বাড়ী হতে বের হতে যাবার সময় আমার বাড়ী লুটপাট করে বাড়ীর সমস্ত কিছু নিয়ে যায়। আমি ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকি। মিলিটারীটা ওই দিন আমার বাড়ীর পাশে এগারোজনকে গুলি করে মারে, তার মধ্যে আমি শুধু বেঁচে আছি। যাদের গুলি করে মারা হল, তারা হল, আমার বাড়ীর উত্তরে আমার বিশিষ্ট বন্ধু অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রহমত উল্লাহ মণ্ডল এবং তার দুই শিক্ষিত পুত্র মোছাদ্দেক ও জিন্নাহ এবং তার বাড়ীতে তিনজন ভাড়াটিয়া, একজন প্রফেসর ও দুজন শিক্ষিত ভদ্রলোক। আমার বাড়ীর উত্তরে সত্যচরণ মিত্র ইত্যাদি বারোজনকে গুলি করে তার মধ্যে এগারোজন মারা যায়। তার মধ্যে আমি পঙ্গু এবং অন্ধ অবস্থায় বেঁচে আছি। তারা চলে যাবার পর আমি আধমরা অবস্থায় পড়ে থাকি। সেইদিন বেলা তিনটার সময় দু'জন বিহারী এসে আমার ঘর হতে কালিপদের মরা লাশ নিয়ে যায়। তারপর সাতদিন পর্যন্ত শুধু আমি শরীরে ভীষণ জ্বর নিয়ে না খেয়ে মেঝেতে পড়ে থাকি। সাতদিন পর ঘোপের বদরউদ্দিন সাহেবের বাড়ী হতে মহর আলী আমার জন্য দুধ ও রুটি নিয়ে আসে। তারপর হতে তার সেবা শুশ্রূষায় আমি সুস্থ হয়ে উঠি। আমার হাতে পোকা পড়ে গিয়েছিল। বর্তমানে আমি অন্ধ এবং আমার বাম হাত পঙ্গু হয়ে গেছে। আমি এখনও খোদার অশেষ কৃপায় বেঁচে আছি আর কি।

শ্রী গণপতি সরকার

কোতোয়ালী, যশোর

১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ আধুনিক সেলুনে আমি কাজ করছিলাম। বেলা এগারোটার সময় চারজন পাক সেনা আধুনিক সেলুনে চলে আসে এবং আমাকে, অজিত, ভুবন ও জগদীশকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করে ধরে ফেলে এবং সবাইকে কালেক্টরেটে নিয়ে

যায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে আমাকে ছাড়া বাকি তিনজনকে রাইফেল, বেতের লাঠি ও বুট দিয়ে গুঁতা, প্রহার ও লাথির পর লাথি মারতে থাকে । তাদের এইভাবে বেলা তিনটা পর্যন্ত মারার পর জিন্নাহ রাস্তার উপর তাদের ফেলে রেখে আমাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যায়। তারপর আমার বাড়ী গিয়ে আমার বড় ভাইকে খোঁজ করে কিন্তু তাকে বাড়ী না পেয়ে ঘরের মধ্যে শেখ সাহেবের যে ফটো ছিল তা ভেঙে ফেলে এবং পরে ওতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারপর আমাকে কালেক্টরেটে নিয়ে আসে। সেখান হতে তাদের গাড়ীতে করে আমাকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়। সেখানে গাড়ী হতে নামিয়ে মার্শাল ল কোর্টে নিয়ে হাজির করে। তারপর কর্ণেল আমাকে জিজ্ঞেস করে তোমার নিকট নাকি ওয়ারলেস পাওয়া গেছে? আমি অস্বীকার করি। তারপর আমাকে একটা ঘরে নিয়ে যায় এবং সেখানে হাওয়ালাদার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে— তোর ভাই কোথায় আমাদেরকে বলে দিবি আর না হয় স্বীকার করবি যে, আমার নিকট ওয়ারলেস পাওয়া গেছে। কিন্তু আমি কোন কথাতেই রাজি না হবার দরুন আমার পাছায় এবং পিঠে পঁচিশটা বেত মারে এবং আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। প্রায় ঘন্টাখানেকের মধ্যে আবার জ্ঞান ফিরে পাই। তারপর প্রায় চল্লিশজনকে মারতে মারতে কোয়ার্টার গার্ডে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে আবার বেতের ছড়ি দিয়ে মারতে মারতে গাড়ী হতে নামায়। গাড়ী হতে নামিয়ে রৌদ্রের মধ্যে চিত করে শুইয়ে রাখে। তারপর বুকের উপর উঠে বুট দিয়ে খোঁচাতে থাকে। এইভাবে বেলা এগারোটা হতে বিকাল তিনটা পর্যন্ত রৌদ্রের মধ্যে শুইয়ে রাখার পর আবার রাইফেলের গোড়া দিয়ে মারতে থাকে। মারার পর আবার গাড়ীতে করে কোয়ার্টার গার্ডে নিয়ে এসে রেখে দেয়। এইভাবে প্রত্যেকদিন অত্যাচার করার দরুন দ্বিতীয় তিনদিন বুটের খচনের সঙ্গে সঙ্গে তিনজন— আমীর, লতিফ ও গৌর নামক তিন ব্যক্তি মারা যায়। তিন দিন পর পর এক বেলা খাবার দিত। আর জল চাইলে প্রস্রাব করে নিয়ে এসে দিত। পায়খানা করতে চাইলে মার আরম্ভ করে দিত। এইভাবে ৬ই এপ্রিল পর্যন্ত আমাদের উপর একই উপায়ে অত্যাচার করার পর ৭ই এপ্রিল মেজর আমাদেরকে ডাকে। আমরা পঁয়ত্রিশ জন মেজরের নিকট হাজির হই। মেজর সবার স্টেটমেন্ট নেবার পর আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে— তোমার নিকট নাকি ওয়ারলেস পাওয়া গিয়েছে এবং মেজর আরও জিজ্ঞাসা করে, তা হলে তোমাকে কোন অপরাধে ধরে নিয়ে আসে। আমি প্রতি উত্তরে বলি, স্যার, আমি একজন বারবার, আমি, ওয়ারলেস চিনি না। আমার বড় ভাই আওয়ামী লীগ করেন। যে চারজনকে রেখে দেয় তারা হলো অরুণ, অমল, সোম, কেষ্ট এবং আর একজন নাম না জানা। ওদের চার জনকে কারেন্ট চার্জের জন্য নিয়ে যায়। তারা আর ফিরে আসে না। তারপর আমি ৭ই এপ্রিল উক্ত একত্রিশ জনের সঙ্গে ক্যান্টনমেন্ট হতে মুক্তি পেয়ে বাড়ী চলে আসি।

শ্রী শংকরপ্রসাদ ঘোষ

গ্রাম-আউড়িয়া, পোষ্ট-হাটবাড়ীয়া
থানা-নড়াই, জেলা-যশোর

যশোরের চৌগাছায় পাকসেনাদের হাতে আমরা ধরা পড়ি। পাকসেনারা চৌগাছার হাইস্কুলে আমাদেরকে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে আমাদের ঘড়ি, টাকাপয়সা সব কিছু নিয়ে নেয়। তারপর প্রথমে আমাকে, জামা ও প্যান্ট খুলে, দু'জন পাকসেনা বাঁশের লাঠি দিয়ে সারা শরীরে প্রহার করতে থাকে। এই ভাবে প্রায় এক ঘণ্টা প্রহার করার পর আমার দু'পা বেঁধে একটা আকড়ার সঙ্গে পা উপর দিয়ে ঝুলিয়ে লাঠি দিয়ে সমস্ত শরীরে প্রহার করতে থাকে, মেজর তখন চেয়ার পেতে বসে আছে। একদল আমাকে প্রহার করতে থাকে, আর একদল আমাকে প্রহার করতে দেখে হাসতে থাকে, আর বলতে থাকে— বল মাদারচোদ, টিক্কা খাঁ জিন্দাবাদ। আমার সমস্ত শরীরে বেয়োনেট মারতে থাকে আর চাকু দিয়ে প্রতিটি নখ ফেড়ে দেয়। আমার সমস্ত শরীর হতে রক্ত ঝরতে থাকে তারপর যে কি হয় আমি বলতে পারি না। প্রায় তিন ঘণ্টা পর আমি জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখতে পাই আমার পাশে আমার দু'বন্ধু ইলিয়াস ও সুনীলকুমার বসু পড়ে আছে। তাদের শরীর হতে আমার শরীরের ন্যায় রক্ত ঝরছে। প্রহারের দরুন তাদের ও আমার শরীর ফুলে যায়। আমরা জল খেতে চাইলে প্রস্রাব এনে সামনে দিত। তার গন্ধ পেয়ে আমরা মুখ বন্ধ করতে থাকলে ইট নিয়ে এসে মুখে মারত। সন্ধ্যার পর আমাদেরকে স্কুলের পিলারের নিকট নিয়ে যায় এবং সেখানে নিয়ে গিয়ে তিনজনকে তিনটা পিলারে পিঠমোড়া করে বাঁধে। আর মাজার সঙ্গে পিলারে বেষ্টন দিয়ে বেঁধে ফেলে আবার প্রহার করতে থাকে। আমরা তৃষ্ণায় জল জল করে চিৎকার করতে থাকি। তখন বৃষ্টি নামে। উক্ত বৃষ্টির জল আমাদের মাথায় পড়তে থাকে। উহা আমাদের শরীর বেয়ে পড়তে থাকে। উক্ত জল খেয়ে আমরা তৃষ্ণা নিবারণ করি। তারপর দিন, হাত-পায়ের রশি খুলে দেয় এবং আবার পিটাতে থাকে। তারা জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে, তোমরা মুক্তিবাহিনী কিনা? ট্রেনিং জানো কি না? তখন আমরা বলি, না, আমরা ট্রেনিং জানি না, আমরা মুক্তিবাহিনীও নই। তারপর মারা বাদ দিয়ে পাকসেনারা ৩/৪ জন, আমাদেরকে ধরাধরি করে তাদের গাড়িতে তুলে যশোর ক্যান্টনমেন্টে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে নিয়ে আমাদেরকে একটা ঘরে বন্দী করে রাখে। তার ১০/১৫ মিনিট পর একজন হাবিলদার ও ৭/৮ জন মিলিটারী আমাদের নিকট আসে এবং আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে, সত্যি করে বলো, ভারতে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং-এ যেতেছিলে কিনা এবং অকথ্য ভাষায় গালি দিতে থাকে। তারপর আমরা তাদের কথার কোনো জবাব নিইনি। তারপর আমাদের হাত আবার

পিঠমুড়া করে পিলারের সঙ্গে বেঁধে ১০/১৫ মিনিট সময় দিয়ে বলে যে, এর মধ্যে যদি সত্যি কথা না বলো তাহলে গুলি করে হত্যা করব— এই বলে আমাদের দিকে বন্দুক ধরে রাখে। আমরা জবাব দেই যে, আমরা সত্যি বলছি আমাদের লোক হারিয়ে গিয়েছে তাদের খোঁজে আমরা এখানে এসেছি। আমরা ভারতে যাবার উদ্দেশ্যে এখানে আসি নাই। তারপর আমাদের তিনজনকে একটা ঘরের মধ্যে পনেরো দিন রেখে দেয়। ওই কয়দিনের প্রত্যেকদিনই খাবারের সময় এবং পায়খানা-প্রস্রাবের সময় কিল, ঘুষি, লাথি, ইত্যাদি খেতে হত। তারপর সেখান হতে যশোর কোতোয়ালী থানায় পাঠিয়ে দেয়। ওখানে এক রাত্রি থাকার পরদিন কোর্টে ৫৪ ধারায় একটি মামলা দায়ের করে যশোর সেন্ট্রাল জেলের হাসপাতালে রেখে দেয়। সেখানে বাঙালী চিকিৎসক ছিলেন, তারা আমাদেরকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলেন। সেখানে বারো দিন থাকার পর কোর্ট থেকে জামিন নিয়ে মুক্তিলাভ করি। তারপর বাড়ি এসে চিকিৎসা করে সুস্থ হয়ে উঠি। জুন মাসের ২০ তারিখে আমরা ধরা পড়ি এবং সেপ্টেম্বর মাসের ২ তারিখে যশোরের প্রথম শ্রেণীর মেজিস্ট্রেট শেখ আবদুল্লাহ সাহেবের কোর্ট থেকে মুক্তি পাই।

শ্রী বিনয়কৃষ্ণ দত্ত

মহেশপুর, যশোর

১৯৭১ সালের ১৩ মে, রোজ রবিবার সকাল ১০ ঘটিকার সময় আমি স্নান করার জন্য বাড়ি হতে বের হই। এমন সময় দেখতে পাই দু'খানা খানসেনার গাড়ি এসে আমাদের মহেশপুর টাউন কমিটি ঘরের সম্মুখে থেমে যায়। আমি ওই গাড়ি দেখার সঙ্গে সঙ্গে স্নান না করে বাড়ি ফিরে যাই। তার ১০/১৫ মিনিট পর টাউন কমিটির চেয়ারম্যান সোজাসোজি আমার বাড়ি চলে আসে এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর আমাকে বলে, চলো টাউন কমিটিতে, মেজর তোমাদের পরিচয়পত্র করে দিচ্ছে। তুমি উহা নিয়ে চলে আসবে। আমি সরল মনে তার সঙ্গে টাউন কমিটির সামনে চলে আসি এবং দেখতে পাই টাউন কমিটি হলের দরজা বন্ধ। তখন যেতে না যেতেই দক্ষিণ দিক হতে দুটা পাকসেনার গাড়ি এসে আমাদের সামনে থেমে যায়। আমি গাড়ির দিকে তাকাতেই দেখতে পাই গাড়ির মধ্যে প্রায় ১০/১২ জন হিন্দু ও মুসলমান বসে আছে। তারপর চেয়ারম্যান মেজরকে আমাকে দেখিয়ে বলে, এ এক মালাউন হায়, অমনি একজন খানসেনা গাড়ি হতে লাফ দিয়ে নেমে আমাকে গাড়িতে উঠতে বলে, আমি গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি স্টার্ট করে মহেশপুর হতে আধা মাইল দূরে ভালায়পুর নামক একটা ব্রিজ

আছে, তার পূর্ব দিকে একটা আম-কাঁঠালের বাগান আছে সেখানে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে আমাদেরকে গাড়ি হতে নামায়। আমি গাড়ি হতে নেমেই দেখতে পাই , ওইখানে একটা গাছের নীচে ৪/৫ টা ছাগল আর একটা কাঁঠাল গাছে একটা যুবক গাছ হতে ওই ছাগলগুলোর জন্য পাতা পাড়ছে। মেজর তাকে দেখেই ডাকে। লোকটি অমনি মেজরের ডাকে তার কাছে চলে আসে। তার হাতে ছিল একটা দা। মেজর দা-খানা তার হাত হতে নেয় এবং ২-৪ মিনিট চেয়ে দেখার পর তাকে জিজ্ঞেস করে ইয়ে কিয়া হায়? সে বলে দা। তারপর দা-খানা তার হাত দিয়ে বলে, এই দা দিয়ে এই লোকগুলোকে জবাই করতে পারবে? লোকটি অস্বীকার করে। সঙ্গে সঙ্গে পিছন হতে একজন পাকসেনা রাইফেল নিয়ে দৌড়ে তার কাছে চলে আসে এবং তার ঘাড়ে এবং পিঠে দুটা আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে যায়। তার ২-৪ মিনিট পর সে মাজা বাঁকা করে সেখান হতে চলে যায়। তারপর আমাদের সবাইকে লাইন করে দাঁড় করায়। আট জন পাকসেনার মধ্যে তিনজন রাইফেল নিয়ে তিনদিকে আমাদের থেকে প্রায় ২০/২৫ গজ দূরে চলে যায় এবং আমাদের দিকে পজিশন নিয়ে থাকে। আর বাকি পাঁচ জন পাকসেনা প্রত্যেকে একটা মোটা লাঠি হাতে করে আমাদের সবাইকে ঘাড়ে এক বাড়ি আর মাজায় দু'বাড়ি মারার পর শেষে আমাদের সবাইকে পায়ে দড়ি লাগিয়ে হেঁচড়ে টেনে একটা গর্তের ধারে নিয়ে সবাইকে বেয়োনেট চার্জ করে আমাদের সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত করে। পরে আমাদেরকে একই গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মাটি চাপা দিয়ে তারা চলে যায়। পাকসেনারা চলে যাবার প্রায় মিনিটি দশেক পর আমি অতি কষ্টে ধীরে ধীরে ওই গর্তের উপরে উঠি এবং আমার সঙ্গে আরও একজন লোক ধীরে ধীরে উপরে উঠে ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়েই ২০/২৫ গজ রাস্তা চলার পর মাটিতে পড়ে যায়। তার কিছুক্ষণ পর সে'সেখানে মারা যায়। আমার পেটে বেয়োনেটের খোঁচা লেগে নাড়ি বের হয়ে গিয়েছিল, আমি আমার গামছা দিয়ে পেট বেঁধে ৪০/৫০ গজ পথ চলার পর একটা বাড়ি পাই এবং সেই বাড়ির মালিক আমাকে দেখে এগিয়ে আসে। আমি পানি খাবার পর সেখানে থাকতে চাইলে বাড়িওয়ালা খানসেনাদের ভয়ে আমাকে রাখতে অস্বীকার করে। তারপর তারা আমাকে ধরাধরি করে ভৈরব নদীর ধারে একটা বাবলা গাছের নীচে রেখে আসে। আমি প্রায় পনেরো মিনিট সেখানে রেস্ট নেবার পর ধীরে ধীরে নদীর পাড়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলে যাই এবং সেখানে গিয়ে দেখতে পাই একজন লোক নৌকা নিয়ে জাল নিয়ে নদীতে মাছ ধরছে। লোকটা আমাকে হামাগুড়ি দিয়ে আসতে দেখে নৌকা নিয়ে নদীর ধারে চলে আসে এবং আমার অনুরোধে আমাকে নদী পার করে দেয়। আমি অতি কষ্টে রামচন্দ্রপুর নামক একটা গ্রামে সন্ধ্যা সাতটার সময় একটা বাড়িতে গিয়ে থাকার জন্য একটু জায়গা চাই কিন্তু ওই বাড়িওয়ালা খানসেনাদের ভয়ে জায়গা দিতে অস্বীকার করে। আমি বলি আমার চলার শক্তি নাই, তখন ঐ বাড়ির

চারজন লোক একটা তক্তায় করে আমাকে নিয়ে রামচন্দ্রপুর স্কুলে রেখে আসার কথা বলে সুন্দরপুর নদীর ঘাটে ফেলে রেখে আসে। আমি সেখানে আধমরা অবস্থায় পড়ে থাকি। তখন রাত্রি প্রায় ১০-৩০ মিনিট। সেই সময় কোটচাঁদপুর হাট হতে জালাল নামক একটা লোক সুন্দরপুর নদীর ঘাটে আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি করে মহেশপুর চলে এসে খবর দেয়। তৎক্ষণাৎ মহেশপুর হতে জালাল ও আরও চারজন লোক একটা বাঁশের মাচান নিয়ে সেখানে চলে যায় এবং ওই মাচানে করে আমাকে মহেশপুরে নিয়ে আসে। আমাকে মহেশপুরে নিয়ে এসে কোহিনুর বেগমের বাড়িতে রেখে দেয় এবং বজলু নামক একজন ডাক্তারের চিকিৎসায় ১০/১৫ দিন পর আমি সুস্থ হয়ে উঠলে ডাক্তার একটা গরুর গাড়ি ভাড়া করে আমার পরিবারের সকলকে ভারতে পাঠিয়ে দেয়। তারপর আমি ভারতে গিয়ে সিন্দ্রানী হাসপাতালে প্রায় দুই মাস চিকিৎসা করার পর সুস্থ হয়ে উঠি এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরপরই বাংলাদেশে চলে আসি। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আমি জানতে পারি আমার সঙ্গে যাদেরকে ধরে নেওয়া হয়েছিল এবং আমার সঙ্গে যাদেরকে একই গর্তে পুঁতে রাখা হয়েছিল, আমি ছাড়া আর সবাই নাকি মারা গেছে।

বনবিহারী সিংহ

নওয়াপাড়া

যশোর

১৯৭১ সালের ২৭ মার্চে পাকবাহিনীর একটি দল সমস্ত ব্যারিকেড সরিয়ে চলে আসে নওয়াপাড়াতে। তারা জনসাধারণকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে এসে ব্যারিকেড উঠানোর কাজে লাগিয়ে দেয়। এই সময় আমি সংবাদ পাই, চেংগুটিয়া রেলওয়ে স্টেশনের মাস্টার সাহেবের নিকট হতে পাকবাহিনী নওয়াপাড়ার দিকে যাচ্ছে। এই সংবাদ পেয়ে আমি স্থানীয় জনসাধারণকে জানাই। তারা নিরাপত্তার জন্য যে যতটুকু পেরেছে সাবধান হয়েছে। সেই সময় আমার ঘরে ছিলেন রুস্তম আলি সর্দার (গার্ড ২৮ ডাউন এক্সপ্রেস), এস, এম, হক (গার্ড ৬৪ ডাউন পেসেঞ্জার), সালে আহমদ, নওয়াব আলি (চেকার), আইনুল হক (পোর্টার), ইমাম আলি ও আবদুল ওদুদ (পয়েন্টসম্যান) গ্যাংসেট নবু শেখ, খালাসি শামছু। আমরা সবাই ডিউটিরত অবস্থায় স্টেশনে ছিলাম কারণ এ ছাড়া জীবনের আর কোনো নিরাপত্তা ছিল না। আর আমরা প্রকৃতপক্ষে কোনো অন্যায় করিনি বলে জানতাম। এরপর হঠাৎ ওই দিন অর্থাৎ ২৭ মার্চ বেলা এগারোটার সময় একদল পাক সেনা স্টেশনের অফিস কামরায় প্রবেশ করে। অফিসে প্রবেশ করে চেয়ারে অবস্থানরত

জনাব রুস্তম আলি সর্দার সাহেব ও নওয়াব আলি সাহেবকে প্রথম হত্যা করে। আমি তাদের নিকটে ছিলাম। তারা হত্যা করে ঘর হতে বের হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণে পুনরায় ঘরে প্রবেশ করে বলে যে, কে জীবিত আছ কাছে এসো। এখানে বলা প্রয়োজন যে, উক্ত দু'জনকে হত্যা করার পর ঘরে অবস্থিত অন্য সবাই বেঞ্চের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে তাদের পাকবাহিনী কর্তৃক ব্রাশফায়ারে কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। কিন্তু পরক্ষণে ঢুকেই যখন তাদের সকলকে দাঁড়াতে বলে তখন আমি একটা আলমারির ও দেওয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে আত্মগোপন করে থাকি। দ্বিতীয়বার ঘরে প্রবেশ করে পাকবাহিনী জনাব সালে আহম্মদ ও জনাব এস,এম, হক সাহেবকে নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং আইনুল হক (পোর্টার) কে বাইরে বের করে গুলি করে কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে গুলিটি তার হাতে লাগে, ফলে জীবনে বেঁচে যায়।

প্রায় দুই ঘণ্টা পর আবদুর রব সাহেব (সহকারী স্টেশন মাস্টার) আমার অফিস ঘরে এসে ডাক দেন আমার নাম ধরে এবং বলেন যে, পাকবাহিনী চলে গিয়েছে। তখন আমি উক্ত গোপন স্থান হতে আত্মপ্রকাশ করি এবং বাড়ি ফিরে এই দৃশ্যের কথা স্মরণ করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। এইভাবে কর্মরত রেল বিভাগের কর্মচারীবৃন্দকে তারা হত্যা করে। তবে যারা শহীদ হন তারা নওয়াপাড়া রেলওয়ে স্টাফ নন। তারা জড়ানো দু'টো ট্রেনের গার্ড সাহেব ও চেকার সাহেব। ওয়াচম্যান জনাব আতর আলি সাহেবও শহীদ হন ওই দিন।

এই মৃতদেহগুলি প্রায় ৪/৫ দিন পড়ে থাকার দরুন পচে যায় কিন্তু সৎকারের ব্যবস্থা হয়নি এবং সাধারণ মানুষ করতে সাহস করেনি। পরে কয়েকজনকে সঙ্গে করে আমি মৃতদেহগুলি সৎকারের ব্যবস্থা করি এবং কবরস্থ করি। পরে পাকবাহিনী নিজেদের দোষ চাপা দেবার জন্য বলে যে, স্টেশনে কে হত্যা করেছে তাদের ধরিয়ে দাও। তারা মানুষকে ভুল সংবাদ পরিবেশন করার চেষ্টা করে।

এরপর মাঝে মাঝে আমি স্টেশনে আসতে থাকি এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরে চলে যাই। জীবনের নিরাপত্তার জন্য আমি শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করি। কিন্তু ১১ এপ্রিল তারিখে একজন পাক মেজর নওয়াপাড়া বাজারে আসে এবং স্থানীয় দালালদের ও দুষ্কৃতীকারীদের নিয়ে একটা সভা করে যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি লুট করতে হবে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মেয়েদের উপর অত্যাচার চালাতে হবে।

এরপর উক্ত ১১ এপ্রিল তারিখে নওয়াপাড়ার বিভিন্ন এলাকার ও আশেপাশে লুটতরাজ শুরু করে দেয়। এতে বিহারীরা সবচেয়ে বেশি নৃশংসতার ছাপ রাখে। আমি যে গ্রামে ছিলাম, সেই গ্রামে উক্ত দিন লুটতরাজ শুরু হলে ওই গ্রাম হতে অন্যত্র পালিয়ে যাই।
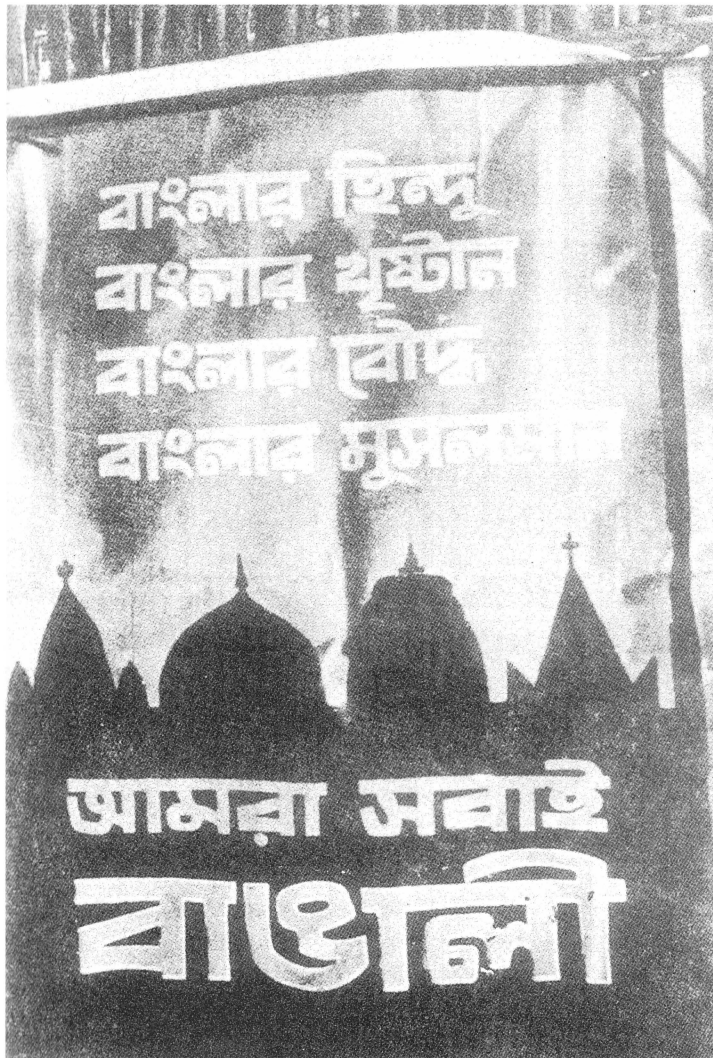
মুজিবনগর সরকার কর্তৃক প্রকাশিত একটি পোস্টার

হিন্দু না মুসলমান ?

পাক হানাদার বাহিনীর এটা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক কাজের অংশ
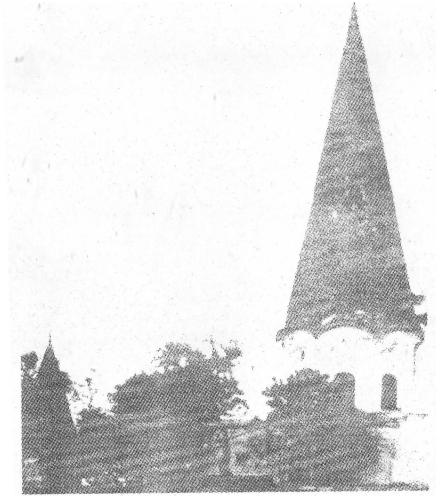
১৯৭১-এ পাক হানাদার বাহিনীর হাতে ধ্বংসের আগে রমনা কালীবাড়ি

যুদ্ধের ময়দানে মুক্তিবাহিনী

১৩ বছর বয়সী এই হিন্দু মেয়েটিকে যুদ্ধের পর
উদ্ধার করা হয় হানাদার বাহিনীর ক্যাম্প থেকে — আলোকচিত্র : ন্যাশনাল
জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন, সেপ্টেম্বর ১৯৭২।

নরপশু পাকিস্তানি বাহিনীর ধর্ষণ ও খুনের শিকার একদিন হিন্দু রমনী

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দ্বারা তিন লাখ নারী নির্যাতিত হয়েছেন,
তাদেরই একজন
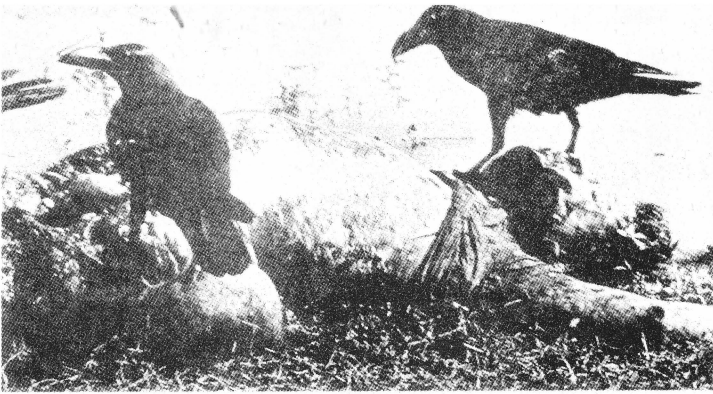
অবরুদ্ধ বাংলাদেশে লাশ ঠুকরে খাচ্ছে কাক, সৎকারের জন্য মানুষ নেই

বিকাশচন্দ্র মল্লিক

মণিরামপুর

যশোর

আমি, সিদ্দিক, ও ইউনুস এই তিনজন পাকসেনাদের হাতে বন্দী হই। তারা আমাদেরকে ঝিকরগাছা নিয়ে যায়। ঝিকরগাছা নিয়ে যাবার পথে আমাদেরকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে ভীষণ প্রহার করতে থাকে। ঝিকরগাছা হতে চোখ বেঁধে গাড়িতে করে সারসায় তাদের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে একটা ঘরের মধ্যে দু'ফুট পানি ছিল। সেখানে দু'হাত পিছনের দিকে রশি দিয়ে বেঁধে একটা জানালার শিকের সঙ্গে বেঁধে রাখে। রাত শেষে আবার সেখান হতে বাইরে নিয়ে গিয়ে ছড়ি দিয়ে, বেয়োনেট দিয়ে, বুট দিয়ে, লাঠি দিয়ে, ভীষণ প্রহার— চড়, ঘুষি, লাথি, দিয়ে ৪/৫ জন মারতে থাকে আর জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে— কোথায় পার্টি আছে? কোনো কোনো এলাকায় অপারেশন করেছ? কোথায় ট্রেনিং নিয়েছ? কয়জন পাকসেনা মেরেছ? ভারতে কার নেতৃত্বে ট্রেনিং নিয়েছ? তুমি ভারতীয় ক্যাপটেন না মেজর? ইত্যাদি বলত আর অকথ্য ভাষায় গালি দিত ও প্রহার করত। জ্ঞান হারিয়ে ফেললে প্রহার করা বাদ দিত। জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখতে পেলাম আমার মাথায় পানি। এইভাবে দু'দিন দু'রাত আমার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানোর পর ১১ অক্টোবর আমাকে যশোর ক্যান্টনমেন্টে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে দু'দিন থাকার পর মেজর আমার স্টেটমেন্ট নেয়। মেজর আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে— তুমি যুদ্ধ করতে এসে অন্যায় করেছ, না ঠিক করেছ? জবাবে আমি বলি, মা-বোনেদের ইজ্জত রক্ষার্থে ও মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র ধরলে যদি অপরাধ হয়, তাহলে আমি অন্যায় করেছি। ঐ কথা বলার পর মেজর আমার উপর প্রহার করা বন্ধ করে দেয়। পুনরায় আমাকে হাজত ঘরে পাঠিয়ে দেয়। এর তিনদিন পর এক বিহারী আমাকে গোপনে হাজত হতে বের করে গুলি করতে নিয়ে যায়। গুলি করার আগে মেজর জানতে পেরে আমার নিকট চলে যায় এবং আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে আর বিহারীকে অশ্লীল ভাষায় গালি দেয়। সেই দিন অর্থাৎ ১৭ অক্টোবর আমাকে ছেড়ে দেবে বলে মেজর দুইজন সেন্ট্রিসহ আমাকে যশোর শহরে নিয়ে আসে এবং সেন্ট্রাল জেলে রেখে দেয়। তারপর পাকসেনারা আহত হতে থাকে। নভেম্বরের শেষের দিকে আমাদের প্রত্যেক আসামীর শরীর হতে এক পাউন্ড থেকে দুই পাউন্ড রক্ত জোরপূর্বক নিয়েছে। রক্ত না দিলে ভীষণ প্রহার করত। ৭ ডিসেম্বর আমরা যশোর জেলখানা হতে মুক্তি পাই। মণিরামপুর থানা ৭ ডিসেম্বর শত্রুমুক্ত হয়। ৮ ডিসেম্বর আমি, রতন, আখতার এই তিনজন মণিরামপুর থানায় চলে আসি এবং ও,সি,-এর নিকট হতে রাজাকারদের

রেকর্ডপত্র নিয়ে নেই। তারপর আমরা মণিরামপুরে ঘোষণা করে দিই— যাদের নিকট অস্ত্রশস্ত্র আছে, তারা ৪/৫ দিনের মধ্যে মুক্তিফৌজ অফিসে জমা দাও। তাদেরকে কিছু বলা হবে না। ঘোষণা করবার কয়দিনের মধ্যেই ৩০০/৩৫০ রাইফেল আমাদের অফিসে জমা হয়ে যায়। ডিসেম্বরের শেষের দিকে ক্যাপটেন সফিউল্লা ই,পি, আমাদেরকে সঙ্গে করে মণিরামপুর চলে আসেন। আমরা তাঁর হাতে আমাদের উদ্ধার করা অস্ত্রশস্ত্র তুলে দিই। তারপর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ঢাকায় গিয়ে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র তাঁর নিকট জমা দিয়ে আসি।

শ্রী চিনিবাস সরকার

গ্রাম-দ্বারিকগ্রাম
শিলাইদহ
কুষ্টিয়া

১৯৭১ সালের আশ্বিন মাস, রোজ রবিবার সকাল ৬টার সময় মিলিটারি, রাজাকার, মিলিশিয়া মিলে প্রায় ৫০/৬০ জন আমাদের গ্রামে আসে এবং হিন্দুপাড়া ঘিরে নেয়। সকলেই মিলিটারির কথা শুনে ছোটাছুটি করে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু যে যেদিক দিয়ে গ্রামের বাইরে যেতে চাই সেই দিক দিয়ে মিলিটারি দিয়ে ঘেরা। আমি, কানাই, মোংলা, ভোলা, খলিশা, শ্রীপদ, বাড়ি থেকে কোথাও যাইনি। তারপর পাকসেনারা এসে আমাদের কয়জনকে ধরে ফেলে এবং বলে— শালা মালাউনকো, মুক্তিবাহিনীকো খানা খেলাও? আমরা তাদের কথা অস্বীকার করি। সঙ্গে সঙ্গে সেখানেই মোংলাকে গুলি করে হত্যা করে। তারপর আমাদের চারজনকে দুই হাত বেঁধে পদ্মা নদীর ধারে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে আমাদের সবাইকে মাটিতে শোয়ায়। তারপর ১০/১২ জন পাক দালাল আমাদের পিঠের উপরে উঠে নাচতে থাকে। অবশেষে নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে জলের ধারে এক এক করে সবাইকে গোরু জবাই করবার মতো জবাই করে নদীতে ফেলে দেয়। এইভাবে সবাইকে জবাই করবার পর আমাকে ঠিক একই উপায়ে গলায় ছুরি চালায় এবং পানির ধারে ফেলে রেখে সবাই চলে যায়। কিন্তু তাদের ছোরাটা আমার শরীর হতে বিচ্ছিন্ন না করেই ফেলে রেখে যায়, ফলে আমি কোনোমতে আধমরা অবস্থায় জলের ধারে পড়ে থাকি। তারপর ঘাড়ে হাত দিয়ে দেখতে পাই রক্ত ঝরছে। চারিদিকে চেয়ে দেখি কোথায় কোনো লোক নেই। ধীরে ধীরে পানির ধার দিয়ে চলতে থাকি। একটা মাছ ধরার নৌকা নদী দিয়ে যাচ্ছিল। আমি নৌকার মাঝিকে অনুরোধ করে

বললাম ভাই, আমাকে নদী পার করে দিবে? মাঝি আমাকে নদীর পর পারে নামিয়ে দেয়। আমি নৌকা হতে নেমে একজন লোকের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিই এবং একজন ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাই। আমি সেখান হতে শুনতে পাই পাকসেনারা আমাদের হিন্দুপাড়া আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে এবং অনেক মেয়ের উপর পাশবিক অত্যাচার করেছে।

গৌরাঙ্গ বিশ্বাস

গ্রাম-নারায়ণপুর, ডাকঘর-জানিপুর
থানা-খোকসা, জেলা-কুষ্টিয়া

১৯৭১-এর ২৩ মে, রবিবার, পাক-বাহিনীর ভয়ে ভারতের দিকে যাত্রা করি। পাক-বাহিনী রবিবারে জানিপুরে এসে আশ্রয় নেয়। রবিবারে পরিবারসহ খোকসা থানার অধীনে বাহরমপুরের মাঠে একটা আমগাছের নীচে রাত্রি কাটাই। সকালে আমি ও অমিয়কুমার সাহা সাইকেল আনার জন্য আবুল মিয়ার বাড়িতে আসার পথে কামালপুর খালের মধ্যে পাক-বাহিনীর সঙ্গে দেখা হয়। পাক-বাহিনী, রাজাকার ও শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানসহ গ্রাম অপারেশনে যাচ্ছিল। পাক-বাহিনী আমাদের দুইজনকে থামতে বলে, তখন আমরা পালাবার সুযোগ না পেয়ে থেমে যাই। পাক-বাহিনী শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসা করে এরা আদাব দিল কেন। চেয়ারম্যান বলে যে এরা দু'জন মালাউন। অমিয় কুমারের (সি,ও অফিসের কেরানি, খোকসা) খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান। মালাউনের কথা শুনে পাক-বাহিনী আমাদের বলে যে টাকাপয়সা যা আছে তা দিয়ে দাও। আমরা টাকাপয়সা সোনা-দানা দিয়ে জীবন ভিক্ষা চাইলাম। যথাসর্বস্ব দিয়ে দিলাম। তখন পাক-বাহিনী আমাদের হাত বেঁধে ফেলল। তারপর কমলাপুরের ব্রিজের পাশে রাস্তার ধারে লাইন করে দাঁড় করিয়ে দেয় এবং গুলি করে। অমিয়কুমার তার শিশুদের জন্য অসহায়ের মতো তাদের কাছে জীবন ভিক্ষা চেয়ে ব্যর্থ হল। গুলি হলে তা অমিয়কুমারের বক্ষভেদ করে আমার মাথায় লাগে। অমিয়কুমার নিহত হয় আর অমিয়কুমারের চীৎকার ও পাক-বাহিনীর বীভৎস হাসি শুনে এবং জীবনের কথা চিন্তা করে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। মাথা দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। দুদিন ওই রাস্তার ধারে খালে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকি। দুদিন পর আফতাব মুন্সির ছেলেরা খাল থেকে তুলে নিয়ে পাশের পানের বরজে আশ্রয় দেয়। সেখানে আমাকে চিকিৎসা করেন।

ডাক্তারের চিকিৎসার সুযোগ ছিল না কারণ পাক-বাহিনী বা দালালের কানে পৌঁছালে

তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াত। আফতাব মুন্সির বাড়িতে বা তার অধীনে দীর্ঘ আড়াই মাস চিকিৎসা হবার পর সুস্থ হলে ভারতে চলে যাই।

ভারতী দেবী চক্রবর্তী

বগুড়া রোড, বরিশাল

১৮ এপ্রিল বরিশালে পাকসেনারা ব্যাপক বোমা ফেলে। আমরা আশ্রয় নিই আলুকদিয়া গ্রামে। ওখানে একমাস থাকি। আমার স্বামী বরিশাল আওয়ামী লীগের দপ্তর-সম্পাদক ছিলেন। এই সংবাদ প্রচার হয়ে গেলে গৃহস্বামী আমাদের রাখতে অস্বীকৃতি জানায়। শুনলাম হিন্দুরা সব আটঘর কুড়িয়ানাতে আশ্রয় নিচ্ছে। স্থান ছিল দুর্গম, চারিদিকে জল, খানসেনা যেতে পারবে এমন ধারণা কারও ছিল না। আমরা কুড়িয়ানাতে আশ্রয় নিই। ওখানে পর পর ৩৬টি গ্রাম সম্পূর্ণ হিন্দুর বাস। মে মাসে আমি আটঘর কুড়িয়ানাতে আশ্রয় নিই। আমরা অরুণ চক্রবর্তীর বাড়িতে থাকি। ওখানে আরও প্রচুর লোক আশ্রয় নেয়।

মে মাসের শেষের দিকে খানসেনারা কুড়িয়ানাতে পৌঁছে অরুণ চক্রবর্তীর বাড়িতে ঢুকে মন্দির, ঘর সব ধ্বংস করে ওখানে পাক ছাউনি করে। সমস্ত গ্রাম খানসেনারা পুড়িয়ে দেয়। আমরা ২/৩ হাজার লোক পেয়ারা বাগানে আশ্রয় নিই। খানসেনারা বাগান কাটা শুরু করল। আমরা বাগানের খালের জলের ভিতর বেলা ১০টায় নামতাম, বেলা ৪/৫ টার দিকে জল থেকে উঠে বাগানের উঁচু জায়গায় বসতাম। সকালে এসেই খানসেনারা গুলি চালাত। যারা একটু আধটু মাথা উঁচু করেছে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে। ওই ভাবে দেড় মাস থাকি। দেড় মাসের মধ্যে আমরা ভাত খেতে পারিনি, পেয়ারা এবং আখের রস খেয়েছিলাম। বাগান কাটতে থাকে আমরা পিছোতে থাকি। জোয়ারে অসংখ্য মৃতদেহ দেখতাম। মৃতদেহের উপর আমরা বহুবার আশ্রয় নিই।

পাকসেনারা প্রত্যহ মানুষ ধরে ধরে হত্যা করেছে। ওই বাগানে লাইন দিয়ে দেড় মাসের মধ্যে দুই হাজারের মতো লোককে হত্যা করে। ওখানে আমাদের মতো যারা আশ্রয় নিয়েছিল তারাই বেশী মারা গেছে। পাশবিক অত্যাচার চালায় অসংখ্য নারীর উপর।

আমার স্বামীকে ধরে ফেলে পাকসেনারা নৃশংসভাবে হত্যা করে। গ্রামে, গঞ্জে রাজাকাররা আমাদের উপর চালিয়েছে অকথ্য অত্যাচার। আটঘর কুড়িয়ানা থেকে আমি হেঁটে হেঁটে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে বরিশালের বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে থাকি।

উপেন্দ্রনাথ দত্ত

গ্রাম-রাজার হাট
ডাকঘর ও থানা-পিরোজপুর
জেলা-বরিশাল

৪ মে, পাকবাহিনী পিরোজপুরে আসে। খানসেনারা শহরে প্রবেশ করে দালাল শ্রেণীর কতকগুলি লোককে শহর লুট করতে বলে। এই সময় তাদের নির্দেশ দেয় যে, তোমরা লুট করো কিন্তু ঘর-দুয়ার নষ্ট কোরো না। পাকবাহিনী রাস্তায় যেসব লোকদের পায় তাদেরই গুলি করে হত্যা করে। প্রথম অবস্থায় হিন্দু, মুসলমান কোনোকিছু তারা নির্ণয় না করে একাধারে সবাইকে গুলি করে মেরেছে।

একজন দালালের কাছে আমি এই সময় বলি যে, ভাই আমার দোকানে প্রায় লাখ টাকার মাল আছে, তুমি এগুলি রক্ষা করার ব্যবস্থা করো। প্রয়োজন হলে তোমার হেফাজতে নিয়ে নাও। তার উত্তরে সে আমাকে জানায় যে, আপনার কোনো চিন্তা নাই। আপনার কোনো ক্ষতি আমরা করব না। আমি আমার সমস্ত কিছু তার কাছে বুঝিয়ে দিয়ে নদীর অপর পারে চলে গেলাম।

আমি সারাদিন নদীর অপর পারে পালিয়ে বেড়াতাম। বিকালের দিকে যখন খানসেনারা তাদের ব্যারাকে ফিরে যেত তখন আমি নদী পার হয়ে টাউনের ভিতর চলে আসতাম এবং যতদূর সম্ভব গা ঢাকা দিয়ে শহরের ভিতর ঘুরে ঘুরে অবস্থা দেখতাম।

পাকবাহিনী আসার পর পাকবাহিনীদের সহযোগী একটা দল সৃষ্টি হয়। পরবর্তী কালে এই দলই বিভিন্ন অত্যাচারের ক্ষেত্রে পাকবাহিনীকে পরিচালনা করেছে। প্রথম দিকে পিরোজপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে লুট করেছে, পরবর্তী পর্যায়ে বাড়িঘর ভেঙে নিয়ে যায় এবং জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়।

মে মাসের শেষের দিকে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক ধরে এনে পিরোজপুর জেটি ঘাটে এনে গুলি করে হত্যা করেছে। এমন দিন ছিল না যে ৫০/৬০ জন লোক হত্যা না করেছে। পাকবাহিনী গড়ে প্রত্যেকদিন ১০০ করে লোককে হত্যা করেছে। প্রথম দিকে যখনই লোক ধরে আনত, তখনই দিবালোকে গুলি করে হত্যা করেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে পাকবাহিনী যে সব লোককে ধরে আনত, তাদেরকে সন্ধ্যার পরে গুলি করে হত্যা করেছে। তৃতীয় পর্যায়ে রাত্রি দেড়টা-দুইটার পর যে সব লোককে ধরে আনত তাদের গুলি করে মেরেছে।

প্রথম দিকে যে সব লোক মারা হত তাদের বেশিরভাগকে গুলি করেই হত্যা করেছে। শেষের দিকে যেসব লোককে ধরে আনত তাদের প্রথমে ভীষণভাবে মারধোর করত

তারপর বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করত। অনেক সময় আমি নিজ চোখে দেখেছি যে দুইজন দুইদিক থেকে একটা লোককে পা টেনে ধরত আর একজন কুঠার বা দা দিয়ে কুপিয়ে দুই ভাগ করে ফেলত।

ইয়াহিয়া খানের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর থেকে দুই-চারজন ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার শহরে আসতে শুরু করে। যারা এই সময় শহরে আসত, তাদের প্রত্যেককেই শান্তি কমিটির কাছ থেকে পাকিস্তানী ব্যাজ শরীরে লাগিয়ে নিতে হত।

শহরে রাজাকার গঠিত হবার পর শহরের পরিস্থিতি কিছুটা ঠান্ডা হলেও রাজাকারেরা ব্যাপকভাবে গ্রাম হতে গ্রামে অভিযান চালিয়ে বহু লোককে ধরে আনত।

পাকসেনা আসার এক মাস দশ দিন পর্যন্ত আমি বলেশ্বর নদীর অপর পারে আমার বিরাট ফ্যামেলি নিয়ে গ্রাম হতে গ্রামে ঘুরে কাটিয়েছি। এই সময় অধিকাংশ দিন আমাকে একবেলা কচুর শাক এবং বিভিন্ন শাকসবজি খেয়ে কাটাতে হয়। পরে অনন্যোপায় হয়ে আমি শান্তি কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করি। তারা আমাকে শহরে আসতে বলে।

জুন মাসের ১৫ তারিখে আমি নদী পার হয়ে শহরে আসি এবং একজন লোকের সহায়তায় শান্তি কমিটির অফিসে যাই। শান্তি কমিটির সেক্রেটারি আবদুস সাত্তার মিয়া আমাকে ঘরের পিছন দিকে এক জায়গায় বসতে দেয়। ওই দিন শান্তি কমিটির মেম্বারদের একটা অধিবেশন ছিল। ধীরে ধীরে বহু লোক এসে শান্তি কমিটির অফিসে যোগ দেয়।

শান্তি কমিটির লোকেরা যখন সবাই বসে, তখন আমি ঘরের অপর একটা রুমে বসে আছি। দালাল মোসলেম খাঁ এই সময় প্রস্তাব করে যে, আমরা এখন পর্যন্ত হিন্দুদেরকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। তার প্রমাণস্বরূপ আমাকে সে দেখিয়ে দেয়। এই সময় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান সাহেব তার উত্তরে বলেন, যে আজ এ লোকের গায়ে গন্ধ হয়েছে তাই না? কিন্তু আপনারা কে অস্বীকার করতে পারেন যে সে আপনাদের কাছ থেকে টাকা পাবে না? তখন সবাই চুপ মেরে যায়।

সাত্তার মোক্তার সাহেব আমাকে তার নিজের বাড়িতে ওই দিন রাত্রিতে লুকিয়ে রাখেন। পরের দিন ভোর হবার আগেই আমাকে নদী পার করে দেন এবং বলে দেন যে আমি পরিস্থিতি স্বাভাবিক দেখলেই আপনাকে জানাব, আপনি তখন আমার বাসায় চলে আসবেন।

ছয় দিন পর শান্তি কমিটির সেক্রেটারী ডাক্তার মিয়া আমাকে আসার জন্য চিঠি দেন। তার চিঠি পেয়ে আমি শহরে চলে আসি এবং সেক্রেটারী সাহেবের তত্ত্বাবধানে থাকি। এই সময় কতগুলি লোকের কথার উপর ভরসা করে আমি যে লোকের কাছে আমার সমস্ত কিছু গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলাম, সেই লোকের কাছে আমি আমার দুরবস্থার কথা খুলে বলি এবং তার কাছে কিছু টাকা চাই। তার উত্তরে তিনি আমাকে ভীষণ গালাগালি করেন এবং পাকবাহিনী দিয়ে আমাকে গুলি করাবেন বলে ভয় দেখান।

২৯ শ্রাবণ, আমি রাত্রি আটটার সময় শহরের ভিতর একটা হোটেল থেকে কিছু খেয়ে বাসায় ফিরছিলাম, এমতবস্থায় পিরোজপুর জামে মসজিদের কাছে রাজাকাররা আমাকে ধরে পাকবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে যায়। এই সময় তারা আমার প্রতি নানারকম গালাগালি ও রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারতে থাকে।

ক্যাম্পে নিয়ে যাবার পর খানসেনারা আমাকে বলে যে, তুমি মুক্তিবাহিনীর হ্যায়। তুমি দুশমন হ্যায়। এই বলে তারা আমার উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। একটা মোটা বেতের লাঠি দিয়ে ভীষণভাবে প্রহার করে, বুট জুতা দিয়ে লাথি মারে— এইভাবে আমার সারা শরীর রক্তাক্ত করে ফেলে।

প্রায় দুই ঘণ্টা আমার উপর অকথ্য অত্যাচার চালানোর পর আমাকে তাদের হাজত অর্থাৎ সেকেন্ড অফিসার সাহেবের বাসায় একটা রুমে বন্দি করে রাখে। আমাকে বন্দি করার সময় আমার পকেট থেকে ২৪টা টাকা তারা নিয়ে নেয়।

আমাকে যে ঘরে বন্দি করা হয় ওই ঘরে আরও আঠারো জন বন্দি ছিল। প্রতি দুই ঘণ্টা পর ডিউটিরত সিপাই চেঞ্জ হয়ে যেত। প্রতিবারে আমার উপর সিপাইরা লাথি ঘুষি মারতে থাকে আর জিজ্ঞাসা করে মুক্তিবাহিনী কোথায়? এনায়েত মিয়া, ডা. আবদুল হাই, ডা. ক্ষিতীশ মণ্ডল এই সব আওয়ামী লীগের নেতারা কোথায় আছে? রাইফেল কোথায় আছে? তিন দিন আমার উপর এইভাবে অত্যাচার চালায়। এই সময় আর কোনো নতুন আসামী তারা হাজতে ঢোকায় না। তবে ঘরের বাইরে যে লোক ধরে এনে ভীষণভাবে প্রহার করে, এটা আমি হাজতের ভিতর থেকে টের পাই।

দশ দিন পর বিভিন্ন জায়গা থেকে আরও চৌদ্দো জন লোককে ধরে আনে এবং তাদের সঙ্গে আমাকে এসডিও সাহেবের বাসার ভিতর একটা পায়খানার মধ্যে বন্দি করে রাখে। এদের মধ্যে আলি আশরাফ নামে একজন ছেলে ছিল। ঢাকা থেকে আসার পথে 'হুলার হাট' লঞ্চ ঘাটে পাকসেনারা তাকে আটক করে। তাকে আটক করার পর ক্যাপ্টেন একটা হোটেলের চুলার ভিতরকার আধাপোড়া কাঠ এনে তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় চেপে ধরে। সারা শরীরের চামড়া ও মাংস পুড়ে দুর্গন্ধ হয়ে ওঠে এবং ছেলেটার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। হাজতে আনার পর নিয়মিতভাবে আমাদের উপর অত্যাচার চালাতে থাকে।

আমাকে হাজির করার পর ক্যাপ্টেন এজাজ আমাকে প্রশ্ন করে যে, তুমি মুক্তিবাহিনী, তোমার কাছে রাইফেল আছে, তোমাদের বাহিনী কোথায় আছে আমার কাছে বলো। আমি তার উত্তরে উর্দুতে বলি যে, আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী মানুষ, ব্যবসা করে জীবিকানির্বাহ করি, কাজেই যদি কিছু জিজ্ঞাসা করতে হয় তবে ব্যবসা সম্পর্কে করুন। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ক্যাপ্টেন সাহেবের সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটি হয়।

অতঃপর ক্যাপ্টেন আমাকে প্রশ্ন করে যে, তুমি এত উর্দু কথা কেমন করে শিখেছ?

তখন আমি কিছুটা ভীতু হয়ে পড়ি। কেন-না আমি ব্রিটিশ আমলে সাত বছর আর্মিতে চাকুরি করেছি জানতে পারলে আমাকে তখনই গুলি করে হত্যা করবে। আমি তখন বুদ্ধি খাটিয়ে বলতে লাগলাম যে, হুজুর আমি ব্যবসায়ী লোক, কাজেই আমি খুলনাতে পাঞ্জাবি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ব্যবসা করি, তারা আমাকে খুব পেয়ার করে এবং প্রতি সাত দিন অন্তর আমি তাদের কাছে এক দিন থাকি— এই সব কথা সত্য-মিথ্যা বলি এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি পাঞ্জাবি লোকের নাম একাধারে বলে যাই।

আমার কথা ক্যাপ্টেন বিশ্বাস করে এবং আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে যে, তোম মেরা দোস্ত হ্যায়। আরও বলে যে তুমি মুক্ত। আজ শহরে কারফিউ কাজেই সকালবেলা তুমি তোমার ঘরে ফিরে যেও। এখন আরাম করো। এই বলে আমাকে পুনরায় সেই হাজত রুমে নিয়ে আসে।

হাজত রুমে আসার পর আর যে চৌদ্দো জন ছিল তারা আমার কাছে কাকুতি-মিনতি করে নানা কথা বলতে লাগল যে, ভাই তুমি তো সকালে বাড়ি যাবে কাজেই আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে তুমি সংবাদ দিবে তারা যেন টাকাপয়সা যা লাগে তাই দিয়ে আমাদের এখান থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে যায়।

রাত্রি এগারোটার সময় একটা প্লেটে করে চারটা রুটি ও একটু মাংস নিয়ে আসে একটা সিপাই আমার জন্য। তখন আমি জোরে জোরে বলি যে ও রুটি আমি খাব না, তোমরা ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কেন-না আজ এগারো দিন হল শুধু পানি খেয়ে আছি আর আজ শুধু আমার জন্য চারটা রুটি এনেছ। কিন্তু এই হাজতের মধ্যে তো মোট আমরা পনেরো জন আছি, সবাই না খাওয়া, কাজেই আমি খাব না। সিপাইটি তখন ফিরে যায় এবং ক্যাপ্টেন সাহেবের কাছে সমস্ত কথা খুলে বলে।

রাত্রি বারোটার সময় একটা বড়ো ঝুড়িতে করে রুটি ও একটা বালতিতে করে আলু ও মাংস নিয়ে আসে এবং আমাকে সবাইকে সঙ্গে করে খেতে বলে।

রাত্রি সাড়ে বারোটার সময় ক্যাপ্টেন আমাকে পুনরায় তার চেম্বারে ডেকে পাঠায়। আমার তখন ভয় হয়ে যায় যে আমি প্রথমে একা রুটি খেতে চাইনি বলে হয়তো তার রাগ হয়েছে। কাজেই আমাকে এখন মেরে ফেলবে। একজন সিপাই আমাকে নিয়ে ক্যাপ্টেন সাহেবের সম্মুখে হাজির করে। আমাকে দেখতে পেয়ে ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করে তুমি খেয়েছ? আমি বলি যে, হাঁ আমি এই মাত্র রুটি মাংস খেয়েছি। ক্যাপটেন পুনরায় হেঁকে ওঠে যে, না আবার তোমাকে আমার সম্মুখে খেতে হবে— এই বলে ডাকাডাকি আরম্ভ করে। একজন সিপাই দুইটি পরটা ও একটা আস্ত মুরগির রোস্ট নিয়ে আসে। ক্যাপ্টেনের হুকুমে আমি তা খেয়ে ফেলি। পরে আমাকে পুনরায় আরাম করার জন্য হাজত রুমে নিয়ে আসে।

পরের দিন সকালে আমাকে পুনরায় ক্যাপ্টেনের রুমে ডেকে নিয়ে আসে এবং আমাকে

কিছু খেতে দেয়। এই সময় ক্যাপ্টেন আমাকে বলে যে এখন তুমি বাড়ি চলে যাও এবং ঠিকঠাকমতো চলাফেলা করবে। আমি বাড়ির দিকে চলে আসি এবং বাড়িতে না গিয়ে রাত্রিতে আর বন্দিরা যে সব কথা বলে দিয়েছে তাদের প্রত্যেকের বাসায় গিয়ে আমি তা বলে আসি। এই সময় যে ছেলেটিকে হুলার হাট থেকে ক্যাপ্টেন ধরে আনে তার খালুর সঙ্গে দেখা করি এবং বলি যে বন্দি আশরাফ আমার কাছে কাকুতি-মিনতি করে বলে দিয়েছে যে তাকে যদি গুলি করে হত্যা করা হয়, তবে যেন তার আত্মার সৎগতি করা হয়।

রাত্রিতে আমার ঘুম আসছিল না, কাজেই বসে বসে নানা চিন্তা করছি, এমন সময় জেটিঘাটে দশ রাউন্ড গুলির শব্দ পেলাম।

পরের দিন সকালে উঠে খবর নিয়ে জানতে পারি যে যাদের বন্দি রেখেছিল তাদের সবাইকেই রাত্রিতে গুলি করে হত্যা করেছে। তখন আমার বন্দি আশরাফের করুণ স্মৃতি মনে ভেসে ওঠে এবং আমি দৌড়িয়ে জেটি ঘাটে চলে আসি। জেটি ঘাটে বেশ কয়েকটি লাশ দেখতে পাই কিন্তু আশরাফের লাশ দেখতে পাই না। একজন নৌকার মাঝির সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারি যে নদীর ভাটিতে কিছু দূরে দুইটা লাশ ভেসে আছে। আমি জেটি ঘাটে জলেতে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং নদীর ভিতর দিয়ে সাঁতার কেটে লাশের কাছে আসি এবং নিজ হাতে আলি আশরাফের লাশ তুলে নিয়ে তার বাবা-মার কাছে হাজির করি এবং তার শেষ অনুরোধের কথা জানাই। লাশ দেখে তার বাবা-মা ভয় পেয়ে যান যে, মিলিটারি জানতে পারলে তাদের সবাইকে মেরে ফেলবে। আমি নিজে সারাদিন গোপনে সে লাশ লুকিয়ে রেখে রাত্রিতে কয়েকজন লোক ডেকে লাশ মাটির ব্যবস্থা করি। আমি শহরে বাস করতে থাকি এবং মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করে শহরের খবরাখবর আদান-প্রদান করতে থাকি।

ক্যাপ্টেন এজাজ ছুটি নিয়ে পাকিস্তানে চলে যায় বিবাহ করতে। তখন ক্যাপ্টেনের চার্জে সুবেদার সেলিম থাকে। এই সুবেদার তখন দালাল নিয়ে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করল। ব্যাপক হারে মেয়েদের ধরে এনে ক্যান্টনমেন্টে ধর্ষণ করতে লাগল। হিন্দু-মুসলমান বলে কোনো বিচার তখন ছিল না— যেখানে যাকে পায় তাকেই ধরে আনতে থাকে। দেখতে দেখতে শহর প্রায় জনশূন্য হয়ে গেল।

আশ্বিন মাসের শেষের দিকে আমার বাসার সম্মুখে থেকে দুটি সিপাই আমাকে ডেকে নিয়ে যায় যে, তোমাকে সুবেদার সাহেব বোলাতা হ্যায়। আমাকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গিয়ে সুবেদার বলে যে, আমি তোমার জীবন নেব, তুমি আমাদের সঙ্গে বহুত দুশমনি করছ। এই বলে তারা আমার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালাতে থাকে। আমাকে মারতে মারতে সারা শরীর রক্তাক্ত করে ফেলে এবং এসডিও সাহেবের পায়খানার মধ্যে আটকে রাখে। ছয় দিন আমি সেখানে বন্দী থাকি। এই সময় আমি দেখতে পাই যে খানসেনারা

প্রত্যেক দিন ক্যাম্পের সম্মুখে বাঙালীদেরকে কয়েকজন মিলে শূন্যে তুলে পাকা রোডের উপর আছড়িয়ে মারত বা এইভাবে আধা মরা হয়ে গেলে বস্তাবন্দী করে তারপর বেয়োনেট চার্জ করে নদীর ভিতর ফেলে দিত। অনেকে আবার জিপ গাড়ির পিছনের দিকে বেঁধে সারা শহরের মধ্যে টানত। এর ফলে সমস্ত মাংস শরীর থেকে পড়ে যেত। আমি এ সব ঘটনা নিজ চোখে দেখেছি। প্রত্যেকদিন আমাকে হাজত থেকে বার করে ক্যান্টনমেন্টের সম্মুখে একটা বাদাম গাছের সঙ্গে কপিকল দিয়ে পা উল্টো দিকে বেঁধে ঝুলিয়ে দিত এবং ভীষণভাবে প্রহার করত।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আমি জেটিঘাটে দুই হাজার লাশ নিজের চোখে দেখেছি। প্রত্যেকদিন আমি ভোরবেলা জেটিঘাটে গিয়ে যেসব লাশ পড়ে থাকত তাদের উলটিয়ে-পালটিয়ে দেখতাম এবং চেনা-শোনা হলে তার বাড়িতে গিয়ে খবর দিতাম।

আমি নিজের চোখে মানুষকে কুপিয়ে, রাস্তায় টেনে, বস্তাবন্দি করে বেয়োনেট চার্জ করে এবং গুলি করে মারতে দেখেছি।

পাকবাহিনীর চেয়ে রাজাকার, শান্তি কমিটির মেম্বার এরা অত্যাচার বেশি চালিয়েছে। পাকবাহিনী যাদেরকে ছেড়ে দিত দালালরা তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করত। পিরোজপুর জেটিঘাটে বিভিন্ন সময়ে প্রায় ৩/৪ হাজার লোককে হত্যা করেছে। কত নারীকে যে তারা ধর্ষণ করেছে তার কোনো হিসাব নাই।

রেণুবালা বারুই

গ্রাম-বাইনকাঠি
ডাকঘর-নাজিরপুর
জেলা-বরিশাল

পাকসেনা প্রথম আমার গ্রামে যায় শ্রাবণ মাসে। আমি তখন গোবর্ধন গ্রামে স্বামীর বাড়ি ছিলাম। কাঠালিয়া গ্রাম, বাইকাঠি, তারাবন গ্রাম সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছে। গ্রামে গ্রামে লুট করে বাড়িঘর সব ভেঙে নিয়ে গেছে, জ্বালিয়ে দিয়েছে। অসংখ্য হিন্দু লোককে জোর করে মুসলমান করেছে।

অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে। বহু মেয়েকে পাকসেনারা ধরে পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে। প্রায় ঘরের মেয়েকে পাকসেনারা ধর্ষণ করেছে। তিনজন মেয়েকে রাজাকাররা ধরে নিয়ে যায় তাদের ছাউনি নাজিরপুর থানার পাশে সাতকাছিমা নামক স্থানের মাদ্রাসাতে। ক্রমাগত সাত-আট দিন অসংখ্য রাজাকার তাদের উপর অত্যাচার চালায়। দিনের পর

দিন দৈহিক অত্যাচার চালায়। রাজাকাররা তাদের ছাউনিতে আরও বহু মেয়ে রাখত এবং দিনে-রাতে ভোগ করত। দেশ মুক্ত হলে অসুস্থ অবস্থায় মুক্তিবাহিনীরা মেয়ে তিনটিকে উদ্ধার করে।

আমার স্বামী কৃষক ছিলেন, জমি চাষ করা ফসল ফলানো তার কাজ ছিল। যুদ্ধ বাঁধলে আমার খুড়তুতো শ্বশুর মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। আমার স্বামীও উৎসাহ ভরে মুক্তিবাহিনীতে নাম লেখান। তারপর থেকে বিভিন্ন জায়গায় গেছেন অপারেশনে। ২৭ আষাঢ় গোবর্ধন স্কুলের পাশে মুক্তিসেনাদের সঙ্গে আমার স্বামীও ছিলেন। দলে প্রায় ৫০০ মতো ছিল। ওই দিন পাকসেনা রাজাকার মিলে ৭০০/৮০০ ছিল। তুমুল যুদ্ধ হয়। মুক্তিসেনারা তাদের ভারী অস্ত্রের সামনে টিকতে ব্যর্থ হয়ে পিছু হটে। সেই সময় আমার স্বামী পাক-বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। আমার স্বামী সহ আরও ছয় জনকে ধরে। সাতজনের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালায়, অর্ধমৃত অবস্থায় সবাইকে গুলি করে হত্যা করে। এরপর রাজাকাররা আমার বাড়িঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস করে এবং অত্যাচার চালায়। শিকদার বাড়ির সবাইকে হত্যা করে। তারপর বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাই। গ্রামের পর গ্রামে ঘুরে পালিয়ে বেড়িয়েছি। আজ আমি অসহায় নিঃস্ব সর্বহারা। যেখানে গেছি সেখানেই দেখেছি পাক বর্বর আর পশু রাজাকারদের অত্যাচারের বীভৎস রূপ। আজ দেশ মুক্ত স্বাধীন কিন্তু আমি কী নিয়ে বাঁচব বলতে পারেন?

ভারতীরাণী বসু

গ্রাম-স্বরূপকাঠি

জেলা-বরিশাল

২৭ শে এপ্রিল আমি কাঠালিয়া থানার মহিষকান্দি গ্রামে যাই আত্মরক্ষার জন্য। তখন চারিদিকে সব বিচ্ছিন্ন অবস্থা। হিন্দু বাড়ী বিভিন্ন স্থানে লুট হচ্ছে, হত্যা চলছে। ওখানে পৌঁছানোর পরপরই স্থানীয় কিছু লোক হিন্দু বাড়ী লুট শুরু করে দেয়। ২০/২৫ জনের বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে সকালে, দুপুরে, রাতে, ভোরে যখন তখন বল্লম, দা এবং অন্যান্য ধারাল অস্ত্র নিয়ে হিন্দু বাড়ী আক্রমণ করে সব লুট করে ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। আমি স্বরূপকাঠিতে ফিরে আসি ৫ই মে। সেদিন ছিল হাটবার ওই দিনই সমস্ত এলাকা লুট করে নেয় দুষ্কৃতীকারীরা।

৬ই মে সকালে পাকসেনা প্রথম স্বরূপকাঠিতে যায়। ওখানকার পীর শর্ষিনার বাড়ীতে গিয়ে পাকবাহিনী ওঠে। ওখান থেকে থানায় আসার পথে শর্ষিনার পুল থেকে থানা

পর্যন্ত (সাহাপাড়া) সমগ্র হিন্দু বাড়ী প্রথমে লুট করে জ্বালিয়ে দিয়েছে। ওখান থেকে পাকবাহিনীর একটি দল অলঘারকাঠির দিকে গিয়ে ঘরবাড়ী জ্বালানো ও সেই সঙ্গে মানুষ হত্যাও শুরু করে। আর একটি দল স্বরূপকাঠি এসে শুধু হিন্দু বাড়ী বেছে বেছে সকল হিন্দু বাড়ী লুট করে পুড়িয়ে দেয়। কালী প্রতিমার উপর অসংখ্য গুলি চালিয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। বহুজনকে হত্যা করে। তারপর পাকবাহিনী ফিরে যায়। তারপর থেকে ক্রমাগত সাত দিন পাকবাহিনী স্বরূপকাঠিতে যায়। গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে আর লুট করেছে। স্থানীয় কিছু লোক এবং পীরের দল পাকবাহিনীর সঙ্গে থাকত। লুট করতে বললে তারা যখন লুট করতে আরম্ভ করে তখন পাকসেনারা ছবি তুলত।

কুড়িয়ানা আটঘর, জলাবাড়ি, সমুদয়কাঠি, জুলুহার, নান্দিঘর, সোহাগদল, ইন্দ্রিরহাট, মণিনাল, বাটনাতলা ইত্যাদি গ্রামসহ নয়টি ইউনিয়নে পাকবাহিনীরা গ্রামের প্রতিটি কোণাতে ঘুরে সব ধ্বংস করেছে লুট করেছে।

কুড়িয়ানা আটঘরে পিয়ারার বাগানে বহুজন আশ্রয় নিয়েছিল। পাকবাহিনী হঠাৎ করে ঘিরে ফেলে অসংখ্য লোককে হত্যা করে। এক মেয়েকে পিয়ারা বাগান থেকে ধরে এনে সবাই মিলে পাশবিক অত্যাচার চালায়। তারপর তিনদিন যাবত ব্লেড দিয়ে শরীর কেটে কেটে লবণ দিয়েছে। অশেষ যন্ত্রণা-লাঞ্ছনা দেওয়ার পর মেয়েটিকে গুলি করে হত্যা করে। মেয়েটি ম্যাট্রিক পাশ ছিল। অন্য একজন মহিলাকে ধরে নিয়ে অত্যাচার চালিয়ে গুলি করে হত্যা করে। এখানে অধিকাংশ লোককে গুলি এবং বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করেছে। শত শত লোককে এই এলাকাতে হত্যা করেছে।

কাউখালি স্টেশনে আমি নিজে দেখেছি একজনকে মুক্তিবাহিনী সন্দেহে রাজাকাররা কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। স্বরূপকাঠিতে টিকতে না পেরে মহিষকান্দিতে যাই। ওখানে গেলে আমাকে সবাই মুক্তিবাহিনীর চর মনে করল এবং অস্ত্র আছে বলল। আমি ওখান থেকে রাতে পালিয়ে যাই রাজাপুরে।

রাজাপুর থানাতে হামিদ জমাদার সমগ্র থানাতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। সমস্ত বাড়ীঘর লুট করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করেছে হত্যা করেছে। হিন্দু কোনো বাড়ীঘর ছিল না সব ধ্বংস করেছিল। ওখানে শুক্কুর মৃধা শান্তি কমিটির সেক্রেটারী ছিল। আমি সহ আরও তিনজন তিন হাজার টাকা দিয়ে কোনো রকম সেবারের মতো বাঁচি। আমি তখন কুমারী ছিলাম। সবাইকে মুসলমান হতে হবে এবং মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করতে হবে এমনি একটি পরিস্থিতিতে সুনীলকুমার দাস নামে এক ভদ্রলোককে আমি বিয়ে করি, সে সময় দুষ্কৃতীকারীর হাত থেকে বাঁচবার জন্য। সময়টা ছিল জুন মাসের শেষ অথবা জুলাই প্রথম।

রাজাপুরে আছি স্বামী সহ। ভোরবেলা রাজাকার, পুলিশ মিলে প্রায় ৩০/৪০ জন আমাদের বাড়ী ঘিরে ফেলে। স্বামীকে লুকিয়ে রাখি। ওরা এসে সব কিছু লুট করে

গালাগালি করে চলে যায়। কিছুক্ষণ বাদে আবার এসে আর যা ছিল সব নিয়ে অত্যাচার চালায়। পাশের একটি লোককে হত্যাও করল।

নৈকাঠি রাজপুর থানা গ্রামে শতকরা ৯৮ জনকে হত্যা করে। ওখানকার সব হিন্দু। ৯৮% মহিলা আজ বিধবা। নৈকাঠির প্রায় সব পুরুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করে তাদের যথাসর্বস্ব আত্মসাৎ করে হামিদ জমাদার ও তার দল। ওই বিপদের মাঝে জঙ্গলে জঙ্গলে এ বাড়ী ও বাড়ী করে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। আমার সব কিছু লুটে নেয় রাজাকার আর পাকবাহিনী। আমি কোনোমতে পালিয়ে বাহিরচরে যাই জুলাই মাসের ১৭ তারিখে। আমি আমার কাজে যোগ দিই। তার পরপরই আমাকে সাসপেন্ড করে রাখে তিনমাস। বাহিরচরে সমগ্র এলাকা খুন, ডাকাতিতে ভরা। সমগ্র এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল।

অক্টোবর মাসে কুদ্দুস মোল্লাকে (মুক্তিবাহিনী) চিকিৎসা করার জন্য কর্নেল আমাদের সবাইকে ডেকে লাঞ্ছনা দেয়। যাবার পথে গানবোট থেকে আমাদের হাসপাতালে শেল ফেলে। আমরা দারোয়ান পাহারা রেখে মুক্তিবাহিনীর চিকিৎসা করেছি। আমাদের ডাঃ শামসুল হক মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে গোপনে গিয়েও তাদের চিকিৎসা করেছেন। আমরা সবাই সবকিছু দিয়ে তাদের সাহায্য করতাম।

বাহিরচরে পাকবাহিনীরা মেয়েদের উপর চালিয়েছে অকথ্য নির্যাতন। বোয়ালিয়া, কাঁদপাশা, রাজগুরু, বাবুগঞ্জ থানা, দুয়ারিকা ইত্যাদি এলাকা থেকে বহু মেয়ে ধরে এনে ভোগ করেছে। আমার জানা এক হিন্দু মহিলাকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ধরে নিয়ে যায়। মহিলা খুব সুন্দরী ছিল। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় চারদিন ক্রমাগত অকথ্য দৈহিক নির্যাতন চালায়। অসহ্য যন্ত্রণায় মহিলা ছটফট করেছে। তার উপর চালিয়েছে নির্যাতন। চারদিন পর মহিলা ছাড়া পায়। আমরা তার চিকিৎসা করে ভালো করি।

আমি স্বামী সহ বাস করছিলাম। আমার সর্বস্ব যাওয়া সত্ত্বেও স্বামী নিয়ে কোন রকমে দিন কাটাচ্ছিলাম। আমার স্বামী স্বাধীনতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। আমাকে প্রায় বলতেন ডিসেম্বর মাস যদি বাঁচি জানুয়ারীর মধ্যে নিশ্চয় স্বাধীনতা পেয়ে যাবো।

৯ই ডিসেম্বর গৌরনদী থানার মাহিলারা ব্রিজের উপর দিয়ে আমার স্বামী যাচ্ছিলেন। তখন পাকবাহিনী প্রায় আত্মসমর্পণ করে এমন অবস্থায় ব্রিজে ডিনামাইট স্থাপন করে রেখেছিল। সেই সময় ডিনামাইট ফেটে ব্রিজ ধ্বংস হয়। আমার স্বামী ওখানেই নিহত হন। সব হারিয়ে একমাত্র স্বামী ছিল, তাও স্বাধীনতার পূর্বমুহূর্তে হারাতে হল।

আমি বাহিরচর থেকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জন্য খাবার পাঠিয়েছি। রাতে যখন-তখন আমার ওখানে তারা এসে থাকত, যেত। আমার স্বামীও মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পে মাঝে মাঝে যেতেন। আমার স্বামীর বড় সাধ ছিল স্বাধীন বাংলার মাটিতে বাস করা। তার সে সাধ পূর্ণ হল না।

ঊষারাণী মল্লিক

গ্রাম-জুলুঘাট, ডাকঘর-মৌশানি
থানা-স্বরূপকাঠি, জেলা-বরিশাল

২২ শে বৈশাখ, ঝালকঠি থেকে রাজাকার ও মিলিটারী স্বরূপকাঠি থানাতে আসে। প্রথমদিন স্বরূপকাঠি থানাতে প্রবেশ করে ১৪ জন হিন্দু পুরুষ ছেলেকে পাক-বাহিনী নৃশংসভাবে হত্যা করে। পাক-বাহিনী আমাদের বাড়ীর পাশেই জুলুঘাট স্কুলে ক্যাম্প স্থাপন করে। পাক-বাহিনী আসার তিনদিন পর আমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে গ্রাম থেকে পালিয়ে আটঘর কুড়িয়ানা চলে যাই।

প্রায় দুই মাস দেশের বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে থেকে শেষে বাধ্য হয়ে আমাদের গ্রামে ফিরে আসি। হিন্দু বলে লোকে আমাদের জায়গা দিতে চাইত না। ঠিকমতো খাবার মিলত না, লোকের কাছে চেয়ে চেয়ে খেতে হত। সব জায়গায় ওই একই কথা, মিলিটারী আসবে পালাও। রাজাকাররা রাত্রের অন্ধকারে গ্রামে গ্রামে ঢুকে বহু যুবতী সুন্দর সুন্দর নারীকে ধর্ষণ করেছে এবং ধরে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গেছে। এই সময় তারা পুরুষদেরকে ধরে নিয়ে যায় এবং সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করে। যাকে একবার ধরে নিয়ে যেত সে আর ফিরে আসত না।

আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি একদিন পাক-বাহিনী ও রাজাকাররা আমাদের গ্রাম আক্রমণ করে। আমরা বাড়ির পিছনে কলাবাগানের মধ্যে লুকিয়ে থেকে সব কিছু দেখছিলাম। আমার বাড়ীর উপর দিয়ে আমার পাশের বাড়ীতে ঢুকে পাক-বাহিনী দুইজন মেয়েছেলেকে ধরে ফেলে এবং ঘরের ভিতর জোর করে নিয়ে যায়। আমরা ঝোপের ভিতর থেকে দেখতে থাকি কিন্তু করার কিছুই থাকে না। মেয়ে দুইটাকে যখন ঘরের ভিতর নিয়ে যায় তখন তাদের কোলের ছোটো ছেলেকে আছাড় মেরে বাইরে ফেলে দেয়। ঘরের ভিতর থেকে মেয়ে দুইটার করুণ চিৎকার ভেসে আসতে থাকে। দুইটা মেয়ের উপর পর পর চার জন মিলিটারী ধর্ষণ করে। মিলিটারী চলে যাবার পর আমরা মেয়ে দুইটির কাছে গিয়ে দেখি তারা অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে। তাদের সারা শরীরে ক্ষতের চিহ্ন। পরনের কাপড় দূরে রয়েছে। সে এক করুণ দৃশ্য। তারা ওই দিন গ্রাম থেকে আরও কয়েকজন মেয়েকে ধরে নিয়ে যায় ক্যান্টনমেন্টে।

পাকবাহিনী থাকাকালে তারা প্রায়ই আমাদের গ্রাম সহ আগে পাশের গ্রামগুলিতে আসত। তাদের আসার খবর পেলেই সব লোক যে যেদিকে পারত পালাত। রাজাকাররা এই সময় সব জায়গায় খুঁজে খুঁজে লোকজনকে ধরেছে। পুরুষদেরকে সেখানেই গুলি করে হত্যা করত আর মেয়েদেরকে ধরে নিয়ে যেত। অনেককে আবার ধর্ষণ করার পর

ফেলে রেখে যেত।

শেষের দিকে রাজাকারদের অত্যাচার চরমে ওঠে। তারা প্রত্যেকদিন গ্রামের ভিতর যেতে থাকে এবং যেখানে যাকে পায় তাকেই মারতে থাকে। তখন বাধ্য হয়ে বাড়ী ছেড়ে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে থাকি।

দেশ স্বাধীন হবার পর চারিদিকে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। মানুষ সব কষ্ট ভুলে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করে।

যতীন্দ্রনাথ মণ্ডল

গ্রাম-শশীদ, ডাকঘর-মৌশানি
থানা-স্বরূপকাঠি, জেলা-বরিশাল

১৭ই বৈশাখ, পাক-বাহিনী গানবোট নিয়ে ঝালকাঠি দিয়ে কাটাখালি নদী দিয়ে শশীদের হাটে আসে। তারা এসে হাটের পাশে গানবোট রেখে গ্রামের উপর নেমে পড়ে। পাক-বাহিনী গ্রামের ভিতর প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের নারী-পুরুষ প্রাণের ভয়ে যে যেদিকে পারে পালাতে চেষ্টা করে। পাক-বাহিনী গ্রামে প্রবেশ করে প্রথমে দামী দামী জিনিসপত্র লুটতরাজ করে এবং পরে নয়খানা বাড়ী অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করে দেয়। ওই দিন দুই জন লোককে তারা গুলি করে। এদের একজন সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় আর একজন গুরুতর রূপে আহত হয়।

২৬শে বৈশাখ, পাক-বাহিনী ও রাজাকাররা পুনরায় আমাদের গ্রামে আসে। তারা গানবোট ও স্পিডবোট নিয়ে ছোটো খাল দিয়ে গ্রামের ভিতর ঢুকে পড়ে। মতিলাল দেবনাথ (ব্যানার্জী) ও হিরালাল দেবনাথের কাপড়ের দোকান লুট করে স্পিডবোট বোঝাই করে কাপড় নিয়ে যায়। এই সময় মতিলাল দেবনাথ-এর কাছ থেকে নগদ ১২০০০ টাকা নেয় এবং তাকে বেয়োনেট চার্জ করে ও পরে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে। এর মধ্যে জিতেন নামে একজনকে পাক বর্বর বাহিনী নারিকেল গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে তার পায়ের কাছে খড়কুটা দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। তার সারা শরীরে আগুন ধরে গেলে সে ভীষণভাবে চিৎকার করতে থাকে তখন পাক বর্বর বাহিনীর গুলি তার মাথার অর্ধেক অংশ উড়িয়ে দেয়।

এই ঘটনা তার স্ত্রীর সম্মুখে হয়। কেননা পাক-বাহিনী তার স্ত্রীকে ধরে এনে তার সম্মুখে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই সময় ক্ষীরদাসুন্দরী নাম্নী এক বিধবা মেয়েকে পাক-বাহিনী সারা শরীরে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। এই

সময় আর এক মহিলা পাশের জঙ্গলের ভিতর পালিয়েছিল তার ছোটো এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে। পাক-বাহিনী তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে এক গুলিতে ছেলে, মেয়ে সহ তিনজনই মারা যায়।

ওই দিন আমাদের গ্রামের মোট চারখানা বাড়ী বাদে আর সব বাড়ী অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করে দেয়।

৫ই জ্যৈষ্ঠ, পাক-বাহিনী ঝালকাঠি থেকে গানবোট নিয়ে পুনরায় শশীদ হাটে আসে এবং হাটের উপর ক্যাম্প স্থাপন করে। ওই দিনই পাক-বাহিনী আমাদের গ্রাম থেকে দুজন লোককে হত্যা করে। তার মধ্যে একজন ছিল স্থানীয় স্কুলের সেক্রেটারী কালীকান্ত মণ্ডল। এই সময় পাক-বাহিনী স্কুলের লাইব্রেরী লুট করে এবং ভেঙেচুরে সব তছনছ করে দেয় এবং লাইব্রেরীর ভিতরে ছাত্রদের দেওয়া রিলিফের গম পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই গমের আগুন নেভাতে গিয়েই সেক্রেটারী সাহেব গুলি খান।

পাক-বাহিনী এই সময় দশ দিন শশীদ হাটে ক্যাম্প করে থাকে। এই সময় তারা ব্যাপক হারে নারীধর্ষণ করে। একমাত্র আমাদের গ্রামের অনেক মেয়েকে পাক-বাহিনী ধর্ষণ করে। পাক-বাহিনী রাত্রিতে গ্রামের ভিতর ঢুকে মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে এবং কিছু কিছু মেয়েকে তারা ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং এক-একজনের উপর পর পর কয়েকজন পাকপশু ধর্ষণ করে। এই সময় এগারো বছরের একটা ছোটো মেয়েকে পাক-বাহিনী তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং একাধারে তার উপর চলে পাশবিক অত্যাচার। পাক-বাহিনী চলে যাবার পর এই মেয়েটিকে উদ্ধার করা হয়। তিন মাস পর্যন্ত এই ছোটো মেয়েটি হাঁটতে পারত না।

আট মাসের গর্ভবতী একটি মেয়ের উপর পাক-বাহিনী এই সময় অমানুষিক পাশবিক অত্যাচার চালায় যার দরুন সন্তান প্রসব করার পর সে ও সন্তান মারা যায়।

২৫ শে শ্রাবণ, পাক-বাহিনী দালালের সহযোগিতায় ঝালকাঠি থেকে গানবোট নিয়ে শঙ্কর ধবল গ্রামে আসে এবং আছমত আলি ও রোহিণী মিস্ত্রিকে ধরে নিয়ে শশীদ গ্রামে আসে এবং সুনীল সরকার নামে এক ছেলেকে গুলি করে হত্যা করে। এই সময় খুব বৃষ্টি নেমে পড়ে। পাক-বাহিনী তখন রোহিণীকুমার মণ্ডলের ঘরে আশ্রয় নেয় এবং হারমোনিয়াম, ঢোল, তবলা নিয়ে খুব গানবাজনা করে এবং কলা খায়। বৃষ্টি শেষে যাবার সময় গৃহকর্তা রোহিণীকুমার মণ্ডলকে গুলি করে হত্যা করে যায়। যে দুইজনকে লোককে তারা বন্দী করে আনে তাদের একজনকে টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দেয় এবং একজনকে শশীদ হাটে বসে গুলি করে হত্যা করে। তাকে হত্যা করার আগে খুব মারপিট করে এবং খুব গালাগালি দেয়। যাকে এই সময় ছেড়ে দেয় তাকে বলে দেয়, তোমরা জয়বাংলা বলতে পারবে না। বলবে, ''জয় পাকিস্তান''।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বরূপকাঠি থানার অশ্বথকাঠি, জিনহার, মাদ্রা, পূর্বজলা বাড়ী,

মৌশানি, জুলুহার, আতা, জামুয়া, জৌসার, গণপতিকাঠি, আরামকাঠি প্রভৃতি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। এই সময় বহু লোককে তারা নির্মমভাবে হত্যা করে। এই সময় মাদ্রা গ্রাম থেকে দুইজন লোককে কুঠার দিয়ে কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাদের অপরাধ ছিল পাকসৈন্য যখন একটা মেয়েকে ধর্ষণ করার জন্য যায় তখন তারা দুইজন বাধা দেয়। এই সময় তারা বহু মেয়েকে ধর্ষণ করে। একমাত্র স্বরূপকাঠি থানাতেই এক হাজারের বেশি মেয়েকে পাক-বাহিনী ধর্ষণ করেছে।

বিভিন্ন সময় আমাদের থানাতে প্রায় ২০০/৩০০ লোককে পাক-বাহিনী হত্যা করে। স্বাধীনতার পর আটঘর কুড়িয়ানা স্কুল ঘরের পিছনে একটা পুকুরের ভিতর থেকে ১৫৬টা মাথার খুলি উদ্ধার করা হয়।

পাক-বাহিনী স্বরূপকাঠি দখল করার পর স্বরূপকাঠি, কুড়িয়ানা, শশীদ, বাউকাঠি জলাবাড়ি এইসব জায়গায় ক্যাম্প স্থাপন করে এবং এখান থেকেই বিভিন্ন জায়গায় অপারেশন চালায়। জলাবাড়ি ক্যাম্প অঞ্চলে তেত্রিশটা গ্রাম শুধু হিন্দু বসতি ছিল, পাক-বাহিনী সব গ্রাম একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

শ্রী ফনীন্দ্রভূষণ পাল

ঝালকাঠি, বরিশাল

আমি পশ্চিম ঝালকাঠি গ্রামে গুরুচরণের পরিত্যক্ত বাড়ী হতে রাজাকার এবং পুলিশ দ্বারা ধৃত হই। পরে ঝালকাঠি থানার ওসি সেকেন্দার সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়। উক্ত গ্রাম হতে আজহার নামক অপর এক ব্যক্তিকে ধরে আনে। তাকে বেদম প্রহার করার ফলে তাঁর গুহ্যদ্বার দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। আমাকে থানায় নিয়ে আসে। সেদিন থানায় প্রায় চল্লিশ জন বন্দী ছিল। যাদের ধরে আনত তাদের রাইফেল দিয়ে বেদম প্রহার করত। এর ফলে অনেকের দাঁত, হাত, পা ভেঙে যেত।

প্রত্যেকদিন ভোর রাতে বন্দীদের থানা হতে কিছুদূর এক বদ্ধভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করত। রাতে গোপনে একটা কমিটি বসত ধৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে। যাদের ছেড়ে দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করত তাদের উক্ত রাতে ছেড়ে দিত, বাকিদের বদ্ধভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করত। আমাকে যেদিন ধরে নিয়ে যায় সেদিন আজহার ও তার পুত্র মুক্তিফৌজ জনাব রশিদকে ধরে নিয়ে আসে। আজহার তার পুত্রের চিন্তায় খাদ্য পরিত্যাগ করে। আমি তাকে বলি যে তোমার পুত্র দেশের জন্য শহীদ হচ্ছে এবং এটা বীরত্বের কথা, সুতরাং দুঃখ পাবার কিছুই নেই। তখন তার পুত্র রশিদ বলে যে আব্বা মরে তো

যাবই, কিন্তু যাবার পূর্বে তোমার সঙ্গে একত্রে আহার করি। উক্ত পুত্র আমাকেও তার সঙ্গে আহার করতে বলে এবং আমাকে তাঁকে আহার করিয়ে দিতে বলে। তখন আমার একত্রে আহার করি। তখনকার সেই দৃশ্য সহ্য করার মতো ছিলো না। সে দৃশ্য অত্যন্ত করুণ ছিল। সে আমাকে তার পিতাকে সাহায্য করার কথা বলে। পরে উক্ত চল্লিশ জনকে রাতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে।

এরপর আমি বাড়ী যাই। পরে পাঞ্জাবীবাহিনী এসে পুনরায় শহরে লুটপাট শুরু করে এবং নারীধর্ষণ বেশী করে। এরা মানুষকে হত্যা করে কবর দিত। এর পূর্বে মানুষদের হত্যা করে নদীতে ফেলত। কিন্তু তখন বিভিন্ন মিশন ঝালকাঠিতে আসতে থাকায় তাঁরা অনেক ভাসমান লাশ দেখে এবং পাক-বাহিনীর অত্যাচার সম্পর্কে সন্দেহ করে। এই জন্য তাদের হত্যা করে মাটি চাপা দিয়ে পাক-বাহিনী চেষ্টা করেছে তাদের কৃতকর্মের নজির চাপা দিতে। পাক-বাহিনী সেই সময় শহরে অবস্থিত বহু পরিবারের নারীদের জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এরপর তাদের দালালবাহিনী ধরে নিয়ে গলা কেটে হত্যা করে।

সুধারাণী বসু

গ্রাম-ছাচলেপুর, ডাকঘর-পিংড়ি
থানা-ঝালকাঠি, জেলা-বরিশাল

১৩৭৮ সালের ৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে ঝালকাঠি থানা হতে ১৪ জন বাঙালী পুলিশ স্থানীয় শান্তি কমিটির দালাল সহ ছাচলেপুর গ্রাম অপারেশনে যায়। সকালবেলা পুলিশগণ আমার পিতার বাড়ী আক্রমণ করে এবং তা জ্বালিয়ে দেয়। আমরা সবাই নিকটস্থ জঙ্গলে পালিয়ে যাই। আমি আমার বড় মেয়ে রমাবতী বসুকে নিরাপত্তার জন্য মোতাহার গোমস্তার বাড়ীতে রেখে দিই। পুলিশরা পরে উক্ত বাড়ীতে গিয়ে মোতাহারের সাহায্যে আমার মেয়ে এবং অপর দুজন মেয়ে কমলারাণী দাস (বয়স ১৭) ও কল্পনারাণী দাসকে (বয়স ১৮) ধরে নিয়ে যায়। পরে মেয়েদের খুঁজতে গিয়ে দেখি যে কমলা ও কল্পনাকে গুলি করে বিষখালি নদীর পারে হত্যা করেছে এবং রমাকে বেয়োনেট দিয়ে হত্যা করেছে। এছাড়াও আমার আত্মীয় দুর্গাশংকর দাসকেও গুলি করে হত্যা করে। আমরা পরে উক্ত লাশ দেখতে পাই। উক্ত মেয়েদের নৃশংসভাবে হত্যা করে এই পুলিশ বাহিনী।

তার পরের দিন পূর্বোল্লিখিত পুলিশগণ পুনরায় উক্ত গ্রামে অপারেশনে যায়। তখন আমার স্বামী নদী পার হয়ে পিংড়ি গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং সেখান হতে অন্যত্র চলে যায়। বহু দিন তার কোনো সংবাদ জানতে পারিনি। পুলিশের ভয়ে আমরা জীবিত

দুই মেয়ে এবং একছেলে নিয়ে চৌকিদার বাড়ির জঙ্গলে আশ্রয় নিই। আমি ও আমার ছোট দুই পুত্র একস্থানে গোপন করে থাকি। অন্যত্র আমার দুই মেয়ে আত্মগোপন করে থাকে। চৌকিদার তখন উক্ত পুলিশদের বলে যে, এই হচ্ছে লিডার সঞ্জীবের মা, একে ধরো। তখন পুলিশরা আমাকে ধরে ফেলে এবং ওসি বলে থানায় যেতে হবে।

সেই সময় আমার সঙ্গের মেয়েটি পুলিশকে বলে— আমাদের মেরো না, আমার কাছে টাকা আছে নিয়ে যাও। তখন পুলিশ তার নিকট হতে ৩০০০ (তিন হাজার) টাকা ছিনিয়ে নেয় এবং আমাদের থানায় নিয়ে আসে। আমার অপর দুজন মেয়ে অসহায় হয়ে যায়। তারা আশ্রয়ের জন্য ঘুরতে থাকে কিন্তু ভয়ে কেউ আশ্রয় দিতে স্বীকার হয়নি। একজন তাদের কান্না দেখে সদয় হয়ে তার বাড়িতে আশ্রয় দেয়। যা হোক আমাকে থানায় নিয়ে এসে প্রায় দেড় মাস আটকে রাখে। তখন নিম্নে বর্ণিত দৃশ্যগুলি দেখেছি।

থানা হতে পুলিশরা বিভিন্ন গ্রামে অপারেশন চালিয়ে নিরীহ লোকেদের ধরে নিয়ে গিয়েছে এবং রাত তিনটার দিকে তাদের হাত বেঁধে দলবদ্ধভাবে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে। ভোর চারটার দিকে সুগন্ধা নদীর তীরে এবং থানা হতে কিছুটা দূরে বদ্ধভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে। আমি থানা হতে বহু মানুষের চিৎকার ও করুণ আর্তনাদ শুনেছি। কাউকেই রক্ষা করেনি।

অনেক মানুষকে থানা হতে ঝালকাঠি মিলিটারী ক্যাম্পে নিয়ে যেত এবং সেখান হতে যখন উক্ত ব্যক্তিদের ফিরিয়ে নিয়ে আসত তখন তাদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে পোড়া ক্ষতের চিহ্ন রেখেছি। পাক-বাহিনী লোহার রড গরম করে উক্ত ব্যক্তিদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতো। পঁরে তাদের থানাতে এনে রাতে উক্ত বদ্ধভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে।

একদিন প্রায় ৯৫ (পঁচানব্বই) জন নিরীহ মানুষকে ধরে নিয়ে এসে হত্যা করে। প্রত্যেকদিন ধৃত ব্যক্তিদের নাম জিজ্ঞাসা করত। কিন্তু সেই দিন তাদের সবাইকে নিয়ে গিয়ে লাইন করে হত্যা করেছে। সকালে একজন পুলিশ এসে তৎকালীন সিআই (পুলিশ) -কে জানায় যে পঁচানব্বই জনের মধ্যে একজন জীবিত আছে। তখন উক্ত সিআই সেই ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য নির্দেশ দেয়। প্রত্যেকদিন এইভাবে ভোররাতে ধৃত ব্যক্তিদের হত্যা করেছে। সিআই-এর নির্দেশে এক একমাসে প্রায় একহাজার লোককে উক্ত বদ্ধভূমিতে হত্যা করেছে বলে আমার মনে হয়।

আমার নিকট হতে আটত্রিশ ভরি সোনা এবং ৫০০ টাকার বিনিময়ে আমাকে ছেড়ে দেয়। আমি তখন নিজ বাড়ীতে চলে যাই। আমি আসার পর আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়নি। আমার পুত্র সঞ্জীব মুক্তিফৌজ হওয়ার তার খোঁজ পাইনি। বড় ছেলে দিলীপের সংবাদও পাইনি। এইভাবে এক মর্মান্তিক ও করুণ অবস্থায় আমার দিন কেটেছে। স্বাধীনতার পর সবাই একত্রিত হই।

শ্রীরমেন কর্মকার (রঙ্গ)

ঝালকাঠি, জেলা-বরিশাল

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পাক-বাহিনী ঝালকাঠি চলে আসে। এসেই তারা ঝালকাঠি শহরে লুটপাট শুরু করে। আগুন জ্বালিয়ে ৯০ ভাগ দালান ও ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেয়। পাক-বাহিনী ঝালকাঠি আসার একদিন পূর্বে আমরা তারপাশা গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিই।

এপ্রিল মাসের ২৫/২৬ তারিখে ঝালকাঠি হতে প্রায় ৭০/৮০ জন পাকসেনা তারপাশা অপারেশনে যায়। পাকসেনারা সংবাদ পেলে আমরা তারপাশার একটা জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকি। তারা একজন মুসলিম লীগের দালালের সহযোগিতায় উক্ত জঙ্গল ঘেরাও করে গোলাগুলি শুরু করে দেয়। ফলে আমরা প্রাণরক্ষার জন্য ছুটাছুটি করে পালাতে চেষ্টা করলে আমাদের দশ জন ছেলেকে তারা ধরে ফেলে এবং আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে, "তোম মুসলমান হ্যায়? কালেমা বাতাও"। আমরা উত্তর করি আমরা মুসলমান। কিন্তু তারা আমাদেরকে দুই হাত বেঁধে ঝালকাঠি নিয়ে আসে এবং থানা কাউন্সিলে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। অতঃপর হাত, পা লাইটপোস্টের সঙ্গে রশি দিয়ে বেঁধে পা উপর দিকে, মাথা নীচের দিকে দিয়ে ঝুলিয়ে প্রত্যেককে বালতি ভরতি পানির মধ্যে মাথা ডুবিয়ে রাখে ও বেতের লাঠি, লোহার শিক ও বৈদ্যুতিক তার দিয়ে প্রায় আধা ঘণ্টা পর্যন্ত আমাদের সমস্ত শরীরে আঘাত করার দরুন আমাদের মধ্যে ৪/৫ জন অজ্ঞান হয়ে যায়। আঘাতের দরুন আমাদের শরীরের বিভিন্ন স্থান হতে রক্ত ঝরতে থাকে। তারপর পুলিশ দিয়ে আমাদেরকে থানায় নিয়ে যায়। পিটানোর সময় আমাদেরকে শুধু বলতে থাকে মুক্তিফৌজ কোথায়? এই বলে, আর প্রহার করে। আমাদেরকে থানায় নিয়ে এসে হাজতের মধ্যে রেখে দেয় এবং ভোর রাত্রি চারটার সময় দু'জন করে একত্রে বেঁধে মোট আট জনকে গুলি করে হত্যা করে। উক্ত দলের মধ্য হতে আমাকে ও নিতাইকে হাজতের মধ্যে রেখে দেয়। এই ঘটনা ঘটার দুইদিন পর আমাকে ক্যাপ্টেনের নিকট হাজির করে এবং ক্যাপ্টেন আমাকে জিজ্ঞাসা করে তোর কোনো বোন আছে? আমি উত্তর করি আমার তিনটা যুবতী বোন আছে। ক্যাপ্টেন আমাকে বলে— আমি তোকে ছেড়ে দিব তুই তাদেরকে নিয়ে শহরে আসবি। আমি তোকে ঘরবাড়ী টাকাপয়সা সব দিব। আমি তার কথায় রাজি হয়ে যাই এবং আমাকে ও আমার চাচাতো ভাই নিতাইকে ছেড়ে দেয়। তারপর আমরা ছাড়া পেয়ে চলে যাই এবং

তাদের সঙ্গে আর দেখা না করে পালিয়ে পালিয়ে দিন কাটাতে থাকি। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে আবার আমি ঝালকাঠি চলে আসি।

সন্তোষীবালা ঢালী

গ্রাম-সুবিদপুর, ডাকঘর-পাশসাতরিয়া
থানা-কাউখালি, জেলা-বরিশাল

বৈশাখ মাসের শেষের দিকে পাকসেনারা আমাদের গ্রামে গিয়ে (নিলতাগ্রাম) সমগ্র গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে। প্রথমে লুট করে তারপর সমগ্র গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। লোক পালাতে চেষ্টা করলে গুলি করে হত্যা করেছে। ছোটো ছোটো বাচ্চা ধরে আগুনে ফেলে হত্যা করেছে। ১০ই জ্যৈষ্ঠ পাকসেনারা আবার আসে। গ্রামের লোকজন মনে করে যেহেতু নিলতাগ্রাম একবার পুড়িয়েছে সেহেতু সেখানে আর পাকসেনা আসবে না। তাই সমস্ত আশেপাশের লোক ওই গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেয়। পাকসেনারা রাজাকার মারফত এ খবর পেয়ে যায়। পাকসেনারা সমস্ত নিলতাগ্রাম ঘিরে ফেলে লুট করার পরে জ্বালিয়ে দেয় একই সঙ্গে ২০ জন লোককে গুলি করে হত্যা করে ও পাশবিক অত্যাচার চালায়।

ঐ তারিখে আমার স্বামী পালিয়ে এক পুকুরের ভিতর মাথা উঁচু করেছিল। পাকসেনারা খুঁজতে খুঁজতে জল থেকে উঠিয়ে আনে এবং ঐ পুকুরের পাড়েই ভীষণভাবে মারধোর করে। হিন্দু বলে অকথ্য গালাগালি করে, অত্যাচার চালায়, পরে গুলি করে ওখানেই হত্যা করে। আমার স্বামীকে হত্যা করে পাকসেনারা আমার বাড়ি আক্রমণ করে। বাড়ীঘর সব জ্বালিয়ে আমার দু'টো শিশু সন্তানকে হত্যা করতে নিয়ে যায়। আমি পা চেপে কান্নাকাটি করলে টাকা চায়। আমার ২০০.০০ টাকা, দুই জোড়া রিং এবং একটি আংটি ছিল (সোনার) সেগুলি সব দিলে আমার ছেলেদের ছেড়ে দেয়।

চিড়েপাড়া থেকে পাকসেনারা মেয়েদের ধরে নিয়ে যায় ভোগের জন্য। নিলতাগ্রামে পাটি তৈরী করে এমন একটি লোকের বাড়ী ঢুকে লুট করে বাড়ী জ্বালিয়ে দেয় তারপর স্বামীকে গুলি করতে গেলে স্ত্রী ছুটে গিয়ে পাকসেনাদের পা জড়িয়ে ধরে বলে আমার বাড়ীঘর সব গেছে এখন স্বামীকে মারবার আগে আমাকে মারো। সঙ্গে সঙ্গে পাকসেনারা মেয়েটির উপর অত্যাচার করে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করে পরে স্বামীকেও গুলি করে হত্যা করে। তারা অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে। গন্ধর্ব গ্রামে পাকসেনারা গিয়ে গ্রাম জ্বালিয়ে বহুজনকে কুড়াল দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। ধর্ষিতা হয়েছে অসংখ্য নারী। স্বামীর মৃত্যুর পর আমি গ্রামে গ্রামে পালাতে লাগলাম ছেলে দুটিকে নিয়ে। মাইলের

পর মাইল না খেয়ে হেঁটে বহু কষ্টে শিশু-সন্তান দুটি নিয়ে ৫ই শ্রাবণ ভারতে যাই। সেখানে বিলাসপুর চক্রবাটা ক্যাম্পে ছিলাম। দেশ স্বাধীন হলে আমি নিজ গ্রামে ফিরে আসি।

শ্রী বিমলকৃষ্ণ দাস

সরকারী স্বাস্থ্য সহকারী
ভোলা জনস্বাস্থ্যকেন্দ্র
ভোলা, বরিশাল

২৮ শে মে রাজাকাররা রাত বারোটার দিকে আমাদের গ্রামের বাড়ি ঘিরে ফেলে। লোকজন দেখে ভাবলাম গ্রামে পাহারা দেয় তারাই হয়তো আসছে। দারোগা এসেই আমার নাম জিজ্ঞাসা করে। নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আটকাতে বলে। রাজাকারদের মধ্যে একজন আমাদের পরিচিত এবং দুই জন আমার সহপাঠী ছিল। আমাদের বাড়ী ঢুকে সবাইকে গ্রেফতার করে বলে— তোমাদের কাছে বন্দুক আছে তোমরা মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করছ। আমার দাদা বিজয়ভূষণ দাস (২) আমি (৩) ব্রজমোহন দাস (জ্যাঠা) (৪) হরিপদ দাস (কাকা) (৫) সুনীলকুমার দাস (খুড়তুতো ভাই) (৬) সহদেব হালদার (কৃষাণ, বাড়ীর) (৭) যোগেন্দ্র বৈদ্য (৮) শ্যামলকৃষ্ণ দাস (৯) সৈয়দ আহম্মদ (১০) রুস্থল আমিন (১১) ইনা আলি। দারোগা সবাইকে থানায় নিয়ে যায়। পথে বালক বলে, শ্যামলকৃষ্ণ দাস, রুস্থল আমিন এবং ইনা আলিকে ছেড়ে দিয়ে আমাদের আট জনকে থানায় নিয়ে আসে। পথে জনৈক রাজাকার বলে, তোমার জ্যাঠাতো বোনকে দিলে সবাইকে বাঁচিয়ে দেওয়া হবে। আমি অস্বীকার করলে আমার জ্যাঠাকে বলে। জ্যাঠা মহাশয় বলেন, 'আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও মেয়ের ইজ্জত দিতে পারব না, টাকা নিতে পারো।' রাজাকাররা ক্ষিপ্ত হয়ে সবাইকে হাজতে আটকে রাখে। ২৯শে মে সকালে রাজাকার আবার এসে আমার বোনকে চায়। আমি অস্বীকার করি। রাজাকার ফিরে যায়। আমার বৃদ্ধ আর এক জ্যাঠা দারোগাকে ছেড়ে দেবার অনুরোধ করলে সে বলে, ক্যাপ্টেন বরিশাল থেকে ফিরলে তখন দেখা যাবে। ক্যাপ্টেন ছিল কায়ানী। ২৯ শে মে ভোলা ডাকবাংলোতে শান্তি কমিটির সভা বসে আমাদের নিয়ে। বরিশাল থেকেও জেলা শান্তি কমিটির লোক আসে আমাদের বিষয়ে। বরিশাল শান্তি কমিটির পুরাতন অনেকেই আমার বড়ো জ্যাঠাকে চিনত। তারা এসে ছেড়ে দেবার জন্য অনুরোধ করে। আমি একটু আশ্বাস পেলাম হয়তো বাঁচব।

৩০শে মে সকাল দশটার দিকে ক্যাপ্টেন নিজে ১০/১২ জন খানসেনা নিয়ে আমাদের দেখতে যায়। আমার ভাইপো ৭/৮ বছর বয়স, ক্যাপ্টেনের পা ধরে খুব কান্নাকাটি করলে ক্যাপ্টেন বলে, আচ্ছা ছেড়ে দেব। আমাদের শিবপুর ইউনিয়ন শান্তি কমিটির সেক্রেটারী ইলিয়াস মাস্টারকে আমাদের পক্ষে সুপারিশ করতে নিষেধ করে। আমার জ্যাঠা ডা. শশীভূষণ দাস দারোগাকে ৫০০০ টাকা দিতে রাজি হলে সে বলে, 'কালকে আসবেন।'

পাক কর্তৃপক্ষ একটি ব্যাজ দেন (সি, এস)। এই ব্যাজ কমন সারভেন্ট, সাধারণ কৃষক, মুচি, মেথর, নাপিত এদের দেওয়া হত। আমাদের বাড়ীর কৃষক হিসেবে ব্রজমোহন দাস, হরিপদকুমার দাস এবং সুনীলকৃষ্ণ দাসের নামে ব্যাজ দেবার জন্য তারা টাকা নেয়। ব্যাজ বুকে থাকলে পাকসেনারা ধরবে না বা গুলি করবে না।

২০শে মে রাত ৮-১৫ মি. ক্যাপটেনসহ ১৪/১৫ জন খানসেনা আসে। আমাদের পাঁচ জন করে হাত বেঁধে দুইটি দলে দশ জনকে গাড়ীতে তোলে। আমাদের আট জন ছাড়া আর দুই জন ছিল বাপতা গ্রামের অনিল এবং চরফ্যাশনের আর একজন।

তারা আমাদেরকে বরিশালে নিয়ে যাবার নাম করে ভোলা খেয়াঘাটে নিয়ে যায়। আমাদের পাঁচ জনকে ট্রাকে বসিয়ে রেখে অপর পাঁচ জনকে নদীর কূলে নামিয়ে আমাদের সামনে এক এক করে গুলি করে হত্যা করে। ঐ পাঁচজনের দলে আমার খুড়তুতো ভাই তখনও মরেনি, 'মা' 'মা' করে কাঁদছে, আমরা শুনতে পাচ্ছি। ঐ অবস্থায় সারারাত থেকে পরদিন আমার ভাই মারা যায়। আমাদেরকে তীরে নামিয়ে এক একজনের জন্যে দুই জন করে সেনা অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আমাদের বলল জলে নামতে। খানসেনারা চায়না অটোমেটিক রাইফেল প্রস্তুত করতে থাকে। আমি বলি, দাদা, সময় যায়, ঝাঁপ দে। দড়িবাঁধা অবস্থায় আমরা পাঁচ জন নদীতে ঝাঁপ দিই। খানসেনারা গুলি চালায়। আমরা টানাটানি করে হাতের দড়ি খুলে ফেলি। আমি সাঁতার দিয়ে নদীর ওপারে চলে যাই। দাদা আর একদিকে চলে যায়। গুলি অনবরত চলছে আর খানসেনারা গালাগালি করছে। একটি কারগো লঞ্চ দাঁড় করানো ছিল তারা তাকে ডাকতে থাকে। আমি তীরে উঠে ক্রলিং করে ধান খেতের দিকে পালাতে থাকি। সাত মাইল দূরে টুংচর গিয়ে পৌঁছাই এক আত্মীয়ের বাড়ী। ওখানে দুইদিন থাকি। জানাজানি হয়ে গেলে বালিয়া গ্রামে পালিয়ে যাই এক বন্ধুর বাড়ী। ওখানে কওছর হাওলাদারের (প্রাইমারী শিক্ষক) বাড়ীতে দুই মাস থাকি। পরে আমার আহত দাদার খোঁজ পেলাম। জানতে পারলাম আমাদের পাঁচ জনের মধ্যে তিন জন বেঁচে গেছি, দুই জন মারা গেছে।

গ্রামে গ্রামে পালিয়ে পালিয়ে দিনের পর দিন জলের ভিতর থেকে জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে ভারতে গিয়ে পৌঁছাই। তারা আমাদের বাড়ীঘর সব লুট করে নিয়ে যায়।

আমাদের গ্রামের রাজাকারদের সহযোগিতায় তারা সমস্ত গ্রামের হিন্দু পরিবারদের ধ্বংস করে। তারপর দেশ মুক্ত হলে আমি আবার বাংলাদেশে ফিরে আসি।

শ্রী অমলকান্তি সেন

অধ্যাপক

সাতকানিয়া কলেজ, চট্টগ্রাম

১৯৭১ সালের ২৩শে এপ্রিল পাক-বাহিনী দোহাজারীতে ঘাঁটি স্থাপন করে। ২৪শে এপ্রিল পাক বর্বর বাহিনী সাতকানিয়া থানার কাঞ্চনা গ্রামে সর্বপ্রথম অগ্নিসংযোগ ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। এই সময় তাদের সঙ্গে তাদের পথপ্রদর্শক হিসাবে ছিল অন্যান্যদের মধ্যে সাতকানিয়ার এক দুর্বৃত্ত। ২৩শে ডিসেম্বরের আগে পর্যন্ত দখলদার বাহিনী ও রাজাকারদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং সাতকানিয়া থানার বিভিন্ন এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের ও মুসলিম প্রগতিবাদী শ্রেণীর লোকদের নানাভাবে হয়রানি করেছে। সে কারও কারও কাছ থেকে বিভিন্ন পরিমাণ টাকা আদায় করেছে ঘরবাড়ী করার ওয়াদা দিয়ে বা প্রাণরক্ষার অঙ্গীকারে।

২৪শে এপ্রিল যেদিন কাঞ্চনা গ্রামটি ভস্মীভূত করা হয়েছে সেদিন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ঘরে মূল্যবান যে সকল জিনিস ছিল তা প্রথমে লুট করা হয়েছে। ঘর থেকে পালিয়ে লোকজন যখন এদিক-সেদিক যাচ্ছিল তখন তাদের কাছে যা পাওয়া গেছে তাও লুট করে নিয়েছে। এই ভাবে বেশিরভাগ লোককে সর্বস্বান্ত করা হয়েছে। তখন বৃষ্টির দিন, তখনও পোড়াবাড়ীতে নতুনভাবে ঘর তৈরী করার অনুমতি দেয়নি শান্তি কমিটির লোক। কাঞ্চনাতে আক্রমণ চালাবার দিন অন্যান্য এগারো জনের মধ্যে চট্টলার সু-সন্তান সাতকানিয়ার গৌরব রায় সাহেব কামিনীকুমার ঘোষ এম,এ,বি, এল মহাশয়কে হত্যা করেছে বর্বর পাক-বাহিনী।

আমাদের চেমশা গ্রামে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে ২৫শে মে। এইদিন পাক-বাহিনী দোহাজারী ঘাঁটি থেকে সকাল আটটা নাগাদ সাতকানিয়ার ভূতপূর্ব এম,এন,এ, আবু সালেহর বাড়ীতে আগুন দেয় এবং দোহাজারী ফেরার পথে যখন চেমশা গ্রামের কাছাকাছি, তখন কয়েকজন দুর্বৃত্ত পাক-বাহিনীকে চেমশা গ্রামের হিন্দুদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেবার জন্য তাদেরকে অভ্যর্থনা করে। সঙ্গে সঙ্গে পাক-বাহিনীর জীপ দিক পরিবর্তন করে চেমশা গ্রামে ঢুকে পড়ে। পাক-বাহিনী গ্রামে ঢুকে দালালদের আগুন জ্বালাবার ভার দিয়ে যায় এবং তাদের সহয়তা করার জন্য সাতকানিয়া থানার কয়েকজন পুলিশ মোতায়েন

করে। এই সুযোগে দালালরা গ্রামে প্রথমে লুটতরাজ চালায় এবং পরে গ্রামের অধিকাংশ বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। আমার প্রতিবেশী হিসাবে একজন গরীব লোক ছিল, সে রিক্সাচালক হিসাবে জীবিকা অর্জন করত। তার বাড়ীও সেদিন রেহাই পায় নাই, কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, আমার প্রতিবেশী সোনা দাসকে তারা ধরে নিয়ে যায়। পরে জানতে পারি তাকে নাকি হত্যা করা হয়েছে। আজও তার কোনো খরব নাই।

আমার এক ভাই বিমলকান্তি সেন সাতকানিয়া কলেজের বি, এ ক্লাসের ছাত্র ছিল। দেশে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়লে সে মুক্তিবাহিনীতে শিক্ষাগ্রহণ ও সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য সীমান্ত পার হবার সময় মিরশ্বরাই থানাতে পাক-বাহিনী ও রাজাকারদের হাতে ধরা পড়ে এবং আটদিন অকথ্য নির্যাতনের পর ২৩শে সেপ্টেম্বর তাদের হাতে নিহত হয়।

আমাদের গ্রামের নিহত স্বপন চৌধুরী ও নিহত দিলীপ চৌধুরীর কথা এখনও ভুলতে পারছি না এবং কখনও ভুলতে পারব না। তারা দু'জনই আমাকে দাদা বলে ডাকত এবং তাদের "অমলদা" ডাকটি আজও আমার প্রতিনিয়ত খেয়াল হয়। অসহযোগ চলাকালে তাদের ভূমিকা ছিল খাঁটি দেশপ্রেমিকের ভূমিকা।

গ্রামে গ্রামে শান্তি কমিটি গঠন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রামেও শান্তি কামিটি গঠিত হয়। আমাদের গ্রামে রাজাকাররা কয়েকবার অত্যাচার চালিয়েছে। সাতকানিয়া দেওয়ানী আদালতের প্রবীণতম লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী বি, এল, মহাশয়কে পর্যন্ত চরমভাবে অপমান করেছে। ৯ই ডিসেম্বর আমাদের গ্রামে পুনরায় এক ব্যাপক অগ্নিসংযোগ চালায় দোহাজারী ঘাঁটির রাজাকাররা।

জ্যোতিন্দ্রমোহন নন্দী

গ্রাম-ফতেয়াবাদ
থানা-হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে পাকফৌজ এই এলাকায় প্রবেশ করে। এই এলাকায় কোনো প্রকার প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ৩০শে চৈত্র পাকফৌজ বিকাল চারটার পরে ফতেয়াবাদ গ্রামে ঢোকে। নগেন্দ্রলালের মেয়েকে গুলি করে হত্যা করে। তারপর এই পাড়ায় এসে রাস্তায় দেবেন্দ্রলাল বিশ্বাসকে গুলি করে হত্যা করে। তার বাড়ী তখনই জ্বালিয়ে দেয়। তারপর আমার বাড়ীতে আসে এবং আমার বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয় এবং লুটপাট করে নেয়। আমার ভাতিজা রণজিৎলালকে গুলি করে হত্যা করে। এই গ্রামে

মোট ৮টি বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। মন্দির ধ্বংস করে, গুলি করে হত্যা করে মোট সাত জনকে। আগুনে জ্বালায় একটি শিশুকে। এই গ্রামের সব ঘরবাড়ী রাজাকাররা লুটপাট করে এবং রাজাকারদের অত্যাচার এখানে খুব বেশী ছিল।

শ্রী বণিক চন্দ্র

প্রধান শিক্ষক, পটিয়া হাইস্কুল
পটিয়া, চট্টগ্রাম

১৪ই মে, শুক্রবার ১০টায় পাঞ্জাবীরা পটিয়ায় এসে স্থানীয় প্রাইমারী প্রশিক্ষণকেন্দ্রে স্থায়ী আস্তানা গাড়ে এবং সেইদিন বিকালে পার্শ্ববর্তী দক্ষিণভূর্ষি ও কেলিশহর গ্রামে কিছু কিছু বাড়ী পুড়িয়ে দেয়, তারপর দিনও তারা ঐ সমস্ত গ্রামে অত্যাচার চালায়। ১৫ই মে শনিবার খবর পাই পরদিন রবিবার ওরা পটিয়াসংলগ্ন সুচক্রদণ্ডী গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে।

এই খবর পেয়ে ১৬ই মে, রবিবার ভোরে ছেলেটিকে নিয়ে পটিয়া থেকে রিক্সা করে আবার বাড়ীর দিকে রওনা হই। এখানে বলে রাখা ভালো একজন ডাকাত আমার স্ত্রী এবং ভাইয়ের কাছ থেকে ২০০০ টাকা আদায় করে নিয়ে যায়। বাড়ীতে কিছু ধান ছিল। ঐ ধান বিক্রি করে তারা ডাকাতদের টাকা দেয়।

অতি ভয়ে ভয়ে ১৬ ও ১৭ই মে গ্রামে কখনও নিজ ঘরে, কখনও অন্য বাড়ীতে গোপনে কাটাই। ১৮ই মে মঙ্গলবার আমার জীবনের কালো দিন। ঐ দিন স্থানীয় গুণ্ডারা, চেয়ারম্যান ও অন্যান্য দলীয় নেতাসহ পাঞ্জাবীরা ছনহরা, চাটরা, ধাউরডেঙ্গা মঠপাড়া ও গুয়াতলি গ্রাম আক্রমণ করে। ছনহরা গ্রামে প্রথমে ঢুকে বাড়ীঘর জ্বালায় এবং পলায়নরত তিন জনকে গুলি করে হত্যা করে ও কয়েকজনকে আহত করে।

আমি নিজ নিরাপত্তার জন্য একটা চামড়ার ব্যাগে নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু জামাকাপড় ও শ' তিনেক টাকা নিয়ে গ্রামের পূর্ব দিকে খালের নিকট ঝোপের কাছে আশ্রয় নিই। বাড়ীর স্ত্রী, পুত্র, ছেলে, মেয়ে যে যেদিকে পেরেছে ছিটকিয়ে পড়ে।

এমতাবস্থায় সকাল আটটায় স্থানীয় ৫/৬ জন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক আমাকে আক্রমণ করে। আমার সঙ্গে যা ছিল টাকাপয়সা, জামা, কাপড়, ঘড়ি, কলম ইত্যাদি কেড়ে নিয়ে যায়। আমাকে হত্যা করার জন্য গ্রামের দক্ষিণ দিকে রাস্তার পার্শ্বে বসিয়ে রাখে। এরা সব আমার পার্শ্ববর্তী জালিয়া পাড়া ও সর্দার পাড়ার লোক, আমাকে হত্যা করবে এই খবর পেয়ে জালিয়া পাড়ার কতিপয় বৃদ্ধ নরনারী দৌড়ে এসে আমাকে এদের কবল

থেকে রক্ষা করে। আমি মুক্তি পেয়ে আবার পূর্বোক্ত স্থানে আশ্রয় নিই। ঐ খালের ধারে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় ২০০ শত নরনারী শস্য খেতে, ঝোপের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিল। প্রায় ১টার সময় দেখি ছনহরা গ্রাম জ্বালিয়ে পাঞ্জাবীরা আমাদের গ্রামে ঢুকে ঘরবাড়ী পোড়ায়, জিনিসপত্র লুট করে। ৪ জন পাঞ্জাবী আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে এসে বিভিন্ন স্থানে লুকায়িতদের তুলে নিয়ে পুকুর পাড়ে জমা করায়। এবার ধারণা হল হয়তো আমাদেরকে এক জায়গায় এনে গুলি করে মারবে, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের বসিয়ে রেখে তারা খালের কূলে কূলে দক্ষিণ দিকে চলে যায় এবং খালের ভিতর লুকায়িত কয়েকজনকে ছেড়ে দেয় এবং তিনজনকে তুলে নিয়ে সদর রাস্তায় গুলি করে মারে। এদের নাম সারদাচরণ দে, বয়স ৬০, যোগেন্দ্রলাল মল্লিক, বয়স ৬০ ও গৌরাঙ্গ মল্লিক, বয়স ৩০/৩৫। পাঞ্জাবীদের সঙ্গে সবসময় স্থানীয় গুণ্ডারা ছিল। তারা পার্শ্ববর্তী ধাউরডাঙ্গা গ্রামের হিন্দুদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দিয়ে সেখানেও ২/৩ জনকে হত্যা করে বেলা ২টার সময় পটিয়া ফিরে আসে। মুক্তি পেয়ে বিকালে বাড়ী ফিরে দেখি বাড়ীতে পোড়া ভিটা খাঁ খাঁ করছে। সেই রাত্রিতে গ্রামের অন্য এক বাড়ীতে (যে বাড়ীটিই শুধু পোড়া যায়নি) রাত্রি কাটাই। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা যারা দিনেরবেলায় এদিক-ওদিক ছিল, রাত্রে এক জায়গায় ওই বাড়ীতে আশ্রয় নিই। অবশ্য এটাও সত্য, কিছু কিছু স্থানীয় মুসলমান আমাদের নিরাপত্তার জন্য এগিয়ে এসেছিল, তাই বেঁচেছি। এতে প্রমাণ হয় দুনিয়ার সব মানুষ পশু নয়, প্রকৃত মানুষও আছে, নচেৎ ভগবানের সৃষ্টি বিফল হত।

শ্রী নীরদবরণ চৌধুরী

প্রধান শিক্ষক, আজগর আলি উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রাম-পশ্চিম শাকপুরা
থানা-বোয়াখালি
জেলা-চট্টগ্রাম

আমি একজন স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। বিগত ২০শে এপ্রিল ১৯৭১ আমাদের গ্রামে পাক-বাহিনী তাদের স্থানীয় দালালদের সহযোগিতায় অগ্নিসংযোগ, নারীধর্ষণ, লুটতরাজ, গুলিবর্ষণ আরম্ভ করে। ইহাতে আমাদের গ্রামে ৫৪ জন লোক মারা যায়। সেদিন সকালে আমি কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী লইয়া বসিয়া দেশের এই পরিস্থিতি লইয়া আলাপ আলোচনা করিতেছিলাম। এমন সময় কয়েকজন লোক আসিয়া আমাকে

বলিল যে বড়ুয়া পাড়ায় পাকসৈন্য আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিয়াছে এবং গুলি করিয়া লোক হত্যা আরম্ভ করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া আমি আমার পাড়ার ছেলে মেয়েকে উপদেশ দিলাম যে তোমরা কৃষক সাজিয়া মাঠে নামিয়া পড়ো। এইভাবে আমার গ্রামের ছেলেমেয়েরা অন্য গ্রামে যাইতে পারিল। ইতিমধ্যে আমাদের গ্রামের দালালরা পাক-বাহিনীকে লইয়া অত্র গ্রামে চলিয়া আসে এবং সমস্ত ঘরবাড়ী অগ্নিসংযোগ করিয়া ভস্মীভূত করিয়া দেয়। আমাদের গ্রামের অধিকাংশ লোক বনে-জঙ্গলে পালাইয়া ছিল। কিন্তু দালালরা আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া ৫৪ জন লোককে হত্যা করে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় চট্টগ্রাম শহর থেকে বহুলোক আসিয়া আমাদের গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়ে আশ্রয় লইয়াছিল। সেই নিরাশ্রয় নাম না জানা হতভাগ্য নিহতদের উক্ত সংখ্যার মধ্যে ধরা হয় নাই।

আমি তখন আমাদের বাড়ীর সম্মুখে পূর্বদিকে পুকুরপাড়ে দাঁড়াইয়া আশ্রয়প্রাপ্ত ছেলেদের উপদেশ দিতেছিলাম। দালালের ছেলেরা আমাদের লক্ষ্য করিয়াছিল যে আমরা কোথায় লুকাইতেছিলাম। আমরা যেখানে লুকাইয়াছিলাম সেই জঙ্গলের পশ্চিম দিক হইতে আমাদের ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। হঠাৎ মনে হইল সকলে একসঙ্গে এক জায়গায় লুকানো ঠিক হইবে না। তখন আমার কথা মতো যে যেখানে পারিল লুকাইয়া পড়িল। আমি আমার ভাই চিত্ত আচার্য উত্তর দিকে গিয়া ছোট্ট একটি জঙ্গলে আশ্রয় লইলাম। তখন চারিদিকে ভীষণ অগ্নিসংযোগ ও গুলিবর্ষণ করিতেছিল। তখন আমি আমার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারি নাই। পাক-বাহিনী অগ্নিসংযোগ করার পূর্বে আমাদের বাড়ী লুণ্ঠন করে। পাক-বাহিনী যখন আমাদের গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল তখন আমরা আবার গ্রামের দিকে চলিয়া আসিলাম। এমন সময় একজন পাক দালাল আসিয়া আবার প্রচার করিল যে পাক-বাহিনী আবার এই গ্রামে আসিতেছে। এই কথা শুনিয়া আমরা আবার পালাইতে আরম্ভ করিলাম। এমন সময় দালালের লোকেরা আমাদের বাড়ীর পোড়া টিনগুলি লইয়া গেল। তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে পাক-বাহিনীর কথা বলিয়া আমাদের ধোঁকা দিতেছিল। এই ঘটনার ঠিক চারদিন পর আবার পাক-বাহিনী আসিতেছে এই কথা শুনিয়া আমি এবং ভাই চিত্ত আচার্য আমার এক মুসলিম ছাত্রের অভিভাবকের বাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। কিন্তু অল্পক্ষণেই বুঝিতে পারিলাম যে এখানে নিরাপদ নয়। ওখান হইতে আবার বাড়ীর দিকে চলিয়া আসিলাম এবং পরবর্তী কী কার্যক্রম হইবে তাহা চিন্তা করিতে লাগিলাম।

২০শে এপ্রিল রাত্রি বারোটা। এমন সময় আমাকে একজন কৃষক লোক আসিয়া খবর দিল আমাদের এখানে থাকা নিরাপদ নয়। সেই কৃষক লোককে লইয়া আমরা রাত্রি একটার সময় বাহির হইলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে যখন রাত্রি শেষ হইয়া গেল তখন কৃষক লোকটি আমাদের চরখিজিরপুর গ্রামে এক খামারের মধ্যে রাখিয়া আসিল। ঐ খানে

থাকিয়া আবার শুনিতে পাইলাম আমাদের বাড়ী (২১শে এপ্রিল) আবার আক্রমণ করিয়াছে।

আমার ভাইয়েরা আশ্রয় লইয়া ছিল আধ মাইল দূরে অন্য একটি খামারে। আমাদের সংবাদ পাইয়া ২২শে এপ্রিল রাত্রি আটটার সময় আমাদিগকে সেই খামারে লইয়া যায়। সেই খামারের পাশেই কর্ণফুলী নদী। ঐ কর্ণফুলী নদীতে পাকফৌজ গানবোট লইয়া অনবরত পাহারা দিতেছিল। ঐ খামারে থাকা নিরাপদ নয় বলিয়া আমরা আবার বাঁশখালি থানার কালিপুর গ্রামে চলিয়া গেলাম। ঐ কালিপুর গ্রামে ৮/১০ দিন ছিলাম। কালিপুর গ্রামে পাক-বাহিনীর দালালদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম। সেখান হইতে আবার কানুনগো পাড়ায় আশ্রয় নিলাম এবং গোপনে বাড়ীর সবাইকে ওখানে লইয়া আসিলাম।

আমার এক ভাই ইঞ্জিনিয়ার। সে আমেরিকান ফার্মে চাকরী করিত। সেই ফার্মের আমেরিকান সাহেব আমাদেরকে তাহার গাড়ীতে করিয়া চট্টগ্রামের জোয়ালগঞ্জ পৌঁছাইয়া দেয়। আমরা ঐ খান দিয়া ভারত সীমান্ত পার হইয়া ত্রিপুরা শরণার্থী শিবিরে গিয়া পৌঁছাই।

সন্তোষ কুমার

গ্রাম-পশ্চিম শাকপুরা

থানা-বোয়ালখালি

জেলা-চট্টগ্রাম

সেদিন ছিল ২০শে এপ্রিল। আমাদের পশ্চিম শাকপুরা গ্রামের উপর চলল পাকসেনার রক্ত নিয়ে হোলিখেলা আর নারী নির্যাতন ও অগ্নিসংযোগ। কী বীভৎস ঘটনা। আজ সেদিনের কথা মনে পড়লে আর মুক্ত বাংলার পবিত্র মাটিতে পাক-সহযোগীদের এবং দালালদের বিনা বিচারে বিনা সাজায় আমাদের গ্রামের উপর দিয়ে যাতায়াত করতে দেখলে আমাদের গা ছম ছম করে ওঠে। যারা আমাদের গ্রামে হত্যা করেছিল, বাড়ী পুড়িয়েছিল, সম্পদ লুণ্ঠন করেছিল, নিরপরাধ গ্রামবাসীর গলায় ছুরি চালিয়েছিল তারাই আবার বাংলার পবিত্র মাটিতে বাস করছে।

২০শে এপ্রিল সূর্য ওঠার আগে অন্যান্য দিনের মতো কয়েকজনকে পাহারায় দিয়ে আমরা একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ সবাই হৈ চৈ করে পালাতে লাগল। শুনতে পারলাম পাঞ্জাবীরা আসছে। তখনই তাড়াতাড়ি যে যেদিকে পারি পালাতে লাগলাম। স্থানীয় মুসলমানদের বাড়ী গেলে তারাও তাদের বাড়ী হতে নামিয়ে দিল। আমরা তখন অন্য দিকে সরে পড়লাম। পাকসেনারা তখন চারিদিক দিয়ে আমাদের গ্রাম ঘিরে ফেলল।

তারপর সারাদিন চলল আমাদের গ্রামের উপর অত্যাচার। প্রতি বাড়ীতে বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিতে লাগল আর সোনা, রূপা, রেডিও মূল্যবান জিনিস হস্তগত করতে লাগল এবং চলল অকথ্য নির্যাতন, ধর্ষণ, হত্যা, লুণ্ঠন-সবকিছু। গ্রামের যুবক, বৃদ্ধ যাকে পেল তাকে করল হত্যা, স্ত্রীর সামনে স্বামীকে হত্যা করল, মায়ের সামনে ছেলেকে হত্যা করল। আর করল অগ্নিসংযোগ। চারদিকে শুধু গুলির আওয়াজ আর গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে পাকসেনাদের পৈশাচিক হাসি। সারাদিন পর বিকাল সাড়ে চারটার দিকে তারা গ্রাম ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। আমরা যারা দৌড়ে পলায়ন করেছিলাম তারা আসলাম গ্রামে, দেখলাম প্রায় বাড়ীতে আগুনে ভস্মীভূত দালান, ঘরের টিনগুলো পড়ে গেছে। কয়েকজন সবেমাত্র গুপ্তস্থান হতে বের হয়ে আসল, কারও মুখে কোনো কথা নেই। পথ দিয়ে ঘুরতে লাগলাম। দেখলাম গুলি খেয়ে রাস্তার আশেপাশে, বাড়ীর প্রাঙ্গণে নর্দমায় পড়ে আছে মৃতদেহ। কী এক হত্যাযজ্ঞ! সবাই আমার আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামবাসী। হায় এদের কী দোষ! কোনোদিন দেখিনি এভাবে হত্যা। দেখলাম বাপ ছেলে একসঙ্গে এক বুকে গুলি খেয়ে ঘুমিয়ে আছে।

দেখলাম কারও চোখে জল নেই, আজ সবাই পাথর হয়ে গেছে। আরো দেখলাম স্ত্রী চেয়ে রয়েছে স্বামীর দিকে, মা তাকিয়ে আছে মৃত সন্তানের দিকে। স্বামী তার স্ত্রীকে ডেকে বলার সময় পায়নি, মা সন্তানকে জাগিয়ে দেবার সময় পায়নি, বোন ভাইকে ডাক দেবার সময় পায়নি। কী পাশবিক হত্যা, নির্যাতন ও অমানুষিক অত্যাচার। আমার ভাষা নেই, আমি লেখক নই, প্রকৃত ঘটনার কিছু মাত্র লেখার চেষ্টা করছি। আর এ ঘটনাকে ভাষায় রূপ দেওয়া ভার আপনাদের।

তারপর গ্রামের কয়েকজন মৃতদেহের কিছু কিছু সৎকার করার নিষ্ফল চেষ্টা করতে লাগলাম মাত্র। গ্রামে প্রায় ১৫০ জন লোক মারা গেল। যেই আমরা গর্ত খুঁড়তে লাগলাম আর অমনি প্রতিবেশী গুণ্ডারা লুট করার জন্য এগিয়ে আসতে লাগল আর বলতে লাগল পাকসৈন্য আবার আসছে। পুনরায় আমরা গ্রাম হতে বের হয়ে পড়লাম। এরই মধ্যে আমরা কোনো-রকমে এক গর্তের ভিতরে ১০/১২ জনকে মাটিচাপা দিলাম। আর সেই মুহূর্তে আমার মনে পড়ল হাতিয়ার ঘূর্ণিঝড়ে উপদ্রুত এলাকার কথা। সেখানে আমরা ওদের কাফনের কাপড় দিয়ে দাফন করেছিলাম কিন্তু আজ আমাদের গ্রামে এদের হিন্দু ধর্মের রীতি অনুসারে কাপড় দেওয়া দূরে থাকুক আগুন পর্যন্ত দিতে পারছি না।

পাকসেনাদের এই অত্যাচারের পরও আমরা কোনোরকমে যে দু'একটা বাড়ী ছিল সবাই তার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে লাগলাম। এভাবে এগুতে লাগলাম। সেই ৪ঠা এপ্রিলের পর থেকে দিনে পাকসেনা আর রাতে মুসলিম লীগ গুণ্ডা ও প্রতিবেশীর তিন দিক থেকে আক্রমণ। রাত্রে চাল ডাল কোনো রকমে দু'একটা খেয়ে সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে ঝোপে বা পানিতে ডুবে থাকা, কোনোরকমে বাঁচার চেষ্টা, কিন্তু

দিনের পর দিন চলল লুট ও নারীধর্ষণ।

তারা ধর্মের নামে আমাদের গ্রামের মন্দির, প্রতিমা ইত্যাদি ধ্বংস করে দিল আর যাকে পেল তাকে মুসলমান হতে বাধ্য করল। মুসলমান হলে থাকতে পারবে নতুবা কেটে ফেলব। এভাবে কয়েকজনকে কেটেও ফেলল।

এরপর ২৩শে এপ্রিল আমাদের পশ্চিম গ্রামে আবার শুরু হল রক্তের খেলা, আর অবশিষ্ট বাড়ীগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিল। পাকিস্তান কায়েম রাখার জন্য। ২৩ শে এপ্রিল পশ্চিম শাকপুরা গ্রামটা সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়েছে। সবাই মিলে সেদিন ভারতের দিকে রওনা হলাম।

শ্রী বিমলকান্তি গুহ

গ্রাম-নাপোড়া
থানা-বাঁশখালি
জেলা-চট্টগ্রাম

৯ই অক্টোবর পাক-হানাদার বাহিনী দ্বিতীয়বার বাঁশখালিতে আসে এবং গুনাগরীতে একটি আস্তানা করে। ঐ দিন তারা লোকজনের উপর কোনপ্রকার অত্যাচার করে নাই। কিন্তু আমাদের নাপোড়া গ্রামের লোকেরা পাঞ্জাবী আসার খবর পেয়ে স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়স্বজন সবাইকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে চলে যাই এবং সন্ধ্যার পূর্বে বাড়ীতে চলে আসি।

১০ই অক্টোবর তারিখে ভোর পাঁচটার সময় পাক-বাহিনী আমাদের গ্রামের পূর্ব পার্শ্বে জঙ্গলের দিক হতে আক্রমণ করে। আমাদের গ্রামের লোকেরা আর জঙ্গলের দিকে পালাতে পারে নাই। নিরীহ নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। আমি যখন আমার পরিবার-পরিজন নিয়ে জঙ্গলের দিকে পালাচ্ছিলাম তখন একটা গুলি আমার হাতের ব্যাগের মধ্যে পড়ে এবং ব্যাগটা ছিঁড়ে হাত হতে পড়ে যায়। আমার সামনে একজন মহিলা দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ গুলিবিদ্ধ হয়, কিছু দূর গিয়ে দেখি আরও তিনজন গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছে। স্ত্রী পুত্র আত্মীয়স্বজন কে কোথায় জানি না, দূর পাহাড়ে চলে যাই। গ্রাম তখন জ্বলছে, লুটপাট চলছে, ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাহাড় থেকে দেখা যাচ্ছে। আমার মতোই অনেকেই পাহাড়ের মধ্যে ঘেরাফেরা করছে। সকলের মুখে হতাশার ছবি। সবাই বলাবলি করছে, মা, বাপ, ভাই সবাই মারা গেল, অবশিষ্ট কেউ নাই, খাওয়া দাওয়া নাই, অনেক লোক একত্রিত হয়েছে। গ্রামের খবরাখবর নেওয়ার চেষ্টা করছি। কেউ কেউ তাদের ছেলে মেয়ে স্ত্রীকে জঙ্গলে খোঁজ করছে, আমিও আমার স্ত্রী, একজন

ছেলে ও এক বৎসরের ভাগিনীকে খোঁজ করতে লাগলাম। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেলো না! অনেকে সান্তনা দিচ্ছে পাহাড়ে কোনখানে আছে, তিন দিন খোঁজাখুঁজির পর রেজাকাঠা নামক স্থানে তাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। দু'দিন ধরে তারা কিছু খায় নাই। তাদেরকে দেখে আমার ভীষণ কান্না এসে পড়লো, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আমি বেঁচে আছি দেখে আনন্দে কেঁদে উঠলো মন, আমার ছেলেটিও কাঁদতে লাগলো। তারপর আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে গ্রামে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছি। গ্রামে এসে দেখি বেশ কিছু লোক আছে। বর্বর পাক-বাহিনীর হাতে মারা গেছে আমার বাড়ীর পাশের পাঁচ জন লোক। কে কোথায় কীভাবে মারা গেছে তা কেউ ঠিক করে বলতে পারছে না।

যেদিন আমরা নাপোড়া বাড়ীতে আসলাম, সেদিন কয়েকজন পাঞ্জাবী সেনাবাহিনী দক্ষিণ হতে জনাব একরাম মিয়া, তার ভাই দানু মিয়া ও মোক্তার আহমদকে ধরে নিয়ে নাপোড়া বাজারে রেখে গ্রামের ভিতর ঢুকলো। আমি তখন বাইরে ছিলাম। দূর থেকে বর্বর হানাদারদের দেখেছিলাম। আমার স্ত্রীও বাইরে ছিল, তাকে ইশারা করে আমি নাপোড়া বাড়ীর পাশ দিয়ে চলে গেলাম। আমার স্ত্রী অন্য দিক দিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেলো। পর মুহূর্তেই আমার বাড়ীতে দুর্বৃত্তরা ঢুকে পড়ে অন্যান্য যারা ছিল তাদের উপর ভীষণ মারধোর করে। আমার ভাগিনী বাসন্তীরাণীর কাছে লুকায়িত বিষ ছিল। তার সতীত্ব রক্ষার জন্য কোন উপাই না দেখে সে বিষ পান করলো। দু-এক ঘণ্টার মধ্যে সে প্রাণ ত্যাগ করে। সে দ্বিতীয় বিভাগে মেট্রিক পাশ করেছিল। রাত্রিতে এসে আমার ভাগিনীকে মৃত অবস্থায় দেখে চোখের জল রাখতে পারলাম না। রাত্রিতে গ্রামের দুই একজন লোককে ডেকে বাসন্তীরাণীকে কবর দেই।

এই ছিল আমাদের গ্রামের কাহিনী।

জগবন্ধু পাল

গ্রাম-লতিফপুর
থানা-লক্ষীপুর
জেলা-নোয়াখালি

রাজাকাররা যখন পাক-বাহিনীর সাথে বিশেষভাবে সহযোগিতা করতে থাকলো তখন এই গ্রামের নিরীহ জনসাধারণের উপর রাত্রিতে জোর তল্লাসী আরম্ভ করে। লতিফপুর গ্রামটি চন্দ্রগঞ্জ বাজারের অতি নিকটবর্তী। পাক দস্যুরা ও রাজাকাররা চন্দ্রগঞ্জ হাইস্কুলের সম্মুখে শিবির করেছিল। রাজাকার ও পাক হানাদাররা গ্রামের দিকে আসা

মাত্রই আমরা ঘরবাড়ী ছেড়ে অন্যত্র পলায়ন করি। এইভাবে আমাদের মধ্যে সর্বসময় সন্ত্রাসের সৃষ্টি করত। ভাদ্র মাসের মাঝামাঝিতে বেশ কয়েকজন রাজাকার রাত্রিতে আমার বাড়ী আসে এবং আমার বাড়ী ঘিরে ফেলে। বাড়ী ঘেরাও করে ঘর হতে আমাকে জোর করে বার করে এবং বন্দুকের বাঁট দ্বারা বেদম প্রহার করে। রাজাকার আমাকে প্রশ্ন করে মুক্তিবাহিনীকে কয় হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিস? মুক্তিবাহিনীদেরকে সাহায্যের কথা অস্বীকার করলে বা মুক্তিবাহিনী কারা তাও অস্বীকার করলে পা দ্বারা বুকে জোরে লাথি মারে। নরপশুরা তাছাড়া যাবার সময় আমার একটা চোখ নষ্ট করে দিয়ে যায়। আমার কাছ হতে বহু টাকাপয়সাও জোর করে কেড়ে নেয়। বর্তমানে আমার চোখ অচল। একেবারে কিছু দেখতে পাই না। তাছাড়া বেদম প্রহারের ফলে আমার একটা হাতও ভেঙ্গে যায়। বর্তমানে পৃথিবীতে থাকা না থাকা একই কথা।

মুক্তিবাহিনী পাক-বাহিনী ও রাজাকারদেরকে সব সময় নাজেহাল করত। ফলে পাক-বাহিনী ও রাজাকার অতিষ্ঠ হয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামে লতিফপুরের নিরীহ বহু জনসাধারণকে ধরে কঠোরভাবে দৈহিক নির্যাতন চালায়। পাক-বাহিনী ও রাজাকাররা আমার বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়। বর্তমানে আমি সর্বহারা।

এডভোকেট সুরেন্দ্র চৌধুরী

জিন্দাবাজার, সিলেট

২৬ শে মার্চ ভোরবেলা হইতেই পাক বর্বর হায়েনার দল সিলেট শহরে কার্ফিউ জারি করে। মাঝে মাঝে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় কাজকর্মের জন্য সময় দিত। কিন্তু ৪ঠা এপ্রিল রোজ রবিবার হইতে কার্ফিউকে আরো জোরদার করা হয়। এই সময় তাহারা এমনও করিত যে অনবরত তিন দিন পর্যন্ত কার্ফিউ জারি করিয়া রাখিত।

৪ঠা এপ্রিলে তৎকালীন ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সিলেট শাখার কর্মরত পুলিশের সহিত আমার আলাপ হয়। তাহাদের মনে পূর্ব হইতেই এই সন্দেহ জাগিয়াছিল যে হায়েনার দল ব্যাঙ্ক লুট করিতে পারে এবং তাহাদেরকে হত্যা করিতে পারে। তাই তাহারা আমাকে বলে যে, যদি পাকবাহিনী আমাদের আক্রমণ করে তাহা হইলে আপনি আমাদেরকে আশ্রয় দিবেন। আমি তখন তাহাদের এই আশ্বাস দেই যে, তোমরা যদি বিপদে পড়িয়া আমার বাসায় যাও তাহা হইলে আমি তোমাদের আশ্রয় দিব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ দিন বেলা ১ ঘটিকার সময় উক্ত ব্যাঙ্ক প্রহরীদেরকে বদলি করিয়া অন্য জায়গায় পাঠায় এবং সেখানে অন্য একটি প্লাটুন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফিসটি আমার বাড়ী হইতে প্রায় একশত গজ দূরে। ঐ দিন বেলা

তিন ঘটিকার সময় পাক সৈন্য ভর্তি তিন খানা ট্রাক ও চার খানা জীপ ব্যাঙ্কের সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। তারপর ট্রাক হইতে প্রায় পঞ্চাশ জন পাক সৈন্য ব্যাঙ্কের চারিদিকে পজিশন নেয়। বাকী কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিয়া ব্যাঙ্কের উত্তর দিকে লোহার তার নষ্ট করিয়া ফেলে। পর মুহূর্তেই তাহারা ব্যাঙ্কের ভিতর প্রবেশ করে। উক্ত সময় প্রহরারত পুলিশগণ চীৎকার করিতে থাকে। তখন বর্বরবাহিনী প্রহরারত পুলিশদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের অস্ত্রগুলি নিজেদের হস্তগত করে। বিকাল চার ঘটিকার সময় তাহারা কার্ফিউ জারি করিয়া ব্যাঙ্ক হইতে প্রায় ৬-৭ বস্তা টাকা ট্রাকে উঠাইয়া লইয়া যায়। উক্ত দিনে আটচল্লিশ ঘণ্টা কার্ফিউ থাকায় জনগণ বাহির হইতে পারে নাই। তাই অনেকেই টাকা নেওয়া সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

সুরেশ দাস

এ্যাডভোকেট, সুনামগঞ্জ, সিলেট

সুরেশ দাস বর্তমানে সুনামগঞ্জে আইন ব্যবসা করছেন। তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী সুরেশ দাস ২৬শে মার্চ জগন্নাথ হলেই ছিলেন। প্রাণরক্ষার জন্য তিনি জগন্নাথ হলের উত্তর বাড়ির (শহীদ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ভবন) ছাদের উপর আশ্রয় নেন। তার সঙ্গে ছিল অনেক সতীর্থ। একমাত্র সুরেশ দাস ব্যতীত আর কেউই পাক-বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের হাত হতে রক্ষা পায়নি। সুরেশ দাস আশ্চর্যজনকভাবে মৃত্যুকে এড়িয়ে গেছেন মারাত্মকভাবে আহত হয়ে।

১৯৬৬, ইংরেজীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হই। ১৯৬৭-৬৮ সালে তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়ন জগন্নাথ হল শাখার সভাপতি নির্বাচিত হই। ১৯৬৮-৬৯ সালে আমি জগন্নাথ হল সংসদের ক্রীড়া সম্পাদক ছিলাম। গণঅভ্যুত্থানের পর ১৯৭০-এর নির্বাচনে ঐতিহাসিক মহান ১১-দফার পক্ষে যখন পূর্ব বাংলার জনগণ রায় দেয় তখন পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরের বেলায় টালবাহানা আরম্ভ করে। ১লা মার্চ তৎকালীন সামরিক জান্তা ইয়াহিয়া জাতীয় সংসদের অধিবেশন বাতিল ঘোষণা করলে পূর্ব বাংলায় গণজোয়ারের সৃষ্টি হয়। এ সময় হতেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধ করতে হবে এই উদ্দেশ্যে সামরিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়। আমরা সংগঠিতভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে প্রশিক্ষণ শুরু করি। পরবর্তীকালে আপোস মীমাংসা চালানো হয়, কিন্তু তা ব্যর্থ হলে শুরু হয় বাঙালী নিধন। ২৩শে মার্চ ছিল প্রতিরোধ দিবস। ২৪শে মার্চ পল্টনে ছিল মাওলানা ভাসানীর জনসভা।

২৫শে মার্চ বিকালবেলা আমি গুলিস্তানে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যার সময় গুজব শোনা

যায় সামরিক আইন জারী হবে। বিভিন্ন স্থানে সামরিক বাহিনী হানা দেবে। সন্ধ্যার সময় পায়ে হেঁটে ঢাকা মেডিকেল কলেজের পিছনে 'পপুলার হোটেলে' খাওয়া-দাওয়া করে কলেজ হোস্টেলের ভিতর দিয়ে আসার সময় চতুর্থ পর্বের ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী ডঃ কামালের সঙ্গে সাক্ষাৎ। তিনি আমাকে জগন্নাথ হলে যেতে নিষেধ করলেন। আমি নিজে কল্পনাও করিনি এমন কোন ঘটনা ঘটতে পারে। তাই আমি তাড়াতাড়ি জগন্নাথ হলে গেলাম। তখন আনুমানিক রাত দশটা। শহরে নানা স্থানে ব্যারিকেড ছিল এবং থমথমে ভাব ছিল। জগন্নাথ হলের গেটের সামনে মৃণাল বোস, জীবন সরকার, সত্যরঞ্জন দাস, অমর দাস, উপেন্দ্র রায় (অনেকের নাম মনে নেই) এবং দারোয়ান দুখীরাম দাঁড়ানো। তারা সবাই উৎসুক হয়ে কি ঘটতে যাচ্ছে জানার জন্য আমাকে প্রশ্ন করতে থাকে। আমি সবাইকে নির্ভয়ে হলের ভিতর যাওয়ার জন্য বললাম। ভিতরে কিছু আলাপ-আলোচনা করে আমরা স্ব-স্ব রুমে গিয়ে শুয়ে থাকি। আমি উত্তর বাড়ির উত্তর দিকে দ্বিতীয় তলায় ১৫২নং রুমে থাকতাম। আমার সঙ্গে ছিল নরসিংদির শিবপুরের সত্যরঞ্জন দাস। আমরা উৎকণ্ঠা ও মানসিক ক্লান্তিতে থাকায় আনুমানিক রাত ১১-৩০ মি. শুয়ে পড়ি। ভৌতিক শব্দ শুনে হঠাৎ ঘুম হতে জেগে উঠি। তখন আনুমানিক রাত্রি ১২-৩০ মিঃ। লক্ষ্য করলাম উত্তরের জানালার কাঁচগুলো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে রুমের ভিতরে অনবরত পড়ছে। ফলে আমরা উভয়ে নিজ নিজ খাটের নিচে শুয়ে পড়ি। কিন্তু শব্দের তীব্রতা না কমায় উভয়ে ছাদের উপর আশ্রয় নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আমরা হামাগুড়ি দিয়ে ছাদের উপর উঠি। ছাদে গিয়ে আরো আটজন ছাত্রকে পাই। তাদের মধ্যে মৃণাল বোস, জীবন সরকার, রবীন সাহা, উপেন্দ্র রায় (অন্যদের নাম মনে নেই) ছিল। আমরা সকলে মিলে জলের ট্যাঙ্কের নীচে শুয়ে পড়ি। কিন্তু চতুর্দিকে নিদারুণ হাহাকার ও গুলির শব্দে আমরা ছিলাম সন্ত্রস্ত। হলের মধ্যে কমপক্ষে দুশো পাক-সৈন্য এবং একটি ট্যাঙ্ক ছিল। হানাদার বাহিনী হলের শহীদ মিনারটিও সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে। ছাদের উপর আমরা আছি কিনা তা জানার জন্য আলোর বুলেট ছুঁড়ত হলের চতুর্দিক দিয়ে হানাদার বাহিনী। রাত আনুমানিক ৪-৩০ মিঃ। হলের গেট ভাঙ্গার শব্দ শুনি। গেটের পাশের রুমে দারোয়ান দুখীরামকে পাক-সৈন্য গুলি করে হত্যা করে। হানাদার বাহিনী হলের নিচতলার রুমে আক্রমণ করেও অনেক ছাত্রকে হত্যা করে। এদের মধ্যে চট্টগ্রামের বাদল এবং হরিধন দাস হলের পুকুরের জলের নিচে কচুরিপানা মাথায় দিয়ে প্রাণ বাঁচায়। হানাদার বাহিনী প্রত্যেক রুমে আগুন দেয়। ২৭শে মার্চ বাথরুমে শিশুতোষ দত্ত চৌধুরী ও তাহার বন্ধু মোস্তাকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। তাদের শরীর ছিল ক্ষতবিক্ষত। অনুমান করা যায় তাদের বেয়োনেট দিয়ে মারা হয়েছিল। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর হলে ছাত্র কম ছিল। দ্বিতীয় তলায়ও কোন ছাত্র না পেয়ে রুমে রুমে আগুন ধরিয়ে দেয়। ভোর আনুমানিক ৬-৩০ মিনিটে সাত জন হানাদার সৈন্য ছাদের উপরে ওঠে। রাইফেল

উঁচিয়ে আমাদেরকে দাঁড়ানোর জন্য বলে। আমরা দশ জন হাত তুলে দাঁড়াই। তখন পাক-সৈন্যরা আমাদের শরীর তল্লাসী করে। প্রথমে দশজন হতে তিনজনকে একটু দূরে নিয়ে ফল ইন করায়, অর্থাৎ একজনের পিছনে আর একজনকে দাঁড় করায়। এ সময় একজন সৈন্য রাইফেল দিয়ে গুলি করে এবং এতে সবাই মারা যায়। এ লাইনে চট্টগ্রামের রবিন ও অমর (আর একজনের নাম মনে নেই) ছিল। তারপর অপরাপর সাতজন হতে তিনজন নিয়ে অনুরূপভাবে গুলি করে। এ লাইনে নেত্রকোনার জীবন সরকার (অন্য দু'জনের নাম মনে নাই) ছিল। বাকি চারজনের মধ্যে উপেন্দ্রচন্দ্র রায় ছাদ হতে লাফ দিয়ে ডাইনিং হলের দিকে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে তাকে হত্যা করা হয়। মৃত অবস্থায় সে মাটিতে পড়ে। বাকী ছিলাম আমরা তিনজন। আমি, মৃণাল বোস (মুকুল বোসের বড় ভাই) এবং সত্যরঞ্জন দাস। আমাদের তিনজনকে হত্যা করার পূর্বে পাক-সেনারা ''বাংলাদেশ খালি কর দেগা'' ''বাংলাদেশ শহীদ মিনার পিয়ার করতা হায়'', ''ঘরমে ঘরমে শহীদ মিনার লাগাতা হায়'' ইত্যাকার মন্তব্য করতে থাকে। আমাদেরকে লাইন করে দাঁড় করানোর সময় সর্বপ্রথমে ছিলাম আমি, পরে সত্যরঞ্জন এবং শেষে মৃণাল বোস। গুলি করার পূর্ব মুহূর্তে মৃণাল বোস লাইনে থেকে সরে দাঁড়ালে তাকে রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করে সামনে নেয় এবং আমার পিছনে থাকা সত্যরঞ্জনও আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। অর্থাৎ মৃণাল বোস প্রথম, দ্বিতীয় সত্যরঞ্জন এবং সবশেষে আমি। সত্য ও মৃণাল উভয়েই আমার চেয়ে একটু লম্বা ছিল। এমন সময় একজন পাকসেনা আমাদেরকে গুলি করে। শুধু রক্তিম আভা বুঝলাম, এরপর কিছুই বলতে পারি না। অনুমান মিনিট দুই পর আমার জ্ঞান ফিরে আসে। চেয়ে দেখি হানাদার বাহিনীর লোকজন ছাদের উপর জলের ট্যাঙ্কের ভিতর কিছু আছে কিনা তা অনুসন্ধান করছে। আমার বুক তখন রক্তাক্ত এবং ডান হাত অবশ, চিৎ হয়ে পড়ে আছি ছাদে। সঙ্গে সঙ্গে মরার ভান করে পড়ে থাকি। সকাল ৭-৩০ মিঃ হানাদার বাহিনী ছাদ হতে নিচে নেমে আসে এবং বলে ''সব শালা খতম হো গিয়া''। এ সময় তারা একটা গুলি করে যা ছাদের উপর পড়লে ইট-সুরকি আমার পায়ের পাতায় ঢুকে যায়। পাক-বাহিনী ছাদের উপর হতে নেমে গেলে সবাইকে মৃত অবস্থায় দেখি। ছাদের উপর নয় জনের মধ্যে একমাত্র আমিই ছিলাম অর্ধমৃত। প্রাণে বাঁচার জন্য আমি হামাগুড়ি দিয়ে ছাদের দক্ষিণ দিকের সিঁড়ি দিয়ে নামার চেষ্টা চালাই। ঠিক এমন সময় দু'জন হানাদার বাহিনী আবার ছাদের উপর ওঠে। আমাকে আহত রক্তাক্ত এবং চলন্ত অবস্থায় দেখে 'ঠের' বলে আদেশ দেয়। আমি তখন নিশ্চিত মৃত্যু জেনে বাম হাতের উপর মাথা রেখে পিঠে আর একটি গুলির অপেক্ষা করছি। কিন্তু হানাদার বাহিনী ২৩শে মার্চের প্রতিরোধ দিবসের কালো এবং বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা দুটি পানির ট্যাংকের উপর হতে নামিয়ে মৃতদেহের রক্তের উপর ফেলে ছাদ হতে নেমে যায়। নামার সময় আমাকে পিঠের উপর

দু'টো লাথি মারে। পরে বহু কষ্টে আহত অবস্থায় আমি ছাদ হতে নেমে প্রথমেই হলের পশ্চিম দিকে ১৪৯নং রুমে প্রবেশ করি। কারণ ঐ রুমটাই ছিল অক্ষত। সম্পূর্ণ হল ধোঁয়ায় অন্ধকার। রুমে প্রবেশ করে আমার রক্তাক্ত লুঙ্গি এবং শার্ট খুলে পায়ের নীচে দেই। কারণ আগুনে সম্পূর্ণ হলটিই এমন গরম হয়ে গেছে যে, দাঁড়ানোর উপায় ছিল না। পশ্চিমের জানালা দিয়ে হঠাৎ দেখতে পাই আমাদের হলের কর্মচারীদের টিনশেডের ঘরে ফরিদপুরের কৃষ্ণগোবিন্দ সাহা হলের দিকে তাকিয়ে আছে। তার সাথে আমার চোখাচোখি হয়। ওই সময় আমার প্রবল ইচ্ছা হয় যে এই টিনশেডের ঘরে আশ্রয়প্রার্থী হই এবং ঘটনার কথা তাকে বলি। তাই জানালার পাশে শেডে দাঁড়িয়ে জল সরবরাহের পাইপটি বেয়ে নীচে নামি। এই সময় বাম হাতে খুব ব্যথা অনুভব করি। ডাইনিং হলের পাশ দিয়ে নালায় নেমে ঐ টিনশেডের ঘরের দরজায় ধাক্কা দেই। কিন্তু দরজা না খোলায় পাশের আর একটি টিনশেডের দরজায় ধাক্কা দেই। তখন হলের রেষ্টুরেন্টের মালিক সুধীরদার ছোট ভাই দরজা ফাঁক করে আমাকে দেখে দরজা খুলে দেয় এবং আমি দ্রুত ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ি। এ সময় বেলা আনুমানিক দশটা হবে। এরপর মেঝের উপর শুয়ে শুয়ে সারাদিন ও রাত কাটাই। পরের দিন অর্থাৎ ২৭শে মার্চ সকাল আনুমানিক সাড়ে সাত বা আটটার সময় মাইকে ঘোষণা দেয়া হয় "কারফু উঠ্ যায় গা"। এই ঘোষণার পর ঘর হতে বের হয়ে প্রথমেই ডঃ রঙ্গলাল সেনের বাসায় যাই। পুনরায় হলের দিকে ফিরে আসি। এমন সময় পরিমল গুহ আমাকে সাহায্য করে এবং হাসপাতালে ভর্তি হই। হাসপাতালে যাওয়ার পূর্বে আমি হলে ঢুকে আমার রুমে যাই। দেখি রুমটা ধ্বংস হয়ে গেছে। সিঁড়ি রক্তাক্ত এবং দারোয়ান দুখীরামকে তার কক্ষে বুলেটবিদ্ধ অবস্থায় মৃত দেখতে পাই। হলের মাঠে ডঃ জি. সি. দেব, ডঃ মনিরুজ্জামান, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মধুদা ও অন্যান্য ছাত্রদেরকে হানাদার বাহিনী গণকরব দেয়। হাউস টিউটর অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যকেও হত্যা করা হয়। হাসপাতালে যাওয়ার পর শেখর চন্দ (দক্ষিণ বাড়ীতে থাকত) এবং ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে আহত অবস্থায় দেখি। ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা হাসপাতালে মারা যান। হাসপাতালে ডাঃ রাব্বী এবং ডঃ মোশারফ সাহেব আমাকে দেখে 'ভাল হয়ে যাবেন' বলে উৎসাহ দেন। এ সময় আমার বন্ধু বকসী বাজারের জামাল আনোয়ার শান্তর বোন ডাঃ শিরিন যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। যখন হাসপাতাল আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা গেল, তখন আমাকে শান্তিনগরে আনোয়ারুল হক এ্যাডভোকেট সাহবের বাসায় যাওয়ার জন্য বর্তমান কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা অজয় দাশগুপ্ত ইঙ্গিত দিলে ছদ্মবেশে শান্তিনগর যাই। সেখানে আমার বন্ধু কামাল হায়দার, আব্দুল মোনায়েম সরকার এবং নির্মল বিশ্বাসকে পাই। ঐখানে কয়েকদিন থেকে আমি ও নির্মল বিশ্বাস মীরপুর, ধামরাই, কালিয়াকৈর হয়ে মির্জাপুর হাসপাতালে এসে চিকিৎসা গ্রহণ করি। সেখান থেকে শক্তিপদ ঘোষ, নির্মল বিশ্বাস ও আমি পাথরঘাটা, হাতিয়া,

নলুয়াগড়, মল্লিকবাড়ি, কাটাজোয়া হয়ে ভালুকা থানায় আসি এবং পরের দিন ভালুকা হতে ত্রিশাল ও ময়মনসিংহ হয়ে নেত্রকোনায় আসি। পরে সেখান হতে নিজ বাসস্থান সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা থানায় এসে পৌছি। পরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

তপন বর্ধন

সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ
মৌলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ
কাগমারী, টাঙ্গাইল

ইংরেজী সাহিত্যের তৎকালীন ছাত্র তপন বর্ধন গণহত্যার মর্মান্তিক বিবরণ দিয়েছেন। জগন্নাথ হলের গণহত্যার হাত হতে মুক্তি পেয়েও আশ্রয় জোটেনি তার শিক্ষকের বাসায়— এমনি দুর্ভাগ্য ছিল সেদিন তার।

অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলোতে আমি হলেই ছিলাম। সম্মান পরীক্ষার ছয় পেপার শেষ হল। পয়লা মার্চের ইয়াহিয়া খানের ভাষণে বাঙালীর লালিত স্বাধীনতা স্পৃহা অগ্ন্যুৎপাতের মতো বিস্ফোরিত হল। আমি নিজে ছাত্র রাজনীতিতে সামান্য জড়িত ছিলাম এবং আন্দোলনের সবকিছু প্রত্যক্ষ করার একটা প্রবল আকাঙক্ষা পোষণ করতাম। ২রা মার্চ স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন, ৬ই মার্চ টিক্কা খানের গভর্নর হিসাবে নিযুক্তি এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পর সকলের মনেই ধারণা হয় যে, দেশে একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে অধিকাংশ ছাত্ররা হল ছেড়ে চলে গেল। কেবল শুধুমাত্র কিছু অতি উৎসাহী এবং যারা প্রাইভেট ছাড়তে নারাজ এমন ছাত্র হলে থেকে গেল। বাণিজ্যের ছাত্র কুমিল্লার নীহার মজুমদারকে ৭ই মার্চ সকালে চলে যেতে দেখে বিস্মিত হয়ে অনুরোধ করলাম বঙ্গবুন্ধর ভাষণ শুনে যেতে। সে আমাকে টিক্কা খান সম্পর্কে জানালো যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সবচেয়ে নৃশংস এই জেনারেল বেলুচিস্তানে ঈদের জামাতের উপর বোম্বিং করেছে এবং সেদিন অনুষ্ঠিতব্য জনসভায়ও বোম্বিং করতে পারে। সে আমাকে হল ছেড়ে বাড়ি যেতে সুপারিশ করলো।

অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার পর আন্দোলনের কিছু গুণগত পরিবর্তন হয়। আন্দোলন এখন আর ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, শিক্ষক, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সকল স্তরের জনগণের মধ্যে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং তা ধীরে ধীরে জঙ্গীরূপ নিতে থাকে। খাওয়ার সময় ছাড়া খুব কম সময়ই আমি হলে অবস্থান করতাম। বিভিন্ন জনসভা ও মিছিলে অংশ নিতাম। মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক চলাকালীন

সময় আমি ২/১ দিনের জন্য বাড়ি যাই। সেখানে আমার গ্রামের যুবকরা আসন্ন মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আমার মা, বাবা, সবাই ঢাকা আসতে বারণ করেন, কিন্তু ঢাকায় কি ঘটছে আর ২৫শে মার্চ আসন্ন সংসদ অধিবেশনের দিন আরও কিছু ঘটতে যাচ্ছে এরূপ একটি কৌতূহল আমার মধ্যে প্রবল হতে থাকে। ঢাকায় ফিরে এসে জগন্নাথ হলকে অনেকটা ভূতুড়ে বলে মনে হলো। প্রায় সব ছাত্রই বাড়ি চলে গেছে। আনুমানিক ৪০/৫০ জন ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা ঐ প্রকাণ্ড হলটিতে অবস্থান করছে।

মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকে কোনরূপ অগ্রগতি না হলে উগ্র জাতীয়তাবাদী ছাত্ররা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের শ্লোগান দিয়ে জঙ্গী মিছিল বের করে। জগন্নাথ হলের মাঠে ছাত্রলীগের অতি-উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবকরা গেরিলা যুদ্ধের মহড়া দিতে শুরু করে। এ থেকেই হয়তো পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ধারণা জন্মে যে জগন্নাথ হলে অস্ত্রের বিরাট মজুত গড়ে উঠেছে। ২৩শে মার্চ পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে সর্বত্র বাংলাদেশের প্রস্তাবিত পতাকা উত্তোলন করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি সৈনিকরা পল্টন ময়দানে গেরিলা যুদ্ধের মহড়া দেয়। সেখানে ছাত্রলীগের এক প্লাটুন গেরিলাও অংশগ্রহণ করে ছাত্রলীগ নেতা চিশ্‌তী শাহ হেলালুর রহমান (২৫শে'র রাতে জহুরুল হক হলে শহীদ) এর নেতৃত্বে। আমিও সেই প্লাটুনের সদস্য ছিলাম। ওই রাতে ছাত্রলীগ নেতা স্বপন চৌধুরী (পরবর্তীতে গেরিলা যুদ্ধে শহীদ) তার বোনের অসুখের কথা বলে তার বাড়ী চট্টগ্রামে চলে গেল। পরে জানতে পারি চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের বিশেষ দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়েছিল।

২৫শে মার্চ সকাল থেকেই চাপা উত্তেজনা লক্ষ্য করি। হলের কিছু ছাত্র ওইদিনও বাড়ী চলে যায়। ওইদিন বিকালে বায়তুল মোকাররমে ছাত্রলীগের এক জঙ্গী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অবশ্য আসন্ন বিপদের কথা জনসাধারণকে জানানো হয়নি। রাতে শহরের লোকের মধ্যে বেশ গুঞ্জন-কিছু একটা হতে যাচ্ছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে জগন্নাথ হলের আবাসিক ছাত্র ও শিক্ষকরা ওই ব্যাপারে কিছুই জানতে পারেনি। ব্যাপারটা আমার কাছে এখনও রহস্যজনক বলে মনে হয়। রাত আটটার দিকে হলের ডাইনিং বন্ধ থাকায় 'হোটেল কাফেরাজে' খেতে যাই। সেখানে রেডিওতে জানতে পারি ইয়াহিয়া ও ভুট্টো ঢাকা ত্যাগ করেছে। হলে ফিরে ইংরেজী বিভাগের ছাত্র কার্তিক শীল ও পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র নিরঞ্জন হালদারের (উভয়েই নিহত) সাথে কিছুক্ষণ আলাপ করে নিজ কক্ষে (উত্তর বাড়ির ১১৯ নম্বরে) ক্লান্ত দেহখানা বিছানাতে এলিয়ে দিই। পূর্বদিকের জানালা খোলা ছিল। বসন্তের মৃদুমন্দ বাতাস ক্লান্ত দেহখানাকে শীঘ্রই গভীর নিদ্রায় অবশ করে দিল।

রাত আনুমানিক ১২টা বা ১২-৩০টা। পরিসংখ্যান বিভাগের ছাত্র দেবী নারায়ণ রুদ্র পাল (বর্তমানে জয়দেবপুরে ধান গবেষণায় নিয়োজিত) আমাকে ডাক দেয়। আমি অতি তাড়াতাড়ি ঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে আসি। ও আমাকে জানালো হল রেইড

হতে পারে। রেইড শব্দটি আমাদের কাছে বিশেষ ব্যঞ্জনায় পরিচিত। আয়ুবী-মোনেমী আমলে এন.এস.এফ এর পাণ্ডারা হকি ষ্টিক ও ছুরি নিয়ে মাঝে-মধ্যে হল রেইড করতো। রেইড মানে যে নির্বিচারে নিরপরাধ ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীকে অকুস্থলে হত্যা করা হবে তা আমরা দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করিনি। নিচে নেমে দেখি মৃণাল বোস, সুশীল, গণপতি, সুরেশ দাস আরও কয়েকজন দাঁড়িয়ে।

মৃণালদা আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠ। তিনি সদ্য এম.এ পাশ করে হলেই থাকতেন। তার সার্টিফিকেটগুলো আমার কাছেই ছিল। তিনি বললেন, সার্টিফিকেটগুলো নিয়ে পরের দিন বাড়ী ফিরে যাবেন। এরই মধ্যে চারদিক থেকে গোলাগুলির আওয়াজ আসতে লাগল। আমরা ইকবাল হল অভিমুখে রওয়ানা হলাম নেতৃবৃন্দের মুখ থেকে কিছু জানার জন্য। ততক্ষণেই ঐ হলে তীব্র আক্রমণ শুরু হয়েছে। এখন হলে (যেখানটায় স্মৃতিসৌধ ঐখানটায়) দাঁড়িয়ে আমরা প্রভোষ্টের বাসায় যাবার কথা বলাবলি করছি। এমনি সময় অতর্কিতে মাঠের পূর্বদিক থেকে ইউ.ও.টি.সি অফিসের কাছাকাছি এলাকা থেকে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হলের উপর আক্রমণ করা হল। বিকট আওয়াজে আমরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে প্রাণভয়ে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড় দিই। অধিকাংশ ছাত্র প্রধান ফটক দিয়ে হলের ভিতরে প্রবেশ করে। আমি ও সীতানাথ (হলের কর্মচারী) পুকুরের পার দিয়ে দৌড়ে সীতানাথের কোয়ার্টারে ঢুকি। একটু পরে এম. এড-এর ছাত্র বিকাশ এবং আরও পরে রত্নকেতন বড়ুয়া ঐ ঘরে আসে। এতক্ষণে হলের পশ্চিম পার্শ্বে গোলাগুলির শব্দ আরও নিকটে মনে হল। মনে হলো আমরা চারিদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে গেছি। বাঁচবার আর কোন পথ খোলা নেই। মুহূর্তে মা-বাবার কথা মনে পড়ল। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজনের চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠল। হলের পূর্ব দিক থেকে মাইক্রোফোনের ঘোষণা—"সারেণ্ডার, সারেণ্ডার, অর ইউ উইল ডাই"। ওদের ধারণা ছিল জগন্নাথ হল ও ইকবাল হল থেকে প্রতিরোধ হতে পারে। বোধ হয় তাই ওরা মর্টার ও মেশিনগান ব্যবহার করেছে নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর। পাক-সেনারা বিনা বাধায় ঢুকে যায় হলে। শুরু হলো ওদের তাণ্ডব। আমি ঘরে বন্দী থেকে ওদের তাণ্ডব প্রত্যক্ষ করিনি। তবে ওদের অট্টহাসি ও ছাত্রদের আর্ত চীৎকার সবকিছু আন্দাজ করছি। ওরা রুমে রুমে, বাথরুমে, কার্নিশে ছাত্রদের খুঁজতে থাকে। কোন ছাত্রকে পেয়ে গেলে ওরা পৈশাচিক আনন্দে চীৎকার করতো, 'ওস্তাদ, চিড়িয়া মিল গিয়া'। তার পরেই শুনতে পেতাম অসহায় বন্ধুর তীব্র চীৎকার। এভাবে চলতে থাকে ওদের নরমেধযজ্ঞ। পশ্চিমদিকের রাস্তায় ছাউনি ফেলে অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে ওরা সারারাত গুলি ছোড়ে। ক্রমে ভোরের আভাসে ভয়ার্ত পাখিকুলের কিচিরমিচির শব্দ কিছুটা অস্বাভাবিক লাগল। মসজিদ থেকে ভেসে এল আজানের ধ্বনি। মনে করলাম পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জেহাদে রত ওরা হয়তো বা নামাজের সময় কিছুক্ষণের জন্য ওদের তাণ্ডব বন্ধ রাখবে। কিন্তু ওদের

পৈশাচিকতার মাত্রা আরও বেড়ে গেল। আমাদের ঘরের দোরে বুটের আওয়াজ পেলাম। সীতানাথ, তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে আমাদের উপস্থিতিতে আরও অসহায় বোধ করল। ওদের ধারণা ছাত্রদের জায়গা দেয়াতে ওদেরও জীবন যেতে পারে। আমাদের মধ্যে কেউবা চৌকির নিচে ঢুকে পড়ল, কেউবা ভয়ে কাপড়ে পায়খানা পেচ্ছাব করে ফেললো। ঘরের জানালাগুলি ছিল পুরানো কাঁচের। পূর্বদিকে তাকিয়ে দেখি হলের ছাদে সেনাবাহিনীর লোক। তিনজন সৈনিক স্টেনগান তাক করে কয়েকজন ছাত্রকে দক্ষিণ দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ছাত্রদের মধ্যে মৃণাল বোসকে চিনতে পারি। সৈন্যরা চীৎকার করে আদেশ দিল, "জয় বাংলা বাতাও"। ছাত্ররা মাথার উপর হাত উঠিয়ে পেছন দিকে যাচ্ছিল। শুনতে পেলাম শুষ্ক কণ্ঠে ক্ষীণ উচ্চারণ "জয় বাংলা"। মুহূর্তে এক ঝাঁক গুলি ওদের বক্ষ বিদীর্ণ করে চলে গেল শূন্যে। ধীরে ধীরে ঢলে পড়ল প্রাণহীন দেহগুলি। দূর থেকে লক্ষ্য করলাম কারও কারও হাত-পা ছোড়াছুড়ি ও মৃত্যুযন্ত্রণাকাতর দেহগুলির গোঙানি। সৈন্যরা ওদের মৃত্যুযন্ত্রণা উপভোগ করছিল। তারপর ওদের পা ধরে ছুড়ে ফেলে দিল নিচে। এ দৃশ্য দেখে আমি জীবিত কি মৃত তা অনুভব করবার চেষ্টা করলাম। সকলের চোখেমুখে মৃত্যুর ভয়াতঙ্ক। আমরা পরস্পর ক্ষমা চাইলাম। এমনি পরিস্থিতিতে সীতানাথের স্ত্রী আমাদের চা বানিয়ে দিল। সীতানাথ এই বলে আমাদের চা দিল যে, বোধ করি এই আমাদের শেষ খাবার।

ধীরে ধীরে বেলা বাড়তে লাগল। গোলাগুলির শব্দ ক্রমশ কমে আসল। ঘরে বন্দী অবস্থায় আন্দাজ করলাম রেসকোর্স এলাকা থেকে বেশ বিরতিতে সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত গোলাগুলি করছিল। দু'জন অনাথ বালক, যারা হলের ছাত্রদের ফরমাশ শুনে জীবিকা নির্বাহ করতো তারা আনুমানিক বারোটার দিকে এসে আমাদের বলল— "বাবু, মিলিটারী হল থেকে চলে গেছে। আপনারা এখনই হল থেকে চলে যান। ওরা আমাদের বলেছিল ছাত্রদের খুঁজে দিতে। মৃণালবাবু, সুশীলবাবুদের মেরে ফেলেছে। হলের সামনে শত শত লাশ সারি করে শুইয়ে রেখেছে"। আমরা এক এক করে স্টাফ কোয়ার্টারের দিকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। আমি হামাগুড়ি দিয়ে বার হয়ে ডাইনিং হলের পাশ ঘেঁষে হলের গেট অব্দি গিয়ে দেখি অসংখ্য লাশ হলের সামনে স্তূপীকৃত করে রাখা হয়েছে। আমার সংজ্ঞা লোপ পেতে বসল। মুহূর্ত দেরী না করে দৌড় দিলাম। প্রতি মুহূর্তের আশঙ্কা এই বুঝি ধরা পড়লাম, গুলিবিদ্ধ হয়ে মাঠে শায়িতদের মতো বুঝি লাশে পরিণত হলাম। এক লাফে পাঁচ হাত উঁচু পাঁচিল পার হয়ে তৎকালীন শারীরিক শিক্ষা বিভাগের পরিচালক মতিউর রহমান সাহেবের বাসার ড্রয়িং রুমের সোফায় বসে পড়লাম। আমার পেছনেই এল রত্নকেতন বড়ুয়া। আমাদের বয়সী দু'জন ছেলে এসে আমাদের সহানুভূতি জানাল। শরীরচর্চা শিক্ষক এসে আমাদের তৎক্ষণাৎ চলে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি জানালেন যে, রাতে শিক্ষকদের আবাসিক এলাকা ঘেরাও করা হতে পারে এবং সেখানে

থাকা আমাদের মোটেই নিরাপদ নয়। আমরা জল খেয়ে উপর তলার সমাজবিজ্ঞানের জনৈক শিক্ষক সাহেবের বাসায় ঢুকে পড়লাম। তিনিও আমাদের অনুরূপ কথা বলে বিদায় দিলেন। প্রাণরক্ষার জন্য আশ্রয় খুঁজতে আবার দৌড় দিলাম। উদয়ন স্কুলের একটা খালি রুমে আশ্রয় নিলাম। এবার কেউ বাধা দিল না। সিদ্ধান্ত নিলাম সেখানেই রাত কাটাবার।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে পাকসেনাদের চলাচল আবার বৃদ্ধি পেল। ট্যাঙ্কের চলাচল অনুভব করলাম। জগন্নাথ হলের মাঠে বুলডোজার দিয়ে লাশ কবর দেয়ার কাজ তখন চলছিল। হলটিতে তখনও আগুন জ্বলছিল। এখান থেকে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় আগুনের লেলিহান শিখা আর কালো ধোঁয়া দেখে জাতির ওপর আরোপিত ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের আশঙ্কায় মুষড়ে পড়লাম।

চব্বিশ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে আমরা অভুক্ত। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সহপাঠী ও শিক্ষকদের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কথা ভাবতে থাকি। রাত গভীর হতেই আতঙ্ক আরও বেড়ে যায়। স্কুলসংলগ্ন মুদি দোকানদার নিজ হাতে মসুরী ডাল ও আলু সিদ্ধ তৈরী করে ভাত খাওয়ালো। সেদিনের খাওয়ার তৃপ্তি ছিল পরিপূর্ণ ও অভাবনীয়। ওখানেই অতি কম ভলিউমে রেডিওতে ইয়াহিয়া খানের ভাষণ শুনতে পেলাম। এখনো তার ধৃষ্টতাপূর্ণ ভাষা আর কর্কশ কণ্ঠ স্মরণে এলে বিরক্তি ধরায়। রত্নকেতন বড়ুয়া ও আমি যুক্তি করে সিদ্ধান্ত নেই যে আমরা পালাক্রমে ঘুমাব। বেঞ্চে উভয়েই শুয়ে পড়লাম। ধীরে ধীরে ওদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেল। মাঝে মাঝে ট্যাঙ্কের চলাচল, বিকট ও তীব্র শব্দ আমাদের আতঙ্ক ও ভীতি বৃদ্ধি করে। দু'জনের আলাপচারিতার মুখ্য উপাদান ছিল নিহত ও নিখোঁজ বন্ধুরা। রাত পোহালে আরেকটি দিন দেখার সৌভাগ্য হল।

সকালে ভারতীয় রেডিও'র খবরে জানতে পারি মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ায় প্রাণে যেন মুক্তির উন্মাদনা সৃষ্টি হল। কারফিউ তোলা হলে আমরা দু'জন ধীরে ধীরে আবার হলের দিকে এগিয়ে যাই। পথে ঘাড়ে গুলিবিদ্ধ সুরেশ দাসের কাছে জানতে পারি কোন কোন বন্ধুর মৃত্যুর খবর। হলে ঢুকেই দারোয়ানের ঘরে দেখতে পাই দারোয়ানের মৃতদেহ আগুনে পুড়ছে। জনৈক ছাত্র অশ্রুনয়নে মৃতদেহ সৎকার করছিল। আমার ১১৯নং কক্ষ ছিল তিনতলাতে। এগিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় রক্তের বিরাট আলপনা দেখতে পাই। বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে উপর থেকে ছাত্রদের ফেলা হয়েছিল। লাশ টেনেও নামানো হয়। সমস্ত সিঁড়ি রক্তে রঞ্জিত ছিল। অনেক কক্ষে রক্তের আলপনা। বাথরুমে পালানো ছাত্রদের ওখানেই হত্যা করা হয়। প্রত্যেকটি বাথরুমকে কসাইখানা বলে মনে হয়েছিল। আমার কক্ষটি অক্ষত ছিল। প্রয়োজনীয় কিছু নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি। যেখানে অসংখ্য লাশের গণকবর হয়েছিল, বুলডোজারের

চাপে সেখানটা ছিল খানিকটা নীচে। রক্ত উপরে উঠে জমাট ধরায় পুকুর সদৃশ মনে হয়। অনেক লাশের হাত-পা বাইরে থেকে দেখা যায়। কোনো কোনো লুঙ্গি ও শার্ট আমি সনাক্ত করতে পেরেছিলাম। মুহূর্ত দেরী না করে এগিয়ে যাই রাস্তার দিকে। ওরা আমাকে কিছু বলেনি। যমপুরী থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এলে মনে পড়ল বঙ্গবন্ধুর কথা—"রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব এবং এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"।

হরিধন দাস

অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ

ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা

পদার্থবিদ্যার ছাত্র হরিধন দাস। জগন্নাথ হলের উত্তর বাড়ীর মধ্যে পাক-বাহিনী কর্তৃক নারকীয় হত্যাযজ্ঞের প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগী। তার বর্ণনা হৃদয়বিদারক, উপস্থাপনা জীবন্ত।

২৫শে মার্চ, ১৯৭১। জগন্নাথ হল। হলে তখনও শতাধিক ছাত্র এবং কয়েকজন অতিথি অবস্থান করছেন। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিধ্বস্ত। তাই দূরবর্তী অঞ্চলের ছাত্ররা হল ত্যাগ করতে পারছে না। ২৩শে মার্চের মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা ভেঙ্গে গেছে। রাজনৈতিক অবস্থা অনিশ্চিত। হলের ছাত্ররা শঙ্কিত। কিন্তু ঢাকা শহরে মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। মাত্র কিছুদিন আগে আমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষা হয়নি। আমি শেষ বর্ষ সম্মান পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র। জগন্নাথ হলের উত্তর ভবনের ২৯নং কক্ষে থাকি। সুনীল কুমার দাস, নতুন তৃতীয় বর্ষ মৃত্তিকা বিজ্ঞানের ছাত্র। সে হল সংসদের সহকারী সাধারণ সম্পাদক। বাড়ী ছিল বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর। মিতভাষী ও বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরু থেকেই আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল বিশেষত রাজনৈতিক কারণে। দুজনেই ছাত্রনেতা মৃণাল বোসকে খুঁজছিলাম। কারণ মৃণালদা সকালেই শেখ সাহেবের বাড়ীতে গেছেন। হলে এমন গুজবও শোনা গেল যে বঙ্গবন্ধু মৃণালদাকে কিছু উপদেশ দিয়েছেন। মৃণালকান্তি বোস। অর্থনীতি শেষ পর্বে উত্তীর্ণ। তাকে না পেয়ে চলে গেলাম ইকবাল হলে (বর্তমানে জহুরুল হক হল)। বন্ধুদের দেখা পেলাম না। ইকবাল হল ও এস. এম হলে ছাত্র নেই বললেই চলে। সন্ধ্যার দিকে হলে ফিরে আসি। ছাত্রনেতারা তখনও হলে ফেরেননি। হলে হাজী আছমত কলেজের দুজন ছাত্র শেখর চন্দের অতিথি হিসাবে আছেন। তাদের সাথে দেখা হল। হলে গুজব চলছে যে ছাত্রনেতাদেরকে গ্রেফতার করা হবে। আমার

এলাকার ছাত্রদেরকে খোঁজ করি। উদ্দেশ্য একযোগে হল ত্যাগ করা। আমার বাড়ী নরসিংদীর নিকটে পারুলিয়া গ্রামে। হলে তখন নরসিংদী এলাকার অনেক ছাত্র। এদের মধ্যে সন্তোষকুমার রায় উদ্ভিদবিদ্যা শেষ পর্বে উত্তীর্ণ, গ্রাম বরাব, জিনারদী। হরিনারায়ণ দাস (পল্টন), শেষ বর্ষ, সম্মান, সমাজবিজ্ঞান; ঠিকানা; ব্রাহ্মণদী, নরসিংদী। সত্যরঞ্জন দাস, শেষ পর্ব, রসায়ন (উত্তীর্ণ); ঠিকানা-বেলাব, শিবপুর, নরসিংদী। ঠিক হল কাল সকালে পায়ে হেঁটে চলে যাব। হায়, তাদের জীবনে আর একটি সকাল আসেনি।

হল থেকে আবার বেরিয়ে পড়ি। বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় ঘোরাফিরি করে রাত দশটার দিকে যখন হলগেটে পৌঁছি, তখন একজন দ্রুতগামী সাইকেল আরোহী "মিলিটারী নেমেছে, রাস্তা থেকে সরে পড়ুন" বলে দ্রুত চলে গেল। হলে প্রবেশ করলাম। ছাত্রদের মধ্যে দারুণ উৎকণ্ঠা। অধিকাংশ ছাত্র ঘুমিয়ে আছে। কেউ কেউ বাইরে থেকে হলে ফিরছে। ভাবলাম সত্যদা'র সঙ্গে দেখা করি কালকের প্লানের ব্যাপারে। সে রাতে তার সাথে ছিলেন সুরেশ দাস (এম. এ উত্তীর্ণ)। সুশীলের সঙ্গে দেখা। সঙ্গে আরেকজন (নাম মনে নেই, গণিত প্রথম পর্বের ছাত্র)। বাড়ী উত্তরবঙ্গে। দ্বিতীয় জনের কাছে আমার রুমের চাবিটা দিয়ে বললাম— আপনি একটু বসুন, আমরা সত্যদা'র সাথে কথা বলে আসি। আমরা তিনতলায় গেলাম। উত্তর ভবনের উত্তরের ব্লকের তিনতলায় থাকতেন সত্যরঞ্জন দাস। রুমটি ভিতর থেকে বন্ধ। আলো নেই। এরা ঘুমিয়ে। সারাদিনের দৌড়াদৌড়ির পর সবাই ক্লান্ত। ফিরে এসেছি। রাত বারোটার দিকে। হঠাৎ চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। অন্ধকারে হাতড়িয়ে নিচতলায় এলাম। ঠিক তখনই জগন্নাথ হলের উপর প্রথম ব্রাশ ফায়ার। উত্তর ভবনের উত্তরের গেটের পাশে আমগাছটির একটি ডাল ভেঙ্গে পড়ল। ব্রাশ ফায়ার ও শেল বিস্ফোরণের অবিরত শব্দ। এত শব্দ হচ্ছিল যে কানের কাছে মুখ রেখে কথা বললেও শোনা যায় না। এ অবস্থায় আমি ও সুশীল আমার ঘরে ঢুকলাম। আরেকজন আগেই রুমে পৌঁছেছিল। গুলি ও গোলাবর্ষণ প্রচণ্ডভাবে চলছে। গুলিতে জানালার কাঁচ ভেঙ্গে গেছে। একটি প্রচণ্ড শব্দ হল। মনে হল পুরো ভবনই বুঝি ধসে গেছে। স্বাধীনতার পর দেখেছিলাম ২৮ নং রুমের দেয়াল বরাবর প্রকাণ্ড এক সুড়ঙ্গ। ট্যাঙ্কের গোলার আঘাতে ভবনের অনেক স্থানে এরূপ সুড়ঙ্গের সৃষ্টি হয়। আমরা তিনজন গা ঘেঁষাঘেঁষি করে ফ্লোরে বসেছিলাম। আধঘণ্টা কেটে গেছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। হঠাৎ গোলার শব্দ আর নেই, গুলির আওয়াজও কমে আসল। ভাবলাম বিপদ কেটে গেছে। কিন্তু এ কী! শক্ত বুটের আওয়াজ কেন? এরা কারা? এরপর যে হৃদয়বিদারক ঘটনার সূত্রপাত হয় তাকে ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শতাধিক ছাত্র, শিক্ষকবৃন্দ, কয়েকশত কর্মচারী, বস্তিবাসী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শহীদ হলেন। পুরো ঘটনার বিবরণ আমার জানা নেই। শুধু স্মৃতি আজও গভীর ঘুমে আর্তচিৎকারের সৃষ্টি করে, সংক্ষেপে তাই বলছি। বুটের শব্দ ক্রমশ নিকটবর্তী হচ্ছে।

মনে হচ্ছে এরা কক্ষে কক্ষে তল্লাশি করছে। ব্রাশ ফায়ারে দরজা ভাঙছে। ঘুমন্ত ছাত্রকে খুন করার জন্য ছুঁড়ছে দু/একটি গ্রেনেড। কেউ আর্তচিৎকার করে উঠছে, আর কেউ তার আগেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করছে। এবার আমাদের পালা। বুটের শব্দ দোরগোড়ায়। হাতে হাত মিলিয়ে একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। এতক্ষণে তিনজনে জড়াজড়ি করে বসেছিলাম। এবার তিন কোণায় সরে গেলাম। আমি দরজার পাশে। ব্রাশ ফায়ারে দরজা ভেঙে গেল। সাথে সাথে দুটো প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। গ্রেনেড চার্জ। জল্লাদটি বলে উঠল, "বাতাও জয়বাংলা, বান্‌চোদ, শেখ মুজিব কাঁহা গিয়া?" পেনসিল টর্চের সাহায্যে দেখল কাজ কেমন হয়েছে। জল্লাদরা গেল পরবর্তী কক্ষে। এভাবে ভোর পর্যন্ত চলতে থাকে। এদিকে আমার কক্ষে আগুন ধরে গেছে। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে বারুদের গন্ধে। আমার কি হয়েছে বুঝতে পারছি না। ভাঙ্গা দরজার নিচে চাপা পড়ে আছি। কোনমতে হামাগুড়ি দিয়ে সুশীল ও অন্য বন্ধুর কী অবস্থা জানতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু এরা কোথায়? হাতড়িয়ে কিছুই বুঝতে পারছি না। রুমে এত জল ও কাদা এল কোত্থেকে? একটু পরেই বুঝলাম মেশিনগান ও গ্রেনেডের আঘাতে ওদের দেহ টুকরো হয়ে গেছে। রক্তে সমস্ত ফ্লোর ভেসে গেছে। দুজন শহীদ হল। ২৭ শে মার্চ জনাম আব্দুল বারী আমার খোঁজে ২৯নং-এ গিয়েছিলেন। তার মুখে শুনেছিলাম রুমটি রক্তে প্লাবিত ছিল। জনাব বারী আমার প্রতিবেশী এবং তখন তিনি এস. এম. হল অফিসে চাকুরি করতেন। যা হোক নিজের অবস্থা বুঝতে পারছি না। দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম। উঠতে পারছি না। বাম পা'টা মনে হয় খসে গেছে। হাতের আঙ্গুলের চেতনা নেই। বুঝতে পারলাম আমার শরীরের অনেক স্থানে জখম। বাম পায়ের পাতা গোড়ালি থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন। গায়ের হাফ শার্ট খুলে পা'টা পেঁচিয়ে নিলাম। শুধু হাতের উপর ভর করে চৌকিতে বসলাম। চারদিকে তখনও গুলি, গ্রেনেড ও মৃত্যুচিৎকার। রাত ক'টা জানি না। শুনলাম করিডোর বরাবর কি যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে টর্চের আলো। মনে পড়ল আগের দিনের জয়দেবপুরের ঘটনা। সেদিন অনেক বাঙালীকে হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলেছিল পাকিস্তানী সেনাবাহিনী। আমাদেরও কি তাই হবে? না, আমাকে পালাতে হবে। ভাবতে ভাবতেই দরজায় এল দুটো বালক। টর্চের আলোয় পরিষ্কার চিনতে পারলাম এরা হাসান ও হোসেন। অনাথ দুই ভাই হলেই থাকে। ছাত্রদের ছোটখাট কাজ করে। কেন্টিন ও ডাইনিং হলের উচ্ছিষ্ট খেয়ে দিন কাটায়। এদেরকে দিয়ে লাশ টানানো হয়েছিল। ওরা রুমে ঢুকলে আস্তে করে বললাম— হোসেন, আমরা মরিনি, আমাদের নিস না। ওরা চলে গেল। পরে জেনেছিলাম পরদিন মাঠে দুজনকেই গুলি করে কবর দেওয়া হয়েছিল। পালাতে হবে। মনে পড়ল, জানালার একটি বড় রড খোলা যায়। গেট বন্ধ হয়ে গেলে ওটা খুলেই আমি রুমে আসতাম। চৌকি থেকে বুক-শেলফের উপর ভর করে কাঁচের জানালা খুললাম। কাঁচের জানালা ঝর ঝর করে পড়ে গেল। ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু

কেউ আসল না। ঘাতকরা তখন লাশ সামলাতে ব্যস্ত। আলগা রডটি খুললাম। রডটি ডান হাতে ধরে শরীরের উপরের অংশ বাইরে ঠেলে দিয়ে রডের উপর ভর করে কর্দমাক্ত ড্রেনে শুয়ে পড়লাম। আর একটু দেরী হলে ধরা পড়ে যেতাম। কারণ একটু পরেই সুশীল ও অন্যজনের লাশ নিয়ে যায়। তখন পিপাসায় প্রাণ যায়। জিহ্বা শুকিয়ে গেছে। ড্রেনের জল পান করলাম কিন্তু পিপাসা মিটলো না। জল চাই। সামনেই পুকুর। ঝোপে আচ্ছন্ন। পুকুরে নেমে যাব। কিন্তু রাস্তায় এটা কি? ট্যাঙ্ক। ট্যাঙ্কটির পরই কুলগাছের চারা, ঝোপে ঘেরা। আজান পড়ল। এতক্ষণ মনে হয়েছে ঢাকায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ছাড়া কেউ নেই। চারদিক নিস্তব্ধ। চারদিকে আগুন। প্রচণ্ড শব্দে মুয়াজ্জিনদের আজান প্রচারিত হচ্ছে।। ভাবলাম এভাবে পড়ে থাকলে রক্ষা নেই। একটু পরেই ফর্সা হয়ে যাবে। তাই শেষ চেষ্টা করে দেখি। বিকলাঙ্গের মতো ট্যাঙ্কটির পাশ দিয়ে কুলগাছের ঝোপে প্রবেশ করলাম। পুকুরের ঢালুতে নেমে গেলাম। সমস্ত হলে তখন আগুন জ্বলছে। তখনও অন্ধকার। আরও একটু নেমে আসলাম। জলে নেমে পেট পুরে জল পান করলাম। পড়ে রইলাম জলেই। বুঝলাম শরীর নিস্তেজ হয়ে আসছে, নড়তে পারছি না। মাথা ডাঙ্গায় রেখে শরীরটা জলে ডুবিয়ে পড়ে থাকলাম। তখন ফর্সা হয়ে গেছে। আমার বাম পাশে দক্ষিণ ভবন, ডান পাশে উত্তর ভবন, সামনে পশ্চিম ভবন। পশ্চিম ভবন থেকে লাশ টেনে আনছে কারা। উত্তর ভবনের ছাদের উপর চিৎকার ও গুলি। গুলি করে লাশ ফেলে দিচ্ছে নিচে। আর চোখ খুলে তাকাতে পারলাম না। তখনও চেতনা হারাইনি কিন্তু নড়ার শক্তি নেই। কিছু বেলা হলে দেখলাম আকাশে চক্কর মারছে পিএএফ-এর একটি বিমান।

যেখানে পড়েছিলাম তার পিছনে ছিল খেলার মাঠ। সেখান থেকে কিছু শব্দ শোনা যাচ্ছে, গোঙানির শব্দ। পুকুরের পার বরাবর কয়েকজন জল্লাদ চাইনিজ রাইফেল কাঁধে নিয়ে খোশ মেজাজে আলাপ করছে এবং চারদিক দেখছে। মাথার উপর উড়ছে কাক ও শকুন। আশপাশে তাকাতে চেষ্টা করলাম। কাক ও শকুন ঠোকরাচ্ছে একটি লাশকে। একটি শকুন প্রায় আমার উপরেই বসে পড়ে আর কি! হাত দিয়ে তাড়াতে পারছি না, শক্তি নেই। জিহ্বা ও চোখ দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলাম আমি মৃত নই। তখন সূর্য উঠে গেছে। চারদিক নিঃশব্দ। মাকে স্মরণ করলাম। বাবা-ভাই-বোনকে স্মরণ করলাম। মনে হচ্ছে আর দেরী নেই, জলে পড়েও পিপাসায় মারা যাচ্ছি। তখনই আবার বুটের শব্দ। চোখ বুঝলাম। কয়েকজন পাকসেনা আমার মাথার ঠিক পিছনে। বুটের সাহায্যে মাথা ঠেলা দিল। আমি জলে পড়ে গেলাম। এরপর আমি জ্ঞান হারাই।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ৩০/৩১ শে মার্চ জ্ঞান ফিরে পাই। ৭নং ওয়ার্ডে। পায়ে ব্যাণ্ডেজ, নাকে অক্সিজেন সিলিণ্ডার। শরীরের চামড়া উঠে গেছে। স্থানে স্থানে ক্ষত। নার্সদের কাছ থেকে জানতে পারি ২৭ শে মার্চ সকালে এক ঘণ্টার জন্য কারফিউ

শিথিল করা হয়। তখন কয়েকজন লোক জগন্নাথ হলের আনাচ-কানাচ থেকে কয়েকজন আহতকে উদ্ধার করে। আমি ওদেরই একজন। স্বাধীনতার পর আমার উদ্ধারকারীদের খুঁজে পাই। তাদের একজনের ডাক নাম ইদু মিয়া। মেডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী রাস্তার পাশে তার পুরানো বই-এর দোকান। বাকীতে বই কিনতাম। ইদু মিয়া কয়েকজন ধোপাকে সাথে নিয়ে হল থেকে আমাকে উদ্ধার করেন। তার কাছ থেকে জগন্নাথ হলের গণহত্যার অনেক বিবরণ জানা যাবে।

নার্সদের কাছ থেকে জানলাম শ্রদ্ধেয় ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরদা পাশের বেডেই মৃত্যুর সাথে লড়ছেন। তাঁকে তার ঘরে চিৎ করে শুইয়ে গলায় পিস্তলের সাহায্যে গুলি করা হয়। গুলিতে তার স্পাইনাল কর্ড ছিঁড়ে যায়। পহেলা এপ্রিল তিনি শহীদ হন। সে সময় হাসপাতালে তার স্ত্রী ও কন্যা উপস্থিত ছিলেন। লাশটি জল্লাদরা নিয়ে যায়। হাসপাতালে আরও দেখা হয় আহত সুরেশ দাসের সাথে। তিনি ২৫শে মার্চ রাতে উত্তর ভবনের তিনতলায় শহীদ সত্য দাসের রুমে ছিলেন। উত্তর ভবনের ছাদের উপর এগারোজনকে লাইন ধরে গুলি করা হয়। সুরেশ দাস ও সত্য দাস এদের অন্যতম। গুলি সুরেশ দাসের ডান বক্ষ ভেদ করে চলে যায়। সত্য দাস সহ দশজন ছাদের উপর শহীদ হন। সুরেশ দাস জলের পাইপ বেয়ে নিচে নামেন এবং পার্শ্ববর্তী কোয়ার্টারে পালিয়ে যান। সুরেশ দাস বর্তমানে সুনামগঞ্জে আইন ব্যবসা করেন। হাসপাতালে দেখা হয় শেখরের সাথে শেখর চন্দ তখন নতুন তৃতীয় বর্ষের ছাত্র (পরিসংখ্যান); বাড়ী কিশোরগঞ্জ। শেখর ২৬শে মার্চ সকালে জল্লাদের হাতে ধরা পড়ে। তাকে দিয়ে হল পার্শ্ববর্তী স্টাফ কোয়ার্টার থেকে লাশ টানানো হয়। ডঃ গোবিন্দ দেব, অধ্যাপক অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য ও অন্যান্যের লাশ এরাই হলের মাঠে নিয়ে আসে। শেখরদেরকে দিয়ে লাশ টানানোর পর মাঠেই লাইন করে গুলি করা হয়। তাঁর ডান হাতের কব্জিতে গুলি করে। সে মরার মতো পড়ে থাকে। শিফ্‌ট চেঞ্জের সময় শেখর দৌড়িয়ে পার্শ্ববর্তী স্টাফ কোয়ার্টারে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। হল মাঠে প্রায় তিনশ' মৃত-অর্ধমৃত ছাত্র, কর্মচারী ও বস্তিবাসীকে কবর দেয়া হয়। স্বাধীনতার পর যখন গণকবর খোঁড়া হয় তখন হাড় ছাড়া কিছু অবশিষ্ট নেই। তবু ঘড়ি, জামা ও প্যান্ট ইত্যাদি থেকে অনেককে সনাক্ত করা সম্ভব হয়।

যে মৃণাল বোসকে আমরা খুঁজছিলাম তাকেও এখানেই কবর দেয়া হয়। আজ আগের সবকিছু মনে করতে পারছি না। অনেকের চেহারা ভেসে ওঠে, কিন্তু শত চেষ্টা করেও নাম মনে করতে পারি না। কিছু কিছু মুখ যে কিছুতেই ভোলা যায় না। সুশীল, গণপতি, সুভাষ, সত্য দাস, সন্তোষ, পল্টন ....মনে হয় এরা আজও জীবিত। আছে আমাদের মাঝেই। শুধু চেয়ে থাকে অপলক দৃষ্টিতে, কী যেন বলতে চায়, কিন্তু মুখে ফুটে ওঠে না কোন ভাষা।

রাধানাথ ভৌমিক

অধ্যাপক, গণিত বিভাগ
ভাওয়াল বদরে আলম সরকারী কলেজ, গাজীপুর

গণিত বিভাগের ছাত্র রাধানাথ ভৌমিক পাক-বাহিনীর জগন্নাথ হল আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই হলের অভ্যন্তরে বিহারীর বাসায় আশ্রয় নেয়। সেখান হতে দেখা ও পরবর্তীকালে শোনা ঘটনা নিয়েই জগন্নাথ হলের গণহত্যার উপর তার বিবরণী রচনা করেছেন।

১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ। সেদিন বিকালবেলা। আমি সদরঘাটে আমার এক আত্মীয়ের বাসায় গিয়েছিলাম। সেখানে আমার আত্মীয় বাবু কেশবচন্দ্রের বাসায় রাত আটটা পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা করি। সেখান থেকে মোহাম্মদপুরের বাসে চেপে গুলিস্তান আসি। গুলিস্তান এসেই একটা টেলিগ্রাম পত্রিকা পাই। কাদের ছিল সে টেলিগ্রাম, তাদের নামটা আমি ভুলে গেছি। সেই টেলিগ্রামে লেখা ছিল ''ভুট্টো এগরিড টু মুজিবস্ ফোর পয়েন্টস্''। তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস আগামীকাল মানে ২৬ শে মার্চ, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া হয়তো একটা ভাষণ দেবেন এবং আমাদের সমস্ত সমস্যা দূরীভূত হয়ে যাবে। এই বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করে আমি টেলিগ্রামটা কিনে হলে চলে আসি। হলে এসে নর্থ হাউজের সামনে কিছু ছাত্রকে বসে থাকতে দেখলাম। তাদের মধ্যে আমার পরিচিত মৃণাল বোসকেও বসে থাকতে দেখলাম। তাকে দেখে আমি পশ্চিম বাড়ীর ১৯ নম্বর রুমে চলে যাই। সেখানে এসে টেলিগ্রামটা পড়ে নেই এবং হাত-মুখ ধুয়ে বিছানায় বসে ভাবতে থাকি আমাদের এতদিনের সমস্যা বুঝি দূরীভূত হয়ে যাবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া, ভুট্টো সাহেব এবং আমাদের শেখ মুজিবর রহমান সাহেব আলোচনায় ছিলেন। এসব ভাবতে ভাবতে আমি বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। মধ্যরাতে হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখন আমি বিছানা ছেড়ে উঠে বসি এবং জানালা দিয়ে দেখি ইকবাল হলের উপরে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। জানালা দিয়ে শুধু আলো দেখা যায় আর জগন্নাথ হলের উপর দিয়ে কেবল গুলির শব্দ শোনা যায়। মাঝে-মধ্যে শব্দ এত প্রবল হয়ে দাঁড়ায় যেন আমাদের নর্থ হাউজের বিল্ডিং কেঁপে ওঠে। ভয়ে চৌকির নিচে বসে থাকি। শেষরাতের দিকে আজানের শব্দ পাই, তখন আস্তে আস্তে দরজাটা খুলি। দরজা খুলে তাকিয়ে দেখি পূর্ব বাড়ীর টিনশেডে আগুন জ্বলছে। নর্থ হাউজের জানালায়ও আগুন। তখন আমার মনে আরও বেশি ভয় দানা বাঁধে। ভাবলাম মিলিটারীর আক্রমণ চরম আকার ধারণ করেছে। তখন গরমের দিন। আমি খালি গায়ে, লুঙ্গি পরিহিত ছিলাম। একটা জামা গায়ে দেই। আমার ইন্টারভিউ দেয়া সার্টিফিকেটগুলো একটা হাতব্যাগে নিয়ে সামনে এগোই। তখনকার সুধীরের ক্যান্টিনের, যা সুধীরদা চালাতেন, বারান্দার দিকে এগিয়ে যাই। এমন

সময়, আমাদের হলে দুটো অনাথ ছেলে থাকতো, তার একটি আমাকে দেখতে পেয়ে ছুটে আসে, বলে বাবু— আর এগোবেন না, ওখানে এক বাবুকে ধরে মেরে ফেলেছে। তখন আমি একটু পিছিয়ে যাই। ভয়ে লাগে, ভয় হাত-পা কাঁপতে থাকে। তখন কোন উপায় না দেখে আমাদের হলের কাছে বিহারীদের যে সব বাসা ছিল, সেখানে চলে যাই, গিয়ে দেখি সেখানে আরও দুই-তিনজন ছাত্র আছে। এদের মধ্যে একজন তপন বর্ধন, অপরজন মাধবগোবিন্দ সাহা। তারপর আমরা একত্র হয়ে ওখানে কিছুক্ষণ কাটাই। ভোর হতে না হতেই দেখি নর্থ হাউজের ছাদের উপর মিলিটারী উঠেছে। মিলিটারী কালো পতাকা ছিঁড়ে ফেলে এবং মনের আনন্দে গুলি করতে থাকে। এখানে আমাদের দিন কাটছিল, এদিকে দুপুর হয়ে আসছে। আমরা যারা আছি সবাই ভয়ে কাতর, জীবন বাঁচে কি বাঁচে না তা নিয়ে চিন্তায় মগ্ন। সেই দুঃশ্চিন্তার মধ্যেও আমরা যে বাসায় ছিলাম সেই বাসার মালিক সীতানাথ চক্রবর্তীর স্ত্রী কিছু ভাত ও আলু-বেগুন সিদ্ধ করে আমাদের খেতে দেয়। কিন্তু ভয়-ভীতির কারণে আমরা কেউ খেতে পারিনি। তবু একটু ভাত মুখে দিয়ে একটু জল খেয়ে আমাদের কেটে যায় সেই দুপুর। দুপুর একটা কি দেড়টার দিকে হলের চারপাশের গুলির শব্দ কিছুটা কমে আসে। ঐ সময় আমাদের মধ্য থেকে মাধবগোবিন্দ সাহা সরে পড়ে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে এবং গুলির শব্দ আবার বেড়ে যায়। পশ্চিম দিকে গাড়ির শব্দ সারা রাত চলছিল। আমরা ভাবছিলাম জগন্নাথ হল উড়িয়ে দিতে বোমাই ছাড়ে কিনা! এরকম আলাপ-আলোচনা আমাদের মধ্যে চলছিল। রাত আটটার দিকে মাইকে শুনলাম, বলছে "দরজা-জানালা খুলবে না বাইরে কারফিউ চলছিল।" মাইকিং-এর ভাষাটা ছিল বাংলায়। এরপর রাতও গভীর হতে থাকে এবং শব্দও বাড়তে থাকে। রাত ভোর হয়ে গেছে, এমন সময় গাড়ীর শব্দটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল, সেই সাথে গুলির শব্দও কমে এলো। ২৭শে মার্চ ভোর সাতটার দিকে রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হয়, তখন আমরা দরজা খুলে বের হয়ে আসি। নাম-না-জানা বেশ কিছু ছাত্রের সাথে দেখা হয়ে গেল। হলের মধ্য মাঠে দেখি একটা গণকবর। এই কবরে অনেক লোককে কবর দেওয়া হয়েছে। একটা নালার মতো কেটে মৃত লাশগুলোকে ফেলে উপরে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। ওদের পক্ষে মাটি সমান করাও সম্ভব হয়নি। আলাপ-আলোচনা করে জানলাম হলের ভিতরে-বাইরে এবং ওই গণকবরের সামনে যাদেরকে গুলি করে মারা হয়েছে তাদেরকে কবর দেওয়া হয়েছে। কালীপদ শীল নামে একজন ছাত্রের সাথে দেখা হল, তার কাছে শুনলাম— ২৬শে মার্চ যাদের গুলি করা হয়েছে, তাদের লাশ যারা জীবিত ছিল তাদের দিয়ে টানানো হয়েছে। তারপর জীবিতদেরকেও লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হয়। ২৬শে মার্চ বেলা একটার দিকে। সেই গুলির সাথে কালীপদ শীলও পড়ে যায় সবার সাথে, তবে তার গায়ে গুলি লাগেনি। যখন চতুর্দিকে একটু নীরবতা দেখা গেল তখন কালীপদ শীল মাথা উঁচু করে

দেখে মিলিটারীরা আছে কি-না। কোথাও কোন মিলিটারী নেই দেখে সেখান থেকে তিনি উঠে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ভিতরের দিকে পালিয়ে যান। আমি তখন হল থেকে বেরিয়ে মেডিক্যালের পাশ দিয়ে গুলিস্তান সিনেমা হলের সামনে দিয়ে বুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে জিঞ্জিরা চলে যাই।

শেখরকুমার চন্দ

বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ

শেখরকুমার চন্দ চরম মুহূর্তেও অবিচল থেকে গণহত্যার কবল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। পাক-সৈন্যের আদেশ মতো লাশ টেনে জগন্নাথ হলে জড়ো করেছেন এবং সেই একই পথে যাত্রার পরিকল্পিত মৃত্যুর হাত হতে অব্যাহিত পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার সৈয়দ এস.বি. হোসেনের বাসায় আশ্রয় পেয়েছেন। পেয়েছেন সেবা-শুশ্রূষা। এর জন্য তিনি কৃতজ্ঞ। জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ ড. জ্যোর্তিময় গুহঠাকুরতাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য জীবন-মৃত্যু সেই কঠিন সময় অনর্গল মিথ্যা কথা বলেছেন এবং সত্যকে বুকের অভ্যন্তরে পাষাণ চাপা দিয়েছেন। কোন প্রয়োজনের তাগিদে সে মুহূর্তে তিনি নিজেই জানতেন।

১৯৭১ সালে আমি তৃতীয় বর্ষ পরিসংখ্যানের ছাত্র ছিলাম। ২৫শে মার্চ রাত ৯টায় আমি বাড়ী থেকে ফিরে আসি হলে। আমার সাথে ছিল পাঁচজন বন্ধু। তবে তারা কেউই জগন্নাথ হলের ছাত্র ছিলেন না। বদরুদ্দোজা জগন্নাথ কলেজের, হেলাল ভৈরব কলেজের এবং বাবুল পাল বাজিতপুর কলেজের ছাত্র ছিলেন। সবাই ঢাকা এসেছেন আমারই সাথে। আমার আবাস তখন জগন্নাথ হলের দক্ষিণ বাড়ীর ২১৬ নম্বর কক্ষে। আমরা পাঁচজন এই কক্ষেই উঠি। আমার কক্ষের পাশে ২১২ নম্বর কক্ষে থাকতেন বেনেডিক্ট ডায়াস। রাত দশটায় আমরা খেতে যাই "ক্যাফে-কাশে"। খেতে যাওয়ার পথে দেখতে পেলাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক এবং ছাত্র মিলে মোড়ের মাথায় ব্যারিকেড দিচ্ছেন। তাদের অনুরোধে আমরাও ব্যারিকেড দেই কিছু সময়। সেখান থেকে ফিরে আসি হলে। তখন হলে থাকতেন মৃণাল বোস। মৃণাল বোসের সাথে হলের গেটে দেখা। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি "অবস্থা কেমন?" তিনি বললেন, "কাজ চালিয়ে যাও।" আমরা তখন ১৫/২০ জন মিলে হলের সামনেও ব্যারিকেড দেই। ব্যারিকেড শেষ হলে আমি হলে গিয়ে শুয়ে পড়ি। এ্যাসেম্বলিতে থাকাকালীন আমি এবং বেনডিক্ট ডায়াস দুজনে খুব সিনেমা দেখতাম। ডায়াসের মুখে শুনলাম ঢাকায় খুব ভালো একটা ছবি চলে। ২৬ তারিখ আমরা সে ছবি দেখব, ডায়াসের সাথে সে পরিকল্পনা করে

আমরা শুতে যাই। ডায়াস তখনও ডাইরী লিখছিল, কিন্তু আমি ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ি। রাত বারোটার দিকে আমার দরজায় লাথির শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। "বাইরে কে?" আমি জানতে চাইলে ডায়াস বাইরে থেকে বলল, " কিছু বুঝতে পারছ? গুলির আওয়াজ হচ্ছে, চলো পালাই। তোমার রুমে যারা আছে, ওরা হলের সবদিক চিনবে না; তুমি ওদের নিয়ে পালাও, আর প্যান্ট এবং জুতা পরে নিয়ো।" আমি যখন হলের গেটে আসি, তখন প্রিয়নাথদা ছিলেন গেটের দারোয়ান। প্রিয়নাথ বলল, "বাবু কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আপনারা হলের পিছন দিক দিয়ে বেরোন। আমি সামনের গেট বন্ধ করে দিই? আমি হলের পিছন দিক দিয়ে দেখছি এস.এম হলের দিক থেকে পুলিশের ভ্যান আসছে। লাইট দেখা যাচ্ছে। তাই হলের পিছনের দিক থেকে পালাতে পারলাম না। পুকুরের পাড় দিয়ে ঘুরে এলাম। দেখি হলের দক্ষিণ দিকের গেট দিয়ে পুলিশ ঢুকছে। সেখান দিয়ে যখন দেখি পালাবার পথ নেই, তখন আমরা ছয়জন (আমার বন্ধু হেলাল, মাহতাব, বদরুদ্দোজা, বাবুল পাল, আমি, আর একজন ছেলে ছিল বরদাকান্ত তালুকদার) সুধীরদার ক্যান্টিনের কাছে ভাঙা লেট্রিনের মধ্যে ঢুকে পড়ি। গুলি চলছে, চারিদিকে চীৎকার "বাঁচাও, বাঁচাও।" রাত্রে খুব গোলাগুলি চলল, শেষ রাত্রের দিকে আর গোলাগুলি চলেনি। ভাঙা লেট্রিনের মধ্যে আমরা ছয়জন দাঁড়িয়ে ছিলাম। সকালবেলা হলের মাঠে কয়েকটি ডেড-বডি দেখা যায়। সুধীরদার ক্যান্টিনের সাথে হলের ছাত্রাবাস ছিল টিনশেড। টিনশেডে যে আগুন দেয় তা আমরা বুঝতে পারছিলাম। আমরা ভাবছিলাম সুইপারদের ওরা মারছে না, শুধু ছাত্রদের মারছে। তখন আমরা সবাই পরামর্শ করি যে, "আমরা যদি ওদের সাথে মিশে যাই তাহলে বাঁচতে পারব।" এমন সময় দেখি মাঠে আর্মি ঘুরছে। দুই-চারবার ভাঙা লেট্রিনের পাশ দিয়ে গেছে। এক ফাঁকে আড়ালের ভিতর দিয়ে সুইপার কলোনীতে ঢুকে গেলাম। সেখানে এক বুড়ো মালী ছিল, সে বলল, "বাবু, আপনাদের তো বাঁচানো যাবে না। আপনারা কিছু মনে না করলে আমাদের কাপড়-চোপড় পরে নিন। আমরা বলব যে আমাদের লোক। আপনারা কিছু বলবেন না।" আমরা ওদের কাপড়-চোপড় পরে নিলাম। সেখানকার এক গোয়াল-ঘরে মেয়েরা বসেছিল। পাক-সৈন্যরা মেয়েদের বসিয়ে রেখে পুরুষদের ধরে এনেছে। তখন আমাদেরও ধরে আনে এবং একটা শিমুল গাছের নীচে বসায়। সামনে তিনটে ডেড-বডি, একটি অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যের, একটি সুনীল আর অন্যটি গয়ানাথের। সামনে আর্মি কামাণ্ডার সিগারেট টানছে আর বলছে, "তোমাদের আমার শেষ করিতে লাগবে তিনদিন, এখানে আমরা আর কিছু চাই না। শুধু মাটি চাই। তোমরা বাঙাল ভাগ যাও, আউয়ুব খানের মুখে তোমরা জুতা দেখাও...।" এ ধরনের সব কথাবার্তা বলছিল। তখন কিছু লোক বলল, "আমরা বাঙালী নয়, বিহারী।" পাক আর্মি তখন 'বাঙালী' ও 'বিহারী' এ দুটো ভাগে ভাগ করে ফেলল। আমরা ছিলাম বাঙালী ভাগে। এর মধ্যে প্রিয়নাথের ডেড-বডি

নিয়ে এলো কালীরঞ্জন শীল। বদরুদ্দোজা, কালীরঞ্জন শীল ও আমি একসাথে ছিলাম। বদরুদ্দোজা কলকাতায় ছিল, ফলে খুব ভালো হিন্দি বলতে পারত। সে বলল "আমাদের বাঁচাও, আমরা হলে কাজ করি।" কালীরঞ্জন শীল নিজেকে বিহারী বলায় পাক-আর্মি তাকে লাথি মেরে ফেলে দেয়। আমাদের তখন স্টাফ কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হল। বাঙালী গ্রুপটাকে নিয়ে যাওয়া হলো স্টাফ-কোয়ার্টারে। আর বিহারী গ্রুপটাকে নিয়ে যাওয়া হলো হলের ভিতরে। স্টাফ কোয়ার্টারে আমরা তিনটে ডেড-বডি পেলাম। আমাদের প্রাধ্যক্ষ ছিলেন জ্যেতির্ময় গুহঠাকুরতা। তারপর কোয়ার্টারে গেলাম উপরে-নীচে কিছু দেখলাম না। পাশের বাংলোতে একটা কালো পতাকা ছিলো, আমার বন্ধু মাহতাবকে দিয়ে সেটি আনিয়ে আর্মিরা পোড়ালো। আমাদের বলল ডেড-বডিগুলো গাড়ীতে আনতে। আমরা গাড়ীতে ডেড-বডিগুলো নিয়ে গেলাম। এখন যেখানে হলের শহীদ মিনার সেখানে ডেড-বডিগুলো জড়ো করা হচ্ছিল। ডেড-বডিগুলো নিয়ে যাওয়ার সময় ড.জি.সি. দেবের বাড়ীতে ওরা ঢোকে তখন কালীদা বুঝি ওদের সঙ্গে ছিল, আমি ছিলাম না। তখন আমরা ভাগ হয়ে গিয়েছি। কেউ আগে, কেউ পিছনে হয়ে গিয়েছে। ডেড-বডি নিয়ে আসার পর সবাইকে লাইন দিয়ে বসালো। একটি ডেড-বডি পড়েছিল সেটি কেউ আনেনি। আমি আর মাহতাব গেলাম সেটা আনতে, আমাদের সাথে একজন আর্মি ছিল। পরিকল্পনা ছিল যে আমরা ডেড-বডি নিয়ে আসার পর মাটিতে বসব, তারপর আমাদের গুলি করবে। কিন্তু মাহতাবকে দাঁড়ান অবস্থায় গুলি করল, মাহতাব পড়ে গেল এবং সেই সাথে আমিও পড়ে গেলাম। পড়ে যাওয়ার পর আমাকে গুলি করল। গুলিটা সৌভাগ্যক্রমে বুকে লাগেনি, হাতে লাগল, ডান হাতে। তারপর আমি মাটিতে শুয়ে আছি, আর শুয়ে শুয়ে আমি মনে করছি "আমি মরে গেছি।" বর্তমান শহীদ মিনারের সামনে আমাকে গুলি করে আমাকেই শেষ গুলি, আমাকে গুলি করার পর হলে আর কাউকে গুলি করেননি। আমি মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর আর্মিরা গোল হয়ে দাঁড়াল। এর আগে আমি দেখেছি হেলালকে প্রথম গুলিটা করল তারপর করেছে বাচ্চুকে তারপর আর কাকে আমি বলতে পারব না। ওরা যখন মাটিতে শুয়ে নিদারুণ যন্ত্রণায় নড়াচড়া করছে, তখন আর্মি আবার গুলি করেছে আমি মাটিতে শুয়ে শুয়েই বুঝতে পারছি আমার একটা হাত নেই, তারপরে শুনলাম আর্মিরা যেন কমাণ্ড দিচ্ছে, কমাণ্ড দেওয়ার পর সমস্ত আর্মি গাড়ীতে উঠল। গাড়ী স্টার্ট দেওয়ার পর আমি সেখান থেকে পালালাম। পালাবার পর মনে পড়ল বিশ্ববিদ্যালয়, হাউজ টিউটর কোয়ার্টারের কথা সেখানে থাকেন জি. কে. নাথ। কিন্তু স্যারকে মনে হলো ঘটনার সময় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেছি। তারপর বাংলোতে গেলাম, নক করলাম কয়েকবার, কেউ সাড়াশব্দ করেননি। হলের কোণায় থাকতেন ড. এম.এন হুদা। তার বাংলোতে গেলাম দেখলাম কয়েকটা চেয়ার-টেবিল পড়ে আছে বারান্দাতে, লোকজন নেই। শামসুননাহার হল তখনো হয়নি। দেওয়াল

টপকে সেখানে ঢুকলাম। দেয়ালের ভিতরে দিকে কতকগুলো ডেড-বডি পড়ে আছে। ভূগোল ডিপার্টমেন্টে ছিলেন নাফিজ আহমেদ, তার বাংলোর ভিতর দিয়ে সৈয়দ এস.বি. হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার, ওনার বাংলোতে গেলাম এবং পিছনের দেয়াল টপকে বাসার ভিতরে গেলাম। স্যারের স্ত্রী ছিলেন, আমাকে ডেকে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। ২৬ তারিখ দিনটা কাটল, রাত কাটল। ২৭ তারিখে দুপুরে কারফিউ তুলে নিলো ঘণ্টা খানেকের জন্য।

এই সময় আমি হাসপাতালে যাই। হাসপাতালে যাওয়ার পথে দেখলাম হলে লোকজন আসছে। লাশ দেখছে, তখন লাশগুলো একসঙ্গে গর্ত করে পুঁতে রাখা হয়েছে। আমি হাসপাতালে যাওয়ার পর সাত নম্বর ওয়ার্ডে আমাকে নেওয়া হলো। সেখানে দেখতে পেলাম ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে। স্যারের গলায় গুলি লেগেছে। স্যার কথা বলতে পারছেন না। স্যারের পাশে তার স্ত্রী বাসন্তী গুহঠাকুরতা, মেয়ে দোলা, আর ড্রাইভার গোপালকে। আমি গেলাম, আমার আহত হওয়ার কথা স্যারকে বলিনি। আমি স্যারকে জিজ্ঞেস করলাম, "স্যার কেমন আছেন?" স্যার বলল, "ভালো, হলের সব ভালো তো?" বললাম, "স্যার চিন্তা নেই, হলের সবাই ভালো। কারোর তেমন কিছু হয়নি।" স্যার খুব কষ্ট করে বললেন "আমি হয়তো বাঁচবো না। হলের সব ছেলেরা ভালো থাকলেই ভালো। আমি বাঁচবো না। আমার জন্যে তোমরা কোন দুঃখ করো না।" এই ওনার শেষ কথা, তারপর তিনি আর কোন কথা বলতে পারেন নাই। হাসপাতালে ২৯ তারিখ সকালে স্যার মারা যান। কালীদার সাথেও আমার আর দেখা হয়নি। কালীদা আছেন এটা আমি ইদুর কাছে শুনেছি। ইদু হাসপাতালে গিয়েছিলো। তার সাথে যখন আমার দেখা তখন সে বলল যে, "কালীবাবু আছেন, আমি ওনাকে উঠাইয়া নিয়া গেছি।" আমাদের হলে থাকতেন সুরেশ দাস। সুরেশদা তখন এম.এড পড়তেন। তিনি এখন সুনামগঞ্জে ওকালতি করছেন। তার কাছে শুনলাম আমাদের উত্তর বাড়ীর ছাদে একসাথে ন'জনকে গুলি করেছে। ন'জনের মধ্যে একমাত্র সুরেশ দাস জীবিত আছেন। এছাড়া রণজিৎ, রবীন রাত্রে মারা যায় হলে। অনেকদিন পর 'সংবাদ' পত্রিকায় কালীদার লেখা জগন্নাথ হলের বিভীষিকাময় সেই রাতের লেখা পড়ি। পড়ে আবার মনে হয় সেই রাত এবং দিনের বিভীষিকার কথা, যখন আমাদেরকে পাক-আর্মি অর্ডার করছে আর আমরা তা পালন করছি চাকরের মতো আর ভাবছি আমরা মরে যাব। আমার একটা বন্ধু ছিল মাহতাব। তার কেউ ছিল না। সে বলেছিল— তোমরা মরে গেলে কেউ মনে করবে, কিন্তু আমি মরে গেলে কেউ মনেও করবে না।

দেবীনারায়ণ রুদ্রপাল

বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা,
ধান গবেষণা কেন্দ্র, গাজীপুর।

দেবীনারায়ণ রুদ্রপাল জগন্নাথ হলের উত্তর বাড়ীতে সংঘটিত ঘটনার হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন। জগন্নাথ হলের অভ্যন্তরে থেকেও তিনি পাক-বাহিনীর বর্বর আক্রমণ হতে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছেন।

সেদিন ছিল ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ সাল। শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধ। অধিকাংশ ছাত্র হল ছেড়ে চলে গিয়েছে। আমরা গুটিকয়েক ছাত্র সেদিন হলে ছিলাম। রাতে খাবার পর আমরা কয়েকজন উত্তর বাড়ীর তিনতলায় ১২৩ নং কক্ষের বিপরীতে পশ্চিম দিকের কক্ষে ছিলাম। উক্ত কক্ষে থাকতেন পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র উপেন রায় (শহীদ)। আমার কক্ষ ছিল ১২৫। ঐ কক্ষে চার জন তাস খেলছিল। তারা হচ্ছে মাধব সাহা, উপেন রায় (শহীদ), জীবনকৃষ্ণ সরকার (শহীদ) এবং সম্ভবত বাদল দাস (বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাঙ্কে চাকুরীরত)। আমি তাদের খেলা দেখছিলাম এবং হিটলারের 'মেইন ক্যাম্প' বইটি পড়ছিলাম।

রাত আনুমানিক ১১-৩০টা। উত্তর দিক থেকে গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসছিল। শব্দ ক্রমশ প্রচণ্ডতর হচ্ছিল এবং নিকটবর্তী হচ্ছিল। আমি তাস খেলোয়াড়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। সবাই চিন্তা করতে লাগলাম ব্যাপার কি হতে পারে। কেউ কেউ বলল হয়তো বা মহসীন বা সূর্য সেন হলের ছেলেরা কোনরূপ আগ্নেয়াস্ত্রের ট্রেনিং নিচ্ছে। কে যেন বলল, পাকিস্তানের সেনারাও আক্রমণ করতে পারে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালীদের ওপর আঘাত হানতে পারে, টিক্কা খান গভর্নর হয়ে আসার পর হতেই এরূপ একটা গুজব শোনা যাচ্ছিল। যা হোক, গোলাগুলির শব্দের সঠিক তথ্য জানার জন্য আমরা নীচে নেমে এলাম, উদ্দেশ্য জহুরুল হক হলে গিয়ে এ ব্যাপারে সঠিক কোন তথ্য জানা যায় কিনা। আমাদের হৈচৈ-এ হলের আরও কয়েকজন ছাত্র বেরিয়ে এসেছে, সবার নাম মনে নেই। তপন বর্ধনের (বর্তমানে করটিয়া সাদত কলেজের অধ্যাপক) কক্ষে লাথি মেরে তাকে আমি জাগিয়ে দিয়েছিলাম। সেও আমাদের সাথে ছিল (সম্ভবত)। উত্তর বাড়ীর উত্তর-পশ্চিম দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দোতলা বাংলো আছে, তার সামনে দিয়ে আমরা বৃটিশ কাউন্সিলের দিকে অগ্রসর হলাম। আমরা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারলাম না, বৃটিশ কাউন্সিলের সামনের রাস্তায় আসার পর পরই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজীষ্ট্রার অফিসের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মেশিনগানের গুলি মনে হলো আমাদের দিকে আসছে। বুঝতে পারলাম সমূহ বিপদ। দৌড়ে হলের সামনে চলে

এলাম। আরও কয়েকজন ছাত্র ইতিমধ্যে নীচে নেমে এসেছে। সংখ্যায় ১০/১৫ জন হবে। বর্তমানে জগন্নাথ হলের যেখানে শহীদ মিনার, সেখানে আগেও একটি শহীদ মিনার ছিল। আমরা সবাই সেই শহীদ মিনারের পাদদেশে দাঁড়িয়ে। সবাই নিশ্চিত পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আক্রমণ করেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলি তাদের টার্গেট হবে। হলে থাকা নিরাপদ নয়, যত শীঘ্র সম্ভব হল ছেড়ে চলে যেতে হবে। রাত তখন আনুমানিক ১২-৩০টা। যে যেদিকে পারি পালানোর সিদ্ধান্ত নিলাম এবং উচ্চৈস্বরে হলের অনান্যদের ডাকতে শুরু করলাম।

কিন্তু পালানোর সুযোগ পেলাম না। মাঠের পূর্বদিকে ইউ.ও.টি.সি.-এর সামনে থেকে ঝাঁক ঝাঁক গুলি আমাদের দিকে আসতে লাগল। কেউ কারো কথা ভাবতে পারলাম না, জীবন বাঁচানোর জন্যে যে যেদিকে পারল দৌড়ালো। আমি ছিলাম উত্তর বাড়ীর মেইন গেটের সামনের রাস্তায়, দৌড়ে সোজা হলে ঢুকে পড়লাম। পশ্চিম দিকের গেটটা বন্ধ ছিল, বেরিয়ে যেতে পারলাম না, করিডোর দিয়ে দক্ষিণ দিকে দৌড়ালাম। আরও ২/৩ জন আমার সাথে দৌড়ালো বলে মনে হলো। সঠিক বুঝতে পারলাম না বা মনের অবস্থাও বোঝার মতো ছিল না।

ক্ষণিক চিন্তা করলাম কি করব, কোথায় লুকাবো। হল থেকে বেরুবার উপায় দেখছি না। উপায় এসে গেল। দক্ষিণ দিকের পায়খানার দিকে এগুলাম। তিনটি পায়খানার মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দুটিতে আগেই কারা যেন ঢুকে পড়েছিল, মাঝেরটি তখনও খোলা ছিল। সোজা ঢুকে পড়লাম। চিন্তা করলাম পাক-সেনারা হয়তো হলে চলে আসবে, দরজা বন্ধ দেখলে ভেতরে লোক আছে নিশ্চিত বুঝতে পারবে। তাই দরজা খোলা রেখে এক কোণে চুপ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। গায়ের জামা-কাপড় খুলে ফ্লাশের টিউবের ফাঁকে গুঁজে রাখলাম এবং মালকোঁচা দিয়ে যতদূর সম্ভব সোজা হয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকলাম। হলের আলো নিভে গেল। চারিদিকে গোলাগুলির প্রচণ্ডতা বেড়ে গেল। শুনতে পেলাম মাইকের শব্দ, তারা যেন কি বলছে। বুঝতে পারলাম না। এভাবে প্রায় ২৫/৩০ মিনিট কেটে গেল। গোলাগুলি করতে করতে সৈন্যরা হলে ঢুকে পড়েছে বুঝতে পারলাম, আরও বুঝতে পারলাম সংখ্যায় তারা অনেক ছিল। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম টর্চের তীব্র আলো এগিয়ে আসছে দক্ষিণ দিকে। বাঁচার আশা ছেড়ে দিলাম। মনে মনে ভগবানকে ডাকতে লাগলাম, তার করুণা ভিক্ষা করতে লাগলাম। পৃথিবীর সকল চিন্তা থেকে নিজেকে যতদূর সম্ভব মুক্ত রেখে ঈশ্বরকে চিন্তা করতে লাগলাম যাতে করে আমি সংজ্ঞা হারিয়ে না ফেলি।

টর্চের আলো পায়খানার দিকে আসতে লাগল, সাথে অসংখ্য গুলি। দরজার ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেলাম দক্ষিণ দিকে স্নানাগারে কাকে যেন পেল এবং সাথে সাথে এক ঝাঁক গুলি। আর্ত চিৎকার শুনতে পেলাম, ভয়ে হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম

হল। বিপদ বুঝলাম। এগিয়ে এলো সেনারা। আমার উত্তর ও দক্ষিণ দিকের পায়খানার বন্ধ দরজার পদাঘাত করতে লাগল, বেরিয়ে আসতে হুকুম দিল। বুঝতে পারলাম ওরা দরজা খুলে দিল এবং এও বুঝতে পারলাম দক্ষিণ দিকের পায়খানায় সম্ভবত উপেন রায় ছিল। তাকে বোধহয় কিছু দিয়ে আঘাত করল, গুলি না করে ধরে নিয়ে গেল। একজন সেনা আমার পায়খানার দিকে পা বাড়াল, ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললাম। শুনলাম সে কি যেন বলল, তাও অনুভব করলাম (চোখ বন্ধ রেখেই), ওরা সবাই চলে গেল। আরও কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকলাম। যখন বুঝলাম আশে-পাশে কেউই নেই চোখ খুললাম। হলের অন্যত্র দরজা ভাঙার শব্দ, আর্ত চীৎকার, বোমা ও গুলির শব্দ।

আনুমানিক ২০-২৫ মিনিট পর এক দলের আগমন। দুটি ছোট ছেলেকে সাথে করে এসেছে, শুনতে পেলাম (যদিও উর্দুতে) ছাদে উঠার পথ কোনটা বলে দিতে এবং আদমী কোথায় লুকিয়ে আছে জানাতে। ছেলে দুটি কিছুই বলছে না, শুধু হাউ-মাউ করে কাঁদছে। ঐ ছেলে দুটি হলেই থাকতো, ছিন্নমূল, ছাত্রদের ফাই-ফরমাশ শুনত। পরে (২৭শে মার্চ) ছেলে দুটির সাথে দেখা। ওরা বলল, "আপনি কি দক্ষিণ দিকের মাঝখানের পায়খানায় লুকিয়ে ছিলেন? নীচের ফাঁক দিয়ে আপনার পা দেখেছিলাম। ওদেরকে বলিনি।" ভাবলাম ঐ ছিন্নমূল বালকদ্বয়ের বুদ্ধিতে আমি বেঁচে আছি। আমার নিকট সামান্য কিছু টাকা ছিল, তা থেকে ওদেরকে পাঁচ টাকা দিলাম। বললাম, বেঁচে থাকলে পরে যদি দেখা হয় তোদেরকে এই উপকারের জন্য পুরষ্কৃত করব। দুর্ভাগ্যবশত দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ওদের সাথে আর দেখা হয়নি, বেঁচে আছে কি মরে গেছে তাও জানি না। থাক সে কথা। রাত্রি ধীরে ধীরে শেষ হতে চলল। রাত আনুমানিক ২/৩টা হবে। ছাদের উপর থেকে কি যেন দক্ষিণ দিকে পুকুর পাড়ে পড়ছে বলে মনে হলো। মনে হলো ছাদ থেকে গুলি করে কাউকে নিচে ফেলছে। পরে জানলাম আমার অনুমান সত্য ছিল। এরপর প্রায় ঘণ্টাখানেক হলের ভিতরটা বেশ নীরব ছিল। ভাবলাম সবকিছু শেষ করে সেনারা চলে গিয়েছে। রাত শেষ হলেই শেষ হবে এ ভয়াবহ গণহত্যা। আজান পড়ার পূর্বে আবার একদল এলো, আবার দরজা ভাঙার শব্দ, বোমা ও গুলির শব্দ। ধোঁয়ার গন্ধ, হাঁচি আসতে লাগল, নাকে-মুখে কাপড় গুঁজে হাঁচি চেপে রাখলাম। এবার আর কোন আর্ত চীৎকার শুনতে পেলাম না। কিছুক্ষণ পরে সবাই হল ছেড়ে চলে গেল বলে মনে হল।

আজান পড়ল। আবার কাদের যেন আগমন। বেশ অনেক লোক মনে হলো। অল্প কিছু কথাবার্তা ও চীৎকার শুনে বুঝলাম এরা হয়তো সেনাবাহিনীর নয়। উর্দু ভাষী লোক, লুটতরাজের জন্যে এসেছে। কক্ষ ভাঙার শব্দ শুনলাম প্রায় সকাল হওয়া পর্যন্ত। বাইরে অবশ্য গোলাগুলি তখনও চলছিল। সকাল হওয়ার সাথে সাথে হলটা খুব শান্ত বলে মনে হলো। বাইরে গোলাগুলির শব্দ শুনে বুঝলাম অবস্থার পরিবর্তন ঘটে নাই। ধ্বংস ও নিধনযজ্ঞ চলছে, তাই আর বেরুতে সাহস করলাম না। হঠাৎ পায়খানার

কমোডের দিকে তাকিয়ে দেখি কে যেন আগে ওখানে পায়খানা করছিল। জল ঢেলে পরিষ্কার করেনি, তখন পায়খানার ফ্লাশগুলো কাজ করত না। পায়খানা করার পর জল ঢেলে পরিষ্কার করতে হতো নিজেদেরকেই। বুঝলাম কেন পাকিস্তানী সেনারা ঢুকতে চেয়েও আমার পায়খানায় ঢোকেনি। দরজা খোলা রাখা এবং পুরোনো মল জমা থাকার কারণে ওই পায়খানায় কেউ থাকতে পারে বলে ওদের তখন বিশ্বাস হয়নি। আর এই অবিশ্বাসের ফলেই আজ আমি জীবিত। বাইরে গোলাগুলি থাকলেও হলের ভিতরটা সারাদিন মোটামুটি শান্ত ছিল। সারাদিন ২/৩ বার কয়েকজন সৈন্যের হলের করিডোর দিয়ে হাঁটাহাঁটির শব্দ শুনলাম মাত্র। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ধরে আসছিল, ভাবতে লাগলাম কখন মুক্তি পাব। কীভাবে এখান থেকে পালাতে পারি চিন্তা করতে লাগলাম। হঠাৎ মনে হলো দোতলার পায়খানাগুলোর পিছনের জানালায় গ্রিল দেওয়া নাই। পায়খানার পাশের পাইপ বেয়ে নীচে নেমে পালানো যেতে পারে। দক্ষিণ দিক দিয়ে পাইপ বেয়ে নেমে স্টাফ কোয়ার্টারে আশ্রয় নেব বলে স্থির করলাম। হলের ভিতরটা একদম নীরব মনে হওয়ায় সকাল আনুমানিক দশটার দিকে একবার বেরুবার চেষ্টা করলাম পায়খানা থেকে। পায়খানা থেকে তাকিয়ে দেখি ২/৩ জন সৈন্য পূর্ব দিকের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। ভাগ্যিস তাদের দৃষ্টি ছিল উত্তর দিকে। এরপর আর সারাদিন বেরুনোর চেষ্টা করিনি।

চিন্তা করলাম, সন্ধ্যার পর যে আজান হয় তখন দোতলার উত্তর দিকের পায়খানায় চলে যাব এবং সুযোগ মতো পাইপ বেয়ে নিচে নেমে যাব। আজান যখন পড়ল ভগবানের নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এক দৌড়ে সোজা তিনতলায় উঠে গেলাম আমার কক্ষে। দেখলাম কক্ষটা খোলা, ভিতরে ঢুকে দেখলাম আমার বিছানাপত্র সহ চৌকি পুড়ে গিয়েছে। পড়ার টেবিল পোড়েনি। টেবিলের ওপর প্যান্ট ও একটি শার্ট ছিল। ড্রয়ারে ছিল ত্রিশটি টাকা এবং সেল্ফে ছিল আমার ঘড়িটা। ঘড়ির কাঁচটা আগুনের তাপে ফুলে উঠেছিল। ঐগুলি নিয়ে দ্রুত কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলাম এবং করিডোর দিয়ে দৌড়াতে আরম্ভ করলাম। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নামার সাথে সাথে শুনতে পেলাম পায়ের শব্দ— বেশ কজন হবে। দৌড়ে দোতলার উত্তর দিকে পায়খানাগুলির পূর্ব দিকেরটিতে ঢুকে পড়লাম। আগের মতো দরজা খুলে রাখলাম। লোকগুলো (সৈন্য কি সাধারণ লোক বুঝতে পারলাম না) সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে দক্ষিণ দিকে চলে গেল। পায়খানায় দাঁড়িয়ে নীচে নামার পরিকল্পনা করতে লাগলাম। সময়ের অপেক্ষা মাত্র। হলের ভিতরটা শান্ত কিন্তু বাইরে তখনও গোলাগুলির শব্দ, প্রচণ্ডতা কমে এসেছে। মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক থেকে গুলির শব্দ ভেসে আসছে। পায়খানার জানালা দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেলাম সেনাদের টহল গাড়ী-বৃটিশ কাউন্সিলের সম্মুখের রাস্তায় এবং হলের উত্তর দিকের রাস্তায়। কিছুক্ষণ পর পর গাড়ীর শব্দ। স্থির করলাম উত্তর দিকের রাস্তা দিয়ে একটি গাড়ী চলে যাওয়ার একটু

পরেই নেমে পড়ব পাইপ বেয়ে।

একটি গাড়ী চলে গেল। প্রস্তুতি নিলাম। পা বাড়ালাম জানালার বাইরে। হঠাৎ পূর্বদিক থেকে তীব্র আলোর ঝলকানি, সাথে প্রচণ্ড শব্দ। বিল্ডিং কেঁপে উঠল। মনে ভাবলাম ওরা হয়তো হলের দিকে কামান চালাচ্ছে। পর পর কয়েকবার এরূপ ঘটার পর নীচে নামার আশা ছেড়ে দিলাম। প্রাণে বাঁচার আশা ছেড়ে দিলাম, মনে-প্রাণে ভগবানকে ডাকতে লাগলাম। এক একবার বিল্ডিং এতো জোরে কেঁপে উঠতো মনে হতো যে ওরা বোধহয় পুরো বিল্ডিংটাকে ধুলিসাৎ করে দেবে। ইঁটের চাপা পড়েই মরতে হবে শেষ পর্যন্ত! অপেক্ষা করতে লাগলাম সেই চরম মুহূর্তের জন্যে।

ক্রমে ক্রমে রাত শেষ হয়ে এলো। চারদিকে পরিষ্কার হয়ে গেছে। নীচে ও বাইরে তাকিয়ে দেখলাম চারিদিক ফাঁকা। লোকজন নেই। গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে না। বৃটিশ কাউন্সিলের সামনের রাস্তা দিয়ে একটি মিলিটারী গাড়ী চলে গেল। কেটে গেল আরও বেশ কিছুটা সময়। সকাল আনুমানিক ৮/৯টা হবে। ২/৪জন সাধারণ মানুষকে রাস্তায় বের হতে দেখলাম। আস্তে আস্তে রাস্তায় মানুষের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল। অনুভব করলাম হলের ভিতর বহু লোক। কথাবার্তার শব্দও শুনলাম। আস্তে আস্তে জগন্নাথ হলের উত্তর দিকের রাস্তায় লোক চলাচল বেড়ে গেল। তাকিয়ে থাকলাম পরিচিত কাউকে দেখা যায় কিনা। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম আমাদের কয়েকজন শিক্ষককে এবং পরিচিত কয়েকজনকে উত্তর দিকের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে। সাহস পেলাম, হয়তো বিপদ কেটে গেছে। পায়খানা থেকে এবার বেরুবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পায়ের হাঁটুর সন্ধিসমূহে প্রচণ্ড ব্যথা। হাঁটু কুচকানো যায় না। অতি কষ্টে হাত দিয়ে হাঁটু আগলিয়ে আগলিয়ে পায়খানা থেকে বেরিয়ে এলাম। বেরিয়ে দেখি অপর দুটি পায়খানায় প্রচুর রক্ত। মধ্যখানের পায়খানায় দেখলাম একটি সাদা প্যান্ট রক্তে রঞ্জিত। সেনারা বোধহয় হত্যা করেছে যারা পায়খানা দুটোতেই লুকিয়ে ছিল। ভাগ্যিস এই দুটোর কোনটিতে ঢুকিনি। ভয়ে মারা পড়তাম। ভগবানের অশেষ কৃপায় বেঁচে আছি। ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালাম। আমাকে বেরিয়ে আসতে দেখে বহু লোক আমাকে ঘিরে ধরল পায়খানার করিডোরেই। নানারূপ প্রশ্ন শুরু করল, আজ আর সে সব মনে নেই।

আস্তে আস্তে নীচতলায় নেমে এলাম। একজন লোক আমাকে হাঁটতে সাহায্য করলো। গেটের সামনে আসতেই ২০/২২ বছরের একটি মেয়ে (নাম মনে নেই) আমাকে জড়িয়ে ধরে হাও-মাও করে কেঁদে উঠল। তার ভাই পঁচিশে'র রাতে হলে ছিল, তার কোন খোঁজ আমার জানা আছে কিনা জানতে চাইলো। হলের ধ্বংসযজ্ঞে আমারও কান্না পাচ্ছিল। মেয়েটাকে শুধু বললাম 'কিছু জানি না। শুধু বলতে পারি, আমি বেঁচে আছি।'

গেটের সামনে দারোয়ানদের কক্ষে দেখলাম একজন দারোয়ানের অগ্নিদগ্ধ লাশ।

বোমার আঘাতে হাত-পা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন। হল থেকে বেরিয়ে দেখলাম শহীদ মিনার ভেঙে ফেলা হয়েছে। হল বিল্ডিং-এর গায়ে কামানের-গোলায় বিরাট বিরাট গর্ত হয়েছে বেশ কয়েকটি। মাঠের মাঝে (যেখানে গণকবর চিহ্নিত রয়েছে) দেখলাম বুলডোজার দিয়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে মাটি খুঁড়ে চাপা দেওয়ার চিহ্ন। বুঝতে অসুবিধা হলো না যে ওখানে হলের ছাত্রদের এবং অন্যদের হত্যা করে কবর দেওয়া হয়েছে। হলের পরিচিত কোন ছাত্রের সাথে দেখা হল না। তবে সেই দুটি ছেলের সাথে দেখা, যাদের কথা পূর্বেই লিখেছি। হলের চত্তরে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটির পর হল থেকে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়— উদ্দেশ্য কমলাপুর স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে করে চলে যাবো ময়মনসিংহ, সেখান থেকে গ্রামে। তখন টাঙ্গাইল যেতে হতো ক্যান্টনমেন্টের মধ্য দিয়ে এবং বাস চলছিল না। গুলিস্তান এসে শুনলাম ট্রেন বন্ধ।

রাজপথে মানুষের ঢল। সবাই নদী পার হয়ে বুড়ীগঙ্গার ওপারে আশ্রয় নেওয়ার জন্য দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। আমিও তাদের সঙ্গে রওনা হলাম। মেডিক্যালের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় আমার এক বন্ধু এবং সহপাঠী মাহফুজুর রহমানের সাথে দেখা। সে তো আমাকে দেখে অবাক। সব খুলে বলতে চাইলে সে বলল, আগে বাসায় চলো, পরে শোনা যাবে। তার সাথে ওদের বকসীবাজারের বাসায় গেলাম। ওর মা, ছোট বোন (সে মেডিক্যালের ছাত্রী ছিল) আমার ভীষণ যত্ন করলেন। হাটু ও পায়ে গরম সেঁক দিয়ে দিল ওর ছোট বোন। বিকালে চলে যেতে চাইলাম নদীর ওপর পারে। কিন্তু ওর স্নেহময়ী মা কিছুতেই ছাড়লেন না। বললেন, "তুমি এভাবে বাড়ী যেতে পারবে না। আমার ভাগ্যে যা হয় তোমারও তাই হবে। যতদিন অবস্থা মোটামুটি স্বাভাবিক না হয় ততদিন থেকে যাও।" বন্ধুটিও মায়ের সাথে যোগ দিল। অগত্যা থেকে গেলাম। ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত ওখানেই ছিলাম। ১৫ই এপ্রিল বাসে করে বাড়ী চলে এলাম।

বাদলকান্তি দাস

সহকারী পরিচালক
পরিসংখ্যান বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক

মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে জগন্নাথ হলের ছাত্র বাদলকান্তি দাস বেঁচে গেছেন। আর প্রত্যক্ষ করেছেন সহপাঠীর মৃত্যুর দৃশ্য। নির্ভেজাল বক্তব্যে তিনি তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন যার প্রতিটি ক্ষেত্রে তার আতঙ্ক ও মৃত্যুভীতির ছাপ বিদ্যমান।

১৯৭১ সালের ঘটনা বলতে গেলে কিছুটা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন প্রথমেই। আমি তখন একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী। ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ বঙ্গ বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পার্লামেন্ট বাতিল ঘোষণা করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় সে কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়। সে সময় বহু ছেলে হল থেকে বাড়ী চলে যায়। আমার মনে হয় শতকরা দশ জন ছেলেও তখন হলে ছিল না। আমি যেহেতু একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী এবং দেশে আয়ুব-বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে, সেজন্য আমি বাড়ী যাইনি। আমরা আয়ুব-বিরোধী মিছিল-মিটিং করতাম। এবং একথা বলতে এখন লজ্জা নেই আমরা কাঠের বন্দুক দিয়ে যুদ্ধের ট্রেনিংও নিতাম। ২০/২২ জন মিলে প্যারেড করতাম। একথা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে, বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য বা দাবী পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকবর্গ কোন মতেই মেনে নেবে না, বরং বড় রকমের একটা গোলমাল হওয়ার সম্ভবনা। আমাদের একটা ধারণা হচ্ছিল যে পাক-বাহিনী হয় আমাদের আটক করবে, তা না হলে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে নিরীহ জনগণের ওপরে। কিন্তু কীভাবে আসবে সে আক্রমণ, সে ধারণা আমাদের ছিল না। ২৫ তারিখ আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে প্যারেড করে ফিরছিলাম। সন্ধ্যা ছয়টার দিকে মনে যেন কেমন একটা ডাক দিল। রাস্তা-ঘাটে লোকজন কমে গেল। রাস্তায় একটা রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এতো জোরে চালিয়ে যাচ্ছ কেন? সে বলল, জানেন না গুলিস্তানের দিকে রাস্তাঘাট থমথমে হয়ে গেছে! নিউমার্কেট ও এলিফ্যান্ট রোডের দিকে মিলিটারীরা দোকানপাঠ সব বন্ধ করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত বাইরে বের হয়ে দেখি যে, লোকজন সব চলে যাচ্ছে। সবারই মনে এক ভয়— কি জানি মিলিটারীরা কখন আক্রমণ করবে। আমার সাথের ছেলেরা বলল, চল, আর কি করব আমরা হলের দিকেই যাই। আমি তখন বলি, এখনও পর্যন্ত কোন কিছু দেখা যায় না। চল, একটু উয়ারীর দিকে যাই। উয়ারীতে আমার একজন পরিচিত লোক ছিলেন; নাম আর.এন. দত্ত। তার সাথে অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই, তাই ভাবলাম ওনার সাথে একটু দেখা করে আসি। তার বাসায় গেলাম, উনি বললেন, "তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর কি? রিক্সা-গাড়ী সব চলে যাচ্ছে। বলে কি যেন হবে, কি যেন হবে। তোমরা সাবধানে থেকো।" তিনি আমাকে রাতে তার বাসায় থেকে যেতে বললেন। আমি বললাম, দেখুন একসাথে সন্ধ্যাবেলায় মিটিং করলাম, মিছিল করলাম। এখন আমি এখানে থেকে যাব, বাকীরা সব বিপদে পড়বে, আমিও যাই। আমি ওনাদের নিষেধ না শুনে বাসা থেকে চলে আসি। রাস্তায় নেমে কোন রিক্সা না পেয়ে হেঁটে হেঁটেই আসতে থাকি। প্রেসিডেন্ট ভবনের সামনে দেখি বহু মিলিটারী। আমি ভেবে পাই না এখানে এতো মিলিটারী কেন। আমি প্রেসিডেন্ট ভবনের পাশ দিয়ে একটা গলিতে ঢুকে পড়লাম। এতো মিলিটারী দেখে ভাবলাম, অন্যদিনে এখানে পাঁচজন মিলিটারী থাকে না, আজ এখানে এতো মিলিটারী কেন? এইসব দেখে আমার মন যেন কেমন হয়ে গেল। তারপর

উয়ারীর দিকে না গিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম। গুলিস্তানের দিকে এসে দেখি রিক্সা-গাড়ী কিছু নেই, লোকজন নেই, যেন একেবারে থমথমে অবস্থা। আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, লোকজন নেই কেন? তিনি বললেন, "কি জানি ভাই, কোন ভয়ে সবাই চলে যাচ্ছে তুমিও চলে যাও।" তখন আমি একটা রিক্সা পেয়ে তাতে উঠেই হলের দিকে রওনা দেই। সামনে একটু এগিয়ে দেখি সমস্ত রাস্তায় রিক্সা, গাড়ী, মানুষ সব যেন দৌড়াচ্ছে— যেন যুদ্ধ যুদ্ধ অবস্থা। আমি যখন মেডিক্যালের কাছে আসি তখন দেখলাম রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা; কোন লোকজনও রাস্তায় হাঁটছে না। আমি রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করি, কি ব্যাপার? রিক্সাওয়ালা বলে, "রেডিওতে বলেছে যে, নিউমার্কেটের ওদিকে ভীষণ গণ্ডগোল; আপনি তাড়াতাড়ি যান গিয়া।" আমি হলের সামনে এসে তাড়াতাড়ি ওকে পয়সাটা দিয়ে ভেতরে চলে আসি। হলে এসে দেখি আমাদের হলে যে হাউজ টিউটরের রুম ছিল সেই রুমে বসে কিছু ছেলে গল্প করছে। ছেলেদের নাম কিছুতেই এখন আর মনে করতে পারব না। তবে সবাই তখন ছিল পরিচিত। মৃণাল বোস, গণপতি হালদার এবং হরিধন দাস সেখানে ছিলেন, এটুকু শুধু মনে করতে পারি। কালীরঞ্জন শীলকেও বোধহয় একবার দেখেছি সে জটলায়। আমিও তখন মিশে যাই সে ভিড়ে। দেখি সবাই রেডিও শুনছে, রেডিওতে অবশ্য তখন এমন কিছু ছিল না, সবাই মিলে গান শুনছিল। সবাই খেয়েদেয়ে এসেছে। সবারই আলোচনার বিষয় ছিল একটা— কিছু একটা ঘটবে। কিন্তু কি ঘটবে তা আমরা কেউ ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমি রুমে চলে আসি, আমার রুম ছিল গ্রাউন্ড ফ্লোরে, দক্ষিণ দিকে, রুম নং ৩৩। রুমে গিয়ে আমি শুয়ে পড়ায় সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়ি। হঠাৎ বিকট গুমগুম শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। আমার মনে হল মেশিনগান বা ১০/২০টি স্টেনগান একত্রে মারলে যে শব্দ হয় ঠিক সেরকম শব্দ। আমার ঘুম তখনও ভালোভাবে ভাঙেনি। আধো ঘুম আধো জাগরণ অবস্থায় আমার মনে হলো স্বপ্ন দেখছি। পরে দেখলাম যে শব্দ ক্রমে ক্রমে বাড়ছে এবং আওয়াজও ক্রমেই এগিয়ে আসছে। তখন আমি ঘুম থেকে উঠে গেলাম এবং বিছানা থেকে উঠে বসলাম। লাইটের সুইচ অন করে দেখি লাইট জ্বলে না। আমি রুম খুলে বাইরে বেরুলাম। বাইরে আওয়াজ হচ্ছে প্রচণ্ড। হঠাৎ আমার মনে হলো আমি তিন তলায় উঠে দেখি। আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠছি কিন্তু কোন ছেলেকে দেখতে পেলাম না। তিনতলায় উঠে গিয়ে দেখি মিলিটারী সমস্ত হল ঘিরে ফেলেছে। আমাদের পূর্বদিকের দেওয়ালের পাশে যে ইউ.ও.টি.সি. সেন্টার ছিল সেখানে আমার মনে হলো কামান বা ট্যাঙ্কের মতো কি যেন দেখলাম। সেখানে অনেক শব্দ হচ্ছিল এবং অস্ত্রসহ অনেক মিলিটারী ঢুকে গিয়েছিল সেখানে। কিছু ওদিকে যাচ্ছে, কিছু এদিকে আসছে— এভাবে ভাগ হয়ে তারা আস্তে আস্তে হলের ভিতরে ঢুকে গেল। এসব দেখে আমি প্রথমটায় খুব ভয় পেয়ে যাই, তারপর দৌড়ে আমার রুমে আসি। আমার রুমে এসে চিন্তা করি কি

করা যায়। শুধু এটুকুই চিন্তাতেই এলো মিলিটারী হল আক্রমণ করেছে। এটুকু চিন্তা আসতেই দৌড়ে আমি মেইন গেটে চলে আসি; দেখি মেইন গেট দুদিক থেকে বন্ধ, ২/৩টা করে তালা মারা। দারোয়ান রুমে নক্ করে দেখি তারাও কেউ নেই, দারোয়ানে রুমের সুইচ অন করে দেখি সে লাইটও জ্বলে না। আমি তখন মনে করলাম আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছি, কিন্তু কেউ কেউ তখনও জেগেই ছিল। হয়তে বা তারা মিলিটারীর সাড়া পেয়ে আগেই সরে গেছে আবার মনে হলো কেউ বুঝি মেইন সুইচ বন্ধ করে গেটে তালা মেরে ওখানে বসে আছে বা কোথাও লুকিয়ে আছে। তখন আমার ভয় হলো, ভেবে পেলাম না আজকে আমার কপালে কি আছে। কিন্তু নীরবে আর কতক্ষণ বসে থাকা যায় এইভাবে? হঠাৎই আমার মনে হলো মিলিটারী নিশ্চয় এসেছে ইন্টেলিজেন্সের কোন খবরের উপর ভিত্তি করে। আমার রুমে তো অনেক নেতা এসে থাকতেন। আমার রুমের কোন লিস্ট হয়তো থাকতে পারে ওদের কাছে। শুধু তখনই আমার মনে হলো রুমে থাকা আমার জন্য নিরাপদ হবে না। এ কথা চিন্তা আসা মাত্র আমি আমার রুম থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠি। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মনে হলো বাথরুমে যাব, বাথরুমে গিয়ে লুকাব। বাথরুমে যাব, এমন সময় দেখলাম বাথরুমের দরজা খোলা। তারা যখন আসবে তখন তো বাথরুমও তো চেক করবে, কাজেই বাথরুমে কি নিরাপদ হবে? এই কথা ভেবে যখন বাথরুম থেকে বের হবো, এমন সময় বাথরুম থেকে মাধবগোবিন্দ সাহা বের হয়ে এলো। দেখি সে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। আমি জিজ্ঞাসা করি— মাধববাবু, কি হয়েছে? কিন্তু তিনি কোন কথাই বলতে পারছিলেন না। আমি মনে করলাম, উনি হয়তো অনেক আগে থেকে জেগে ছিলেন, উনি অনেক শব্দ শুনেছেন এবং অনেক কিছুই দেখেছেন, সেজন্য হয়তো তিনি ভয়ে কাঁপছেন। উনি বললেন, "এতক্ষণ বাথরুমে ছিলাম কিন্তু আমার এখন মনে হচ্ছে বাথরুমে থাকাটা নিরাপদ নয়।" আমি বললাম, "চলুন আপনার রুমে যাই, সেখানে দুটো চৌকি আছে তার নীচে আমার দুই জন লুকিয়ে থাকি। তারপর কপালে যা আছে তা হবে। মৃত্যু যদি থাকে তবে তা কেউ ঠেকাতে পারবে না। রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে? চলুন আমরা দুই চৌকির নীচে ঢুকে হরির নাম যপ করতে থাকি।" তার রুমে ঢুকে চৌকির নীচে ঢুকছি, এমন সময় হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ শুরু হল। তার মানে মিলিটারী গেটের সামনে চলে এসেছে এবং গেট ভাঙছে। তবে কি দিয়ে গেট ভাঙছে তা বুঝতে পারছিলাম না, শুধু গেট ভাঙার বিকট আওয়াজ পাচ্ছিলাম। এই শব্দ শোনার পর হঠাৎই আমার সমস্ত অনুভূতি লোপ পেল, কিভাবে যে চৌকির নিচে ঢুকলাম তা বলতে পারবো না। চৌকির নীচ থেকে বুঝতে পারছিলাম মিলিটারী গ্রাউন্ড ফ্লোরে এসে পড়েছে, তাদের জুতোর আওয়াজ পাচ্ছি। মানসিক অবস্থা তখন এমন যে, বুকের ভিতর টিপটিপ করে লাফাচ্ছিল হৃৎপিণ্ড, সমস্ত শরীরের লোম দাঁড়িয়ে গেছে, গরম হয়ে যাচ্ছে মাথা। হৃৎপিণ্ডের গতি

এতো দ্রুত হচ্ছিল কোন মতে তা চেক দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল হৃৎপিণ্ডের গতি থেমে যাবে এখুনি। মিলিটারীরা গুমগুম করে দরজা ভাঙছিল। আমরা দুইজনে চৌকির নীচ থেকে বুঝতে পারছিলাম না কাকে মারছে, কাকে ধরছে। শুধু শুনতে পাচ্ছিলাম গুলির শব্দ, গগনবিদারী আর্তচীৎকার আর মৃত্যুপথযাত্রী আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত আকুল আর্তি "বাঁচাও বাঁচাও"। আমি তখন হৃৎপিণ্ডের ক্রমাগত দ্রুত স্পন্দন কমাতে ১-২-৩ গুনতে মগ্ন। বিশ্বসংসার আমার কাছে অচল, স্থবির। আমার চিন্তায়-চেতনায় কেবল শব্দ পাচ্ছি। আমারই নিজস্ব হৃৎপিণ্ডের ক্রমাগত লাফিয়ে চলার দুরন্ত শব্দ। সে শব্দ ছাপিয়েও মাঝে মাঝে কানে বাজে আহাজারি আর আমার বুক থরথর করে কাঁপে। যতবার পারি জপতে থাকি— হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ আর কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা জানাতে থাকি, হা কৃষ্ণ তুমি ছাড়া তো আজকে আর কোন গতি নেই। যদি রাখো তবে আবারও দেখব পৃথিবীর আলো বুক ভরে, নেব হাওয়া, গন্ধ, বাঁচিয়ে না রাখলে এই তো শেষ। ততক্ষণ মিলিটারী তিনতলায় পৌঁছে গেছে, রুম ভাঙছে যাকে সামনে পাচ্ছে, তাকে গুলি করছে এটুকুই শুধু বুঝতে পারি। এ অবস্থায় অনুমান একেবারে অবাস্তব, কারণ শারীরিক কিংবা মানসিকভাবে সুস্থ না হলে কারো পক্ষে অনুমান সম্ভব নয়। মৃত্যুর মুখোমুখি না দাঁড়ালে মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করা একেবারে কল্পনাতীত ব্যাপার। তখন আমার মানসিক বৈকল্যের অবস্থা। কিন্তু তার মাঝে মনে হলো, মরে তো যাবই একবার পিতা-মাতাকে একটু স্মরণ করে নিই। পিতা-মাতার নাম স্মরণ করে নিলাম আর হরে কৃষ্ণ নাম জপ করতে লাগলাম। আমি শুনতে পেলাম মিলিটারীদের একজন আর একজনকে উচ্চৈস্বরে কি বলছে। কথাগুলি এখন আর ঠিক মনে পড়ছে না। তবে এটুকু মনে আছে, বলছিল "যেখানে পার বাথরুম, ল্যাট্রিন চেক করো, সবাই ধরো, মারো।" এরকম কি সব যেন। আমরা যে রুমে ছিলাম, সেই রুমের ফার্স্ট ফ্লোরে বাথরুমের কর্ণার থেকে ২/৩ টি রুম রেখে তার পর সব রুম চেক করে আসছিল। ধুপধাপ শব্দ করে কে যেন দৌড়ে আসছিল। পিছন থেকে তার বজ্রহুংকার ভেসে এলো "ডন্ট স্টেপ মোর"। তারপরে স্টেনগানের শব্দ। শব্দ হলো কারো পতনের। তখন আমার হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে দ্রুতলয়ে শত-সহস্র গুণ। হঠাৎ আমার খেয়াল হলো, একটা বোকামি করে ফেলেছি, আমরা আমাদের রুম ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছি। তখনকার সেই দিশেহারা অবস্থায় এটুকু সাধারণ জ্ঞানও আমাদের লোপ পেয়েছে যে, কোন রুম ভেতর থেকে বন্ধ থাকে তবে স্বভাবত সবাই ধরে নেবে ভেতরে লোক আছে। আমার তখন মনে হলো যেন আমাদের রুমের কাছে মিলিটারী আসল। বন্ধ দরজায় লাথি বা অন্য কোন কিছু দিয়ে বেশ কয়েকবার আঘাত করলো। প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হলো আমার মৃত্যুর দূত যেন উদ্দ্যত খাঁড়া হাতে আগুয়ান আমার বন্ধ দরজায়। গলা শুকিয়ে কাঠ, বুকের ধড়ফড় তীব্রতর, ২/৩ কলসি জল একেবারেই গিলে ফেলতে

পারি। অনেকগুলো আঘাতের পর হঠাৎ করে দরজাটা ভেঙে পড়লো, হঠাৎ করে তীব্র, তীক্ষ্ণ আলোর ঝলকানি দিয়ে ঘরে ঢুকলো মিলিটারী, আমরা দুজন যে দুটো চৌকির নীচে শুয়েছিলাম সে দুটো চৌকির মাঝখানে কিঞ্চিৎ ফাঁক ছিল লোক চলাচলের। সেই ফাঁক দিয়ে হেঁটে গেল মিলিটারী, আমি শুধু তাদের জুতো দেখতে পেলাম। আমার শুধু মনে হতে লাগল মিলিটারী যদি মাথা নিচু করে একটু তাকায় চৌকির নিচে, তবে আমাদের আর কোন কথা বলতে হবে না কোনদিনও। কৃষ্ণের কৃপায় মিলিটারী আর চৌকির তলার দিকে দেখলো না, একজন অপরকে বলল এখানে কোন আদমী নেই, তারপর তারা চলে গেল। অন্যান্য রুমগুলোতে তখনও তাণ্ডবলীলা চলছে তার শব্দ পাচ্ছিলাম। মিলিটারী বের হয়ে যাবার পর আমার শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক চেয়েও কম ছিল। যদিও মিলিটারী চলে গেছে আমাদের রুম থেকে কিন্তু তবুও মৃত্যুভয় আমার তখনও কাটেনি।

আমি যখন দৌড়ে গেটের কাছে যাই, তখন হলে কাজ করত যে দুটো অনাথ ছেলে, তাদের বসে থাকতে দেখছিলাম। মিলিটারী সেই ছেলেদুটোকে ধরে নিয়ে আসে তাদের সাথে। এতে অবশ্য তাদের সুবিধা হয়েছিল, হলের ছেলেরা কোথায় বসে বা থাকে এগুলো মিলিটারীর পক্ষে চেনা বা জানা সম্ভব নয়। এদের ধরে নিয়ে এসেছিল সে সব জায়গা চিনিয়ে দিতে। আমাদের ছাদের উপর কিছু ছেলে লুকিয়ে ছিল। আমার মনে হয় ছেলেদুটোকে তারা ছাদে যাওয়ার সিঁড়ি দেখিয়ে দিতে বলছিল। তা না হলে মিলিটারীর পক্ষে ছাদে ওঠা সম্ভব ছিল না, কারণ ছাদে যাওয়ার সে সিঁড়িটা ছিল একটা স্টোর রুমের ভিতরে যা তাদের জানার কথা নয়। ছাদে আমাদের অনেক বন্ধুকে তারা খুঁজে বের করে গুলি করে। প্রায় সবাই মারা যায় তবে তাদের মধ্যে আহত অবস্থায় বেঁচে একজন। আমার ধারণা মিলিটারীর মস্তিষ্কের সুস্থতা ছিল না। কিংবা তারা মদ খেয়ে এসেছিল। এজন্য তারা বার বার চেক করছে এবং কোথায় কোথায় চেক করছে তা তারা ভুলে যাচ্ছে। আমরা যে ঘরে লুকিয়েছিলাম প্রথমবার, আমাদের না পেলেও আরও কয়েকবার তারা সে ঘরে পদচারণা করে, কিন্তু তখনও পায়নি। ধীরে ধীরে দিনের আলো ফুটে উঠল। আস্তে আস্তে আলোকিত হয়ে উঠল ঘরের সব কিছু। তখন ভয় আমার আরও বেড়ে গেল। ভাবলাম, রাতের বেলা আমাদের দেখেনি ঠিকই কিন্তু এখন তো দিন, এখন নিশ্চয় আমাদের দেখে ফেলবে। তার মানে এ যাত্রা বাঁচার আশা এখানেই ইতি। যেখানে যে অবস্থায় ছিলাম এখনো ঠিক সে অবস্থায় আছি, একটু নড়াচড়া করার উপায় নেই- কারণ তাহলে ব্যাগ এবং বিভিন্ন জিনিসপত্র নড়ে এবং শব্দ ওঠে কড়কড় করে। সকালবেলা মিলিটারী আবার এলো, আবারও সোজাই চলে গেল, চৌকির নিচে দেখেনি। আশেপাশে সমস্ত দামী জিনিস তারা নিয়ে গেছে, বাকী জিনিসপত্র দুই চৌকির মাঝে রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। আগুন যে জ্বলছে তা আমি বুঝতে

পারছি না, ধোঁয়া উঠছে, নীচে একটা গরম গরম ভাব। যখন দেখি ঘরের সমস্ত কিছুই পুড়ে গেছে এবং পোড়া জিনিস সব পোড়ে পোড়ে ভাব তখন আমি আমার সাথের লোকটাকে জিজ্ঞাসা করি এখন আর কিভাবে থাকা যায়? এরপর আমি আস্তে আস্তে উঠে দরজার কোণায় দাঁড়িয়ে কান পেতে থাকি। কিন্তু কোন শব্দই পাই না। তৎক্ষণাৎ চিন্তা করে ফেলি কি করলে আমি সহজে বাঁচতে পারি। চিন্তা করলাম মেডিক্যালের দিকে দৌড় দিলে মিলিটারী দেখে ফেলতে পারে, এস.এম হলের দিকে মিলিটারী থাকা বিচিত্র কিছু নয়। আমাদের হল থেকে সব চেয়ে কম দূরত্বে হলো রোকেয়া হলের হাউজ টিউটরের বাসা। কোনমতে এ রাস্তাটা পার হতে পারলে আমি বেঁচে যাব। যেই ভাবা সেই কাজ, আমি এক দৌড়ে হলের দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে চলে গেলাম। উত্তর দিকে যেয়ে দেখি ৫/৬ সিটের একটা রুম ছিল, সেখানে অনেক ছেলেরা থাকত। সেখানে ৪/৫টা লাশ পড়ে আছে, চারিদিকেই রক্তের গঙ্গা। আমি আর চাইতে পারি না, এ বীভৎস দৃশ্য দেখে আমার চোখে জল চলে এলো। আমার মনটা এতো বিমর্ষ হয়ে গেল যে আমি কিছু চিনতে পারি না, আর কিছু বুঝতে পারি না। আমি যখন দৌড়ে গেছি, নীচে থেকে শুনতে পেলাম একটা জুতোর আওয়াজ। আমি ভাবলাম মিলিটারী আসছে। তখন দৌড়ে বাথরুমে ঢুকে গেলাম এবং একটা পায়খানার ভেতর ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে দরজা আটকে দিলাম, পায়খানার জানালা ছিল ভাঙা, সে ভাঙা জানালার ভেতর গলে জলের পাইপ বেয়ে আমি নীচে নেমে এলাম। নীচে নেমে প্রথমে আশেপাশে তাকিয়ে দেখলাম কোন মিলিটারী দেখা যায় কিনা। কোন মিলিটারী না দেখে হামাগুড়ি দিয়ে হলের ওই দেওয়াল টপকে রাস্তা পার হলাম। শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখি রক্ত আমার বিভিন্ন জায়গায় জমাট বেঁধে গেছে আর জল পিপাসায় জীবন যায় যায় অবস্থা। রাস্তাঘাটে একটা কাক-পক্ষীও নেই। তখন ধীরে ধীরে আমি স্টাফ কোয়ার্টারে গিয়ে নক্ করলাম জল খাওয়ার জন্য, কিন্তু কোন শব্দ নেই। দরজা-জানালা সব বন্ধ, কেউ দরজা খুলল না। তখন আমার মনে পড়ল উদয়ন স্কুলের কাছে স্টাফ কোয়ার্টারে কেমিষ্ট্রী প্রফেসর আলী মোহাম্মাদের ছেলে হালিম নামে এক ছাত্রের কথা। সে আমার সঙ্গে পরিচিত। দরজা নক্ করার পর তারা দরজা খুলে দিল। আমার কাছ থেকে তারা সমস্ত ঘটনা শুনলো। এতো কাছে থাকা সত্ত্বেও শুধুই তারা টের পেয়েছে গণ্ডগোল হয়েছে কিন্তু ছাত্রদের মারছে, একেবারেই মেরে ফেলছে তা তারা ধারণা করতে পারেনি। আমার মুখ থেকে সমস্ত কথা শুনে তারা বুঝতে পারল জগন্নাথ হলে সব ছেলেকে মেরে ফেলেছে। ২/৪ জন বেঁচে থাকলেও থাকতে পারে। তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করল কজন বেঁচে আছে? আমি বললাম— কয়জন বেঁচে আছে তা আমি বলতে পারব না, তবে আমি অনেক কষ্ট করে বেঁচে আছি এইটুকু শুধু বলতে পারি। তারপর তাদের বাথরুমে গিয়ে শরীরের সমস্ত জমাট বাঁধা রক্ত পরিষ্কার করে হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নিলাম। ওদের ঘর থেকে জামা-পায়জামা দিল, সেইগুলো পরে

বিকালবেলা বাইরে চলে এলাম। উদয়ন স্কুলের কাছে আমার একজন বন্ধু ছিল, আমার সাথে পড়ত, নাম ভুলে গেছি। ওদের ওখানে গেলাম, দরজা নক্ করলাম, দরজা খুলল। আমার কাছে সমস্ত শুনলো। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি জগন্নাথ হলের ছাত্র, আমি থাকলে তাদের বিপদ হতে পারে এই ভয়ে আমি আশ্রয় চাওয়া সত্ত্বেও তারা আমাকে আশ্রয় দিল না। তারা আমাকে সেখান থেকে চলে যেতে বলল। যেহেতু আমি হিন্দু মানুষ, মিলিটারীরা যদি জানতে পারে আমি সেখানে, তবে যদি আবার তাদের ওপর আক্রমণ করে, এই ভয়ে তারা আমাকে আশ্রয় দিল না। যাই হোক আমাকে যখন বের করে দিল তখন আমি ২৬ তারিখ সন্ধ্যার দিকে উদয়ন স্কুলের গেটটা ক্রস করে ভিতরে গেলাম। আমাদের চট্টগ্রামে দীপক নামে একজন ছাত্র, জগন্নাথ হলে ভি.পি ছিলেন, তার কাছে গেলাম। তিনি তখন বাণিজ্য বিভাগের একজন শিক্ষক। উনি ব্যাচেলার ছিলেন। তার ওখানে গেলাম। যেয়ে দেখি উনি নেই, বাসা থেকে বলল তিনি চলে গেছেন। তখন আমি আর কি করব, সমস্ত বাড়ী ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ। উদয়ন স্কুলের পশ্চিম পাশে যে প্রফেসর কোয়ার্টারগুলি ছিল তার মাঝখানে একটা লাল একতলা বিল্ডিং ছিল। আমি যখন বুঝতে পারছিলাম কোথাও আর আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়, তখন আমি আর কাউকে ডিসটার্ব না করে ওই লাল বিল্ডিং-এর বারান্দাটা খুব বড়ো ছিল, সে বারান্দাটায় গিয়ে খালি দরজার সামনে শুয়ে রইলাম। রাত দশটার দিকে প্রফেসর সাহেবের স্ত্রী দরজা খুলে বাইরে বের হলেন এবং হঠাৎ আমাকে দেখে আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল, "আরে এ কি!" তখন সবাই একটা ভয়ের মধ্যে ছিল, এদিকে জগন্নাথ হল, ওদিকে ইকবাল হল; ইকবাল হলে তখনও আওয়াজ হচ্ছিল। স্যারের স্ত্রীর চিৎকারে স্যারও বেরিয়ে এলেন। কোন ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক তিনি ছিলেন, আমার এখন মনে নেই, ফার্মেসী অথবা এ্যাপলাইড কেমেষ্ট্রী। আমি তাকে বললাম, "স্যার, আমি জগন্নাথ হলের ছাত্র, কোনমতে বেঁচে আছি। আমি আপনাদের কোন ডিস্টার্ব করছি না রাতটা আমি এখানে কোনমতে কাটাতে চাই। আপনাদের এখানে তো বারান্দা আছে আর কোথাও তো বারান্দা নেই।" তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার বাড়ী কোথায়?" আমি বললাম, 'আমার বাড়ী চট্টগ্রামে।' তিনি বললেন, "আমার বাড়ীও চট্টগ্রামে। এসো, এসো ভেতরে এসো"। তার বাড়ী ছিল সম্ভবত মীরেশ্বরাই। উনি আমাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে বসালেন। ওনার কাছে বসে আবার সমস্ত ঘটনাটি খুলে বললাম। ওনার ঘরে ঢুকে দেখলাম মানুষ কেমন ভয় পেয়েছে। ওনার স্ত্রী-ছেলে-মেয়েদের মুখ ভয়ে শুকিয়ে পাংশুবর্ণ হয়ে গেছে। তিনি আমাকে সামান্য কিছ খাবার দিলেন। সবাই বসে সমস্ত রাত কাটালাম, ঘুমোলে আরও বিপদ বেশী হবে। ঘুম এলো না সারারাত। রাত কাটিয়ে দেওয়ার পরে সকালে উঠে আমরা টেলিভিশনের কাছে বসলাম। দেখলাম জেনারেল টিক্কা খান একটার পর একটা কি যেন ঘোষণা দিচ্ছেন। এইসব ঘোষণা দিয়ে

কারফিউ-এর ঘোষণাও দিলেন। কারফিউ দেওয়াতে সমস্ত লোকজন আটকা পড়ে গেল। ২৭ তারিখ সকাল ন'টার দিকে কারফিউ উঠিয়ে নেওয়া হলো। তখন স্যার বললেন, ''এখানে থাকা সম্ভব হবে না। আমি ধানমণ্ডি চলে যাব আমার শ্বশুরের বাড়ীতে। কারফিউ এখন নেই, তুমি যেখানে পার পালাও। ঢাকা শহরে আর থেকো না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তুমি, শহর ছেড়ে একেবারে চলে যাও।'' খালি পায়ে, ছেঁড়া একটা জামা, ছেঁড়া একটা পাজামা পরে বেরুলাম। আমার কাছে একটাও পয়সা নেই। ওখান থেকে বের হয়ে উদয়ন স্কুলের গেট দিয়ে এস.এম. হলের পাশ দিয়ে জগন্নাথ হলে এলাম। আমার মানসিক অবস্থা তখন এমন হয়ে গেছে যে রাস্তায় হাজার হাজার লোক দেখে আমার মনে হলো এ সমস্ত লোক রাস্তায় আটকে পড়ে গেছে। এখন তারা যার যার গন্তব্যস্থলে যাচ্ছে। তখনও সম্ভবত প্রফেসরস কোয়ার্টারস, হল, বস্তি, শেখ সাহেবের বাড়ি এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছাড়া আর কোথায় আক্রমণ হয়নি। আমার মনে হল জগন্নাথ হল, ইকবাল হল, এস. এম. হলে কি হয়েছে তা দেখবার জন্য লোকজন রাস্তায় বার হয়েছে। আমি যখন জগন্নাথ হলের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি তখন আমার যে কি অনুভূতি। আমি তখনও ভয়ে এতো কাতর যে প্রতিজ্ঞা করলাম, এখন আর জগন্নাথ হলে ঢুকব না। আমি আর হলেও ঢুকলাম না, আর রুমেও এলাম না। আমার টাকা-পয়সা, সার্টিফিকেট, ঘড়ি, মশারি সেরকমই রয়ে গেল। আমি সেই অবস্থায় হলের পাশ দিয়ে মেডিক্যাল হয়ে রাস্তায় হাঁটছি। রাস্তায় একটা রিক্সা নেই। শহীদ মিনারের কাছে গিয়ে দেখলাম শহীদ মিনার ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। অনেক জায়গায় রক্তের দাগ, মনে হয় প্রচুর মানুষ মেরেছে। আর একটু এগিয়ে দেখি মেডিক্যালের সামনে হাজার হাজার মানুষের জটলা। আমি সেখানে ঢুকলাম না। উয়ারীতে আর. এন দত্ত মহাশয়ের কাছে চলে গেলাম। যাওয়ার পথে একটা বীভৎস দৃশ্য দেখলাম— গভর্নর ভবনের পাশে যে বস্তিটা ছিল তা পুড়িয়ে দিয়েছে, সেখানে আর কিছু নেই। লোকমুখে শুনলাম বস্তির সব লোক পুড়ে মরেছে।

বেনেডিক্ট ডায়াস

বাণিজ্য বিভাগের কৃতী ছাত্র বেনেডিক্ট ডায়াস জগন্নাথ হলের ডাইনিং হলে আত্মগোপন করে ৭১-এ গণহত্যার হাত হতে রক্ষা পান। ডাইনিং হলের অভ্যন্তর হতে ঘটনাপ্রবাহ যতটুকু দেখেছেন আর বাকীটুকু শুনেছেন সাথী বন্ধুদের নিকট হতে, তার বিবরণ দিয়েছেন তিনি।

২৫শের রাক্ষুসে রাত্রির কাহিনী আমি ভুলবো না। সে ভয়াল রাতের নৃশংসতম

কাহিনী সব চেয়ে ভয়ের কাহিনীকে হার মানায়। ১৯৬৯ সালের কুচক্রী আইয়ুব খান আন্দোলনের মুখে গদি ছাড়তে বাধ্য হলেন বটে কিন্তু ক্ষমতা দিয়ে গেলেন ইয়াহিয়া খানের হাতে। ইয়াহিয়া, ৭০ সালের নির্বাচন দিতে বাধ্য হলেন। বিজয়ী হলো (১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি) আওয়ামী লীগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে। অবস্থা বেগগতিক দেখে ক্ষমতা ছাড়তে চাইলেন না ইয়াহিয়া, পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর যোগসাজশে। জুলফিকারের ফিকির আমাদের বুঝতে বাকী রইল না। ইয়াহিয়া খান ১লা মার্চ ঘোষণা করলেন : জাতীয় সংসদের অধিবেশনে বসবে না। তার এই অবাঞ্ছিত ঘোষণায় সারা পূর্ব বাংলার লোক গর্জে উঠল। অবস্থা যখন ক্রমেই হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে তখন আলোচনার নামে ইয়াহিয়া কালক্ষেপণের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অস্ত্র ও সৈন্য আনতে লাগল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ও হলে তখন অলিখিত ছুটি চলছিল। অধিকাংশ ছেলে বাড়ী চলে গেছে। যে কয়েকজন রয়ে গেছে, তারা শহরে নানা কাজে জড়িয়ে আছে অথবা আন্দোলন দেখতে দেখতে নেশা ধরে গেছে; এর পরিণতি দেখতে চায়। আমি ছিলাম শেষের দলে। চাটগাঁ থেকে স্নেহময় দাদা (রেমণ্ড ডায়াস) বার বার তাগাদাপত্র দিচ্ছেন, "চলে আয় চাটগাঁ, দেশের অবস্থা ভালো না।"

প্রতিদিনের মতো খাওয়া-দাওয়া সেরে সেদিনও আমরা কজন হলের লনে বসে আলাপ করছি। এমন সময় ৫-৬ জন ছেলে ঝড়ের বেগে বলে চলে গেল : "পাকিস্তানী আর্মি এদিকে মার্চ করে আসছে তোমরাও পালাও।" কথাটার তত গুরুত্ব দিলাম না। তখন গুজবে ভর্তি সারা শহর। আমরা খানিক আগে যেমনটি ছিলাম তেমনটি নিরুদ্বেগে লনে বসে উৎসাহের সঙ্গে গল্প করছি। কিন্তু তাদের সতর্কবাণীর গুরুত্ব দিতেই হলো। যখন সে ছেলের দল আবার এসে মরিয়া হয়ে বলল, "তোমরা এখনও আছ, সরে যাওনি?" তখন আমাদের টনক নড়ল। অবস্থা বেগতিক দেখে প্রিয়নাথ দারোয়ানের টর্চ নিয়ে মৃণাল বোসকে সাথে করে আমি সলিমুল্লাহ হলে গেলাম। দেখি, হল ফাঁকা। গেলাম ইকবাল হলে (বর্তমানে সার্জেন জহুরুল হক হল)। সে হলও ফাঁকা। কেবল কর্মরত দারোয়ান পায়চারি করছে, এরাই বললেন, "সব ছেলে চলে গেছে হল ছেড়ে।"

দেখি, অবস্থা ভীষণ বেগতিক। ফেরত এলাম হলে। কি করব ভাবছি। হলের পুকুর পাড়ে আমি, সত্যরঞ্জন বাড়ৈ, সুশীল মোদক সম্ভাব্য করণীয় কাজ সম্পর্কে কথা বলছিল। মাখন দারোয়ান টর্চ হাতে আসছিল উত্তর ভবন থেকে। সিলেটের টানে শুধালে, "বাবু হিতা হইচে?" "কি হয়েছে দেখি।" আমার উত্তর।

পুকুরপাড়ে আমরা চারজন দাঁড়িয়ে কথা বলছি। এমন সময় আমাদের লক্ষ্য করে মাঠের অপর দিকে থেকে প্রচণ্ড আওয়াজ হলো। এ আওয়াজ জনজীবনে সম্পূর্ণ নতুন ও অপরিচিত। তখন উত্তর বাড়ির দিকে মুখ করে কথা বলছিলাম আমরা। এমন সময়

এক ঝাঁক গুলি এলো আমাদের দিকে। ভাগ্যিস ডানদিকে একটা ছোট্ট আমগাছ ছিল। গুলি লেগে গাছের ডাল ভেঙে গেল, নইলে তখন আমরা কুপোকাৎ হতে পারতাম। যা হোক বুঝতে আমাদের একটুও বেগ পেতে হলো না যে, পাকিস্তানী বাহিনী নৃশংস নির্যাতন শুরু করেছে। তখন লাফিয়ে পড়ে আমরা পুকুরের খাদের নিচে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। গুলি বৃষ্টির মতো ধুলোবালি-পাতা উড়িয়ে আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। এই মহাসংকট অবস্থায়ও আমি সাহস ও ধৈর্য্য হারাইনি। স্রষ্টাকে এর জন্যে ধন্যবাদ। মুহূর্তে আমি কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। জলে ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো ধরে বাঁচতে চায় তেমনি পুকুরের খাদ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে হল সেলুনের পাশ দিয়ে উপরে উঠলাম। হলে ঢুকে একটা প্যান্ট ও কেডস্ জোড়া পড়ে (দৌড়াবার সুবিধার জন্য) ডাইনিং হল লাগোয়া শেষ "স্টোর রুমে" ঢুকলাম। সেখানকার অবস্থানটা এরকম : ডাইনিং হলের প্রথমে সবজি কাটাকুটির ঘর, এরপর রান্নাঘর তারপর আর একটা স্টোর রুম, তারপরের স্টোর রুমে লুকাই আমরা। ঐ কক্ষে আমরা চারজন বসে আছি; মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছি।

এভাবে মৃত্যুর জন্য আমরা যখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত, তখন এলো পাক-বাহিনী। টপাটপ তারা একতলা, দোতলা, তেতলায় উঠল। সে নিস্তব্ধ ভয়াল রাতে তাদের বুট জুতার প্রচণ্ডতা তীব্রভাবে আমাদের কানে বাজতে লাগল। মনে হচ্ছিল, আমাদের বুকের উপর দিয়ে উঠছিল তারা। বেয়নেটের খোঁচার আঘাতে কাঁচ ভেঙে ভেঙে এগুচ্ছে তারা। এটা-ওটা আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। ঘুমন্ত ছাত্রদের গুলি করে মারছে। তাদের মরণ-চীৎকার ভেসে আসছে। হলে ঢুকেই তারা সারেণ্ডার, সারেণ্ডার চিৎকার করছিল। কিন্তু সারেণ্ডার করবে কে? ওদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, এখানে ভারতীয় সৈন্য আছে। গাঁজাখুড়ির কোন সীমা-পরিসীমা নেই যেন!

যাহোক, তেতলা ও দোতলা থেকে নেমেই মৃত্যুদূতেরা এগিয়ে এসেছিল আমাদের দিকে। বেয়নেটের খোঁচায় ডাইনিং হলের কাঁচ ভাঙছিল অনবরত। যে রুমে আমরা লুকিয়ে আছি সে ঘরগুলোর প্রথমটা দেখলো ফাঁকা; পরেরটাও। ভাবলাম আর কয়েক মুহূর্ত পরে আমরা শেষ। কিন্তু তখন তখনি একটা বুদ্ধির মতো বুদ্ধি জাগল মাথায়। তাদের আসবার মুহূর্ত কয় আগেই দরজার দুইপাশে রক্ষিত চেয়ারের ভেতর দুজন দুজন করে ঢুকে চুপ করে রইলাম। একজন অবিমিশ্রকারী ছেলে তাড়াতাড়ি দরজার ছিটকিনি বন্ধ করে দিল। কিন্তু বোল্ট ছিল সোজা। মিলিটারী এসে দরজায় বুট জুতার ঘা দিল জোরে। সোজা করে লাগানো বোল্ট খুলে গেল। টর্চ মেরে ভেতরে দেখলো তারা। বলল : "সব শালা ভাগ গিয়া হায়"। নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছিল না আমার।

আমরা তিনজন যেখানে ছিলাম, ওখান থেকে মাঝে মাঝে বাইরে তাকানো, এই করে ২৭শে মার্চ সকাল হলো। তখন রাস্তায় বিজাতীয় কণ্ঠে ঘোষিত হতে থাকল, "কারফিউ,

কারফিউ, উঠা দিয়া, উঠা দিয়া"। ২৫শে মার্চ থেকে ২৭শে মার্চ সকাল পর্যন্ত কারফিউ দিয়ে তারা হত্যযজ্ঞ চালিয়েছে; নৃশংসতার চরম করেছে তারা। আমাদের নাওয়া নেই, খাওয়া নেই এর মধ্যে। তারপর এলো শেখর চন্দ। সে যেন আমাকে ভূত দেখলো, আমিও তাই।

যশোদাজীবন সাহা

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
সরকারী দেবেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
মাণিকগঞ্জ

ইতিহাসের ছাত্র যশোদাজীবন সাহা দেখেছেন মানব ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা। তৎকালীন এ্যাসেম্বলীতে ছাত্র হিসাবে অবস্থানরত যশোদাজীবন সাহা জগন্নাথ হল সন্নিহিত এলাকায় গণহত্যার প্রত্যাক্ষদর্শী।

২৫শে মার্চ (১৯৭১), সন্ধ্যা ৭-৩০। আমি, দীপঙ্কর বাবু (পদার্থ বিদ্যা প্রিলিমিনারীর ছাত্র) ও ছোট ভাই সুভাষচন্দ্র সাহা (প্রথম বর্ষ অনার্স, উদ্ভিদ বিদ্যার ছাত্র) এই তিনজন জগন্নাথ হলের অদূরে অর্থাৎ বর্তমান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ কোয়ার্টারের নিকট নির্মিত মসজিদের সাথে অবস্থিত হাসিনা হোটেলে রাতের খাওয়া শেষ করে জগন্নাথ হলে ফিরে আসি। আমরা আনুমানিক নটার দিকে হলের এ্যাসেম্বলী হাউজ-এর সামনে দাঁড়িয়ে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। এমন সময় মুকুল বোসের বড়ো ভাই মৃণাল বোস (যিনি উক্ত রাতে মারা যান) তিন ব্যাটারী একটা টর্চ লাইট নিয়ে ইকবাল হল হতে ফিরে এসে বলতে থাকে যে, রাতে পাক-বাহিনীর আক্রমণের সম্ভাবনা আছে। অতঃপর আমি ও আমার ভাই এ্যাসেম্বলীর চার নম্বর কক্ষে চলে যাই। সামনে সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা থাকায় আমি লাইট জ্বালিয়ে পড়তে বসি। আমার ছোট ভাই বাড়ী হতে আসার কারণে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ছিল। তাই সে ঘুমিয়ে পড়ে। রাত আনুমানিক এগারোটার দিকে বিভিন্ন দিক হতে গোলাগুলির আওয়াজের শব্দ শুনতে পাই। প্রথমত ভেবেছিলাম হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা নিজেদের তৈরি বোমা বা পটকা ফাটাচ্ছে। আমার রুম হতে সংলগ্ন সড়কে কিছু লোকের কথা শোনা যাচ্ছে আমি কৌতূহলী হয়ে সেখানে অর্থাৎ দেওয়ালের অপর পার্শ্ব হতে লক্ষ্য করলাম, বেশ কিছু সংখ্যক অপরিচিত লোক লাইট পোস্টের বাল্বগুলো ঢিল মেরে ভেঙে ফেলেছে এবং ইঁট, গাছ ও অন্যান্য দ্রব্যদি দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে। আমি রুমে ফিরে এসেই বই নিয়ে

আবার পড়তে বসি। বোমা বা পটকার ন্যায় আওয়াজ ক্রমান্বয়ে হলের দিকে আসছে এবং মনে হচ্ছে রেসকোর্স ময়দান হতে হলের দিকে আসছে। প্রথমে বিদ্যুতের ন্যায় আলোক রশ্মিগুলো আমার রুমের জানালার কাঁচ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছে এবং সাথে বিকট আওয়াজ ও কিছু লোকের উচ্চ কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। ইতিমধ্যে আমার ভাই ঘুম হতে উঠে পড়েছে এবং সে ভয়ে হলে চৌকির নিচে আশ্রয় নিচ্ছে। আমি মনে করলাম চৌকির নিচে আশ্রয় নেওয়া নিরাপদ হবে না। তাই রুমে তালা লাগিয়ে ভাইকে নিয়ে বাথরুমের মধ্যে আশ্রয় নেই। ভাই বাথরুমের দরজা বন্ধ করছিল, কিন্তু আমি তাতে বাধা দিই এই কারণে যে দরজা বন্ধ থাকলে হয়তো সন্দেহ করে দরজা ভেঙে আমাদের ধরে ফেলবে। সুতরাং দরজা বন্ধ না রাখাই উত্তম এবং খোলা দরজার পাশে আমরা লুকিয়ে থাকবো। ইতিমধ্যে প্রচণ্ড কণ্ঠস্বর দক্ষিণ বাড়ী ও উত্তর বাড়ী হতে শোনা গেল এবং তাতে স্পষ্ট মনে হচ্ছে সেখানে ছাত্রদের হত্যা করা হচ্ছে এবং রুমে রুমে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের এখানে থাকা নিরাপদ না, সুতরাং তাড়াতাড়ি করে পালিয়ে যাওয়ায় ভালো বলে মনে করলাম। ভাই সহ আমি তাড়াতাড়ি করে এ্যাসেম্বলী হাউস-এর ছাদে উঠতে থাকি। গেট বন্ধ না থাকলে হয়তো বাইরে যেতাম। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই পাক-বাহিনীর হাতে পড়ে জীবন দিতে হতো। ছাদে ওঠার পথে যে রুমটা তাতে দুজন ছাত্র ছিল। আমি তাদেরকে বের হয়ে আসতে বলি। কারণ ছাত্রদের হত্যা করা হচ্ছে। আমার কথায় তাদের একজন রুম হতে বেরিয়ে আসে এবং অপর জন না বেরিয়ে আসার কারণে সেখানে সে মারা যায়। যে ছেলে আমার সাথে বেরিয়ে আসে, সে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে প্রথম বর্ষ অনার্সের ছাত্র এবং গোপালগঞ্জে তার বাড়ী। বর্তমানে সম্ভবত জাপানী মিটসুবিশি কোম্পানীতে চাকুরী করে। পথিমধ্যে আমার ভাই আমার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমি তখন আমার বর্তমান সাথী নিয়ে এ্যাসেম্বলী ছাদের উঁচু দেওয়াল বেয়ে একটা পরিত্যক্ত দরজাবিহীন বাথরুমে আশ্রয় নেই। তারপর সমস্ত রাত সেখানে কাটাই। সেখান হতে সড়ক দিয়ে পাক-বাহিনীর গাড়ীর যাতায়াতের শব্দ শোনা যায়। এর ঠিক নিচে প্রভোস্টের অফিস, কয়েকজন শিক্ষকও বসবাস করতেন, সেখানে পাক-বাহিনীর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনা যাচ্ছে। তারা দরজা ভাঙচুর করছে। ওদের উচ্চারিত ভাষায় অংশবিশেষ বোঝা গেল। ওদের ভাষা ছিল "মেইন গেট কিধার হায়" আমি পরিত্যক্ত রুম হতে উত্তর দিকে কেবল আগুন দেখতে পেলাম। ছাদের উপর হতে বুঝতে পারলাম নিচে কিছু লোকের আকুল চীৎকার, হয়তো বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। দুর্ভাগ্য, সব চিৎকারই ব্যর্থ, পাক-বাহিনীর নিকট তাদের জীবন দিতে হলো। ২৬শে মার্চ বেলা একটায় আমি ও আমার সাথী পাইপ বেয়ে নীচে নেমে হলের বাইরে যাবার পথে ও মাঠের মধ্যে অসংখ্য লাশ ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় দেখতে পেলাম। প্রায় সবার শরীরেই শার্ট ছিল। হলের পূর্ব দিকের গেট

দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার পথে গেটের দুই পাশে দুটো লাশ দেখতে পাই। তখন একজনের শরীরে হালকা নীল রঙের শার্ট ছিল এবং অপর জনের শরীরে খানিকটা পুরানো সাদা রং-এর টেট্রনের শার্ট ছিল। লাশ পার হয়ে প্রভোষ্ট শ্রদ্ধেয় জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার কোয়ার্টারের দিকে যাই। প্রথম তলায় দরজার সামনে প্রচুর পরিমাণ রক্ত। একটা ছোট লম্বা বালিশ রক্তে ভেজা অবস্থায় পড়ে আছে। রক্তের ভিতর কিছু কিছু পায়ের চিহ্ন দেখতে পেলাম। আপ্রাণ ডাকাডাকি করা সত্ত্বেও ভিতর হতে কোন আওয়াজ পেলাম না। অতঃপর দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ তলায় উঠি। চতুর্থ তলা নতুন তৈরি হওয়ায় সেখানে কখনও কোন শিক্ষক বসবাস করতে যান নাই বা কর্তৃপক্ষ কারো নামে তা মঞ্জুর করেন নাই। এখানে প্রতিটি রুমে দাগ দেখতে পেলাম। রাস্তা হতে ৪র্থ তলার রুমগুলোর অবস্থান সুস্পষ্ট দেখা যায় বলে খানিকটা ভয় পেলাম। উপর হতে পাক-বাহিনীর চলাচলরত জীপগুলো দেখা যাচ্ছে বলে তাড়াহুড়ো করে উপর হতে কোয়ার্টারের মধ্যে একটা পরিত্যাক্ত পুকুরঘাটের নীচে বা পুকুরের পাড় ঘেঁষে জঙ্গলের ভিতর আশ্রয় নিতে যাই। সেখানে প্রভোষ্টের গাড়ীচালক আমাকে আশ্রয় দিতে নারাজ, কারণ আমি ছাত্র। আমাকে বাঁচতে হবে, তাই ওর কথায় কান না দিয়ে জঙ্গল ঘেঁষে পুকুরের পাড়ে শুয়ে পড়ি। চারিদিকে তাকিয়ে দেখি আমার ন্যায় বহু ছাত্র সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। আমি প্রচণ্ড ক্ষুধা ভোগ করছিলাম। তখন উক্ত প্রভোষ্টের গাড়ীচালক আমাদের উপর ঝুলন্ত কচি একটা আম ছিঁড়ে তা আমাকে খেতে দিল। সেই আম আমি খেলাম বটে তবে আমার মুখ ও গলায় ঘা হয়ে যায়। তখন খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম। দিনের বাকী অংশ সেখানেই কাটালাম। রাতে পাক-বাহিনীর অনেক গাড়ী সড়ক দিতে যাতায়াত করছিল। কোন এক সময়ে ওরা হয়তো শহীদ মিনারের মাঝখানটায় গোলা মেরে নষ্ট করে দিয়েছে। জঙ্গলের ভিতরে যারা, তাদের কেউ প্যান্ট পরা বা কেউ লুঙ্গি পরা। আমি ব্যক্তিগতভাবে লুঙ্গি পরা ছিলাম। সমস্ত রাত গাড়ী ছাড়াও মাটিতে গর্ত করা গাড়ীর আওয়াজ হচ্ছিল। ২৭শে মার্চ পুকুরের পাড়ে কিছু লোক, সম্ভবত মেডিক্যাল কলেজ হতে আগত, আমাদেরকে বলল : ''আপনারা যেখানে আছেন সেখান হতে বের হয়ে আসেন-কারণ কারফিউ তুলে নেওয়া হয়েছে।'' আমরা প্রথমে এই কথা বিশ্বাস করতে পারলাম না। শেষটায় লোকের যাতায়াত দেখে বের হয়ে আসি। আসার পথে লোকের নিকট শুনলাম জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা তখনও জীবিত তবে তাকে বাঁচাতে হলে রক্তের প্রয়োজন। বের হয়ে হলের দিকে ছুটে যাই। হলের ভিতরে লোক না থাকায় বাইরে কিছু সংখ্যক লোক হলের ভিতর প্রবেশ করার জন্যে এদিক-ওদিক করছিল। আমি তাদেরকে বললাম, আপনারা আমার সাথে একটু আসবেন কি, কারণ আমার ভাই এখনও হলের ভিতরে আছে। সে মৃত না জীবিত, তা জানি না। তারা আমার সাথে রাস্তা দিয়ে কিছুটা এগিয়ে আসল। জগন্নাথ হলের মাঠের ভিতর ছড়ানো-ছিটানো লাশগুলো গর্ত করে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে।

পাক-বাহিনী তাড়াহুড়ো করে মাটি দেওয়ার ফলে লাশগুলো সম্পূর্ণ মাটি দেওয়া সম্ভব হয় নাই। আমি ভাই ভাই করতে করতে সম্ভাব্য লুকানোর জায়গার উদ্দেশ্যে এ্যাসেম্বলী হাউজের ছাদে উঠতে থাকি। এক পর্যায়ে ছাদের উপর জলের ট্যাঙ্কের নীচে আমার ভাই, দীপঙ্কর বাবু ও একটি নাম না জানা মেয়েকে দেখতে পাই। ওদেরকে আমি তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসার জন্য বলি। ওরা আমার সাথে নেমে আসে। জগন্নাথ হলের মাঝখানে টিনশেডগুলো তখন আর নেই। কারণ পাক-বাহিনী আগুন দিয়ে তা পুড়িয়ে দিয়েছে। বেনেডিক্ট ডায়াসকে দেখলাম হাতে একটা পোশাকের বাক্স নিয়ে দক্ষিণ বাড়ী হতে বের হয়ে যাচ্ছে। আমার বন্ধু শিশুপাল (অর্থনীতিতে অনার্স-এর ছাত্র এবং তার বাড়ী সিলেট জেলায়।) বিধান বাবু (আমার এক বছরের অগ্রজ, ইংরেজী বিভাগের অনার্সের ছাত্র) আরও অনেকে মারা গেছে বলে তখন ধারণা করলাম। এ্যাসেম্বলী হাউজের ১,২,৩ এবং ৪ নম্বর কক্ষ তখন অক্ষত অবস্থায় তালাবদ্ধ ছিল। আর সব রুমগুলো তালাভাঙা অবস্থায়— বইপত্র ও অন্যান্য জিনিস ছড়ানো-ছিটানো ও এলোমেলো অবস্থায় দেখতে পেলাম। অধিকাংশ রুমগুলো আসবাবপত্র ও বই তখনও জ্বলছিল। বাইরের থেকে আগত অপরিচিত লোকেরা অবশিষ্ট জিনিস বয়ে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। কাউকে হারমোনিয়াম, বাইসাইকেল ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে বাইরে চলে যেতে দেখলাম। বাধা দেওয়ার মতো কোন লোক তখন হলে ছিল না। আমি তাদেরকে বললাম, এই সব জিনিসপত্র আপনারা নিয়ে যাচ্ছেন কেন। উত্তরে ওরা বলল, স্বাভাবিক অবস্থা হলে পুনরায় সব ফেরত দেবো। দুর্ভাগ্য, উক্ত জিনিসপত্র তারা আর ফেরত দেয় নাই। ঐ মুহূর্তে আমরা শুনলাম ড. জি.সি দেব ও অন্যান্য শিক্ষকদের হত্যা করা হয়েছে। এবং তাদের সবাইকে জগন্নাথ হলের মাঠে গণকবর দেওয়া হয়েছে। সড়ক দিয়ে তখনও পাক-বাহিনীর গাড়ী যাতায়াত করছিল। ২/৩ জন লোক একত্রে হাঁটতে নিষেধ করা হচ্ছে। তখন দূর হতে গোলাগুলির আওয়াজ কানে ভেসে আসছিল। সাধারণ যানবাহন চলাচল না থাকায় পায়ে হেঁটে লোকেরা এবং আমরা দুই ভাই সদর ঘাটের দিকে যাই। দীপঙ্করবাবু ও নাম না জানা মেয়েটি ড. আলীম সাহেবের বাসার উদ্দেশ্য শহীদ মিনারের পাশ ঘেঁষে রাস্তা দিয়ে চলে যায়। সদর ঘাট এসে দেখতে পেলাম সেখানে লঞ্চ বা অন্য কোন যানবাহন নেই। আমরা নৌকা যোগে সদর ঘাট থেকে অপর পাড় জিঞ্জিরা চলে যাই। জিঞ্জিরা হতে একটা লঞ্চ (জনশূন্য অবস্থায়) চালু হওয়ার সাথে সাথে অপর পাড় হতে পাক-বাহিনীর সেনারা গুলি করে উহার গতি রোধ করে। অগত্যা পায়ে হেঁটেই বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হই। আমার মতো অসংখ্য লোক তখন পায়ে হেঁটে নিজ নিজ গ্রাম বা শহরের দিকে যাচ্ছে। তখন হেলিকপ্টারের সাহায্যে পাক-বাহিনীর লোকেরা টহল ও নিচের দৃশ্যবলী অবলোকন করছিল। তাতে লোকেরা ভয়ে ভয়ে সামনের দিকে এগুচ্ছিল। আমরা শ্রীনগর চেয়ারম্যানের বাড়ী এক রাত এবং ভাগ্যকুলে জনৈক লোকের

বাড়ীতে আর এক রাত কাটিয়ে এসে পৌঁছি। পথিমধ্যে আমাদেরকে জনসাধারণ আন্তরিকভাবে সাহায্য করে। বাড়ী হতে আগত আমার এক শিক্ষক শ্রদ্ধেয় মোতাহার হোসেন সাহেব বেলা ১১টার দিকে পথিমধ্যে আমাদেরকে দেখে কেঁদে ফেলেন। পাগলের ন্যায় বাবা, মা, দাদা ও অন্যান্য পাড়া-প্রতিবেশী সহ অগণিত লোকেরা আমাদের ডেকে অবাক হয়ে যায়। তাদের ধারণা ছিল আমার নিশ্চিত ভাবে ২৫ শে মার্চ জগন্নাথ হলে মৃত্যুবরণ করেছি।

রানু রায় (দে) ও অরুণ দে

পিতা - মধু দে

ছোট্ট মেয়ে রানু ও ছোট্ট ছেলে অরুণের স্মৃতিতে বাবা (মধুদা), মা, দাদা ও বৌদি হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি অম্লান। মধুকে জীবন্ত অবস্থায় জগন্নাথ হলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয়। মা, দাদা ও বৌদির ছিন্নভিন্ন লাশ ১০/১২ দিন ঘরে পড়েছিল পরে পৌরসভা এইসব গলিত মৃতদেহ সরিয়ে ফেলে। এই অতিবাস্তব নির্মম ও নিষ্ঠুর ঘটনার বর্ণনা করেছেন মধুদার কন্যা রানু (দে) ও পুত্র অরুণ (দে) ঘটনার কোন কোন অংশের বর্ণনা দিয়েছেন।

২৫শে মার্চ রাত থেকে দেখি জগন্নাথ হলের চারিদিকে মিলিটারী। আমরা সবাই ভয় পাচ্ছিলাম, ছোট ছিলাম। বাবা বললেন, "তোমরা কেউ বাইরে তাকাবে না। সবাই ঘরের ভিতরে বসে থাকো।" বাবা-মা চিন্তিত; দাদাও চিন্তিত। নতুন বৌদি ঘরে। চারিদিকে দেখি আগুন। জগন্নাথ হলের দিকে, শিববাড়ীর রাস্তা, মেডিক্যাল-এর রাস্তায় গাছ পড়ছে, ছাত্ররা চীৎকার করছে। মিলিটারীরা গাড়ী দিয়ে নামছে। আমরা একটু একটু লুকিয়ে দেখলাম। তারপর ভোর হওয়ার সাথে সাথে দেখি আমাদের দরজায় কারা যেন ধাক্কা দিচ্ছে। নীচে মিলিটারী ছিল। দরজায় ধাক্কা দেওয়ার পর বাবা মাকে বলল, "আমি কি করব?" মা বলল, "তুমি দরজা খুলো না। দরজায় খুব বেশি ও জোরে লাথি দিচ্ছে। বাচ্চারা দরজা খুলুক।" বাবা বলল, "বাচ্চাদের দেখে রাগ করতে পারে। আর ওরা তো কিছু বলতে পারবে না। আমিই খুলি।" বাবা দরজা খুললো, তখন সকাল সাতটা কি আটটা হবে ততটা মনে নেই। দরজা খোলার সাথে সাথেই দুই হাত উপরে তুলেছে বাবা। হাত তোলার পর বাবাকে টান দিয়ে উর্দুতে কি বলল বুঝি নাই। বাবাকে মিলিটারীরা সিঁড়ি ঘরে নিয়ে বসাল। হুড়মুড় করে কতোগুলো মিলিটারী ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারা একদম ভিতরের রুমে চলে গেল। ঐ ঘরে বৌদি ছিল। বৌদিকে দেখেছি চীৎকার করতে। আমি দৌড় দিয়ে এসে দাদাকে বললাম, "দাদা, বৌদিকে মারছে।" তখন দাদা

এ ঘর থেকে ঐ ঘরে দৌড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই দরজার কাছে দাদাকে মিলিটারীরা গুলি করল। দাদা-বৌদির বিয়ে হয়েছে মাত্র পাঁচ মাস। অগ্রহায়ণ মাসে বিয়ে হয়েছিল। আমি দাদার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দাদার বুকে একটাই গুলি লাগে। ঐ গুলিটা দাদার বুক ভেদ করে এসে আমার গালে লাগে। দাদা সাথে সাথেই দরজার একটু সামনেই পড়ে যায়।

মা অসুস্থ ছিল। মা অন্তঃসত্ত্বা ছিল। মাকে ওরা তখন আর কিছু বলে নাই আমি দৌড়ে বাবার কাছে চলে গিয়ে বললাম, "বাবা, দাদাকে ওরা মেরে ফেলেছে।" বাবা তখন কিছু বলতে পারছে না। নির্বাক হয়ে আছে। চুপচাপ চেয়ে আছে। মা চীৎকার করছে। দাদা বৌদির ঘরে পড়েছিল। ঘরের সবকিছু ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। দুইটা মিলিটারীই ঘরে আসে আর সবাই সিঁড়িতে ছিল। তারপর বাবাকে তাক করেছে এমন যে বাবাকে মারবে। বাবার মুখে তখনও কোন শব্দ ছিল না। শুধু হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। একবার শুধু বলেছে উর্দুতে যে, "আমি কি করেছি?" মিলিটারীরা ঘরের মধ্যে জিনিসপত্র ভাঙছে আর বলছে "এবার মুজিব বাপকো ডাকো।" আমি বাবাকে জড়িয়ে ধরেছি আর বলছি, "আমাদের মারবেন না, বাবাকে মারবেন না।" আমাকে এক লাথি দিয়ে সরিয়ে দিল মিলিটারীরা। পরে মা এসে তাদেরকে মারতে বারণ করে। বাবাকে তখন দাঁড় করায় মারার জন্যে। তখন মা সামনে গিয়ে হাত দিয়ে বাবাকে আগলে ধরতে যায়। আর সাথে সাথে মিলিটারীরা মায়ের দুটো হাত কেটে ফেলে রাইফেলের মাথায় যে চাকু থাকে সেটা দিয়ে (বেয়োনেট দিয়ে)। মার হাত দুটো মাংস কিমার মতো হয়ে যায়।

আমি দরজার সামনে ছিলাম। এই সব দেখে দরজা বন্ধ করে দিই। ওরা আবার লাথি দিয়ে দরজা খুলে ফেলে। আমি দেখলাম মা পড়ে গেছে। মায়ের উপর মিলিটারীরা তখন অনেক গুলি করছে। মার শরীরের সব জায়গায় গুলি পড়েছে, বুকে, মুখের উপর। বুকে গুলি লাগার সাথে সাথে মায়ের গলার সোনার হারটা তিন টুকরো হয়ে যায়। মার জিহ্বা বের হয়ে পড়ে। বাবার উপরে মা তখন পড়ে যায়। মাকে শুইয়ে দিচ্ছে বাবা, কাঁদতে ছিল বাবা। আমিও কাঁদছিলাম। মিলিটারীরা মনে করেছিল মায়ের সাথে সাথে বাবাও পড়ে গেছে। মাকে গুলি করার সময় বাবার গায়েও অনেক গুলি লেগেছে। পরে মিলিটারীরা নিচে চলে যায়। বাবার জামা রক্তেই একেবারে ভিজে গেছে। আমি যখন দরজা বন্ধ করছিলাম তখন লাথি দিয়ে দরজা খুলে ওরা আবার অনেকগুলো গুলি ছোড়ে। অনেকক্ষণ ধরে বাবা মাকে নিয়ে কান্নাকাটি করছে। বাবা তারপর মাকে রেখে খোড়াতে খোড়াতে আমাদের কাছে আসে। আমি বাবাকে বললাম, "বাবা, তোমার তো রক্তে জামা ভিজে যাচ্ছে।" বাবা কিছু বলে নাই। বাবা জিজ্ঞাসা করল যে, "তোর দাদা কোথায়?" আমি বললাম যে, "ঐ ঘরে পড়ে আছে।" বাবা সেখানে যায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে। তখন বাবার গা থেকে শুধু রক্ত পড়ছিল। বাবা দাদাকে ধরে কাঁদছিল, বৌদিকে ধরেও কাঁদছিল।

দাদা-বৌদি দুইজনেই মারা গেছে। বাবা তখন আমাকে বলল, "তোর কি হয়েছে?" আমি তখন কথা বলতে পারছিলাম না। গালে গুলি লেগে মুখ ফুলে গেছে। বুকেও লেগেছিল, গুলি একপাশ থেকে ঢুকে ওপাশ থেকে বেরিয়ে গেছে। তখন প্রচুর রক্ত পড়ছিল আমার শরীর হতে। আমাকে বাবা বলল, "তুই বসে থাক মা।" অরুণ ওরা কাঁদছিল। বাবা তখন ল্যাংড়ার মতো খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলছিল, হাঁটতে পারছিল না। ডান হাত এবং ডান পা ওঠাতে পারছিল না। একটা গুলি পিঠে লেগেছিল, যা দেখা যাচ্ছিল। আমি টান দিয়ে গুলিটা তুলে ফেলেছি। বাবা তখন কিন্তু মারা যাননি।

আধঘণ্টা পর দুজন বাঙালি লোককে নিয়ে এসে মিলিটারীরা আবার বাবাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন আমি বাবাকে জড়িয়ে ধরলাম। গেঞ্জি পরা ছিল ওই লোক দুইটা। আমি বললাম, কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন বাবাকে। তখন ওরা ওদের ভাষায় বলল, "ভালো করে দিয়ে যাবো।" এটুকু বুঝলাম। ঐ লোক দুইটা আর কিছু বলে নাই। বাবাকে নিয়ে যাচ্ছে দেখে আমি আবার গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরেছি। তখন আমাকে টান দিয়ে ঘরের মধ্যে ফেলে দেয় মিলিটারীরা। ওরা বলছিল যে, "লের্‌কিকো হটাও।" বাবা তখন বলছিল যে, "ওরও তো গুলি লেগেছে।" উর্দুতে বলছে বাবা। ঐ লোক দুটো ভালো মানুষের মতো বাবাকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, "বাবাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন"। তখন ওরা বলল, "হাসপাতালে। ভালো হলে পাঠিয়ে দেব।" নিচে নেমে দেখি বাবাকে জগন্নাথ হলের দিকে নিয়ে গেছে। আমি আর বাবাকে দেখি নাই। তারপর ঐ তিনটে লাশ নিয়ে আমরা ঐ ঘরে ছিলাম। আমার আর কথা বলার মতো শক্তি ছিল না। রাত্রি হয়ে গেলে উপরতলার লোকজন এসে আমাদের নিয়ে যেতে চাইলো। আমি বললাম, "ভাই বোনদের নিয়ে যান; আমি থাকি।" ওনারা বললেন, "তোমার ভয় করবে।" তারপর আমাকে কেউ উপরে নিয়ে যায়। "ওরা তো বলে গেছে যে বাবাকে দিয়ে যাবো। ওরা তো আর এসে বাবাকে দিয়ে গেল না।" ছোট ভাই-বোনরা কাঁদছিল। গাড়ী যেই আসে আমি মনে করি এই বুঝি বাবাকে নিয়ে আসে। গালে গুলি লাগাতে মুখটাও বন্ধ হয়ে গেছে। বুকে গুলি লাগায় নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না। পরের দিন ভোরে কয়েকজন আত্মীয় আসে এবং পাড়ার ছেলেরা পুকুরপাড় দিয়ে গোপনে আমাকে মেডিক্যালে নিয়ে যায়। এই দিকে ছোট ভাই-বোনগুলি হারিয়ে যায় ও আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। মা, বউদি ও দাদার লাশ দশ বারোদিন ঘরেই পচে। তারপর পাড়ার লোকজন মিউনিসিপ্যালিটিতে খবর দেওয়ার পর নাকি গাড়ী এসে ঐ লাশ তিনটি নিয়ে গেছে। এ কথা অবশ্য অন্য লোকজনদের ও পাড়ার লোকদের কাছে শুনেছি।

চান্দ দেব রায়

মালী, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ফুল ফোটানো যার কাজ তার সাথে ফুল-প্রেমিকের ভাব হওয়াটাই স্বাভাবিক। ফুল ভালোবাসতেন ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। আর সেজন্যে উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের মালী চান্দ দেব রায়ের সাথে ছিল পরিচয় ও স্নেহের সম্পর্ক। চান্দ দেব জগন্নাথ হলের গণহত্যার শিকার। তিনি ১৯৬৫-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় জগন্নাথ হলে আশ্রয় নেন। ২৬ শে মার্চ-এর পর গোবিন্দ দেবের মরদেহ পাক-বাহিনীর আদেশে নিয়ে আসেন জগন্নাথ হলের গণকবরে। তার মতে "গোবিন্দ দেবের রক্তে আমার দেহ ভিজেছে তাই আমার দেহও খুবই পবিত্র।" এর পরও পাক-বাহিনী তাকে গুলি করেছিল, কিন্তু মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতালের ডাক্তারদের প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেলেন চান্দ দেব এবং সাক্ষী হয়ে রইলেন জগন্নাথ হলের গণহত্যার।

জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার বাড়ীতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমি যেতাম। ওনার সাথে আমার খুব ভাব হয়ে গেছিল। তার সঙ্গে এমন ভাব হওয়ার কারণ তিনি ফুল খুব ভালোবাসতেন আর ফুলের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ভাবতেন। তার সবচেয়ে প্রিয় ফুল ছিল রজনীগন্ধা, ২৫ তারিখ বিকেলে যখন আমি তার কাছে যাই, তখন পাঁচটা বাজে। তখন তার মনটা ছিল খুব গম্ভীর। আমাকে তিনি বললেন যে, কালকে আমাকে একটা রজনীগন্ধার চারা এনে দিতে হবে। আমি বললাম, "আজ তো লাগবে না, লাগবে কাল ঠিক আছে আমি এনে দেব আগামীকাল।" উনি তখন আমাকে বললেন যে, "দেখ, চতুর্দিকে কি রকম সমস্যা দেখা যাচ্ছে, অবস্থা বিশেষ ভালো মনে হচ্ছে না।" আমি তার কথায় সায় দিয়ে বললাম, "হ্যাঁ ঠিক তাই।" তখন বকসীবাজারের দিক থেকে একটা মিছিল এলো, লাঠিসোটা নিয়ে শ্লোগান দিয়ে। উনি আমাকে বললেন যে, "চলো দেখে আসি।" আমরা হেঁটে মেডিক্যালের দিকে বকসীবাজারের মোড় পর্যন্ত এলাম। তিনি আমাকে বললেন : "চান্দ! অবস্থাটা কেমন যেন খারাপ দেখা যাচ্ছে"। আমি বললাম : সত্যিই ভালো মনে হচ্ছে না।" তিনি বললেন : "তাহলে চলো বাড়ীতে ফিরে যাই।" তখন আমরা আবার বাড়ী ফিরে এলাম। উনি পুনরায় আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, "কালকে যেন মনে থাকে। আমার রজনীগন্ধা নিয়ে আসা চাই।" আমি বললাম, "হ্যাঁ, আনবো।" তিনি আমাকে বললেন : "রাত্রে তোমরা একটু সাবধানে থাকবে, সম্ভবত রোড কারফিউ হতে পারে। তোমরা ঘর থেকে বের হবে না, নিরাপদে থাকবে বাসায়।" এরপর আমি আমার বাসায় চলে আসি।

কয়েকদিন পর্যন্ত সন্ধ্যার পরই ব্লাক-আউট থাকতো। সময় সময় বোমা ফাটার শব্দ

হতো বিভিন্ন জায়গা থেকে। আমরা বাসার সকলে রাত দশটার দিকে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। রাত এগারোটার দিকে কয়েকজন ছাত্র কুড়াল চাইতে এলো, তারা রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করবে। সেই সময় রাতের অন্ধকারের জন্যে কোন ছাত্রকে চিনতে পারলাম না। কুড়াল আমাদের কাছে না থাকায় হাত-দা দিতে চেয়েছি। তারা বললেন, না, কুড়ালই প্রয়োজন। তারা বললেন যে, "অবস্থা ভীষণ খারাপ, আপনাদের থাকলে দেন, না হলে দেরী করবেন না।" পরে ওনারা কুড়াল না পেয়ে চলে গেলেন। চারিদিক তখন নীরব, কোন শব্দ আর পাওয়া যাচ্ছে না। এভাবে রাত বারোটার সময় বা বারোটা বাজেনি হয়তো তখনও, ব্রাশ ফায়ারের শব্দ ভেসে এলো রেসকোর্সের দিক থেকে। আমরা ভাবলাম হয়তো রোড কারফিউ দিয়েছে তাই এভাবে শব্দ হচ্ছে। সামরিক বাহিনী অথবা নিয়মিত বাহিনী হয়ত গুলি করছে। আমরা চুপ করে থাকলাম। সম্ভবত পাবলিক লাইব্রেরীর দিক থেকে তারা এলো, এসে এই এলাকাটি ঘিরে ফেলল। তখন তারা কি যেন একটা কথা বলল খুব জোরে, মাইকে নয়। এর পর তিনটি বিকট শব্দ হলো এবং সমস্ত এলাকাটি লাল হয়ে উঠল। শব্দে মাটি পর্যন্ত কেঁপে উঠল। এর সাথে সাথেই ব্রাশ ফায়ারের শব্দ হলো। গুলির শব্দে আমরা ভয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লাম। রাত যখন তিনটে বাজে তখন এই হলে (জগন্নাথ হল) তারা ঢুকলো। গয়ানাথের ছেলে শিবু ছিল তখন হল গেটের দারোয়ান, তাকে গেট থেকে ডেকে নিল। শিবুকে নিয়ে পাঞ্জাবী সৈন্যরা মারধোর করল। তখন তারা বলল উর্দুতে, "শালে তোমার মুজিবর বাপকো বোলাও। শালে জওয়ান সব লেড়কা, সব ছাত্র কিধার হ্যায়, তুম শালা জান্তা বে, ঠিক বাত বোলো, তুমি শালা সব জান্তা, বাতলাও।" তখন শিবু বলল, "নেহি ওলোক তো এক মাহিনা আগে সব চালা গিয়া। সব বাড়ীমে চলা গিয়া।" সৈন্যরা জিজ্ঞাসা করল, "ইধার সে কোন হ্যায়"? শিবু বলল, "উসব তো কর্মচারী আছে।" সৈন্যরা বলল, "বোলাও সব"। চারদিক নিস্তব্ধ। শিবু তখন এসে হলের কর্মচারী বিহারী দাসের বড়ো ছেলেকে ডেকে নিয়ে গেল। ওকে ধরে রাইফেলের বাট দিয়ে ভীষণ মারধোর করল। উত্তর বাড়ীর দিকে গোলাগুলি ছুঁড়তে শুরু করল। তবে ওরা তখনো উত্তর বাড়ীতে ঢোকেনি। আমি গরুর ঘর থেকে এসব দেখছিলাম আর খুব অসহায় বোধ করছিলাম। মাকে ডেকে বললাম, "মা, অবস্থা বেশ খারাপ দেখা যাচ্ছে, তোমরা বাড়ীতেই থেকো, আমি দেখি কি করা যায়।" আমার একটা কালো চাদর ছিল, ওটা গায়ে জড়িয়ে বের হলাম, দেখতে লাগলাম সব। দেখলাম বিরাজদার ঘরের পিছনে কাকে যেন খুব মারধোর করছে। আমি দক্ষিণ বাড়ীর টিনশেড ডাইনিং হলের দিক দিয়ে বের হতে গিয়েও গেলাম না, ভাবলাম যে হয়তো অসুবিধা হবে। আমি যখন দক্ষিণ বাড়ীর দিক থেকে এসে পড়লাম ঠিক তখনই দু'জনে আমাকে দেখে ফেলল। আমি বুঝলাম যে আমাকে ওরা দেখে ফেলেছে। তাই হেড দারোয়ান মাখনের ঘরের হাঁস-মুরগীর খোঁয়ার ছিল, ওখানেই

পিছন দিকে একটু উবু হয়ে একটা ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়লাম। তখন ওরা আমাকে খুঁজছে আর বলছে, "আবে, উহু কারে এক আদমীকো দেখা, ও কিধার গিয়া, ও শালা কিধার ভাগ গিয়া?" আমার সামনেই আমাকে খুঁজছে। যখন দেখলাম যে ওরা আমাকে খুঁজতে খুঁজতে অনেক দূরে চলে গেল, তখন আমি মাখনের হাঁসের ঘর থেকে বেরিয়ে গোয়াল ঘরে ঢুকলাম। গরুর সাথে চুপচাপ বসে থাকলাম। ওরা আমাকে খুঁজতে খুঁজতে সামনের দিকে চলে গেল। সামনের দিকে যেয়ে যাকে সামনে পাচ্ছিলো তাকেই মারধোর করছিলো। মারধোর শেষ করে এই ব্যাচটা চলে গেলো, তারপর নতুন আর একটা ব্যাচ এলো।

নতুন গ্রুপটা এসেই ডাইনিং হলে আগুন ধরিয়ে দিল। পুরোনো ডাইনিং হল অর্থাৎ টিনশেডের ক্যান্টিনের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিল। আগুন ধরানোর পর ওই আর্মিরা বলতে থাকলো, "তুম লোগ ইধার সে নিকাল যাও, ইস আদমী তুম লোগ সব আলগা আগার সাম চালা যাও।" অর্থাৎ, তারা বলছিল ঐ ঘর থেকে বের হয়ে যাবার জন্য। কি দিয়ে যে তারা আগুন ধরালো আমি তা বলতে পারবো না। সম্ভবত কোন কেমিক্যাল পাউডার দিয়ে ধরিয়েছিল সে আগুন। সেই সময় চার জন সৈন্য এসে বুদ্দু নামে এক লোককে ধরে তার পেটের মধ্যে বেয়োনেট ঢুকিয়ে দিল। বুদ্দু বার বার বলছিল, "দেখ, হামলোগ তো এক ভাঙ্গী হ্যায়।" অর্থাৎ আমি একজন মেথর। সৈন্যরা তখন বলল যে, "শালে তুম ভাঙ্গী হ্যায়, ছোড় দে, ছোড় দে, এ শালা তো ভাঙ্গী হ্যায়, উ শালাকে মারতা কিয়া ফায়দা হোতা? চল দোসরা তরফ চল।" এই বলে ওরা চলে গেল। আমি তখনও গোয়াল ঘরে লুকিয়ে আছি এবং দেখছি। ওরা সম্ভবত বুঝতে পারলো যে ঘরের ভিতর লোক আছে, আগুন ধরিয়ে দিলেই সব বেরিয়ে পড়বে। তখন তাই তারা আগুন ধরিয়ে দিল ঘরে ঘরে। আমি বুঝতে পারলাম এখানে থাকলে জ্বলে পুড়ে মরবো, তাই সেই মুহূর্তেই নিজের ঘরে এসে ঢুকলাম। আমার মাকে বললাম, "মা, অবস্থা ভীষণ খারাপ, তুমি এক কাজ করো, দরজা খুলে দাও। তুমি বুড়ো মানুষ তোমাকে দেখলে আর কিছু বলবে না। তুমি দরজার কাছে বসে থাকো, তোমাকে দেখলে আর ঘরের ভিতরও আসবে না।" দরজা খোলার শব্দে সৈন্যরা এসে আমার মাকে জিজ্ঞাসা করলো, "কৈ হ্যায় ঘর কে আন্দার?" মা বলল, "নেহি সাহাব, সব নিকাল গিয়া, সব পাহাল গিয়া।" সৈন্যরা তখন ওদের ভাষায় যা বলল তার অর্থ দাঁড়ায় : "তোমরা সব চলে যাও, সরকার তোমাদের সাহায্য করবে। তোমরা সব চলে যাও।" এই বলে তারা মাঠের দিকে চলে এলো। তখন আমরা দেখলাম যে, ঘরের মধ্যে থাকলে আমরা জ্বলে-পুড়ে মড়বো, আমাদের বাঁচার আর কোন উপায়ই নেই। তাই এই অবস্থায় আমরা ঘর ছেড়ে বের হয়ে এলাম বাইরে।

পাঁচটার দিকে যখন পুবের আকাশ একটু একটু ফর্সা হয়ে এলো, তখন সৈন্যরা চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলল আমাদের এবং আমরা যারা বয়সে একটু তরুণ ছিলাম

তাদেরকে ধরলো। মাঠের দিকে খগেন এবং শ্যামলালের গোয়ালঘরটা যেখানে ছিল, সেখানে আমাদের দাঁড় করালো। আমরা সংখ্যায় কতজন ছিলাম তা অবশ্য এখন মনে নেই, তবে কিছু ছাত্র আমাদের সাথে ছিল, তাদেরকেও ধরে আনা হয়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুখ চেনা থাকলেও এখন আর তাদের নাম মনে নেই। তারা ছেঁড়া জামা, লুঙ্গি পরে আমাদের মধ্যে বসে থাকলো। পাক-সৈন্যদের মধ্যে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সম্ভবত মেজর হবেন, তিনি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। হালকা মেশিনগান পুরো ভর্তি, আমাদের সামনে তাক করা। আমরা তখন বুঝলাম যে সেখানেই আমাদেরকে ব্রাশ ফায়ার করে শেষ করে দেবে। তখন লক্ষ্য করে দেখলাম ওরা যেন কি বলছে, ওরা বলছে, "শালে তোমার মুজিবর বাপকো বোলাও"। ওদের মুখ থেকে যা খুশি তাই অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করছে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ওদের কাছে প্রার্থনা করছে কাতর স্বরে, আর সৈন্যরাও সাথে সাথে গালিগালাজ করছে। পাক-সৈন্যরা বলল, "তুম লোগ সব ইসকো আন্দার আও।" গোয়াল ঘরটা বেশ বড়ো ছিল, সবাইকে গোয়াল ঘরে ঢুকালো। আমি তখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে মেশিনগান ঠিক করা হচ্ছে, একটু পরেই আমাদের সব শেষ করে দেবে। ছাত্ররাও আমাদের সাথে চুপচাপ করে বসে আছে। সৈন্যরা আবার আমাদের সকলকে বের হয়ে আসতে বলল, "তুম লোগ সব বাহার নিকাল যাও, শালা কৈ ধিরসে ভাগনা নেহি ইধারসে।" তখন আমি গোয়াল ঘরের ভিতর থেকে দেখছি সামনের মোড়ে একটা ট্যাঙ্ক রয়েছে, শিববাড়ীর রাস্তার মোড়ে। টি.এস.সির মোড়েও ট্যাঙ্ক, একটা ট্যাঙ্ক জগন্নাথ হলের দিকে মুখ করে আছে। একজন হানাদার সৈন্য এসে বলল যে, 'ক্যাপ্টেন সাহাব বোলাতা হ্যায়।' কি একটা অর্ডার আনার জন্য যেন ডাকছে। কালো-কালো, লম্বা-লম্বা মিলিটারী আসলো চার-পাঁচ জন। আমাদের সবাইকে বলল লাইন ধরতে। আমরা সবাই লাইন করলে পর আমাদের বলল হাঁটতে। আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। পাক-সেনারা আমাদের গায়ে স্টেন ঠেকিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল। ওই মাঠের দিকে যেদিকটায় সুধীরদার ক্যান্টিন এবং ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ছিল সেখানে দেখলাম একটা মৃতদেহ পড়ে আছে। আমাদেরকে গোয়াল ঘরের দিক থেকে নিয়ে এলো মাঠের দিকে। পোষ্ট অফিস এবং শ্রমিক ইউনিয়নের অফিসের দিকে নিয়ে এসে বসতে বলল আমাদের। আমরা সবাই বসলাম এবং তারা মেশিনগান ঠিকঠাক করতে লাগল। আমি ভাবছিলাম যে সম্ভবত এখানে আমাদের ব্রাশ ফায়ার করবে। আমাদের ভিতর থেকে একজন বলল, "দেখেন আমরা তো নিরীহ কর্মচারী। আমাদেরকে মেরে আপনাদের কি লাভ হবে?" তখন পাক-সেনাদের মধ্যে একজন বলল যে, "বোল শালা, জয়বাংলা বোল। শালে, তোম লোগ কো জয়বাংলা বোল। তুমহারা মুজিবর বাপকো বোলাও উ বাচায়গা। তুম লোগ কো সব শালে খতম কর দিয়া।" ক্যাপ্টেনের ওখানে কি যেন ওয়ালেস এলো, তখনই বলল, চল। আমাদের মাঝে ছাত্ররা সকলই

তখন চুপচাপ। আমাদের কর্মচারীদের মধ্যে একজন শুধু কথা বলছিল। পাক-বাহিনীর ওরা বলল যে, ''চল হামারা ক্যাপ্টেন সাহাব বোলাতা হ্যায়। যো অর্ডার দেগা উই হোগা।'' ওয়ারলেসে আলাপ-আলোচনা হয়ে গেছে। মৃত লাশগুলো বিভিন্ন জায়গায় যে রয়েছে ওগুলো আমাদের দিয়ে তুলবে। ড. মতিন চৌধুরীর বাসার দিকে যে দেয়াল ভাঙা আছে আমাদের ওখানে নিয়ে গেল। রাস্তার অপর পাড়ে কতগুলো পাথরের টুকরোর স্তূপ ছিল। পাথরের টুকরোগুলোর স্তূপের উপরে ক্যাপ্টেন বসে আছে চেয়ারে। তখন তিনি আমাদের দেখে হাসলেন এবং জোরে বললেন, ''শালে বাঙালি, শালে মাদারচোদ, শালে জয়বাংলা বোল। তুমকো মুজিবর বাপকো বোলাও, উ তুমকো বাঁচায়েগা''। আমাদের মধ্যে একজন বলল, ''আমরা সব কর্মচারী স্যার, ইউনিভারসিটিকো কর্মচারী হ্যায়। ছাত্র তো কোহি নেহি হ্যায়। হামারা সব ইউনিভারসিটিতে কর্মচারী আছে''। ক্যাপ্টেন তখন খুব হাসল এবং বলল, ''কর্মচারী, বানচোদ শালা, সব শালা ঝুটা বোলতা হ্যায়, শালা কর্মচারী হ্যায়, ইনকো শালেকো সব চেক করো।'' আমাদের সবাইকে হাঁটু পর্যন্ত চেক করলো একজন সিপাহী বলল ''তুম লোগ কুছ কাম করনা পারেগা''। আমাদের মধ্যে একজন বলল, ''ক্যায়া কাম''। পাক-সেনা বলল, ''কাম করেগা, তোম লোগকো ছোড় দেগা।'' ছাড়ার কথা শুনে আমাদের মনের মধ্যে কেমন করল। তখন আমরা ঠিক করলাম যে, কাজ করলে যখন ছেড়ে দেবে, যে কাজই হোক না কেন আমরা করতে প্রস্তুত। আমাদের সকলকে দুজনের এক একটা গ্রুপ করে ভাগ করলো। তখন সকাল হয়ে গেছে। আমাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় যে মৃত লাশগুলি পড়ে ছিল সেগুলি এক জায়গায় তুলে আনার জন্য আদেশ করলো। দুজন করে এক একটা যে গ্রুপ ছিল, তাদের মধ্যে আমার গ্রুপে ছিল শ্যামলাল। শ্যামলাল ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়ীতে কাজ করত। অন্য গ্রুপের মধ্যে ছিল মিস্ত্রি, ইলেকট্রিক কাজ করত এবং তার সাথে ছিল দাসু। দাসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়ীতে কাজ করত। শিবু, গয়ানাথের ছেলে এবং আমার ভাই মুন্নিলাল, যিনি পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং-এর কাজ করতেন। আমার বড়ো বুধীরাম একজন ড্রাইভার ছিলেন এবং সাথে জহর ছিল, বেলিয়ার বাবা। জহর বোটানী বিভাগে কাজ করত। আমাদের মধ্যে যে ছাত্ররা ছিল, যাদের পাক-সেনারা জানতো কর্মচারী হিসাবে তাদেরকেও আমাদের কর্মচারীদের সাথে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক গ্রুপের জন্য দুজন করে পাক-সেনা ছিল। আমাদের কাজ হলো মৃতদেহ টেনে আনা। আমাদের গ্রুপে ঐ দুজন যারা আমাদের তত্ত্বাবধানে ছিল তারা আমাদের পিঠে স্টেনগান ঠেকিয়ে নিয়ে যেতো এবং নিয়ে আসতো। সবাই দেখছিলো এই নাটকীয় দৃশ্যাবলী এবং লক্ষ্য করছিলো এই অচিন্ত্যনীয় ঘটনা। মৃতদেহগুলির মধ্যে যার যার মৃতদেহ এনেছি তারা হলেন, শিববাড়ীর রাস্তার ধারে সি এন্ড বি-এর একটা গোডাউন ছিল। সেখানে প্রথমে নিয়ে যায় আমাদের এবং

সেখানে ১০/১২ জনের মৃতদেহ দেখলাম। তাদের সবাই আমার অচেনা, হয়তো তাদেরকে ধরে এনে ব্রাশ ফায়ার করা হয়েছে। গোডাউনের মধ্যে পা দেওয়ার সাথে সাথে দেখলাম রক্তে একদম সমস্ত গোডাউন ঘরটা ভিজে গেছে। আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হলো একটি একটি করে নিতে। তখন আমি এবং শ্যামলাল দুজনে একটা লাশ নিয়ে হলের বর্তমান শহীদ মিনারের চত্বরে এনে রাখলাম। হলের বাইরে সমস্ত লাশগুলোকে আমাদের গ্রুপে সকলে এনে এনে ওই জায়গায় রাখছে। সব মাথা এক দিকে করে লাশগুলি সাজিয়ে রাখা হলো। এর আগে একটা ঘটনা, সকালবেলা উত্তর বাড়ীর ছাদের উপরে জলের ট্যাঙ্কে সম্ভবত ৫/৬ জন ছাত্র ছিল, তাদের পানির ট্যাঙ্ক থেকে তুলে এনে ছাদের কার্ণিশে দাঁড় করিয়ে গুলি করে নিচে ফেলে দিল। আমি তখন হল শহীদ মিনারে ছিলাম। সি এন্ড বি গোডাউন থেকে দশটা লাশ নিয়ে এলাম। আমি মিশ্‌রী এবং শিবু, ড. জি.সি দেবের লাশ বয়ে নিয়ে এলাম। শিবু এবং মিশ্‌রী কেউই এখন আর বেঁচে নেই। এরপর শ্যামলাল এবং আমাকে বলল, "চল উধার যানা হ্যায়।" আমরা বললাম, "কাহা যায়েগা?" তখন পাকসেনারা বলল, "হামলোগ ইচ্ছা খুশি"। আমরা গেলাম শিববাড়ীর প্রথম দালানটাতে মধুদার বাসায়। যখন আমরা তার বাসায় প্রবেশ করলাম, তখন দেখলাম মধুদার গর্ভবতী স্ত্রী মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তার ছোট-মেয়ের বুকে বুলেট বা বেয়োনেটের আঘাতে রক্ত ঝরছে। তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে সে কাঁদছে। মধুদা দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছেন, রক্ত ঝরছে। তখন আমাদের তত্ত্বধায়ক পাকসেনারা বলল, "শালে দেরি কিউ কারতা? উঠ যাও, দেরী নেহি।" আমরা চোখের সামনে যা দেখলাম তাতে আমাদের হতভম্ব অবস্থা। আমাদেরকেও চেনা যায় না। সমস্ত গায়ে রক্ত লেগে ছিল। তখন আমি বললাম, "মধুদা চলেন"। মধুদা আমাকে বললেন, "কোথায় নেবে?" আমি বলতে পারলাম না। তখন মধুদার ছোট মেয়ে বলছে, আমার বাবাকে এখান থেকে নেবেন না। তখন পাকসেনারা বলে উঠল, "এই লেড়কি চুপ কর, নয়তো গোলি কর দেগা" আমি এবং শ্যামলাল মধুদাকে ধরে তার দুইহাতের ডানার দুদিক আমাদের কাঁধে ফেলে মধুদাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলাম। আস্তে আস্তে যখন হাঁটিয়ে আনছি তখন দেখলাম মধুদার বুকে রক্ত, অর্থাৎ তার বুকে গুলি লেগেছিল। তিনি কোন কথাই আর জিজ্ঞাসা করেননি বা কথা বলেননি। পাক সেনারা সকলই রাস্তার উপরই, কেউ চা গরম করছে, কেউ বোতল থেকে মদ ঢেলে খাচ্ছে। তাদের মুখেও একটি কথা আমাদের গালাগালি করা, তারা বলছে যে, "শালে জয় বাংলা বোল, তুমহারা মুজিবর বাপকো বোলাও, উহু তুম লোগকো বাঁচায়েগা"। এইভাবে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দিচ্ছে। ওদের গায়ে কোন রক্তের দাগ ছিল না। মধুদাকে বর্তমান হল শহীদ মিনারের যেখানে সমস্ত লাশগুলো এনে রাখা হয়েছিল সেখানে এনে বললাম, "মধুদা আপনি এখানে শুয়ে পড়ুন।" তখন মধুদা আমাকে বলেন যে, "ওরা কারা, এগুলি কি সবই মৃত?" তখন আমি মধুদাকে

বললাম, "এগুলো কারা আপনি জানেন না? এরা সবাই মৃত। আর কিছুক্ষণ পর আমাদের ঐ একই অবস্থা হবে। আপনি এক কাজ করুন, শুয়ে পড়ুন।" রক্ত ঝরতে ঝরতে তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলেন। দেখলাম শিববাড়ীর শিবমন্দির থেকে চার জন সাধুকে ধরে আনলো আমি তাদের মধ্যে একজনকে চিনতাম, যার নাম ছিল ব্রজানন্দ সাধু। ব্রজানন্দ সাধু প্রিয় ভক্ত ছিল মুকিন্দ্র সাধু। যার সাথে আমার খুব ভালো আলাপ ছিল। কিন্তু এই অবস্থায় তার সাথে আলাপ করার কোন সুযোগ পেলাম না। তখন কাকে কি বলব সে ভাষা খুঁজে পেলাম না। আমরা সবাই তখন মৃত্যুপথযাত্রী। আমরা কেউই এখান থেকে বাঁচবো না তা জানি। আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে তাও জানি। আমি তখন স্থির নিশ্চিত যে আমি মরব। তাই ভাবছিলামও না, আমরা কি করে বাঁচবো। এতো লাশ দেখে কোন কিছু আর চিন্তা করার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। আমরা কেউ কোনভাবে আর পালানোর চেষ্টা করিনি। আমি ভাবলাম যে আমার মা রয়েছে, বোন রয়েছে, আমি একা প্রাণ নিয়ে কোথায় যাব? মেরে যদি ফেলেই আমাদের সবাইকে মেরে ফেলুক, এক সঙ্গে আমরা মরে যাব। তখন শিববাড়ীর সাধু চারজনকে এনে দাঁড় করিয়েছে এবং পাকসেনারা বলল, "তোমরা ঠায়রো ইয়া পার।"

এভাবে চারদিক থেকে মৃতদেহগুলি আনা হলো। কোথাও আর কোন মৃতদেহ নেই, আশেপাশে যা ছিল সব আনা হয়েছে বর্তমান শহীদ মিনারের চত্বরে। ড. জি.সি দেবের সমস্ত গায়ে গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়েছে। ড. দেবের পরনে তখন ছিল ধুতি আর গেঞ্জি। তার নাকে-মুখে কোন গুলি না লাগায় আমি তাকে চিনতে পেরেছিলাম। তার প্রাণের স্পন্দন পুরোপুরি থেমে গেছে, তিনি তখন সম্পূর্ণ মৃত। মোটা মানুষ ছিলেন ড. দেব, তাই ঐ অবস্থায় তাকে ভীষণ অদ্ভুত দেখা যাচ্ছিল। বুলেটের প্রতিক্রিয়ায় তার শরীর ফুলে গেছে। যখন সকাল ৮-৩০ কি ৯টা বাজে তখন আমার জানা মতে সম্ভবত বিশ জনের লাশ টেনেছিলাম শ্যামলাল এবং আমি দুজনে। শ্যামলাল এবং আমার মধ্যে আর কোন কথা হয়নি। আমি শ্যামলালের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছি কিন্তু সে কোন শব্দ করেনি। আমি তাকে বললাম, "আমাদের কোন উপায় নেই, এখনই মরে যেতে হবে। কাজে তোমার কোন কথা থাকে তো বলো, আমরা কিছুক্ষণ আলাপ করে নিই।" কিন্তু তার কাছ থেকে কোন শব্দ পেলাম না। তখন আমি বুঝলাম ভয়ে সে সন্ত্রস্ত, অথবা ভয়ে তার কণ্ঠনালী শুকিয়ে কোন স্বরই বের হচ্ছে না। যখন সব লাশ আনা হলো তখন দেখলাম মেয়েলোকের কোন লাশ নেই। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে শুয়ে আছে সবাই। হিন্দু-মুসলমান বুঝলাম এইভাবে যে, আমি একজন মৌলানা সাহেবকে তার মধ্যে দেখতে পেলাম যার মাথায় টুপি ছিল, মুখে দাড়ি ছিল, তিনি তখনও জীবিত, কলেমা পড়ছেন। আমাদেরকে দিয়ে যারা লাশ টানিয়েছিল তারা এই সময় চলে গেল এবং অন্য ছয়জন পাক-সেনা এলো। তখন আমি ভাবলাম যে ওরা চলে যাচ্ছে কেন?

তখন দেখলাম যে ওরা গালাগালি করছে, কিন্তু কথাগুলো ঠিকমতো বেরোচ্ছে না। আমি বুঝলাম যে ওরা খুব মদ খেয়েছে এবং এই অবস্থায় ওদের ভাষায় আমাদের বলল যে, ''তুম লোগ সব লাইন হো যাও। লাইন হও শালে সাব, শালে বেহেনচোদ, সাব শালে লাইন হো যাও। দেরী মাত কর লাইন হো।'' তখন লাইন হওয়ার কথা শুনে আমাদের মধ্যে কি একরকম অবস্থা হয়েছিল তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। কেউ হাতজোড় করছে, কেউ বলছে যে আমার ছেলে আছে, আমার মা আছে, আমার বোন আছে, আমাদেরকে একবার দেখা করতে দিন আপনারা। এইরকম করুণ আর্তি শুনতে পাচ্ছি আমি, কিন্তু যারা এরকম বলছে তাদেরকে লাথি মেরে ফেলে দিচ্ছে। সামনে যারা আছে তাদেরকে গুলি করে ফেলে দিচ্ছে। এ সমস্ত দেখে আমি ভাবলাম যে, এদের কাছে আবেদন-নিবেদন কোন কথাই কোন কাজে আসবে না। তাই পশুদের কাছে কোন কথাই আমি বলব না। আমি তখন লাইনে দাঁড়ানো আছি। আমি লাইনে কয়েকজনের পাশে ছিলাম। ৩/৪ জনের পিছনে ছিলাম আমি, আমার পাশেই ছিলেন আমার বড়দা। এরপরে ছিলেন একজন বাইরের লোক, তাকে আমি চিনতে পারিনি। এর পরেই ছিলেন ঐ মৌলবী সাহেব। তিনি যখন দাঁড়িয়ে ছিলেন তখন তিনি ভালো মানুষ। তখন অপর দিক থেকে গুলি করছে। গুলি করা দেখে মৌলবী সাহেব কলেমা পড়তে লাগলেন এবং কোরান-হাদিসের বিভিন্ন আয়াত পড়তে লাগলেন। মৌলবী সাহেব হয়তো কিছুদূর এগিয়ে যখন ওদের কাছে গিয়েছিলেন তখনই তাকে গুলি করে। পরপর তিনটে গুলি করল তাকে। এরপরে আমার দিকে পজিশান নিল দেখলাম। যখন একটা গুলি এসে আমার ডান উরুতে লাগল তখন আমি মৃতদেহের পাশে পড়ে গেলাম। আমার বড়দাকে দেখলাম যে তিনি গুলি খেয়ে পড়ে গেলেন। কেউ কেউ গুলি খেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। আমি তখন সম্পূর্ণ ভাবে লক্ষ্য করতে পারছি, গুলি খেলেও আমার জ্ঞান ছিল সজাগ। গুলি খেয়ে একে অপরের কাছে যাচ্ছে আর হাতজোড় করছে কেউ কেউ। কেউ বলছে, মেরো না আমাদের এভাবে। আমার বড়দা যখন গুলি খেলেন তখন উনি উঠে যেতে চাইলে আমি তাকে ডান হাত দিয়ে চেপে রাখি। রক্ত ঝরার শব্দ যা কোনদিন শোনা সম্ভব নয়, তাও আমি শুনেছি। ফিনকি দিয়ে রক্ত একসাথে বের হবার শব্দ হচ্ছিল। শব্দটা জলের ট্যাপ খুললে যদি খুব জোরে জলের চাপ আসে তাহলে যে শব্দ হয় তা হচ্ছিল। কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, যা কারো পক্ষে কোনদিনই শোনা সম্ভব হয়নি। তখন দেখলাম যে পাক-সেনারা হালকা মেশিনগান ঘুরিয়ে যারা এদিক-ওদিক করছে বা নড়ছে তাদের উপর পুনরায় গুলি করছে। যাদেরকে ওরা গুলি করছে, তাদের মৃত্যুকে ওরা নিশ্চিত করতে পুনরায় গুলি করছে। আমার ভীষণ চিন্তা হয়ে গেল আমার উপর আবার গুলি করে কিনা। যখন দেখলাম যে আবার আমার উপরে গুলি করার পদক্ষেপ নিচ্ছে তখনও বড়দাকে আমি চেপে রেখেছি। তিনি উঠতে চাইছেন, আমি

তাকে বললাম, "তুমি একটু ক্ষান্ত হও, উঠতে যেয়ো না।" এই বলে আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে চেপে ধরলাম কিন্তু রাখতে পারিনি। যতক্ষণ আমি তাকে চেপে ধরে রেখেছি তাতে আমি দেখছি আমার হাত আর তার শরীর থেকে উঠছে না। মনে হলো যেন চুম্বকের মতো আমার হাতটা আটকে আছে। এই অবস্থায় দাদা বলছেন, "আমার মেয়ে আছে, আমার স্ত্রী আছে আমি কীভাবে তাদের কাছে যাব? আমার স্ত্রী আর মেয়েটাকে একটু দেখতে চাই।" আমি তখন তাকে আশ্বস্ত করলাম যে একটু পরেই তুমি দেখতে পাবে। এরপরে আমি দেখলাম পাক-সেনারা চলে যাচ্ছে। যখন পাক-সেনারা চলে গেল তখন বড়দা আমাকে বললেন, "আমাকে ছাড়ো তুমি, আমি যাবো।" আমি দেখলাম যে পাক-সেনারা গাড়ীতে উঠে চলে যাচ্ছে। তখন বড়দা উঠে দৌড় দিলেন, কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর তিনি মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। তখন এই হল এলাকায় কোন সৈন্য ছিল না; অর্থাৎ শিববাড়ীর এলাকা দিয়ে যারা প্রবেশ করছিল তারা সকলেই চলে গেল। যারা এসেছিল তাদের সংখ্যা প্রায় ১৫০ জনের মতো। সকলেই চলে গেল। তখন আমি দেখলাম যে, ছেলে- মেয়ে-স্ত্রী সবাই জল নিয়ে দৌড়ে আসছে। ঘটির মধ্যে জল নিয়ে আসছে, কারণ যারা গুলি খেয়ে পড়েছিল তারা 'জল দাও' 'জল দাও' চীৎকার করছে। জল নিয়ে যারা দৌড়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে বিন্দুর মা ছিলেন, দাসু রামের স্ত্রী ছিলেন। দাসু রাম ভাইস চ্যান্সলরের বাড়ীতে মালীর কাজ করত, এখনও তার স্ত্রী ভাইস চ্যান্সলরের বাড়ীতে মালীর কাজ করে। তখন আর কেউ আসছিল কি না বলতে পারব না, কারণ তখন আমার চোখ নিস্তেজ হয়ে আসছিল, শরীর নিস্তেজ হয়ে আসছিল, চোখে লাল রক্তের মতো রঙ দেখছিলাম। তখনি উপস্থিত হলো আমার মা, বোন এবং বৌদি। তারা আমাকে একটু জল খাওয়ালো, আমি তাদেরকে বললাম, আমাকে জল দিও না, আমাকে তুলে নিও চলো এখান থেকে। তখন তারা আমাকে নিয়ে এলো। কিন্তু বড়দা তখন জীবিত থাকলেও তার খবর কেউ করতে পারেনি, তাকে তুলে আনা সম্ভব হয়নি। অনেক লাশের মধ্যে তাকে আর খুঁজে আনা সম্ভব হয়নি। বিন্দুর মা আর কয়েকজন ছেলে মিলে তার স্বামীকে তুলে নিয়ে আসছে। তখন ওনার স্বামী জীবিত ছিল। হয় তো বাঁচবেন না, কিছুক্ষণ পরেই মারা যাবেন এই অবস্থা। আমাদের জগন্নাথ হলের বল খেলার মাঠে বর্তমানে যে গ্যালারী আছে সেখানে নিয়ে এলো। তখন দেখলাম হলের ইলেকট্রিশিয়ান চিৎবল্লী একদম পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে। ঐ দিকে কান্নাকাটির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, আমি শুনতে পাচ্ছি। আমাকে সবাই ঘরে নিয়ে এলো। আমার শরীরের রক্ত দেখে সবাই ভয় পেয়ে গেল, দেখল যে রক্তে ঘর ভেসে যাচ্ছে। আমি দেখলাম যে একটা জলের গামলা নিয়ে ঘরের মধ্যে যে রক্ত পড়ছে তা মাটি থেকে গামলায় তুলছে আমার মা। আমি ভাবলাম যে আমি যখন জীবিত আছি তখন এভাবে এ অবস্থায় আর অপেক্ষা করলে আমাকে মরতে হবে। তাই প্রথমে ভাবলাম রক্ত যে

ঝরছে, তা কীভাবে বন্ধ করা যায়। আমার শরীরে দুর্বলতা এসে যাচ্ছিল এবং শরীর শিথিল হয়ে আসছিল তখন। মাকে বললাম, "মা তোমরা কেঁদো না, সবাই এখান থেকে চলে যাও। তোমরা এখানে থাকলে মারা পড়বে।" মা বললেন, "তোমাকে ছেড়ে আমি যাব না, সবাই তো মরে গেছে। কে আমাদের দেখবে, কে আমাদের খাওয়াবে?" আমি বললাম, "বোন এবং বৌদিকে নিয়ে তোমরা এখুনি চলে যাও, আর আমার জন্য এক জগ জল এখানে রেখে দাও। যদি আমি জীবিত থাকি তাহলে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে। আর যদি মরে যাই তাহলে এই ঘরে আমার কঙ্কাল পাবে এবং এখানেই আমার স্মৃতিটা করে দিও। তোমরা চলে যাও।" সকলেই তখন গাট বেঁধে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মা যেতে চান না, তাকে অনেক বুঝিয়ে পাঠিয়ে দিলাম।

আমি তখন একদম একা, আর কারও কোন শব্দ শব্দ পাচ্ছি না। ভাবলাম যে সত্যি সকলেই চলে গেছে। জলের জগটা তুলে জল খাওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে শক্তিটুকুও নেই যে জলের জগটা তুলে জল খাবো। সমস্ত শরীর আমার ছেড়ে দিয়েছে আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না, আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। আমার যখন এই অবস্থা তখন দেখলাম মা কয়েকজন লোক নিয়ে ঘরে উপস্থিত। মা সবাইকে বললে "আমার ছেলেকে তোমরা বাঁচাও। তোমাদের যত টাকা-পয়সা লাগে আমি দিব, তবু ওকে একটু মেডিক্যালে নিয়ে যাও।" তখন তারা তাড়াতাড়ি করে আমাকে ধরে বাঁশের বেড়ার উপর তোলে। হয়তো কারওর ঘরের দরজা ছিল, এই বেড়াটাকে নিয়ে আমাকে তার উপর তুলল এবং তার উপর কাপড় ঢাকা দিয়ে ছুটলো। বকসীবাজার যাওয়ার পথে মেডিক্যালের পিছনের গেট দিয়ে মেডিক্যাল হাসপাতালে নিয়ে এলো। আর তখনই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাকে ভিতরে নিয়ে গেল। মেডিক্যালের ডাক্তাররা আমাকে ঘিরে থাকলো এবং আমাকে বহু কথা জিজ্ঞাসা করতে থাকলো। তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কি ছাত্র না অন্যকিছু? আমি বললাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানী বিভাগের একজন কর্মচারী। আমি হলেই থাকি। ডাক্তাররা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, "ওখানে সবাইকে কি মেরেছে?" আমি তাদেরকে তৎকালীন অবস্থা বর্ণনা করলাম। তখন প্রফেসর সাহেব সবাইকে বললেন, "একে জলদি করে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাও। একে আর বেশি কথা জিজ্ঞাসা করার সময় নেই।" আমার শরীরে যেখানে আঙুল দেয় সেখানেই আঙুল দেবে যায়। এই অবস্থায় আমাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেল। এরপর আমার চিকিৎসা হতে লাগল। পরে শুনেছি যে গুলি করে মেরে যাওয়ার ঘন্টাখানেক পর ট্রাক্টর, রোলার ইত্যাদি এনেছিল এবং মৃতদেহগুলো যতদূর সম্ভব নিয়ে ট্রাকে তুলে, আর যেগুলো নিতে পারেনি ট্রাক্টর দিয়ে পুঁতে রেখেছিল। শ্যামলালের কোন গুলি লাগেনি, সে ওখান থেকে পাক-সেনারা চলে আসার পরই চলে এসেছে।

মোহন

পেশা : মালী, বয়স : ২৫
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জগন্নাথ হলও তৎসংলগ্ন এলাকা হতে গণহত্যার শিকার লাশগুলোকে জগন্নাথ হলের মাঠে জড়ো করার পর সবার সাথে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল মোহন। পায়ে গুলি লেগেও বেঁচে যায় মোহন। জীবন-মৃত্যুর সংকটময় সময়ে মানবতার ডাকে সহযোদ্ধাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন তিনি।

জগন্নাথ হল। ২৫শে মার্চের রাত। তখন আমি জ্বরের জন্য খুব অসুস্থ ছিলাম। আমি ঘুমে অচেতন, হঠাৎ বিকট একটা আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখলাম যে, চারিদিকের আকাশে লাল আলো এবং ধোঁয়ার আভা। দেখলাম আরও দুটি সবুজ রঙ আকাশে ভেসে উঠল, মোট তিনটি শব্দ হয়েছিল। আমাদের ঘর থেকে দেখি যে জগন্নাথ হলের মাঠের পাশের রাস্তায় গাড়ি ভর্তি পাক-সৈন্য। মাঠের দেওয়াল ভাঙা থাকায় গাড়ি ভর্তি সৈন্য মাঠের মধ্যে ঢুকল। দেওয়ালটি ভাঙা ছিল, কারণ ইউ.ও.টি.সি'র ট্রেনিং এই জগন্নাথ হলে হতো। গাড়ি ভর্তি সৈন্য আমাদের বাসার সামনেই রাখলো। আমি এসব ঘর থেকে দেখছি, বের হচ্ছি না। আমি বাবাকে ডেকে বললাম, পাক আর্মিরা দরজা খুলতে বলছে, বাবা তখন উঠে ঘরের দরজা খুলে দিল। ঢুকেই ওরা আমাদের সমস্ত লোকগুলোকে বাইরে বের হতে বলল। আমরা যারা ঘরের মধ্যে ছিলাম তারা সবাই বাইরে বের হয়ে এলাম। আমরা উর্দুতে বলছি, 'হাম লোক কৈ কাছর নেই হ্যায়, হামলোককা উপর ক্যা জুলুমছে আয়া।" ওরা আমাদের বলল, "তুম লোক উর্দুমে বাতচিতকে বাতায়া সামাজমে নেহি তো হাম মেজর সাবকো বোলায়া।" রাতে আমাদের সবাইকে নিয়ে গেল মেজর সাহেবের কাছে, তখন প্রায় রাত চারটা, অর্থাৎ কিছুক্ষণ পরেই আজান দিয়েছে। টিনশেডের ছাত্রাবাস, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এগুলিতে আগুন লাগানোর পরই আজান দেবে। কি একটা পাউডার দিয়ে ওরা আগুন লাগাল। আমরা প্রথমে মেজরের কাছ থেকে চলে আসার পর আবার আমাদের ডেকে নিয়ে গেল লাশ টানার জন্য এবং লাশ টানার জন্য আমাদের দুটো ভাগ করলো। বাংলাভাষী এবং উর্দুভাষী এই দুটো ভাগে ভাগ করা হলো আমাদের দুইদিকে। দুই গ্রুপ সৈন্য আমাদের ভার নিল কাজ করানোর। বাংলাভাষী গ্রুপ কাজ শুরু করলো হলের ভিতর আর অন্য গ্রুপ সৈন্য আমাদের নিয়ে গেল শিববাড়ীর দিকে। আমার সাথে আরও পাঁচজন লোক ছিল। এদের মধ্যে বুধীরাম, আমি মোহন, মিস্ত্রির ছেলে জহরলাল এবং অন্য আর একজনের নাম আমার মনে নেই। আমি এবং আমাদের অন্য কজন মিলে দেববাবুর লাশ টেনে আনি,

রক্তমাখা ভারী শরীর। আমরা যখন দেববাবুকে আনছি তখন তার পরনের ধুতিটা খুলে গিয়েছিল এবং আমরা পরস্পরের মধ্যে বাংলায় কথা বলছি। আমি তখন দেববাবুর লাশ মাটিতে রেখে তার কাপড়টা ঠিক করে দিচ্ছি। এরই মধ্যে আমার ঘাড়ে রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারলো পাক সৈন্য। বলল, ''তুম ইয়ে লাশ কো কিউ রাখতা হ্যায়, এক সাথমে টেনে চাল।'' আমি তখন লাশটা টেনে তুললাম এবং বর্তমান শহীদ মিনার পর্যন্ত এনে রাখলাম। আমরা যখন দেববাবুকে আনতে গেলাম, তখন দেখলাম যে সমস্ত ঘরবাড়ির দরজা বন্ধ। আমাদেরকে আর্মির লোকজন দরজা ভাঙতে বলল কিন্তু আমাদের হাতে কিছু না থাকায় আমরা তা পারিনি। তখন পাক-সৈন্যরা লাথি মেরে তা ভাঙল। ঘরের ভিতরে আর কোন লোকজন ছিল না। বাইরে থেকে দেববাবুকে ওরা গুলি করেছে, জানালা দিয়ে দেববাবুর বুকে গুলি করেছে এবং দেববাবু বিছানার কাছে পড়ে আছেন। পরে আমরা দেববাবুর লাশ টেনে নিয়ে বর্তমান জগন্নাথ হল শহীদ মিনারের কাছে রাখি। চারিদিক থেকে আরও লাশ টেনে আনা হচ্ছে, আমি যে সমস্ত লাশ টানিনি তাদের মধ্যে পরিচিত মধুদাকে জীবিত অবস্থায় এখানে টেনে আনা হয়েছিল। জগন্নাথ হল থেকে যে সমস্ত লাশ আমি টেনেছি তা সবই শক্ত হয়ে গেছে। উত্তর বাড়ি থেকেও বহু লাশ আমি এনেছি, উত্তর বাড়ীর রুমের মধ্যে এবং বাইরে এ সমস্ত লাশ পড়েছিল। এরা যে কীভাবে মারা গেল, বোমা না গুলি তা বুঝতে পারা যায় না। পেটের মধ্যে কিছুই নাই, এমনি ভাবে মারা হয়েছে। মনে হয় পেটের মধ্যের যা, তা সবই তুলে নেয়া হয়েছে। যারা প্রথম প্রথম গুলি খেয়েছে তারা শক্ত হয়ে গেছে। পুকুরের পাড় থেকেও আমি অনেক ছাত্রের লাশ টেনেছি। ভোরের দিকেই ঐ সমস্ত জায়গা থেকে আমি ছাত্রদের লাশ টেনেছি। এইভাবে আমাদের দিয়ে অনেক লাশ টানানোর কাজ করালো ওরা। যে সমস্ত ছাত্রের লাশ আমি টেনেছি তাদের সবাইকে আমি চিনি না, তবে যাদের সাথে ছোটবেলায় ফুটবল খেলেছি কিন্তু নাম জানি না তাদেরকেও আমি শহীদ মিনারে এনে রেখেছি। এদের মধ্যে আমি একজন ছাত্রকে স্বাধীনতার পরেও দেখেছি। সে এখনো বেঁচে আছে, তবে নাম জানি না। যে সমস্ত ছাত্রদের টেনেছি তাঁদের কেউ কেউ তখনও বেঁচে ছিলেন। তখনও কথা বলছিলেন। তারা বলছে যে, ''আমাদের এখানে রেখো না। অন্য জায়গায় নিয়ে চলো। আমাদের অন্য ব্যবস্থা করো।'' আমরাও তখন ভয়ে ছিলাম। আমরা বললাম' ''একটু চুপ করে থাকেন, ওরা সরে গেলে একটা ব্যবস্থা করা যাবে।'' আমাদের তো বেশীক্ষণ ওখানে থাকা নিষেধ, তাই আমরাও ভয়ে ভয়ে আছি। তাদের কারও কারও পা ভেঙে গেছে, হাত ভেঙে গেছে কিন্তু মারা যায় নাই। এর পরে যখন সমস্ত লাশ টানা হয়ে গেল তখন আমাদের যারা উর্দুতে কথা বলতে পারি তাদেরকে মেজর সাহেবের কাছে নিয়ে গেল। এদের মধ্যে আছে আমার কাকাতো ভাই মিস্ত্রী, উনি মারা গিয়েছেন। মিস্ত্রী উর্দুতে পাক-সেনাদের সাথে কথায় কথায় বহু কথা জিজ্ঞাসা

করলেন, এমনকি যেন তর্ক বেধে গিয়েছিল। মেজর মিস্ত্রিকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''আপলোক বিহারী হ্যায়?'' বুঝতে পারছিলাম মেজর তা বিশ্বাস করছিলেন না। আমরা তবুও কথা বলছি, সকলেই কাতর প্রার্থনা করছি। আমরা বললাম, ''আপ জবান কো পয়জাল করনে হ্যায়?'' তবুও মেজর আমাদের কিছুই বিশ্বাস করলেন না। বহুক্ষণ পরে বললেন, ''ঠিক হ্যায়, ইয়ে লোগকো লিয়ে যাও।'' আমাদেরকে অনেক আগেই মারার আদেশ দিয়েছিল। আমাদের নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়ার পরে বর্তমান শহীদ মিনারে নিয়ে আসা হলো। আমরা যারা উর্দুতে কথা বলতে পারি সেই গ্রুপেই নিয়ে আসা হলো শহীদ মিনারে। আমাদের নেওয়ার পর তারা গুলি করার আয়োজনে বন্দুক ঠিক করছে, এটাও আমরা দেখছি তখন। অন্য দল তখনও লাশ টানার কাজ করছিল এই ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের দিক থেকে। চারিদিকেই গার্ড দেওয়া আছে যাতে কেউ পালাতে না পারে। আমরা এই সমস্ত দেখে ভীষণ কান্নাকাটি করছি, কিন্তু কে শোনে কার কথা। আমরা শুধু কান্নাকাটিই করছি আর কোন কথা বলছি না। আমাদেরকে লাইন করতে বলল এবং আমি ছিলাম লাইনের একেবারে প্রথমে। হঠাৎ আমার কিসের যেন একটা চোট লাগল, আমি পড়ে না গিয়ে কয়েকজন লোকের পিছে চলে গেলাম। একজনের পেটে গুলি লাগার পর দেখলাম তার পেটের সমস্ত কিছু চলে গেছে। ওটা দেখছিলাম বলেই আমার চোট লাগার পর আমি ভেবেছি যে, আমি মরে গেছি, আমারও পেটের মধ্যে কিছু নেই। তখন আমি লাফ দিয়ে পুরোনো লাশগুলো যা মৃত তাদের মধ্যে গিয়ে লুকালাম, ওখানে লুকিয়ে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। তারপরে কি হয়েছে তা আমি কিছুই টের পাইনি। যখন হুঁশ হলো তখন দেখলাম যে আমার গায়ে একটাও গুলি লাগেনি। আমি আমার পা দুটো একটু নড়াচড়া করলাম। তখন ওরা আমাকে আবার গুলি করল পা দুটোকে জোড়া করার সাথে সাথে। আমার পায়ে দুটো গুলির একটি উরুতে এবং অপরটা পায়ের হাঁটুর নীচে লাগে। আমি ভাবলাম যে ওরা যখন এখনও আছে, তখন পা দুটোকে ছেড়ে দিই। শেষে দেখলাম আর ওরা গুলি করল না। তখন আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ি এবং আবার যখন হুঁশ হয় তখন দেখলাম ওরা আর কেউ নেই। আমি দেখলাম যে আমার শরীর থেকে রক্ত ঝরছে, পা ফুলে গেছে আর লুঙ্গি-টুঙ্গি যা ছিল তা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। আমার কাছেই দেখলাম বুধীরামকে। আমি মাথা উঠাইনি, যখন অনুভব করলাম যে আর্মি সব চলে গেছে। তখনই শুনলাম চারিদিক থেকে শুধু পানি, পানি। আমি তখন ভাবলাম পাক আর্মি শুধু মেরেই ফেলে যাবে না, আবার হয়তো লাশগুলোকে কিছু করতে ওরা আসবেই। আমি দেখলাম বুধীরাম উত্তরবাড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছে, আমি তখন তাকে দুলাভাই বলে ডাক দেই। তিনি শুনলেন এবং দাঁড়ালেন, আমিও দেখলাম যে তাঁর পেটের মধ্যে থেকে সমস্ত নাড়িভুড়ি বেরিয়ে আসছে। তিনি খুব কষ্ট করে পেট চেপে ধরে হেঁটে যাচ্ছেন। তাঁকে নিয়ে উত্তর বাড়ির ভিতরের দিকে গেলাম এবং আমাকে তিনি বললেন, ''আমাকে

একটু পানি দাও।" আমি বললাম, এখান থেকে বের হয়েই পানি খাওয়াব। উত্তর বাড়ির কাছে যে গেট, সেখান থেকে আমরা দুজনে আস্তে আস্তে শিক্ষকদের কলোনীর দিকে গেলাম এবং বহু কষ্ট করে দেওয়াল পার হলাম দুজনেই। আমরা দেওয়ালের ওপাশে গিয়ে আমাদের বিভাগীয় শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ জামাল সাহেবকে ডেকে বললাম যে, "আমি স্যার আপনার বিভাগের একজন মালী। আমাকে বোধহয় চিনতে পেরেছেন। স্যার আমার পায়ে গুলি লেগেছে, আপনার বাসায় আমি আসব, একটু পায়ে কাপড় বেঁধেই আবার চলে যাবো।" তিনি আমাকে কিছু বললেন না। আমি আর স্যারের বাসার দিকে না গিয়ে রোকেয়া হলের দেওয়াল টপকে গেলাম। ওপারে গিয়ে দেখলাম ভিতরের কাজের লোকগুলো কাজ করছে। তারা আমাদেরকে দেখলো এবং আমরা একটা ডিপোর মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম। বুধীর গায়ের রক্ত সব বের হয়ে যাচ্ছিল, তাই ঢুকেই তাড়াতাড়ি তা বাধার চেষ্টা করলাম। এক সময় দেখলাম যে, সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি তাকে বহু ডাকাডাকি করলাম, কিন্তু সে উঠল না। আমি আর অপেক্ষা না করে আমার মাসির কাছে চলে গেলাম। ভিসির বাড়ীতে তিনি মালীর কাজ করেন। তাঁকে ডেকে আনলাম এবং বহু কষ্টে তাঁর সাথে তাঁর বাড়িতে চলে গেলাম। পরের দিন কারফিউ তুলে নেওয়ার পর মেডিকেলে চলে গেলাম। ভিসির বাড়িতে থাকাকালে সবাই বলছে যে, গুলি খাওয়া লোক এখানে এসেছে শুনলে এখানেও আর্মি হানা দেবে। যাইহোক মেডিকেলে গিয়ে প্রায় মাস দেড়েক পর সেখান থেকে ভালো হয়ে আসি এই হলে। বুধীরাম ওখানেই উপুড় হয়ে পড়ে থাকল আর উঠতে পারলো না, হয়তো ওখানেই শেষ। হলের ছাত্র একজন বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করতো, তাঁর সাথে মেডিকেলে দেখা হলো। তাকে দ্বিতীয় গ্রুপে গুলি করেছে এবং ওনার হাত ভেঙে গেছে। স্বাধীনতার পরেও তাঁর সাথে দেখা হয়েছে। টেলিভিশনে যখন আমার কথা নেওয়া হল তখন আমি আমার স্যারের ব্যবহারের কথা বলেছিলাম, সত্য কথা বলেছিলাম, ভয় কি? তবে রোকেয়া হলে যাওয়ার পরে লেবাররা জিজ্ঞাসা করছিল, আমরা হিন্দু না মুসলমান। আমরা বলেছিলাম আমরা মুসলমান, তবুও তারা আমাদেরকে সহায়তা করেননি ভয়ের কারণেই।

শ্যামলাল

মালী, উপাচার্যভবন,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শ্যামলাল রাজভর ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব ও মধুদার মৃতদেহ বহন করে জগন্নাথ হলের মাঠে এনেছেন। তার সাথে ছিল চান্দ দেব রায়। তাদের উভয়কেই পরে জগন্নাথ হলে মাঠের লাইনে

অন্যান্যদের সাথে গুলি করে। কিন্তু উভয়েই আশ্চর্যজনক ভাবে বেঁচে গেছেন। শ্যামলাল রাজভর এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞার বর্ণনা দিয়েছেন।

আমার শালা কাজ করত নিপা অফিসে। ২৫ তারিখ সে আমাকে এসে বলল তুমি আজকে ঘর ছেড়ে চলে যাও। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘‘কেন ঘর ছেড়ে চলে যাব?’’ সে বলল, এমন হতে পারে পাক সেনারা এসে তোমাকে গুলি করতে পারে। আমি বললাম, বেশ ভালো কথা, মরতে হলে আমি আমার ঘরের সামনে মরবো, তবু আমি ঘর ছেড়ে চলে যাবো না। নিপায় নাকি এরকম কথা নিয়ে একটা মিটিং হয়েছে, সে খবর আমার শালা আর চান্দুর ভাই মণিলাল আমাকে এসে বলল। এ কথা শুনে আমি বাইরে চলে গেলাম। বাসায় বলে গেলাম, তোমরা সবাই খেয়ে দেয়ে রেডি হও। বাইচান্স যদি ঘর ছাড়তে হয় তবেই ছাড়বো। পাক সেনারা যদি আসেই তাহলে মরতে হলে মরবো। তারপর বাসায় ফিরে খেয়েদেয়ে বসে আছি। এমন সময় রাত এগারোটা-সাড়ে এগারোটার দিকে মিলিটারীর গাড়ী ঢুকলো। জগন্নাথ হল এলাকায় মতিন চৌধুরীর বাড়ী ছিল। তার বাড়ীর দেওয়াল পাক-সৈন্য ট্যাঙ্ক দিয়ে ভেঙে ভিতরে ঢুকলো। আমার ঘর ছিল বর্তমান হলের গ্যালারীর সামনে। তেরোটি গাড়ী গোলাবারুদ ভর্তি, হলের ভিতরে ঢুকলো। গাড়ীর চাকায় ছিল হাফ পাম্প। গাড়ী এসে আমার ঘরের সাথে দাঁড়াল। তারপরে একজন একজন করে পুরুষ লোকদের, তারা ঘর থেকে ধরে নিয়ে এসে গোয়াল ঘরে আটকে রাখলো। পাকিস্তানীরা আমাদের জিজ্ঞাসা করলো, ‘‘তোমরা কি জয়বাংলার লোক’’? আমরা উর্দুতে জবাব দিলাম, ‘‘না স্যার, আমরা জয়বাংলার মানুষ না। হাম লোক মুসলিম লীগ হ্যায়। হাম সাব ভাঙ্গি হ্যায়’’— মানে সুইপার। ‘‘ইধার মে ঢোকো’’ বলে কয়েকটি বাড়ি দিয়ে ওরা আমাদেরকে বন্ধ করে রাখলো। রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটার সময় অপারেশন শুরু হলো। এই ঘরের মধ্যে ষাট জন লোক ছিলাম আমরা। দেখলাম সাত জন কর্মচারী, কিছু রিক্সাওয়ালা, কিছু ঠেলাগাড়িওয়ালা কিন্তু কোন ছাত্রই নেই সেই ঘরের মধ্যে। এর আগেই সাতজন ছাত্রকে দেখেছি যাদের আমার ঘরের কপাটের সামনে মেরে ফেলেছে। রাত চারটের দিকে শেষ হল জগন্নাথ হলের অপারেশন, পুরুষ লোক যেখানে যাকে পেয়েছে মেরেছে। ছাত্রদেরকেও মেরে ফেলেছে। পুরুষ লোক বলতে কোন লোক নেই জগন্নাথ হলের মধ্যে। যা আছে ষাটটি লোক, তা এই ঘরের মধ্যে বন্দী। এই ষাট জনের পিছনে ষাট জন পাক সেনা দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দিয়ে হলের যেখানে লাশ পড়েছিল সেগুলো এনে হলে বর্তমানে যেখানে শহীদ মিনার সেখানে রাখতে বলল। আমি প্রথমে নিয়ে এলাম দেববাবুর লাশ। আমাদের জগন্নাথ হলের প্রভোষ্ট [সাক্ষাৎকারদানকারী অবগত ছিলেন না সে গোবিন্দ দেব তখন আর জগন্নাথ হলের প্রভোষ্ট নন। — সম্পাদক], আমি এবং আমার শালা তাকে ছেঁচড়িয়ে

বাইরে নিয়ে এলাম। এতো বড়ো বডি কিভাবে আনি। স্যারের পরনে একটি ধুতি কাপড় ও গেঞ্জি ছিল। তাকে রেখে আবার গেলাম শিববাড়ির স্টাফ কলোনীতে। ওখানে গিয়ে দেখলাম মধুদাকে, মধুদার তখনও জ্ঞান ছিলো। মধুদা বললেন, "তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?" উনি আবারও বললেন, "আমি এখান থেকে কোথাও যাবো না।" আমি বললাম, "আপনার শক্তি থাকলে অন্য কোথাও চলে যান, না হলে এই লাশের সাথে ঘুমিয়ে থাকুন।" মধুদাকে নিয়ে আমরা বহু লাশের মধ্যে শুইয়ে দিলাম। দেওয়ালের উপরে স্টেনগান নিয়ে সেনারা বসে আছে, তারা আবার ওই লাশের উপর গুলি করল। আবার আমরা লাশ আনতে গেলাম। রাস্তার পাশে একটা বড়ো ঘর ছিলো সেখানেও বহু লাশ ছিল। পাক সেনারা বলল, "জলদি কর শালারা।" লাশ টানা হয়ে গেলে আমাদের ষাট জনকে লাইনে দাঁড় করানো হলো। এই লাইনের ভিতরে অনেকেই আমার পরিচিত। আমার এক সম্বন্ধী, এক শালা, সীতানাথের ছেলে শঙ্করবিহারী, তার দুই ছেলে, খগেন দে ও তার ছেলে মতিলাল আর আমাদের একটা মালী। তারপর দুইটা পাক সেনা দুই দিক থেকে গুলি করল। গুলি করার আগে কাউকেই জিজ্ঞেস করেনি। কিছুদিন আগে আমি একটা ছবি দেখেছিলাম 'ওয়ার্ল্ড অপারেশন'। সে ছবির একটা কাজ আমি এখানে করেছিলাম। আমাকে যখন ফায়ার করল তখন আমি ডেড বডি নিয়ে মাটির সাথে লেগে গিয়েছিলাম, মাটির সাথে আমি এক হয়ে গিয়েছিলাম। ওরা অপারেশন শেষ করে শিববাড়ির দিকে চলে গেল, সেখানে ওদের আরো একটা পার্টি ছিল। সেখানে ওদের খাওয়া-দাওয়া সব কিছু রেডি। কলা, বিস্কুট, সিরাপের বোতল অর্থাৎ সবগুলিতেই ব্রাণ্ডি, দামী-দামী বোতল সব। যারা অপারেশন করেছে তারা সব বুড়ো লোক, যুবক মিলিটারী একটাও ছিল না। গুলি করে বহু লোক মারা সত্ত্বেও বহু লোক তখনও জীবিত ছিল। আমার বাবা, আমার ভাই, আমার বড় সম্বন্ধী আর চাঁন্দ দেব এরা তখনও জীবিত। ওরা চলে যাবার পর আমি উঠে যে বাসায় কাজ করতাম সেখানে গেলাম। বাড়ির মালিকের নাম এন.এন.হুদা, যিনি পরে অর্থমন্ত্রী হয়েছিলেন। বাড়িতে ঢোকার পর দেখি পাক সেনারা তাঁর ফ্যামিলিকে গ্রেপ্তার করে রেখেছে। আমি বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঢুকে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকলাম। এম.এন.হুদার মেয়েকে ধরে বাইরে নিয়ে এলো। তখন ওনার মেয়ে বলছিল, "দেখুন, আয়ুব খান আমার আব্বাকে একটা সোনার মেডেল দিয়েছে।" মেডেলটা পাক সেনাদের হাতে দেয়া হয়েছিল। প্রাইজটার মধ্যে আরবিতে কি যেন লেখা ছিল। বেগম সাহেবা বললে, "এখন তোমার আব্বাকে বের করে দাও।" মেয়েটি বলছিল, "আম্মা এখন যদি আব্বাকে বের করে দিই তবে ওরা আব্বাকে মেরে ফেলবে। আব্বাকে বের করে দেবো?" চারটার সময় বেগম সাহেবা নিজে গাড়ি বের করলেন। তাদের একটা ভক্সওয়াগান ছিল। চারটার সময় এক ব্যাগ টাকা সহ সাহেব, তাঁর মেয়ে এবং পাক সেনারা বের হয়ে গেল। জঙ্গলে বসে আমি তখন দেখছি একটা

ট্যাঙ্ক জগন্নাথ হলের ভিতর ঢুকলো, আর একটি ট্যাঙ্ক ড. নাফিস আহমেদের বাসার সমানেই থাকলো। ট্যাঙ্ক ঢুকলো চারটার সময়, ঢুকে বহু লোক মারলো। এটা ২৬ তারিখের কথা।

কেশবচন্দ্র পাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কেশবচন্দ্র পাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কাজ করেন। চাকুরী পাওয়ার পর পরই জগন্নাথ হলেই আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজনৈতিকভাবে সচেতন কেশবচন্দ্র পাল নিজেরই অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন এবং একই সাথে তৎকালীন পরিস্থিতির একটি চিত্র ধরার চেষ্টা করেছেন। কেশবচন্দ্র পাল বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর বিজ্ঞান শাখায় কর্মরত।

২৫শে মার্চের বিকালে কলাবাগানে টিউশনি করে বাসে চেপে বাসায় ফিরছিলাম। পরিচিত লোকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো। কিন্তু পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি কোন কথা বলিনি।

জগন্নাথ হলেই আমার বাসা। বাসায় ফিরে ভাত খেলাম। রাত দশটার আগ পর্যন্ত পরিস্থিতি ছিল অনিশ্চিত। চারিদিকে থমথমে ভাব। লক্ষ্য করলাম লোকজন সন্ত্রস্ত। যাইহোক শুয়ে পড়লাম। রাত বারোটার দিকে গোলাগুলির শব্দ হতে লাগলো। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তাই জানতে পারিনি। আমার স্ত্রী আমাকে জাগিয়ে তুলল। দেখলাম আমার আত্মীয়স্বজনরা ভীত হয়ে পড়েছে। আমার বাসাই পূর্ব বাড়ির পিছনে ছিল। আত্মীয়রা সবাই বলল তাদেরকে এ্যাসেম্বলীতে রেখে আসতে। আমি রেখে এলাম। তাঁরা এসেম্বলীতে অবস্থান একটু নিরাপদ মনে করেছিল। এ্যাসেম্বলী হাউস তখন অন্যরকম ছিল। অডিটোরিয়ামটা ছিল সম্পূর্ণ খালি, পিছনের দিকে রাখা ছিল বড়ো বড়ো কয়েকটি প্রতিমা।

আমরা যখন এ্যাসেম্বলীতে আসি রাত তখন সাড়ে বারোটা হবে। আসার সময় রাস্তায় একজন নাম না জানা পরিচিত ছাত্রের সাথে দেখা হলো। তিনি বললেন, কোন ভয় নেই। জহুরুল হক হলের ছাত্রদের ট্রেনিং হচ্ছে, ভয় পাবেন না। এ্যাসেম্বলীতে আমার পরিবার এবং আত্মীয়স্বজনদের সাথে শহীদ সুনীলের পরিবারও ছিল। সুনীল ছিল তখন জগন্নাথ হলের দারোয়ান।

বাসায় ফিরেই বুঝতে পারলাম জগন্নাথ হল পাক সেনাদের আক্রমণ কবলিত হয়েছে।

মিলিটারীরা হলের পশ্চিম দিক থেকেই প্রথমে হামলা শুরু করলো। আগে পশ্চিম দিকের গেট এতোটা পাকাপোক্ত ছিল না। মাঠের পূর্ব দিকের প্রাচীরও ভাঙা ছিল। হল মাঠে ইউ.ও.টি.সি ট্রেনিং হতো, তাই হয়তো সারানো হয়নি। আমি দেখলাম বোমা ফাটিয়ে এবং গুলি করতে করতে পাক সেনারা পশ্চিম দিক থেকে এগিয়ে আসছে। ভয়ে ঘরে ঢুকে পড়লাম। ঘরের দুই দিক থেকে তিন হাত উঁচু দেয়াল থাকায় নিরাপদ ভেবেছিলাম। তখনকার দিনে ওগুলো ছিল স্টাফদের কোয়ার্টার।

বুদ্ধি নামে এক লোক বখ্সীবাজারের এক ডাক্তারের ড্রাইভারের কাজ করত। বুদ্ধি ছিল আমাদের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের চান্দুর ভাই। হল আক্রান্ত হলে বুদ্ধিদা তার স্ত্রী ও বাচ্চাদের নিয়ে আমার ঘরে এসে আশ্রয় নিল। বুদ্ধিরাম ও আমি ঘরের চৌকির নীচে লুকিয়ে থাকলাম। আমার মনে হয় জগন্নাথ হল থেকে যদি কোন রকম প্রতিরোধ করা হতো তাহলে আক্রমণ আরও তীব্র হতো। যাইহোক কিছুক্ষণ পর গুলির শব্দ থেমে গেল। মিলিটারীরা প্রত্যেক হাউসে চেক আরম্ভ করল। এভাবে এক ঘন্টা থেকে দেড় ঘন্টা সময় কেটে গেল। তারপর শুরু হল আমাদের বর্তমান অবস্থান-কর্মচারীদের কোয়ার্টারের তল্লাশী।

এসব কোয়ার্টারে তখন ছয়টা পরিবার থাকতো। এ হলের পিয়ন ছিল তখন রবির বাবা। প্রথমে তার ঘর তল্লাশী শুরু হলো। মিলিটারীরা তার ঘরে প্রবেশ করেই জিজ্ঞাসা করলো, "আপলোক কি হ্যায় ?" একে একে সব তল্লাশী চালাল। অবশ্য রবিদের ঘরের পরেরটা আর তল্লাশী করেনি। জি.সি. দেবের অধীনে কাজ করত খগেনদা। তার ঘরেও তল্লাশী চালায়নি। অবশেষে আমাদের ঘরে হামলা চালাল। দরজা ভেঙে ঘরের মধ্যে ঢুকল। বুদ্ধি ও আমি চৌকির নীচে লুকিয়ে ছিলাম তা আগেই বলেছি। ঘরের সামনে ছিল আমার শাশুড়ি। এসেই জিজ্ঞাসা করল, "আপকা লোক কিধার" হ্যায় ?" তখন আমাদের লোক যারা সামনে ছিল তারা বলল, "না বাবা কেউ নেই।"

আর্মির হাতে একটা টর্চলাইট ছিল। সেটায় খুব বেশি আলো হয় না বলেই আমাদের দেখতে পায়নি। দেখলে আমাদের মেরে ফেলত। মিলিটারীরা আমাদের লোকজনদের জিজ্ঞাসা করল, তোমরা এখানে কি কর? তখন ওরা বলল, আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী করি। অবশেষে কিছু না পেয়ে চলে যাবার সময় মাখনের বড়ো বড়ো গরুগুলো দেখে মন্তব্য করল, গরুগুলো বেশ। মাখন আমার ভগ্নিপতি ও এই হলের দারোয়ান ছিল।

ভোর হওয়ার ঠিক পূর্বে ছাত্রদের টিনশেডের আবাস ঘরটাকে ওরা জ্বালিয়ে দিল। এই ঘরটা পুড়তে পুড়তে আমাদের বাসায় আগুন লাগার উপক্রম হল। আমরা ঘর ভেঙে বেরিয়ে পরলাম। দেখলাম কি যেন গুঁড়ো ছিটিয়ে দিল, তারপর ম্যাচ জেলে আগুন ধরিয়ে দিল। এরপর কয়েকজন আর্মির একদল এসে বলল, "এ আদমী বেরও।"

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে জিনিসপত্র বের করে আনলাম। জ্বলতে লাগল ঘরগুলো। দাউ দাউ করে ছড়িয়ে যেতে লাগল আগুন। অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলাম আমরা ক'জন।

এ্যাসেম্বলী থেকে আমাদের লোকজন খবর নিতে এলো। আমরা লক্ষ্য করলাম মাঠে কয়েক শত পাক আর্মি উত্তর-পূর্ব দিকে পজিশন নিয়ে বসে আছে। তাদের ভিতর থেকে কয়েকজন পর্যায়ক্রমে ডিউটি দিচ্ছে। এই সব গ্রুপ এক একজন মানুষ ধরে আনছে আর জবাব দিতে বাধ্য করছে তাদের জিজ্ঞাসার।

আমাদের পরিবারের যারা এ্যাসেম্বলীতে ছিল, তাদের কাছে সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তারা বলল প্রথমে সেখানে কিছু আর্মি এসে কিছু না পেয়ে চলে যাচ্ছিল। এমন সময় ঘরের ভিতর কোন একটা বাচ্চার কান্নাকাটি শুনে তালা ভেঙে মিলিটারীরা এ্যাসেম্বলীতে প্রবেশ করে। লোকজন থাকা সত্ত্বেও এ্যাসেম্বলীর বাইরে থেকে তালা দেয়া ছিল। মিলিটারীরা তল্লাশী চালায় এবং দারোয়ান সুনীলকে ধরে নিয়ে যায়। আরও শুনলাম বর্তমানের হল অফিস সংলগ্ন ঘর থেকে হাউস টিউটর অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যকে ধরে নিয়ে গেছে। নিয়ে যাওয়ার সময় তার হাত ধুতি দিয়ে বাঁধা ছিল, আর পরনে ছিল শুধু জাঙ্গিয়া। পাক-সেনারা তাকে মারধোর করছিল। নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বেশ অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন। সুনীলকে নিয়ে বর্তমান সুধীরদার ক্যান্টিনের কাছে গুলি করে। এখানে হত্যা করে অনুদ্বৈপায়ন স্যারকেও।

ভোর হয়ে গেল। আমি আমার পরিচিত হলের ইলেকট্রিশিয়ান চিৎবালীদা, লালবিহারীর সাথে বর্তমান ইষ্ট হাউসের ঠিক পিছনে মাঝামাঝি বরাবর এসে দেখা করলাম। এখানেই তার ঘর ছিল। তার সাথে তখনকার বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলছিলাম। এমন সময় উত্তর বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম আর্মিরা ছাদের উপর উঠছে। পানির ট্যাঙ্কে লুকানো ছাত্রদের হাত ধরে টেনে বার করছে। গুলি করে লাথি মেরে ছাদ থেকে ফেলে দিচ্ছে নীচে। চিৎবালীদাকে এই দৃশ্য দেখালাম। বললাম, এবারে আমাদেরও রক্ষা থাকবে না। এই দৃশ্য দেখার পর আমরা দুজনেই খুব ভীত হয়ে পড়ি।

এমন সময় আমাদের কাছে ২/৩ জন আর্মি এলো। আমাদের বলল, "এ আদমী লোক, হামার সাথ আইয়ে।" আমি যাইনি। কৌশল করে নিজেকে বিহারী বলে পরিচয় দিয়ে বেঁচে গেলাম।

ইতিমধ্যে আমাদের বস্তির লোকজন ভেবে নিয়েছিল বিহারী বা মুসলমান বলে পরিচয় দিলে হয়তো আর কিছু হবে না। মহিলারাও কপালের সিঁদুর মুছে ফেলে তৈরী হয়েছিল। আমাদের যুবকরাও বিহারী বা মুসলমান বলে পরিচয় দিয়ে বাঁচার চিন্তা করতে লাগল।

মিলিটারীদের ডাকে যারা গিয়েছিল তাদের মধ্যে খগেনদা ও তার ছেলে মতি এবং গয়ানাথের দুই ছেলে ছিল। এই গয়ানাথ ছিল হলের পিয়ন। তার দুই ছেলে শিবু ও শঙ্করও তাদের সাথে গিয়েছিল। দেহে শক্তি-সামর্থওয়ালা লোকগুলো তখন খুশি মনেই

যায়। তারা ভেবেছিল কাজকর্ম করলে তাদের আর মারবে না।

তারপর দেখলাম তাদের প্রতি তিনজনকে এক-একটা গ্রুপে ভাগ করে নিল। সমস্ত লোকজন দক্ষিণ বাড়ির ভিতর থেকে বের করে আনলো কয়েকটা লাশ, একের পর এক। আমি এবং লালবিহারীদা তখনও পূর্ব বাড়ির পিছনে। একজন আর্মি এসে বলল, "এই আদমী লোক তোম কেয়া কারতা হু? বাঙ্গালী হ্যায় না বিহারী হ্যায়?" আমি থতমত খেয়ে বললাম ঃ "হাম বিহারী হ্যায়।" চিৎবালীদাকে দেখে বললাম, "ইয়ে হামার ভাই হ্যায়।" কিন্তু আর্মিটা সে কথা শুনলো না। বলল, "নেহি, হামরা সাথ আইয়ে।" এবারও চিৎবালীদার সহায়তায় ছাড়া পেলাম। তারপর পূর্ব বাড়ির পিছনে ভাঙা পায়খানার মধ্যে লুকিয়ে থাকলাম।

সমস্ত লাশগুলি মাঠে গুছিয়ে রাখা হলো। তারপর যারা লাশ টেনেছিল তাদেরকে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করলো। পায়খানার মধ্যে লুকিয়ে থেকে সেই গুলির শব্দ আমি শুনেছিলাম। আর শুনেছিলাম সেই সব গুলি খাওয়া মানুষের আত্মীয়স্বজনদের আর্তনাদ। আমি ওখান থেকে ভয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মাখন অর্থাৎ আমার জামাইবাবুর রাত্রে ডিউটি থাকায় তার কোন খোঁজ পাইনি। আমার বাবা ছিল অন্ধ মানুষ। তিনি ইষ্ট হাউসের পিছনে আমাদের সাথেই থাকতেন এবং গোলাগুলি হওয়ার সময় তিনি ওখানেই ছিলেন। ওখানে আর্মি ঢুকেছিল কিনা তা জানতে পারিনি।

যাহোক আমি দাসুরামের ঘরের মধ্যে এসে লুকিয়ে থাকলাম একটি ছোট বাক্সর মধ্যে, হাত-পা গুটিয়ে। বাক্সটা ছিল সম্ভবত কবুতরের থাকার জায়গা। ওই বাক্সটার খোলামুখে দাশুরামের মা আর আমার বোন গোবরের ঘষি দিয়ে ঢেকে দেয়। আমার দারুণ শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। প্রাণভয়ে তবু বেরোতে পারিনি। একবার বেরিয়ে এসে শুনলাম বিন্দুর বাবা অর্থাৎ দাশুরাম মারা গেছে। "এই হামার ঘরমে কোন ল্যাড়কা হ্যায়? হামারা ল্যাড়কা কো মার দিয়া" বলে দাশুরামের মা কান্নাকাটি করতে লাগল। চিৎবালীদাকে দেখলাম দৌড়ে ছোটাছুটি করছে আর আবোল-তাবোল বকছে। মনে হলো মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তার আত্মীয়স্বজনরা তাকে জোর করে ধরে মাথায় জল দিয়ে শান্ত করতে লাগল।

দেখলাম আহত লোকগুলো গুলিবিদ্ধ ক্ষত নিয়ে 'জল' 'জল' করে চিৎকার করছে। উঠতে চেষ্টা করে আছাড় খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। তাদের আত্মীয়স্বজন বা বাচ্চারা যারা কাছে ছিল, মরণমুখী মানুষগুলোর মুখে জল দিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করছে।

দুপুর দেড়টার আগে আর্মিরা হল ছেড়ে যায়। তার আগেই আমি সুনীলের পরিবার, আমার পরিবার এবং মাখনের পরিবারের সকল বাচ্চাদের নিয়ে হল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। কারও কোন খবর পেলাম না। বাবা এবং মাখনেরও না। যখন এ্যাসেম্বলীর কাছে এলাম তখন কে যেন বলল— আর্মি এসেছে। তাড়াতাড়ি সবাই আবার এ্যাসেম্বলীর

মধ্যে ঢুকে পড়লাম। আমার বোন অর্থাৎ মাখনের স্ত্রী আমকে একখানা মেয়েলি কাপড় দিল। মেয়েদের মতো কাপড়খানা পরে পুনরায় বেরিয়ে পড়লাম। বেরোবার সময় ডান দিকে ড. মণিরুজ্জামানের লাশ আর আমার বাম দিকে এক অপরিচিত ব্যক্তির লাশ দেখতে পেলাম।

বকসীবাজারের মোড়ে যেখানে এখন মসজিদ, সেখানে তখন কয়েকটি বইয়ের লাইব্রেরী ছিল। সেখান থেকে একজন লোক কাটারী হাতে হলের দিকে আসছিল। সম্ভবত লুটপাট করার জন্য। সে লোকটা আমাকে দেখে বলল, "আপনি আবার শাড়ি পরে মেয়ে সেজেছেন কেন?" তখনই বুঝলাম শাড়ির ফাঁক দিয়ে আমার বড়ো বড়ো গোঁফ বেশ দেখা যাচ্ছে। আমি কোন জবাব না দিয়ে মেডিকেল কলেজে জলের পাওয়ার পাম্পের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। মেডিকেল কলেজে অডিটোরিয়াম হলে বাচ্চাদের রেখে শুনতে পাচ্ছিলাম নয়াবাজারের দিকে গুলির শব্দ। আগুন দেখা যাচ্ছে।

বাচ্চারা তখন খিদেয় কাতর। এক অপরিচিত লোকের কাছে কোথায় খাবার পাওয়া যাবে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি মেডিকেল কলেজের মেইন গেটের কথা বললেন। সেখান থেকে বাচ্চা ও নিজেদের জন্য পাউরুটি কিনে আনলাম। মেডিকেলের ডাক্তার-নার্সরা আমাদের সহানুভূতি জানালেন। বাচ্চাদের ও মেয়েদেরকে খালি রুমগুলোতে রাখতে বললেন। আর পুরুষদের বললেন রুগীদের বেডে শুয়ে থাকার জন্য। বাচ্চা সহ মেয়েদেরকে খালি রুমগুলোতে রাখালাম। পরে শুনেছিলাম মিডফোর্ডে রুগী ছাড়া যাদেরকে পেয়েছে মিলিটারীরা তাদেরকেই গুলি করে মেরেছে।

ইতিমধ্যে আর এক সমস্যা হলো। শাহ আলম নামে হল কর্মচারীর পরিচিত একজন এসে আমাকে জানাল সে কোন সিট পায়নি। আমি তাকে আমার সাথে এক বেডে থাকার পরামর্শ দিলাম। রাতটা বড়ো ভয়ে ভয়ে কাটালাম। দুজনের একই সাথে ঘুম হয়নি। ভেবেছিলাম রাতে যদি আর্মিরা এসে চেক করে তখন একজন বেডে থাকবে, অন্যজন বাথরুমে যাবে।

যাক রাতে আর কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। ভোর হলো। শাহ আলমকে সাথে করে আমি হলে আসলাম। এসেই দেখি এ্যাসেম্বলীর কাছে দক্ষিণ দিকের গেইটে পূর্ব দিকে মুখ করে আর্মির গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। হলে ঢুকে দেখলাম খগেনদার স্ত্রী কান্নাকাটি করছে।

ইষ্ট হাউজের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বাবাকে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে পেয়ে বুকে জুড়িয়ে ধরলেন। বললেন "মাখন বেঁচে আছে ভয় নেই। সে গোপাল স্যারের বাসায় গেছে।" আমি গোপাল স্যারের বাসায় গেলাম। স্যার আমাকে খেতে দিলেন, কিন্তু কিছুই খেতে পারলাম না। তিনি আমাদের হল ছেড়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। আমি মেডিকেল কলেজে ফিরে গিয়ে পরিবারবর্গ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

মনে পড়ছে আমি যখন পরিবারসমেত হল ত্যাগ করি ইষ্ট হাউজের পিছনে এক

ছাত্রবাবুকে দেখেছিলাম হাত-পা ভেঙে যাওয়ায় শুধু কাতরাচ্ছে। আমার কাছে তিনি জল খেতে চাইলেন। আমি জল এনে তাকে খাইয়েছিলাম। কিন্তু তিনি যখন তাঁকে মেডিকেল কলেজে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন, আমি তখন আমার অপারগতার কথা বলি। জানি না সে ছাত্রবাবু আজও বেঁচে আছে কিনা।

আরও একজন ছাত্রবাবু আমাকে বলেছিলেন, "২৫ তারিখে আমি টিনশেডের কাছে আমগাছে ছিলাম। ২৭ তারিখ সকালে আমগাছ থেকে নেমে চলে গিয়েছিলাম।" বিক্রমপুর অবস্থানকালে যুদ্ধের নয় মাস সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বহুবার এসেছি। একদিন টি.এস.সি.র সামনে আমাকে আর্মি জিজ্ঞাসা করেছিল, "হিন্দু"?

সে সব দিন ছিল বড় কষ্টের, বড় ভয়াবহ। অনেক বিপদের মধ্যে তবু বেঁচে ছিলাম। আজও বেঁচে আছি।

রেণুবালা দে

স্বামী : শহীদ খগেন দে
কর্মচারী, ল্যাবরেটরী স্কুল,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়।

খগেনচন্দ্র দের স্ত্রী রেণুবালা দে। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন স্বামী ও সন্তানের মৃত্যু একই জল্লাদের গুলিতে। গুলিতে আহত খগেন দে ও তার পুত্র মতিলাল দের করুণ আর্তনাদ, বাঁচার চেষ্টা ও জলের তৃষ্ণা— সব তাঁর মনে মারাত্মক আঘাত করেছে। জগন্নাথ হলের মাঠে সারিবদ্ধ ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী ও জনগণের সাথে স্বামী ও সন্তানকে তিনি গুলি খেতে দেখেছেন। সেই পূণ্য স্মৃতি তার আজ শেষ সম্বল।

১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চ আমি, আমার ছেলে-মেয়েরা, ছেলের বাবা সবাই খাওয়া-দাওয়া করে রাত এগারোটা-সাড়ে এগারোটার দিকে শুয়ে পড়ি। আমার শরীরটা বেশি ভালো ছিল না, তাই একটু ঘুম এসে গিয়েছিল, কিন্তু ছেলেদের বাবা তখনও ঘুমাননি। যখন বাইরে প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছিল তখন সে আমাকে ঘুম থেকে তুলে বলল, "তুমি তো ঘুমিয়েছো, যদি বেশি রকমের শব্দ হয়, তবে আমাকে জাগিয়ে দিও। আমি এখন একটু ঘুমাই, তুমি জেগে থাকো।" আমি জেগে থাকি, আমার শিবু তখন ছোট। শিবু খাওয়ার জন্য জেগে উঠল, ওকে দুধের বোতল খাওয়ালাম। কিছুক্ষণ পর ভীষণ শব্দ হচ্ছিল, মনে হয় শব্দগুলো মুসলিম হলের দিকে। বাইরে শুনি লোকজনের শব্দ। আমি তখন লাইট জ্বেলে দরজা খুলে বাইরে আসি। বাইরে লাইট জ্বলছে, সবাই কথাবার্তা বলছে,

কোথায় কি যেন ঘটছে। বিয়ের বাজি ফুটছে, না-কি ফায়ার হচ্ছে, কিছু বুঝা যায় না। একবার আমি ঘরে যাই, একবার বাইরে আসি। যখন শব্দ আরও প্রচন্ড বেগে হচ্ছিল তখন ওর বাবাকে আমি জাগাই। বললাম, ‘‘উঠ, চারিদিকের অবস্থা বেশি ভালো না।’’ সে উঠে বলল, ‘‘এগুলি বাজি নয়, ফায়ারের শব্দ, আমি উঠে কি করব? ফায়ার হলেও এগুলো আমাদের দিকে নয়, অনেক দূরে।’’ তখন আমি বাইরে এসে দেখি বিন্দুর মা, আরও অনেক লোকজন দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। মুহূর্তের মধ্যে লাইট চলে গেল। যখন লাইট চলে গেল তখন আমি ঘরে এলাম। শুনলাম জগন্নাথ হলের পশ্চিম পাশ দিয়ে শব্দ ভেসে আসছে। তখন ওর বাবাকে বললাম, ‘‘লাইট তো নেই, তুমি উঠ।’’ আমি বিছানা চৌকির উপর থেকে নীচে নামিয়ে দিলাম। মতি এবং আমার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা সবাই আবার শুয়ে পড়ল, ওর বাবাও শুয়ে পড়ল। আমি আর শুইনি। আবার বের হলাম। শিবু নামে যে ছেলেটি ছিল, সে দৌড়ে এলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘‘শিবু; কি ব্যাপার?’’ সে বলল, ‘‘বৌদি; তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েন মিলিটারীরা আমাদের হল অ্যাটাক করেছে। আমাদের বাঁচার তো কোন উপায় নেই, ছাত্র তো নেই, সব বিপদ আমাদের উপর পড়বে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েন। ফায়ার করলে উপর দিয়ে যাবে, অন্তত এক হাত উপর দিয়ে যাবে। শুয়ে পড়েন।’’ এই কথা বলতে বলতে শিবু চলে গেলে আমিও ঘরে ঢুকলাম। এই সময় বাইরে আরও প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছিল। আমি আমার স্বামীকে বললাম, ‘‘মনে হয় বিহারী এসেছে, রায়ট লেগে গেছে, এবার সব শেষ করে ফেলবে।’’ আমার স্বামী বলে, ‘‘ না, কিছু না।’’ জগন্নাথ হলের সামনে প্রচণ্ড জোরে একটা আওয়াজ হলো। সেই আওয়াজের সাথে সাথে আমাদের ঘরের সবাই জেগে উঠে। আমার বড়ো ছেলে বলে, ‘‘বাবা; আমি বার বার আপনাকে বলেছিলাম বাড়ি যেতে। আপনি গেলেন না আর আমাকেও যেতে দিলেন না। মাকে নিয়ে যেতে চাইলাম, তাও আপনি দিলেন না। কাউকে যেতে দিলেন না। আজকে আর কারোরই বাঁচার কোন উপায় নেই, আজ এখানেই মরণ।’’ তখন ছেলের বাবা তাকে ধমকে বলল, ‘‘চুপ থাক! যদি পরমায়ু থাকে তবে তা কেউ কোন দিন নিতে পারে না। কত যুদ্ধ গেল, কত রায়ট গেল, আমার তো কিছুই হলো না। আমি সেই একই রকম আছি।’’ এ কথা বলতে না বলতে পাক-সৈন্যরা এসে দরজায় ধাক্কা দিল। ভাগ্য ভালো আমাদের ঘরে প্রথমে ধাক্কা দেয়নি। যে ঘরে ধাক্কা দিল, সে ঘরে লোক পেল। সেটা ছিল মাখনের ঘর। সারারাত আর আমাদের ঘরে ধাক্কা দেয়নি। আমাদের ঘরের পিছনে একটা টিনশেড ছিল, তাতে আগুন দিল। আগুন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা তীব্রভাবে জ্বলে উঠল। আমি তখন শিবুকে কোলে করে বাসনার হাত ধরে বের হলাম। বাইরে দেখি আমাদের দরজার সামনে দুইজন পাক-সৈন্য দাঁড়ানো। আমি তাদের আমি তাদের দেখে খুব ভয় পেলাম। তারা জিজ্ঞাসা করল, ‘‘ঘরে কোই ছাত্র লোক হ্যায়?’’ আমি বললাম, ‘‘ছাত্র লোক নেহি

হ্যায়।" তখন তারা বলল, "তোম লোককো হাম লোক কুছ নেহি করেগা। তুম কোন লোক হ্যায়?" আমি বললাম, "হাম লোক ম্যাথর মে হ্যায়।" এই কথা ওর বাবা চৌকির নীচে বসে শুনলো। মিলিটারী যখন বলছে আমাদের কিছু হবে না, আমাদের মারবে না তখন সে বের হয়ে এলো। পাক-আর্মি আমাদের পাশে পাশে ঘুরতে লাগল কিন্তু কিছুই বলল না। তবে ঘরের জিনিসপত্র অর্ধেক পর্যন্ত বের করল এবং মাঠে নিয়ে গিয়ে জমা করল আর অর্ধেকে আগুন লাগিয়ে দিল। মোহনের ঘরের সামনে আমাদের গোয়ালঘর। সেখানে বসে আমি শিবুকে দুধ দিতে শুরু করেছি, তখন মতি গিয়ে আমার পাশে বসল আর ওর বাবা গরুর রশি বাঁধছে, ঠিক তখনই মিলিটারী ওর বাবার হাত চেপে ধরল। আমার পাশে বসা ছিল মতি, তাকেও ধরলো। দুইজনকে ধরে ওই গোয়াল ঘরের মধ্যে বসাল। আমাদের পাড়ার কিছু ছাত্র আর যত পুরুষলোক ছিল তাদের সবাইকে ওই গোয়ালঘরে ঢোকাল। তাদের বসানোর পর আমরা মেয়েলোক বসে আছি দরজার সামনে। গোয়ালঘর ভর্তি পুরুষ। সামনে বন্দুক উঠিয়ে ধরে মিলিটারীরা বলল, "শোয়ারকে বাচ্চে; 'জয়বাংলা' বল, উল্টা নেহি কহে। বল জয়বাংলা। তোমকো বাপ শেখ মুজিব কাহা হ্যায়, বল।" ওরা যখন এরকম করছে, আমরা তখন ভাবছি এখনই গুলি করবে। আমরা সবাই হাউ-মাউ করে চিৎকার করে কেঁদে উঠলাম। গরুর ঘর থেকে সবাইকে বের করে তখন লাইন করে নিয়ে গেল সুধীরের ক্যান্টিনের দিকে। কিছুক্ষণ পর দেখি ৩-৪ জনে ধরে ধরে এক-একটা করে লাশ এনে রাখছে জগন্নাথ হলের মাঠের মধ্যে। আমরা দেখে তো অবাক যে এগুলি কি আনে? দেখতে দেখতে ভেঙে পড়লাম। দেখলাম বাসনার বাবা, মানে আমার স্বামী আর ছেলে মতি কতজনের লাশ নিয়ে এলো ধরে ধরে। এনে রাখলো মাঠের মধ্যে। যাদের তখনও দম একেবারে বের হয়নি, তাদের ফায়ার করেছে পিছন দিক থেকে। তারা শুয়ে পড়েছে সাথে সাথেই। তারপর যারা লাশ টেনে আনল তাদের বলল লাইন ধরে দাঁড়াতে। লাইন করানোর পর তাদের কি বলল তা আমি জানি না। যারা লাইনে ছিল তারা, আর লাইন থেকে যারা বেঁচে ফিরেছে তারা জানে। তারপর লাইনে দাঁড়ানো সবাইকে গুলি করল। আমরা মাঠের কোণায় বসে দেখছি তাদের গুলি করেছে, তারা একবার উঠে বসেছে আবার শুয়ে পড়েছে। বিন্দুর মা গিয়ে বিন্দুর বাবাকে নিয়ে এলো। সে জল জল করছিল। আমি একটু জল খাওয়ালাম সঙ্গে সঙ্গে তার দম বের হয়ে গেল। আমার স্বামীকে আনবার তো কেউ নেই, আমার বাচ্চা ছয় মাসের শিশু। আমি গেলাম বাসনা গেল, বাসনার কোলে শিবুকে দিলাম; আমি বললাম, "তুমি উঠ, আমি তোমাকে নিয়ে যাবো।" আমি তখন তার হাতের নীচে দিয়ে হাত দিলাম, মাথা লাশের উপরে পা লাশের উপরে। আমি দেখলাম পায়ে তার জুতা, হাতের কিছু অংশ নেই। আমাকে দেখে সে বলল, "আমাকে জল খাওয়াও।" আমি বললাম, "তুমি আগে ঘরে চল। তোমাকে আমি নিয়ে যাব।" তিনি তখন বললেন,

"নিতে তো পারবে, কিন্তু আমার তো সব শেষ।" তখন একটা জিপ হল গেট দিয়ে ঢুকলো। আমি তা দেখে ভয় পেয়ে গেছি। স্বামীর কাছ থেকে চলে এলাম ছেলের কাছে। বললাম "চল, তোর বাবাকে তো নিতে পারলাম না।" ছেলে বলে কি : "মা নেওয়ার তো কিছু নেই। তুমি মনে কোন কষ্ট নিও না। আমি তোমার এক ছেলে, মরে গেলে কি হবে। তোমার তো লক্ষ লক্ষ ছেলে রইল। দুঃখ করো না। আমি বলেছি বাবাকে বারে বারে। বাবা তখন শোনেননি, এ যে হবে আমি জানতাম। বাবা তখন বোঝেনি, বুঝতে পারেনি। জল, মাগো জল দাও।" আমি বলি, "বাসনা তুই একটু জল খাওয়া।" এই বলে আমি আবার মাঠের পাশে চলে এলাম। বাসনা ওর বাবাকে, মতিকে জল খাইয়ে এলো। এসব দেখে আমার পেটের ভিতর থেকে মোচর দিয়ে রক্ত বমি শুরু হল এমন তীব্রভাবে যে আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না। আমি যে আবার যাবো সে শক্তি আমার নেই। বাসনাকে আবার পাঠালাম। "যা, গিয়ে দেখ মতিকে একটু আনতে পারিস কিনা।" বাসনা আবার গেল, আবার জল খাওয়ালো। মতি বাসনাকে বলল, "বাসনা মাকে চিন্তা করতে মানা করিস, আমি শেষ, আমাকে আর নিয়ে যেতে পারবি না। তুই যা, ওই এসে পড়ল।" অমনি আবার পাক-আর্মির মিনিটে মিনিটে রাউন্ড দেওয়া শুরু হল। তখন মতি কিংবা মতির বাবা কাউকেই আমরা আর আনতে পারিনি। কিছুক্ষণ পর হোসেনী দালান থেকে একটা ছেলে এল। বটতলা লাইব্রেরীতে থাকত ছেলেটা। ওই ছেলেটা এসে আমাদের সবাইকে নিয়ে গেল। আমি বললাম : " আমি যাব না, এখানে লাশ পড়ে আছে দুজনের। তাদের ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।" তখন সে বলল, না চলেন, আপনাদের রেখে এসে যদি সময় পাই তবে যতটুকু শক্তিতে কুলায় এদের নিয়ে মেডিকেলে রেখে আসব। একবার আপনারা চলেন, আপনাদের হোসেনী দালানে রেখে আসি।" তখন সে আমাদেরকে জোর করে হোসেনী দালানে নিয়ে গেল। হোসেনী দালানে যাবার পথে আমাদের গেটের সামনে দেখি এক ভদ্রলোক পড়ে আছেন, সাদা হাফপ্যান্ট পরা। তারপর চলে গেলাম হোসেনী দালানে এবং সেখানেই থাকলাম। ওই ছেলেটি জল-খাবার যা পারলো তা এনে দিলো আমাদের। আমরা তো সারা রাত কান্নাকাটি করলাম। ছেলেটা আবার সকালে এলো আমাদের দেখতে। সে বলল, "মিলিটারী আবার ঢুকেছে হলে, আমি তাই আর এগোতে পারিনি লাশের সামনে।" তারপর দিন-রাত্রি যে কিভাবে কেটে গেল তা এখন আর বলতে পারিনা। ২৭ তারিখে আমি শিববাড়িতে এলাম, কয়েকঘন্টার জন্যে আমি শিববাড়িতে ছিলাম। শিববাড়ি থেকে ৫-৬জন লোককে ধরে নিয়ে যে মেরে ফেলেছে তা শিববাড়ির বাবা জানে না। আমার কাছ থেকে সব শুনে বলে, "মা! তোমার এই অবস্থা তাহলে আমাদের শিববাড়ির যে ৫-৬ জনকে ধরে নিয়ে গেছে তাদের কি অবস্থা?" আমি বললাম : "আমি তো দেখেছি আমার সামনে তাদের গুলি করে মেরে ফেলেছে।" বাবা তখন জিজ্ঞাসা করলেন : "তারা কি মিস্ত্রি না সাধু?"

আমি বললাম : " মিস্ত্রি ছিল একজন, নাম মুকুন্দ। আর একজন লোক সে ছিল শিববাড়ির ব্রাহ্মণ পুরোহিত। বাড়ি মাণিকগঞ্জ। আরও ছিল তিন কি চারজন, মোট পাঁচজন।" বাবা এসব কথা শুনে তো অবাক। শিববাড়িতে একদিন ছিলাম। তারপর ঢাকা ত্যাগ করলাম।

রাজকুমারী দেবী (বিন্দুর মা)

স্বামী : শহীদ মনভরন

নিপার কর্মচারী

রাজকুমারী দেবী নিজ স্বামীকে সারিবদ্ধ যুবা ও বৃদ্ধের সাথে গুলি খেতে দেখেছেন। বহুসংখ্যক লাশের মধ্য হতে নিজের স্বামীকে বাসায় নিয়ে আসেন, কিন্তু বাঁচাতে পারেননি। জগন্নাথ হলের মাঠে লাইন করে দাঁড় করিয়ে গুলি করা ও আহত-নিহতদের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা হৃদয়স্পর্শী।

২৫শে মার্চ, ১৯৭১। এমনিতে শুনেছিলাম চারিদিকে গোলমাল হবে। আবার শুনলাম যে সকালবেলা জল থাকবে না। তিন দিন এমন অবস্থা চলবে, কেন জল থাকবে না, তার কিছুই জানি না। ২-৩ দিন জল থাকবে না তাই সন্ধ্যার দিকে জল তুলে রেখে ঘরের কাজ সেরে শুয়ে পড়েছি।

রাত তখন এগারোটা হবে, ২-৩ জন ছাত্র এসে ডাকাডাকি করতে লাগল— "বস্তিওয়ালা কেউ জেগে আছ?" কেউ তখন কোন শব্দ করল না। তখন কে যেন বলল, "মরা ঘুম ঘুমাও বাপু, বুঝবা।" ছাত্রদের মধ্যে থেকেই কেউ কথাটা বলল। আরও বলল : "ঘুমাও বাপু বুঝবা। কুড়ালটা চাইতে এসেছিলাম তাও দিলে না। রাস্তা ব্লক করতে হবে, তা আর হলো না।" এই কথা বলেই তারা চলে গেল। ঐ কথা শুনে আমি আমার স্বামীকে ডেকে বললাম, "এই শুনছো, ঘুমিয়ো না, বাইরে কি বলে গেল শুনেছো তো?" তখন আমার স্বামী আমাকে বলল, "চুপ করো, মরলে আমরা শুধু একা মরব না, সবাই মরলে আমরাও মরব।" এর প্রায় ১৫/২০ মিনিট পর শ্রী চাঁদ রাজভর— এর বড়ো ভাই আমার স্বামীর নাম ধরে ডেকে বলল, "তুই কি করছিস রে, দেখতো নিউ মার্কেটের দিকে আগুন দেখা যায়।" এভাবে আরও মিনিট দশেক পরে আমাদের জগন্নাথ হলের মাঠে কিসের যেন একটা জোর আওয়াজ শুনলাম। বর্তমানে মাঠের গ্যালারীর সামনে যেন বজ্রাঘাত হলো। কে কোথায় যাবে, কি করবে ভেবে পেলাম না। সবারই তাড়াতাড়ি লাইট নিভানো, দরজা বন্ধ করা এমন একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। তখন

বুঝলাম যে একটা কিছু ঘটেছে। ঠিক তখনই শুরু হলো ঝাঁক ঝাঁক গুলির শব্দ। আমার স্বামী আমাকে বলল : "দাঁড়িয়ে থেকো না, তাড়াতাড়ি মাটিতে শুয়ে পড়ো।" বাচ্চা তিনটাকে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে মাটিতে শোয়ালাম। বাচ্চারা বলছে, "মাগো, ভীষণ শব্দ হচ্ছে।" আমি বললাম, "বাবা শুয়ে থাক, উঠ না, উঠলে বাঁচবো না। আমরা সবাই মরবো।" বাচ্চাদের সাথে কথা বলায় আমার স্বামী বলল, "তুমি চুপ করো। মিলিটারী ঢুকেছে পিছন দিক থেকে, দরজা ভাঙছে, টের পাও?" আমি বললাম, "টের পাওয়ায় দরকার নেই, মরণ একদিন তো হবেই। তাতে আর কি?" চারিদিকে তখন ধোঁয়া আর গুলির শব্দ, বারুদের গন্ধ। আমরা সবাই শংকিত, কারোর কোন হুশ নেই, শরীর কাঁপছিল আমাদের সবার। গুলির শব্দ ভীষণ, আধঘন্টা পর্যন্ত যেন কামান ডাকছে। বুঝতে পারলাম যে ছাত্রবাবুরা জানালা খুলে লাফিয়ে মাটিতে পড়ছে এবং বস্তির দিকে দৌড়ে আসছে। উত্তর বাড়ীর দিক থেকে অথবা দক্ষিণ বাড়ির দিক থেকে সুধীরবাবুর বর্তমান ক্যান্টিনের ওখানে কয়েকজন ছাত্রবাবু কম্বল গায়ে, কেউ কেউ চাদর গায়ে কেবল পালানোর চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণ পর মিলিটারী আমাদের দরজার সামনে এসে বলল, "কই হ্যায়? দরজা খুল দো, তুম লোককো শুট করনে হোগা।" তখন আমার বুড়ী কাকি বলল, "ঠেরিয়ে সাহেব, দরজা এখন খুল নেহি হে আয়, মাত লেজিয়ে।" ১০/১২ জন মিলিটারী একসাথে তেড়ে এলো আমাদের দিকে, ভয়ে আরও চুপসে গেলাম। আমার স্বামী তার বড়ো চেহারার শরীরটা নিয়ে আমাদের একটা বড়ো কাঠের আলমারীর পিছনে লুকালো। সেখান থেকে সে বলতে লাগল : "বলবে না যে আমি এখানে আছি।" ঘরের মধ্যে আমরা রইলাম বুড়ী কাকি, আমি, বাচ্চারা, ভাসুরপো ও শাশুড়ী। তখন মিলিটারীরা ওদের ভাষায় বলল, "এ তুম লোক কো আদমী কিধার হ্যায়" তখন বুড়ী কাকি বলল, "সামনে হোতা হ্যায়।" পাক-সৈন্যরা আবার বলল, "মাদারচোদ আদমী লোক কিধার গিয়া?" আমি বললাম, সাহেব এই তো ঘর হ্যায়।" আমরা আসলে বুঝতে পারছিনা কি ওরা বলতে চায়। ওরা আবার বলল, 'ইসমে কাহা মিলা, দাওয়া?" বুড়ী কাকি বলল : "কালকে আমাদের জল থাকবে না তাই তুলে রেখেছি।" আমি বললাম : "কাহা বোলনা সাহাব হাম লোক সামাজতা নেহি। ম্যায় কই দওয়া নেহি।" তখন পাক-সেনারা বলল : জহর নেহি মিলায়া?" আমি বললাম : "নেহি সাহাব জহর নেহি মিলায়া; জহর মে হাম নেহি জান্তা হো কিধার মিলতা।" পরে আমাকে বলল দু গ্লাস পানি পিলাও। আমি দুটো কাঁচের গ্লাসে পানি দিলাম ওদের হাতে। ওরা আবার বলল : "মিলায়া নেহি তো?" আমি বললাম : "নেহি সাহাব মিলায়া নেহি জহর হাম নেহি চিনতা।" ওরা জল খেয়ে একটা গ্লাস আমার হাতে দিল আর একটা ফেলে দিল। এবার ওরা বলল : "তুমহারা চল।" প্রথমে আমাকে, পিছনে বুড়ী কাকি আর ওরা সামনে-পিছনে দুটো মেশিনগান নিয়ে আমাদেরকে বলল : "হাম লোককো

পিছে চল, তুমলোককো মেজর সাহাব বোলাতা হ্যায়, তুম লোক চল।" আমি বললাম : "আপ লোক কিয়া কার দিয়া সাহাব? হামার তিন বাচ্চা হ্যায়।" তখন আমাকে বলল : "উঠ যাও।" আমি তখন পাগলের মতো জিজ্ঞাসা করলাম যে আমার এই বাচ্চা তিনটাকে কি করব? তখন পাক সেনারা বলল, "উধার মে চল সমাজতা হ্যায়, ও বাচ্চা তো তুম লোক চুপচাপ উধার মে ঠেয়রো।" আমার সাথে বুড়ী কাকিকেও নিয়ে চলল, ভাসুরপোকে বলল : 'তুম ভি চল'। আমরা অনেকেই যাচ্ছি দেখে আমার মনে একটু সাহস হলো। কিন্তু তবুও আমি বুড়ী কাকিকে বললাম : "তুমি যেয়ো না। তোমাকে দেখে হয়তো ওদের মতলোব খারাপ হয়েছে। তুমিও যেয়ো না, তাহলে আমিও না গিয়ে পারব না।" পুনরায় তাদেরকে বললাম : "দেখিয়ে সাহাব, আপ লোক হামারা ভাই হ্যায়, বাপ হ্যায়, সাহাব আপ লোক কিধার লিয়ে যাতা হামকো? আপ লোক জুলুম নেহি কর।" তখন ওরা বুড়ী কাকির হাত ধরে জোরে টান দিয়ে বলল : "চল্ চল্ উধার সে চল্।" এই সময় দুজন মেজর গোছের পাঞ্জাবী এলো, তারা বলল : 'ইসকে কিয়া হোতা হ্যায়?" ওদের ভাষায় আরও অনেক কিছু বলতে লাগল। এক সময় মেজর গোছের একজন বলল : "লিয়ে যাও কাহা? ঘরমে ছোর দো।" তখন তারা আমাদেরকে ছেড়ে দিল এবং আমি ছাড়া পেয়ে বুড়ী কাকিকে বললাম, "কাকি এখানে থাকা নিরাপদ নয়, চল আমরা অন্য কোথাও যাই।" বুড়ী কাকি যেতে চাইলেন না। আমি আমার স্বামীর কথা বলে বললাম "সে তো নিরাপদেই আছে আমরা অন্য কোথাও যাই।" কিন্তু বুড়ী কাকি গেলেন না। আমি আমার তিন বাচ্চাকে নিয়ে মঞ্জুদের বাসায় গিয়ে আশ্রয় নিই। যাওয়ার সময়ে আমার স্বামী বললেন, "তোমরা কাপড়-জামা ছেড়ে মেথরদের জামা-কাপড় পরো, নইলে রক্ষা পাবে না।" আমি মঞ্জুদের বাড়িতে ওদের দেয়া কাপড় তাড়াতাড়ি পরে নিলাম। এই সময়ে দেখলাম মিলিটারীরা ওই বাড়িতেই ঢুকলো। আমি দেখলাম যে মেথরদের বাড়ির অনেক সুন্দর সুন্দর বউদিদের নিয়ে ওরা কাড়াকুড়ি করতে লাগল। তখন আমি অন্ধকারে একটা পায়খানার পাশে বাচ্চাদেরকে নিয়ে চুপ করে লুকিয়ে থাকলাম। আমি ভাবছিলাম এই বাঁচাই আমার শেষ বাঁচা। তখনও আমার স্বামী ঘরে আলমারির পিছনে নিরাপদে আছেন। ইতিমধ্যে সুধীরবাবুর ক্যান্টিনে ওরা আগুন ধরালো। তখন আমার স্বামীর সাথে আমার দেখা হলো। আমি তাকে বললাম, " তুমি সাবধানে থেকো।"

রাতটা যে কিভাবে কেটে গেল বলতে পারব না। পরের দিন ভোরে যখন সবাই লাশ টানছে, তখন আবার আমার সাথে আমার স্বামীর দেখা হলো। সকালে লাশ টানছে চান্দু আর শ্যামলাল, সাথে কয়েকজন মিলিটারী। দেখলাম ওরা মধুদাকে নিয়ে আসছে। শুধুমাত্র আমার স্বামীকে দেখার জন্যেই আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম ওই পায়খানার কাছে। ওদিকে যখন বাইরে থেকে লাশগুলো আনছে, তখনই যেন কেমন করে আমার স্বামীকে পায়খানার কাছে পিছন দিক থেকে থাবা দিয়ে ধরলো এবং ওই বহু লোক, যাদেরকে

ধরে এনেছে তাদের সাথে মিশিয়ে দিলো। আমার তখনই মনটার মধ্যে কুডাক ডেকে উঠল। আমি আমার স্বামীকে বললাম : ''তুমি কোথায় যাচ্ছ? ওদের সাথে যেয়ো না।'' তখন মিলিটারী আমার স্বামীকে বলল : ''এ তুম লোক চলো হামকো কাম কার দেগা।'' আমার স্বামী বললেন : ''সাহাব হাম কাম কর দেগা তো হামকো ছোর দেগা?'' ওরা বলল : ''হুম, কাম করে গা তো তুম লোককো হাম ছেরগা''। এসময় দেখলাম এই ব্যাঙ্কের কাছ থেকে প্রিয়নাথের লাশ তুলে নিয়ে গেল। প্রিয়নাথ এই হলের দারোয়ান ছিল। পরে দুজন দুজন করে ভাগ করে লাশ টানার কাজে লাগিয়ে দিল। লাশের পরে লাশ, একের পর এক আসছেই। লাশের স্তূপ হয়ে গেল।

আগে যখন মধুদাকে নিয়ে এসেছিল তখন মধুদা যেন কি বলতে চাইছিল। আমি আমার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছি আর ভাবছি যে, সে যদি ছাড়া পেত তাহলে আমি বাঁচতাম। হঠাৎ দেখি লাশ টানার ওখানে আমার স্বামী নেই। তখন আমি চান্দুকে জিজ্ঞাসা করলাম তার কথা। চান্দু বলল : ''আছে হয়তো কোথাও, তুমি দেখছ না কিন্তু সে তোমাকে ঠিকই দেখছে। লাশ টানছে।'' এ সময় দেখলাম শিববাড়ির এক সাধুকে নিয়ে এলো দুজন। সাধুকে সম্পূর্ণ সুস্থই দেখলাম। তাকে নিয়ে এলো মাধবদা আর মনীন্দ্রদা। দেখলাম খগেনদা আর তার ছোট ছেলেটাকে ধরে এনে লাশ টানার কাজে লাগাল। খগেনদা ছিলেন আর্টস বিল্ডিং-এর (দর্শন বিভাগের) পিয়ন। মাথায় চুল ছিল না খগেনদার। তিনি পুরো সুস্থ। তিনি লাশ টানেননি কিন্তু যারা টানছিল তাদের সাথে সাথে থাকছেন। কিছুক্ষণ পর দেখলাম যারা লাশ টানছিল তাদেরকে লাশের মধ্যে তিনটি লাইন করে দাঁড় করিয়ে দিল। লাইনে দাঁড়ানো লোকগুলোর মধ্যে কেউ কেউ হাত জোড় করে কিছু বলতে চাইছে। আমি তখন ছিলাম মাঠের মধ্যে। দূরত্বটা হবে বর্তমান জগন্নাথ হল আর মাঠের মধ্যে যতটুকু দূরত্ব হবে ততটুকু। আমার তখন কোন ভয়ভীতি ছিল না, কোন জ্ঞানও ছিল না। এই সময় দেখলাম দক্ষিণ বাড়ির গেটের কাছে সৈন্য ভর্তি একটা গাড়ি এলো। আমি ওদের কাছে গিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। তখনই চান্দুর বড়ো বৌদি কাছে এসে দাঁড়াল। দেখলাম চান্দুর বড়ো ভাই আর কে যেন একটা লাশ নিয়ে এলো। ইতিমধ্যে ৩ জন মিলিটারী ত্রিকোণে দাঁড়িয়ে লাইনের লোকগুলোকে মারার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমি কি করে দেখবো এই দৃশ্য! আর কোন দিশা না পেয়ে পুনরায় মেথরদের বাড়িতে এসে পড়ে গেলাম। এই ভাবে আমি এখানে পড়ে যাওয়ার ২/৩ মিনিটের মধ্যেই একটা বিরাট শব্দ হলো। তখনও আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। রাধে বলে একটা লোক ছিল সে হঠাৎ বলে উঠল : ''আহা বিন্দুকা বাপ, বাপকো সব খতম কর দিয়া।'' যখনই সে বলল যে, 'সব খতম কর দিয়া' সাথে সাথে আমি এক দৌড়ে আবার সেই মাঠের কাছে গেলাম, দেখলাম যে পুতুলের মতো সমস্ত লাইন দিয়ে লোকগুলো পড়ে আছে। খগেনদা গুলি খেয়ে একবার উঠতে চান আবার পড়ে যান। এইভাবে বার বার

উঠতে চেষ্টা করছেন তিনি। মিলিটারীরা পিছন ফিরে গিয়ে আবার তিনদিক থেকে আগের মতো গুলি করতে লাগল। শুধু ধূলায় ধূলায় ভর্তি হয়ে গেল সব। যখন দ্বিতীয়বার আবার গুলি করে তখন ওই লাশগুলো থেকে মাত্র ২০/২৫ হাত দূর থেকে সব দেখতে লাগলাম। খগেনদার তখনও একটা হাত নড়ছে, কি যেন বলতে চাইছেন তিনি। এদিকে দেখলাম আমার স্বামীর কোন দেখা নেই, ভাবলাম নিশ্চয় মেরে ফেলা হয়েছে। আমি তখন আমার বাসা থেকে দশ হাত দূরে জগন্নাথ হলের মাঠের মধ্যে বর্তমান শহীদ মিনারের ১২/১৪ গজের মধ্যে থেকে সবই দেখছি। কেউ আর নড়ে না। গুলি করে মিলিটারী চলে গেলে সবাই ওই লাশের দিকে ছুটছে। এই সময় বকসীবাজার মোড়ের মসজিদে ওখানকার ইদু নামে একজন লোক এসে বলল : "এই তোমরা কি করছ? এখনই সরে যাও যদি বাঁচতে চাও।" তখন আমি কোন কথা চিন্তা না করেই লাশের কাছে যাবার জন্য ব্যাকুল হলাম। বুড়া কাকা বলল আমার স্বামীর কথা যে : "চলো দেখে আসি ও বেঁচে আছে কিনা।" কাকা আর আমি লাশের পাশে গেলাম। সেখানে তখন বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন এসে দেখছে তাদের পরিচিত লোকজন বেঁচে আছে কিনা। আমি আমার স্বামীকে পেয়ে লাশের মধ্য থেকে তার পা ধরে টেনে বের করলাম। ঘরে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করলাম। পাশে দেখলাম চান্দুর বড়ো ভাই গোঙাচ্ছে। তার পেটে গুলি লেগেছে এবং সমস্ত নাড়ী-ভুড়ি বাইরে বেরিয়ে আসছে। তার বৌ জল নিয়ে দৌড়ে আসছে। কিন্তু সে তাকে বারণ করে বলছে : "আসিস না, আসিস না, তোরা সব ফিরে যা।" এইভাবে বলতে বলতে সে রোকেয়া হলের দেয়াল টপকে চলে গেল। এদিকে চান্দুর ছোট ভাই মুন্নীলাল, সে-ও বহুকষ্টে উঠতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু উঠে আবার পড়ে গিয়ে একেবারে নিস্তেজ। এখন ছাত্রবাবুরা যেখানে 'রিং' ঝোলে সেখানেই সবাই পড়েছিল। যাহোক আমি এবং আরও কয়েকজন মিলে আমার স্বামীকে বাসায় নিয়ে এলাম। তখন আমি বুঝতে পারিনি যে তার কতটুকু ক্ষতি হয়েছে। মনে হচ্ছিল বাসায় এলে তিনি দাঁড়াতে পারবেন, কিন্তু বাসায় এনে দেখি সমস্ত শরীরটা বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। আমি তখন প্রায় পাগলের মতো তাকে ঘরে নিয়ে আসাতে কেউ কেউ বলেছে যে দেখ এই লাশের জন্য আবার এই বস্তিতে হামলা না চালায়। যাহোক আমার স্বামী আমাকে বলল : "আমার মাথার বালিশটা দাও, আমার মাথায় জল দাও, আমার যেন কেমন কেমন লাগছে।" তখন তিনি আমার সাথে সচেতন ভাবে কথা বলছেন। তার শরীরের রক্তে আমার সমস্ত শরীর ভেসে গেছে। বুড়া বাসু নামে একজনের রক্ত আমার শরীরে লেগেছে। এই বুড়ার তিনটি গুলি লেগেছিল তবুও সে তখনও বেঁচে ছিল। আমার স্বামী আমাকে বলল : "আমার কেমন লাগছে, আমি আর বাঁচবো না, আমি মরে গেলাম।" আমি বললাম, "তোমাকে আমি মরতে দেব না, মিলিটারী একটু সরে গেলে তোমাকে আমি মেডিকেলে নিয়ে যাব।" তখন তিনি আমাকে

আবার বললেন, "দেখ আমার পা দুটো নেই, আমার পিঠটা খুলে দেখ। তখন আমি আমার শাশুড়িকে ডেকে দেখতে বললাম। তিনি দেখে বললেন : "এখান থেকে সমস্ত রক্ত ঝরে যাচ্ছে, সমস্ত রক্ত বের হয়ে যাবে।" স্বামী আমাকে বললেন, "বড়ো ভাইকে ডাকো।" বড়ো ভাইকে ডেকে বললেন, "আমার বাচ্চা-কাচ্চা সব রেখে গেলাম, তুই দেখিস।" আমাকে বললেন, "তুমি হলে থেকো না, নারায়ণ গঞ্জে তোমার বোন-জামাইয়ের কাছে যাবে। উনি একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।" আমার শাশুড়ি বললেন, "একি হল; তুই চলে গেলি? আমার কি হবে, তোর বাচ্চা-কাচ্চার কি হবে?" তিনি বললেন, "বড়ো ভাই তো আছে, ও দেখবে। তুমি আর কি করবে, তুমি ভগবানকে ডাকো যেন আমার আত্মাটা তাড়াতাড়ি বের হয়ে যায়। আমি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি।" আমার মেয়েটার বয়স সাড়ে পাঁচ বছর, ও সমস্ত দেখে চোখ বুজে আছে আর চোখ খোলে না। কেবল বলে, "লাশ ফেলো," তখন আমার শাশুড়িকে দিয়ে মেয়েটাকে মাঠে পাঠিয়ে দিলাম, ভাবলাম এসে ক্ষতস্থান বেঁধে দেব এবং মেডিকেলে নিয়ে যাব। মেয়েকে রেখে এসে দেখি ওর বাবা কোন কথা বলছে না। আমি খুব ডাকাডাকি করলাম। কিন্তু কোন সাড়া নেই। ভাবলাম এই মাত্র এতো কথা বলল, এখন নেই? আমি দিশাহারা হয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলাম। সমস্ত লোক যারা ছিল তারা সবাই ছুটে এলো। আমাকে কেউ কেউ বলল, "তুমি চিৎকার করো না, আর কিছু তো করার নেই, এখন চুপ করে থাকো। তোমার চিৎকার শুনলে মিলিটারীরা এসে আমাদের সবাইকে শেষ করে ফেলবে।" তখন আমার বড়ো ভাসুর আমার স্বামীর লাশটাকে মাঠের মধ্যে রেখে এলো। আমি ভীষণ কান্নাকাটি করছি দেখে মঞ্জুর বাবা আমাকে ধরে সান্ত্বনা দিতে লাগল। ইতিমধ্যে সবাই হল ছাড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আমি মাখনের বউকে বললাম, "সবাই তো চলে যাচ্ছে, আমি বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে কোথায় যাব? চলো না একবার ওদের বাবাকে দেখে আসি।" তখন মাখনের বউকে সাথে নিয়ে আমি লাশের পাশে এলাম। লাশের পাশে বসে নমস্কার করে চলে এলাম আবার। বাচ্চাদের নিয়ে কোথাও যাওয়ার জন্য বাইরে বের হলাম। পূর্ব দিকের গেটের কাছে দেখলাম গলায় কাপড় দিয়ে টেনে আনছে ছাত্রদের লাশ সবাই মিলে। আমি তখন একা, ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, রাস্তাও পার হতে পারছি না। কয়েকজন ধোপা আমাকে রাস্তা পার করে দিল। আমি বাচ্চাদের নিয়ে হল ত্যাগ করে কিছু দূরে রাস্তায় সবার সাথে মিলিত হলাম। চলে গেলাম সবাই মিলে হোসেনী দালানে। হোসেনী দালান থেকে প্রায় চার দিন পর বেণীর মাকে সাথে নিয়ে মেডিকেলে এলাম। সেখানে এসেই শুনলাম জ্যোতিবাবু স্যার এইমাত্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। বেণীর মাকে সঙ্গে নিয়ে আমি স্যারকে দেখতে এলাম।

চিৎবল্লী

প্রাক্তন বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি
জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অতি পরিচিতি চিৎবল্লী এতো মারাত্মক হত্যাযজ্ঞ দেখে নিজের মস্তিষ্ক ঠিক রাখতে পারেনি। পাগলের মতো সারা হল দৌড়াদৌড়ি করছে। বিহারী মনে করে পাক-বাহিনী তাকে হত্যা করেনি। জগন্নাথ হল গণহত্যার সম্পর্কে তার বর্ণনা মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক।

২৫শে মার্চ দিনেরবেলা মিছিল, মিটিং ইত্যাদি সমস্ত শহরে। রাত ১১টার দিকে আমরা খবর পেলাম লোকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা ছেড়ে নবাবপুর এলাকার দিকে যাচ্ছে। আমরা হলে কর্মচারীরা সকলেই ছিলাম। কেউ আমরা যাইনি। একজন লোক বলল যে এখানে থাকা নিরাপদ নয়। তাই এদিকে সমস্ত লোক শহরের দিকে যাচ্ছে। আমি তখন ভাবলাম যে আমরা যাব না। যা ভাগ্যে আছে তাই হবে। আমি, দাশু, মোহন, বুধীরাম মিলে মহাভারত পড়ছিলাম সন্ধ্যা থেকে। তারপরে আমরা সবাই মিলে খাওয়া-দাওয়ার জন্য যে যার বাড়ি চলে গেলাম। আমি বাসায় গিয়ে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়লাম, কিন্তু ঘুমাইনি তখনও। কিছু কিছু আওয়াজ পেলাম চারিদিকে। আমি তখন একটু বাইরে বেরিয়ে এলাম এবং শিববাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি যে জগন্নাথ হলের চারিদিকে যে দেওয়াল তাতে শুধু বন্দুকের নল তাক করা আছে। লোক দেখা যায় না বন্দুকের নল দেখা যাচ্ছে। আমি তখন ঘরের দিকে আসি এবং বলি যে তোমরা কেউ বাইরে যেয়ো না, অবস্থা ভালো দেখা যাচ্ছে না। গুলি চললে আমরা কেউ বাঁচবো না। এইভাবে আমরা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লাম এবং বাসায় বসে থাকলাম। কিছুক্ষণ পরেই চারিদিক থেকে শুধু গুলির আওয়াজ ভেসে আসতে থাকলো। অবিরাম গুলির শব্দ শুনে আমি আমার বাসার বাইরে চলে এলাম। আমার বাসাটা ছিল বর্তমান পূর্ব বাড়ির উত্তর দিকে। আমরা ঐখানে বসে থাকার জন্য রাস্তা, শিববাড়ি স্পষ্ট দেখতে পেতাম। এমন সময় দেখলাম দুই জন লোক হল থেকে শিববাড়ির দিকে যাওয়ার জন্য দেওয়ালের কাছে গিয়ে আবার ফিরে এলো হলের মধ্যে। তখনই আমি বুঝলাম মিলিটারীরা এর মধ্যে এসে পড়েছে। আমি ঘরে থাকলাম। আবার শুরু হলো গুলির শব্দ। ক্রমাগত গুলির শব্দে আমি ঘরেই বসে থাকলাম চুপচাপ, কিছু করার নেই। তখনই চারিদিকে মিলিটারী এসে পড়ল। আমার বাসার দিকে মিলিটারী চলে এলো। আমি ঘরের মধ্যে ভয়ে কাঁপছি। কি হয়, কি হয় এই ভেবে। আমাদের বাসার মধ্যে দুজন মিলিটারী আসল। তখন আমি আমার মেয়েকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ওরা আমাকে বলল, "ইধার আও, বাচ্চা উতারকো।" আমি গেলাম ওদের কাছে। আবার বলল, "বাচ্চাকো

উতারকো।'' আমি বাচ্চা নামিয়ে দিলাম। ওরা বলল, ''চল, হামারা সাত চল।'' আমি চললাম ওদের সাথে, জানি না কোথায় যাব, কেন যাব, কিছুই জানি না। ওরা একজন আমার পিঠে বন্দুক ধরে রাখল আর অপরজন সামনে। চললাম ওদের সাথে। কিছুদূর গিয়ে একটা মেথরবাড়ি ছিল, বুদ্ধদের বাড়ি। ওদের তিনটা রুম ভাগ ভাগ করা ছিল চারটে। ওরা একজন একটা রুমে ঢুকলো অপর অন্য তিনটা রুমে ঢুকলো, কি যেন দেখলো। সেখান থেকে ফিরে আসলাম বাসায়। বাসায় আসার পর ওরা আবার এলো, এসে বলল, ''উহু কিধার গিয়া?'' তখন আমার বৌদি বলল, ''ও তো আপকে সাত গিয়া''। তখন ওরা আবার বলল, ''ঠিক হ্যায় হাম দেখে গা।'' এই বলে ওরা চলে গেল। এর মধ্যে সারারাত ওরা আর আমার বাসায় আসেনি। তারপর ওরা চারিদিকে আগুন ধরিয়ে দিল। ক্যান্টিন, ক্যান্টিনের সাথে ছাত্রাবাস ছিল তাতে, হলের কর্মচারীদের বাসাগুলোতেও আগুন ধরিয়ে দিল। যখন চারিদিক থেকে আগুন আমার বাসার দিকে আসছে, তখন আমি আমার বাচ্চাদের নিয়ে বাইরে চলে গেলাম। আমি আমাদের ঘরের সামনে একটু জায়গায় তিনটি ঘরে আমাদের তিন পরিবারের লোক জড়ো হলাম। আমার বাসা, বুদ্ধরামের বাসা, দাশুরামের বাসা, নরেশের বাসা এই চার বাসার লোকজন জড়ো হলাম। ওদের মধ্যে আমরা যারা পুরুষ ছিলাম আমি, বলীরাম, দাশু, কেশব, রতন, এরা সবাই বসে ছিল। আমি শেষ রাতে যখন দেখলাম যে চারিদিক থেকে লাশগুলো টেনে আনছে, সে লোকগুলোতো একটা নেকের কাজ করছে। আমি ভাবলাম যে, আমিও যাই একটু লাশ ধোলাই করি গিয়ে, ধোলাই মানে টেনে টেনে এনে মাঠে গিয়ে জড়ো করি গিয়া। শিববাড়ি, জগন্নাথ হলের ভিতর থেকে মিলিটারী সাথে সাথে এ কাজ করছে। যারা লাশ টানছে তাদের মধ্যে ছিল মিস্ত্রি, মনভরন, শিবু, শংকর, বুধীরাম, মুন্নিলাল, জওয়াহর, বাসু, মোহন (২), শ্যামলাল আরও অনেকে। এদের মধ্যে চান্দুও ছিল। আমি তখন মনে মনে বললাম যে, ''আমাদের হলের এতোগুলো লোক লাশ ধোলাই করছে, ওরা নেকের কাজ করছে, আমিও যাই। আমার স্ত্রী আমাকে বাধা দিয়ে বলে, ''না তুমি যাবে না।'' আমি রাগ হয়ে বললাম, ''ওরা তো ধর্মের কাজ করছে, আমি যাব। তুই আমার ধর্মের কাজে নিষেধ করিস না। তোর কথায় আমি যাব না?'' এই বলেই যখন রওনা করলাম তখনই দরজায় একটা ধাক্কা খেলাম, মনে বাধা পেলাম। বাধা পাওয়ার পরে একটু বসলাম পাঁচ মিনিট, আবার উঠে যাওয়ার জন্য বের হতে গিয়ে আবার বাধা পেলাম দরজায়, এবার আমি বললাম, ''বার বার বাধা পড়ছে, থাক যাবো না।'' তখন মাঠে গিয়ে বসে থাকলাম। তখন দেখছি যে আমাদের লোকজন লাশ ধোলাই করছে। এমন সময় দেখলাম পূর্বদিক থেকে ৩/৪ জন মিলিটারী আর আমাদের কয়েকজন দক্ষিণ বাড়িতে লাশ আনার জন্য যাচ্ছে। আমাকে দেখে ওরা বলল, ''এই, ইধার আও।'' তখন আমি, কেশব, দাশু, বলীরাম সবাই এক সাথে গেলাম। একটু

দূরে একটি তালগাছ ছিল, সেখানে এসে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করল, ''এই তুম বাঙালী হ্যায়?'' তখন আমি বললাম, ''নেহি সাহাব, হাম বাঙালী নেহি হ্যায়, পশ্চিমা হ্যায়।'' ওরা আবার বলল, ''ইয়ে তো শালা কোন আদমী হ্যায়?'' আমি বললাম, ''ইয়ে তো হামারা পশ্চিম ঘরনেওয়ালা। হাম মুলকি আদমী হ্যায়।'' আবার বলল যে, ''তুম ইসকে আন্দার কিয়া আয়া?'' আমি বললাম, ''সাহাব, হাম তো নোকড়ি করতা হ্যায়। ছোট ছোট বাচ্চা হ্যায়, তো হাম নোকড়ি করতে হ্যায়।'' ওরা বলল, ''তুমলোক তো মারতা নেহি হ্যায়।'' আমি বললাম, ''কাভি কাভি যদি কসুর হোতা কাভি ধাক্কা লাগা দেতা হ্যায়। জরুর নোকড়ি কারতা।'' আবার বলল, ''আপ বাঙালি মার সাকতা হ্যায়?'' আমি বললাম, ''জরুর মার সাকতা হ্যায়।'' ওরা আবার বলল, ''ঠিক হ্যায় তুম লোক যাও, বাঙালি মারো পোচ্ কে, অর ফিরভি তুছে জবরদাস্ত হ্যায়, হামকো বোলা, মারো।'' আমি বললাম, ''হ্যা সাহাব ঠিক বোল সাকতা।'' আমি তখন আমার সাথে অন্য যারা অর্থাৎ কেশব ও বলীরামকে বললাম, ''এই আগে চল, দাউর আর লাকড়ি নে, তো দেখা যায়ে তো।'' এই কথা বলার পর মিলিটারীরা হাসলো এবং ওদিকে চলে গেল। আমি তখন বললাম যে, ''দেখ ভাই জীবনে এবার বাঁচা গেল। এর পরে আর সুযোগ হবে না তাই যে যেভাবে পারো ভাগো। যে যেখানে পারো চলে যাও, আর দেখা দিও না।'' কে কোন দিকে যে গেল, তার খবর আমি আর জানি না। আমি আমার বাসায় চলে এলাম। আমার ঘরের উত্তর দিকে একটা জানালা ছিল, সেই জানালা দিয়ে দেখি যে মানুষগুলি লাশ আনছে, রাখছে। শেষের দিকে শিববাড়ি থেকে কয়েকটি লাশ এনে ওদের অফিসারের কাছে রাখছে, আর খবর বলছে। সিপাহী যে লাশ আনছে তাদের মধ্যে, মনে হয় মধুর ক্যান্টিনে মধুকে দুইজনে কাঁধে করে হাঁটিয়ে এনেছে। পরে মেজর মিলিটারীদের কি যেন বলল। তারপর লাইন ধরতে বলল। যারা লাশ টানছিল তারা সব লাইনে দাঁড়াল। ওই লাইনের শেষে মিস্ত্রি ছিল। মিস্ত্রি মিলিটারীর দিকে হাতজোড় করে কি যেন বলছিল, আর সাথে সাথে তাকে গুলি করে মারলো। মিস্ত্রি পড়ে গেল আর সাথে ব্রাশ ফায়ার করল। ব্রাশ ফায়ার করাতে সকলে পড়ে গেল। মারার পরে মিলিটারী চারজন হাসল এবং হাসতে হাসতে আমাদের বাসার দিকে আসল। তখন আমি ভাবলাম ওদেরকে মারল এইবার আমাদের দিকে যখন আসছে আমরা যে কয়জন তখন আছি, আমাদেরই ডাকবে কবর দেবার জন্য। আমি দেখলাম যে কেউ নেই তাহলে আমিও ঘর থেকে বের হয়ে যাই। আমাদের এ্যাসেম্বলির যে গেট আছে সেখান থেকে বের হয়ে যাব। ভাবলাম। কিন্তু দেখি সেখানেও কয়েকজন বন্দুক হাতে মিলিটারী পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, আমি তখন আবার পিছনে ফিরে গেলাম। আমি ভাবছি যে আমাকে যদি সামনে দেখে তাহলে আমার রক্ষা নেই। পিছনে যদি যাই ওরা আসছে এদিকে— তাহলে একই অবস্থা হবে। আমি এখন কি করি? আমি যে ঘরগুলো পুড়ছে সে ঘরগুলোর

মধ্যে ঢুকলাম। কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই আগুনের তাপে। বাথরুমে গেলাম, আমার পায়ে জুতা না থাকায় পা ধোয়ার জায়গায় যে দুটো ইঁট দেওয়া ছিল তা তখনও গরম হয়নি তার উপর দাঁড়ালাম। ডানে-বামে সব জায়গায় আগুন জ্বলছে। তিন-চার মিনিট পর আমার হঠাৎ ভীষণ জল পিপাসা লাগল, জীবন বের হয়ে যাবার মতো। জলের কল ছেড়ে জল আসছে দেখে স্বস্তি পেলাম, কিন্তু জলের মধ্যে হাত দিতেই গরম জলে আমার হাত পুড়ে গেল। জলের ট্যাঙ্ক আগুনে গরম হয়ে গিয়েছিল। হাত সরিয়ে নিলাম, ভাবলাম বাসায় গিয়ে জল খাবো, মারে যদি তো মরবো। জল পিপাসায় মরে যাই আর কি! আর এক বাথরুমে গিয়ে জল খেতে পারলাম না। আরও দুই তিন মিনিট অপেক্ষা করে বাসার দিকে গেলাম। আমার তখন হুঁশ ছিল না। আমি কে? কেন এখানে? সে সব কিছু মনে করতে পারছিলাম না। বাসায় গিয়ে দেখলাম আমার ভাই, বউদি, আমার স্ত্রীকে। তারা দেখেছে আমার মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে, তাই ওরা ভাবলো যে আমি গুলি খেয়েছি। কিন্তু সে সব সম্পর্কে আমার হুঁশই ছিল না। তারপর নাকি আমি মাঠে গিয়ে পাগলের মতো দৌড়াদৌড়ি করেছি। কারণ আমি হয় গুলি খেয়েছি, না হয় আমার মাথায় গন্ডগোল হয়েছে। পরে আমার মনে পড়েছে, আমার শরীরে যে রক্ত তা হলো আমি পাগলের মতো এদিক-ওদিক করে যখন ক্যান্টিনে ঢুকতে চেয়েছি, তখন কোন দরজা না পেয়ে জানালার কাঁচ মাথা দিয়ে ভেঙে ভিতরে ঢোকার সময় মাথা কেটে গিয়েছিল। আমি যখন মাঠে পাগলের মতো দৌড়াদৌড়ি করছি, তখন আমার বড়ো ভাই আমাকে ধরতে গেল, কারণ কেউ যাতে না দেখে। সে আস্তে আস্তে গিয়ে আমার কোমর ধরে আমাকে অন্য ঘরে ঢুকিয়ে মাথায় জল দিতে লাগল এবং এক পর্যায়ে আমি দেখলাম যে আমার সমস্ত শরীর ভিজা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। কিছুক্ষণ পর তিনজন লোক এলো আমাদের ওখানে। তাদের একজন বুদ্ধর ছেলে শিবু, বকসীবাজারের মোড়ে মসজিদের কাছের ইদু মিয়া, অপরজনকে চিনতে পারিনি। তারা বলল, "আমরা দেখতে এলাম তোমাদের মধ্যে কে গুলি খেয়ে মারা গেছে বা জীবিত আছে। এখন রোডে মিলিটারী নেই, তারা সবাই নামাজ পড়তে গেছে, রোড খালি। তোমরা জীবন বাঁচাতে চাইলে এখন হল ছেড়ে চলে যাও।" তাই এদের কথা মতো আমরা সবাই রওনা হলাম। হোসেনী দালানে তিন দিন থাকার পর আবার আমরা কেউ কেউ মেডিকেল কেউ কেউ এদিক সেদিক চলে গেলাম আমাদের বাচ্চা-কাচ্চা সহ। রাস্তায় রাস্তায় লাশ পড়ে আছে। আমার পা পুড়ে যাওয়ায় পোড়া পা নিয়ে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল।

মাখনলাল রায়

পেশা : হেড দারোয়ান

জগন্নাথ হল

প্রধান দারোয়ান হিসাবে মাখনলাল রায় হলকে রক্ষা করতে পারেননি, কোনমতে আত্মরক্ষা করেছেন মাত্র। গণহত্যার বড়ো একটি অংশ তিনি নিজেই দেখেছেন দক্ষিণ বাড়ির দিক হতে। কিন্তু বয়স বেশি হওয়ায় সব কিছু গুছিয়ে বলতে পারেননি। তবু যা বলেছেন তাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

২৫শে মার্চ রাতে ছাত্রবাবুরা রাস্তায় ব্যারিকেড দেবার জন্য হলের পুরোনো সব পানির ট্যাংক নিয়ে যায়। আমিও তাদের সাথে ছিলাম। ছাত্রবাবুদের কাছে আমি জিজ্ঞাসা করলাম তারা ওই সমস্ত ট্যাংক দিয়ে কি করবেন। তাঁরা বললেন, ''মিলিটারী আসার পথ বন্ধ করতে হবে। আমাদের হলে যাতে গাড়ি না আসতে পারে তাই রাস্তা বন্ধ করতে হবে।'' জগন্নাথ হলের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে গোডাউন ছিল তা থেকেই এই পুরনো জলের ট্যাংকগুলি নিচ্ছে। আমি বললাম, ''মিলিটারী আসবেই, এগুলো দিয়ে কি আর আসা বন্ধ করা যাবে?'' ছাত্রবাবুরা বললেন, ''এগুলো সরিয়ে আসতে আসতে আমরা সবাই চলে যাবো বা সরে যেতে পারবো।'' ইকবাল হলে গোলাগুলি চলছে। রাত তখন সাড়ে এগারোটা বাজে, ইকবাল হলের মাঠে যে শব্দ হচ্ছে এ সম্পর্কে ছাত্রবাবুদের জিজ্ঞাসা করলে তারা বললেন যে, ''না, ও তো আমাদের ছেলেরা করছে।'' আমি বললাম, ''এতো গোলাগুলি ছাত্ররা করছে বলে আমার মনে হয় না।'' তখন তারাই বলল যে, ''দেখি তো কি ব্যাপার।'' তখন দুই-তিন জন ব্রিটিশ কাউন্সিলের দিকে গেল এবং দৌড়ে এসে বলল যে, ''মিলিটারীরা, ইকবাল হলে মিলিটারীরা গোলাগুলি করছে। এখন কি করতে পারি?'' এ কথা বলতেই মিলিটারীরা এসে আমাদের হল ঘিরে ফেলেছে। আর্মি জগন্নাথ হলে ঢুকে পড়েছে ঐ ভাঙা দেওয়ালের দিক থেকে। মতিন স্যারের বাসার দিক থেকে মাঠের দেওয়াল ভাঙা ছিল। পাক-সেনারা ঢুকেই গুলি করতে শুরু করল। আমি তখন পুকুরের ঘাটে দাঁড়ান। যখন ৩০/৩৫ জন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিকেল সেন্টারে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়েছে তখনই গুলি শুরু হয়। সবাই উত্তর বাড়ি, দক্ষিণ বাড়ির চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কে কোথায় গেল ঠিক করা যায়নি। তখন পাক-সৈন্য উত্তরবাড়িতে গুলি করছে। বোঝা গেল যে উত্তরবাড়ির উপরই সৈন্যদের আক্রোশ। এদিকে যে ছাত্র ছিল তা ওদের ধারণা ছিল না। আমি এবং প্রিয়নাথ ছিলাম দক্ষিণ বাড়ির গেটে। প্রিয়নাথকে বললাম, তোমার খাকি পোশাক থাকলে পরে নাও, আমি পোশাক পরছি। এমন সময় উত্তর বাড়ির দিক থেকে একটা গাড়ি এসে থামলো।

ওরা নেমে আমাদের ঠাকুর ঘরটার দিকে আসছে। তখন আমি দক্ষিণ বাড়ির গেটে ছিলাম। এসেই প্রিয়নাথের ঘাড়টা ধরল। আমাকেও ধরতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি ছুটে পালিয়ে যাই। পরে শুনেছি এদিক সেদিক ওকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শেষে ওকেই আগে গুলি করে। যতদূর জানা যায় যে, সুধীরের ক্যান্টিনের কাছে বড়ই গাছের নীচে প্রিয়নাথকে গুলি করে। আমি ছুটে দক্ষিণ বাড়ির ডাইনিং-এর পাশে একটা ছোট রুম ছিল সেখানে লুকিয়ে পড়ি। ওই রুমে একটা লাইট ছিল সেটা নিভিয়ে ফেলি। দক্ষিণ বাড়ির ডাইনিং হলে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুটি রুম ছিল। আমি দক্ষিণ দিকের রুমে গিয়ে ঢুকলাম। ওই রুমে ছাত্ররা ছিল যাদের নাম আমার মনে নেই। তখন ওখানে আর চারজন মিলিটারী এসে খুঁজতে লাগল। আর বলতে লাগল, "শালে লোক কিধার হ্যায়, কিধার গিয়া"। আমরা তো ভাঙা চেয়ার মাথায় দিয়ে চুপ করে বসে ছিলাম। রুমটাতে কতগুলি ভাঙা চেয়ার ছিল। সৈন্যরা খুঁজে এদিকে চলে এসেছে আর যায়না ওদিকে। আমরা আস্তে আস্তে কথা বলছি যে, "বাবু ওরা এভাবে হামলা করছে এখন কি হবে?" এভাবে বসে বসে কথা বলছি আর এদিকে খুব গোলাগুলির শব্দ পাচ্ছি। এত শব্দ হচ্ছে যে সমস্ত হলটাই কাঁপছে। ছাত্রবাবুরা বলছে, "কি আর করবে, ধরে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাবে, মারধোর করবে, করে ছেড়ে দেবে।" এটুকু আশ্বস্ত করলো ছাত্রবাবুরা আমাকে। রাত যখন ভোর পাঁচটা, সৈন্যদের আরও একটা গাড়ি এসে হলে ঢুকলো। গাড়িটা দক্ষিণ বাড়ির পশ্চিমের গেট দিয়ে ঢুকেছে। তখন আমি বললাম, "বাবুরা এখন তো বাঁচার সম্ভবনা নাই। রাত্রিবেলা ওরা খুঁজে পায়নি, দিনের আলোয় পরিস্কার আমাদের দেখতে পাবে। কি করবো, এখন আমাদের নিশ্চিত মৃত্যু, কোথায় যাবো?" তখন জানালা দিয়ে দেখলাম ওরা তিনতলা পর্যন্ত উঠেছে এবং নেমে গেল। ডাইনিং-এর দিকে আর এলো না। কোনরকম সেবারেও প্রাণে বেঁচে গেলাম। দুপুরবেলা বারোটার দিকে আমরা এখানে আছি, এরপর আমরা বাইরে গেলাম। আমরা এদিকে বাসায় আসতে পারিনি। ছাত্রবাবুরা বের হয়ে কে কোন দিকে গেল তা বলতে পারি না। দক্ষিণ বাড়ির মধ্যে লণ্ড্রির কাছ থেকে মাঠের মধ্যে আমি সব দেখছি। বেলা যখন প্রায় তিনটা (আনুমানিক) তখন আবার ওরা ট্রাকটা নিয়ে আসে। একটা ট্রাকটর এনে গর্ত করে বর্তমান শহীদ মিনারে সামনে এবং পরে ওই গর্তের মধ্যে সমস্ত লাশগুলিকে ফেলে। কারও হয়তো হাতে গুলি লাগায় না মরে বাঁচতো, তাকেও জোর করে মাটি চাপা দেওয়ালো। আহত লাশগুলি হাত দিয়ে বারণ করে, কিন্তু তারা শোনেনি, ঠেলে মাটি দিয়ে দিল। এমনভাবে গর্তের মধ্যে ফেললো কারও হাত, পা, মাথা, কাপড়, লুঙ্গি বেরিয়ে আছে। এইভাবে মাটি দিয়ে চলে গেল।

ইদু মিয়া

পুস্তক বিক্রেতা

ঢাকা।

জগন্নাথ হলের অক্টোবর ভবনের বিপরীতে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদটি বর্তমান যেখানে, সেখানেই ছিল ইদু মিয়ার দোকান। ইদু মিয়া শিক্ষিত নন, কিন্তু যে কর্ম তিনি সম্পাদন করেছেন তা তাকে মহত্ত্বের শীর্ষে তুলে দিয়েছে। জগন্নাথ হলের ছাত্র-শিক্ষকদের এবং পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়ের কোয়ার্টারের শিক্ষক ও তাদের স্বজনদের হত্যার পর লাশগুলো যখন জগন্নাথ হলের মাঠে এনে পাকবাহিনী ক্ষণিকের জন্য বুলডোজার সংগ্রহ করতে হল ত্যাগ করে, ইদু মিয়া তখন জগন্নাথ হলের মাঠ হতে আহতদের মেডিকেলে নিয়ে গেছেন প্রাণ বাঁচানোর জন্য। ইদু মিয়ার জন্য হয়তো অনেকে বেঁচে গেছেন।

২৫শে মার্চ রাত আটটায় সংবাদ পেলাম ইউনিভারসিটির এলাকায় মিলিটারী আক্রমণ করবে। আমরা তখন তাস খেলছিলাম, মনভরণ, বুদ্ধরাম এবং আর একজন, মোট চারজন তাস খেলছিলাম। আমি তখন মণভরণকে বললাম, "তোমরা আজ হলে থেকো না, বিপদ হতে পারে।" আমরা তখন ওখানেই ঘোরাঘুরি করছিলাম। রাত এগারোটার সময় মিলিটারী আসল। জগন্নাথ হলের রাস্তার সামনে নুড়ি বিছানো ছিল, নতুন করে রাস্তা বানানো হবে। সেখানে এসে মিলিটারী থামল। এমন সময় দেখি জগন্নাথ হলের পূর্বদিক দিয়ে হলুদ বাতির মতো কি যেন কতগুলো উপর দিয়ে উড়ে গেল। তারপরে গুলির আওয়াজ কামানের মতো। কিছু সময় পর আওয়াজ থেমে গেল। জগন্নাথ হলের পূর্বদিক দিয়ে মিলিটারী ঢুকে গেল। জগন্নাথ হলের উত্তর বাড়ির সামনে গিয়ে বলল, "Come down all person" দুই-তিনবার বলার পর গুলি ছোড়া আরম্ভ হলো, তখন চারদিক থেকে শুরু হলো কান্নাকাটি। কিছুক্ষণ পর দেখি এ্যাসেম্বলীর সামনে আমার খুব অন্তরঙ্গ লোক শ্রী অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যকে। তাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে এলো। এনে রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করে ফেলে দিয়ে কয়েকটা লাথি মারল। তারপর তাকে ওরা নিয়ে গেল। তার পরণে ছিল ধুতি, আর তার পৈতেটা ঝুলছিল। তাকে ধরে নিয়ে পূর্বদিক দিয়ে মিলিটারীরা চলে গেল। আমি জগন্নাথ হলের বিপরীতে একটি মসজিদ ছিল সেখানে বসে সব দেখছিলাম। এর মধ্যে কান্নাকটি, চীৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে। একজন ছাত্র এ্যাসেম্বলীর পাশ দিয়ে দেওয়াল টপকে দৌড়ে শহীদ মিনারের কাছাকাছি পৌঁছাবার সাথে সাথে তাকে গুলি করল। গুলি খাওয়ার সাথে সাথে সে ছিটকে পড়ল এবং 'জল দাও', 'জল দাও' বলে চিৎকার করতে লাগল। সারারাত এরকম গুলি চলছে আমরা দেখছি। জগন্নাথ হলের টিনের চালে যে একটা

ছাত্রাবাস ছিল তাতে পাক-বাহিনী আগুন লাগিয়ে দেয়। তারপর তারা শিবু, শঙ্কর আর কয়েকজনকে নিয়ে বের হল বাইরে লাশ তুলে আনতে। শহীদ মিনারের সামনে যে ছেলেটিকে গুলি করেছিল তাকে নিয়ে গেল। এরপর তারা চলে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪ নম্বর বাড়িতে। সেখানে গিয়ে বের করে নিয়ে এলো মণিরুজ্জামান সাহেবকে, পরিসংখ্যনের প্রফেসর। পরণে লুঙ্গি, হাতে ঘড়ি, তাকে বের করে এনে জগন্নাথ হলের গেটের কাছে রাখা এনে রাখা হলো। পরে আর একটা ছেলেকে নিয়ে এলো। পরে আমি চিনতে পেরেছি সেটা ছিল মনিরুজ্জামান স্যারের ছেলে। যারা লাশ টেনে নিয়ে এলো তাদের জগন্নাথ হলের মাঠে লাইন করে দাঁড় করিয়ে মেশিনগান দিয়ে গুলি করলো। সব লোকগুলো পড়ে গেল। আবার আরেক দল নিয়ে এলো। তাদের যখন গুলি করে তখন যে ধোঁয়া উঠে, সে ধোঁয়া ছিল লাল। কিছুসময় পর মিলিটারী সব চলে গেল। মিলিটারী চলে যাবার পর আমি হলে ঢুকি। ঢুকে সর্বপ্রথম আমাদের যে স্টাফ কর্মচারী ছিল তাদের ওখানে গেলাম। তাদেরকে বললাম, ''তোমরা তাড়াতাড়ি বের হও। তোমাদের যে টাকা-পয়সা, সোনা-গয়না আছে সব নিয়ে বের হও, আমার সঙ্গে চলো।'' তারপর মাঠের মধ্যে গেলাম, যেয়ে দেখি আমার এক পরিচিত ছাত্র কালীদা, মাঠে পড়ে আছে। তিনি বললেন, ''আমার গুলি লাগেনি, আমাকে নিয়ে যান। আমাকে যখন গুলি করেছে তখন আমি শুয়ে পড়েছি।'' তার উঠার ক্ষমতা নেই। তাকে আমি ধরে নিয়ে যাই। আমি তাকে একটা ফুলপ্যান্ট আর শার্ট পরিয়ে বলি,''জলদি আপনি ভাগেন। চলে যান এখান থেকে।'' তারপর দেখি মনভরনের লাশ, মনভরনের মা, তার স্ত্রী নিয়ে আসছে। তারপর পেলাম চান্দের ভাইকে আহত অবস্থায়, তাকে নিয়ে এলাম। এসে তার বাড়ির কাছে রাখলাম। তখন আমার শুধু মনে হলো, আমার এখন একটা কর্তব্যই, তা হলো যারা জীবিত আছে তাদের বের করে নিয়ে আসা। খগেনের স্ত্রী মানে মতিনের মা, তিনি আমাকে বললেন, ''আমার মতিনের নাকি হাতে গুলি লেগেছে, ওকে যেয়ে ওকে নিয়ে আসুন।'' তখন আমি আবার গেলাম মাঠে, যেয়ে দেখি মতি জীবিত নাই, সেকথা আমি আর তার মাকে বললাম না। চানদেবকে নিয়ে প্রথমে একটা কনট্রেকটারের গোডাউনের রাখা হলো। উনি আমার কাছে জল খেতে চেয়েছিল কিন্তু আমি দেয়নি, কারণ আমি জানি আহত অবস্থায় মানুষ জল খেলে মারা যায়। আমি তাকে বললাম, ''আপনি এখানে থাকেন।'' তারপর একজন বুড়ো লোকের হাতে গুলি লেগেছিল। তাকে বের করে নিয়ে এলাম। তার পরিবারের সব নিয়ে চলে এলাম নিরাপদে। আমি যখন সবাইকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি তখন বহুলোক আমাকে নিষেধ করেছে যে তুমি আর যেয়ো না, গেলে মারা পড়বে। আমার সাথীরাও আমাকে নিষেধ করেছে, চাপ দিয়েছে আর জগন্নাথ হলে না যেতে। কিন্তু তবু সে নিষেধ অমান্য করে আমি গেছি মানুষগুলিকে বাঁচাতে। আমি সবার নিষেধ অমান্য করে জগন্নাথ হলের পুকুর পাড় দিয়ে যাওয়ার সময় দেখি পুকুরে

একটা মাথা, তার সমস্ত শরীর জলে ডোবা। কাছে গিয়ে চিনতে পারলাম, হরিধন দাস, ফিজিক্সে অনার্স পড়ে। তাকে যেয়ে টেনে তুললাম, দেখি লোকটা অজ্ঞান। আমি একা খুব কষ্ট করে কাঁধে তুলে পূর্বদিকের গেট দিয়ে মেডিকেলে নিয়ে গেলাম। তাকে মেডিকেলে রেখে চান্দের ভাইকেও নিয়ে গেলাম মেডিকেলে। এই করেই সারা রাত কেটে গেছে, একটুও ঘুমাইনি। কি করে ঘুমাই? আমার আত্মীয়দের মতোই কতগুলো লোক পড়ে আছে। বিপদের মুখে তাদের দেখে তো ঘুম আসে না! তাই মেডিকেলে এদের দিয়ে আবার ফিরে এলাম হলে আর কেউ আছে কিনা দেখতে। এসে দেখি এ্যাসেম্বলির ভিতরে যশোদাজীবন সাহা। বাইরে এসে আমাকে চিনতে পারল। বলল, ''আমি আমার ভাই আটকা পড়ে আছি। আমাদের নিয়ে চলো।'' তাদের বের করে নিয়ে এসে আমার এখানে রাখলাম। তারপর বুদ্ধরামের স্ত্রী সাথে দেখা, তার সাথে একটা বাচ্চা। সে বলল তার বাচ্চার বাপের নাকি গুলি লেগেছে, ওদের খোঁজ করে আনতে পারি। আবার মাঠে গেলাম, দেখলাম অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যকে, তাকে মাঠে এনে গুলি করেছে। তখনও বহু লোক জীবিত আছে, কেউ কেউ কথা বলতে পারে। একত্রে এতো লাশ আমি জীবনে দেখিনি। অবশ্য আমার গোনা নেই। তবে ৬০/৬৫ জনের লাশ তো হবেই। ড্রেনে দেখলাম একটা লাশ পড়ে আছে, আমার পরিচিত। নিরঞ্জন হালদার। বাড়ি বরিশাল, ফিজিক্সে অনার্স পড়তেন। খুব পরিচিত। আমরা একসাথে ওঠাবসা করেছি। উত্তর বাড়িতে দেখলাম দুটো লাশ। সেই দুটো কুকুরে খেয়েছে। রেজিষ্ট্রার বিল্ডিং থেকে একটা ছেলেকে নিয়ে এলাম। সে পরিসংখ্যানে পড়তো। আমার সঙ্গে ছিলেন ধীরেনবাবু, জগন্নাথ হলের স্টাফ। আমরা পরে ৩৪ নং বাড়িতে এলাম। ৩৪ নং বাড়িতে নীচ তলায় ছিল হাই সাহেবের পরিবার; তাদেরকে বাইরে বের করে নিয়ে এলাম। তারপরে এলাম জ্যোর্তিময় গুহঠাকুরতা স্যারের বাসায়। স্যারের স্ত্রী বাসন্তি দেবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, স্যার কোথায়? তিনি বললেন, ''স্যারকে মিলিটারীরা জখম করেছে, তাকে মেডিকেলে ভর্তি করেছি।'' স্যারের কাছে গেলাম। স্যার আমাকে বললেন, ''তুমি হয়তো মনে করছ আমি ভালো, কিন্তু আমি থাকবো না। আমি মেডিকেলে শুনেছি তুমি নাকি হলের অনেক ছাত্রদের বাঁচিয়েছ, আমি যদি থাকতাম সে কথা আমি প্রকাশ করতে পারতাম।'' তিনি তারপর আর মাত্র ৩/৪ দিন জীবিত ছিলেন। স্যারের স্ত্রীর কাছে গেলাম স্যার মারা যাবার পরে। বললাম, ''আমি কি আপনার কোন সাহায্যে আসতে পারি?'' তিনি বললেন, ''হ্যাঁ আপনাকে স্যারের লাশটা যে করেই হোক এনে দিতে হবে। মিলিটারীরা যদি স্যারের লাশ নিয়ে যায় তবে আমি খুব দুঃখ পাব।'' আমি বললাম, ''আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, স্যারের লাশ কোনমতেই আমি মিলিটারীদের নিতে দেব না।'' মেডিকেলে অনেক ছাত্র আছে আমার পরিচিত, তাদেরকে নিয়ে স্যারের লাশ আমি খুঁজেছি, কিন্তু পাইনি।

ধীরেন্দ্রচন্দ্র দে

প্রাক্তন কর্মচারী, অধ্যক্ষের কার্যালয়,
জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ধীরেন্দ্রচন্দ্র দে জগন্নাথ হলের অতি পরিচিত ব্যাক্তি। তার বাসা ছিল জগন্নাথ হলেই। তিনি উত্তর বাড়ির পিছন হতে এবং পুকুরের পশ্চিম দিকে গণহত্যার নারকীয় ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেছেন। সুরেশ দাস গুলি খেয়ে ধীরেন্দ্রচন্দ্র দের বাসায় আশ্রয় নেয়। তার সাক্ষাৎকারে রয়েছে এসব ঘটনার হৃদয়স্পর্শী বিবরণ।

আমি প্রতিদিন সন্ধ্যার দিকে হল থেকে বের হয়ে বাসায় যেতাম। বাসায় আমার অনেক গরু-বাছুর ছিল, তাদের খাবার দিতাম। তারপর ঘরে যেতাম, ঘরে গিয়ে চা-টা খেয়ে বাইরে যেতাম। বাইরে থেকে ৯-১০টার দিকে ফিরে আসতাম। ২৫ তারিখও ঠিক তাই করেছি। আসার পথে দেখলাম আমার ছোট ভাই, ইউনিভারসিটিতে পড়ত। সে, তার এক বন্ধু মাঠের মধ্যে যে বেঞ্চ ছিল, সে বেঞ্চে বসা। আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কিরে বাসায় গেলি না?" সে বলল, "হ্যাঁ যাই। এ কথা জিজ্ঞাসা করে আমি চলে গেলাম বাসায়। কিছুক্ষণ পর সেও বাসায় গেল। আমার গরু-বাছুর যা ছিল সবগুলো ঘরে নিয়ে বাঁধলাম। গরু-বাছুর বেঁধে হাত-পা ধুয়ে খেতে বসলাম। যখন খেতে বসেছি সে সময়ে গোলাগুলির আওয়াজ শোনা গেল। তখন বাজে প্রায় এগারোটা, সাড়ে এগারোটা। তাড়াতাড়ি খেলাম। আমার স্ত্রীকে বললাম তুমি তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সারো আমি একটু বাইরে দেখে আসি। রাস্তায় হট্টগোল শোনা যাচ্ছে। গাছ কাটার আওয়াজ, রাস্তায় অনেক পুরনো ট্যাংক ছিল সেগুলো ধাক্কিয়ে নেবার আওয়াজ। ইউনিভারসিটির গুদামের সামনে গেলাম, দেখলাম মৃণাল বোস। তার সঙ্গে আরও একটি ছেলে তার নাম আমার মনে নেই। তারা বের হয়ে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনারা কোথায় যান?" উত্তরে তারা বলল, "একটু দেখে আসি।" মিনিট পাঁচের মধ্যে তারা ফিরে এলো। ফিরে আসার পর তাদের সাথে আমার দেখা হলো গেটের সামনে। জিজ্ঞাসা করলাম, " কি দেখে এলেন?" তারা বললেন, "কিছুই না, আমাদের লোকই" এর আগে একটা লোক রাস্তায় দৌড়াচ্ছে আর চিৎকার করছে যে মিলিটারী বের হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি রাস্তাঘাট বন্ধ করো তা না হলে সব মেরে ফেলবে। এ কথাবার্তার পর মিনিট ২-৩ এর মধ্যে আমি বাসায় ফিরে গেলাম। বাসায় ফিরে গিয়ে আমি দরজার সামনে গেছি, আমার স্ত্রী বাসনপত্র ধুয়ে বাসায় ফিরছিল। এমন সময় বিকট একটা আওয়াজ এলো, আওয়াজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর হাত থেকে সমস্ত থালা-বাসন সব পড়ে গেল। দুজনে একত্রে থালা-বাসন কুড়িয়ে ঘরের লাইট বন্ধ

করে দিলাম। এমন সময় দেখি সীতানাথ দৌড়ে হলে যাচ্ছে। বলে গেলেন দেখে আসি দুখীরাম কি করে। আমি সীতানাথকে ডেকে বললাম, "হলে যাওয়ার দরকার নেই, কারণ কখন কোন দিক থেকে কোন গুলিগোলা এসে গায়ে পড়ে, দুখীরাম ঠিকই আছে।" রাত দুইটা-তিনটার দিকে দু'জন ছাত্র এসে আমার ঘরে ঢুকলো। নামগুলো আমার মনে নেই। তখন হলে প্রচণ্ড গুলি হচ্ছিল এবং দুই-তিনটা রুমে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নর্থ-হাউজের কোন কোন ঘরে আমি দেখলাম আগুন জ্বলছে। রাত্রে আমি একটুও ঘুমাইনি, সব ছেলে মেয়েদের লেপের নীচে শুইয়ে গেলাম। কাউকে চলাফেরা করতে দেইনি। রাত ২-৩টার দিকে তিন জন ছাত্র এসে আমার ঘরে ঢুকলো। একটা ছাত্র আমাকে বিপদে ফেলতে শুরু করলো। যখন গুলির বড়ো বড়ো আওয়াজ হত তখনই সে চিৎকার করে উঠত। আর দুই জন ছেলেকে নিয়ে আমি মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধে দিলাম আর যেন সে কোন চিৎকার করতে না পারে। বেশ কিছুক্ষণ পর তাকে অনেক বোঝানোর পর সে চিৎকার করা বন্ধ করল। যখন ভোর হয়ে গেছে, আমি ঘরের জানালা দিয়ে দেখলাম বেশ কিছু মিলিটারী ছাদে উঠে গেছে। উঠে কোথায় কি আছে না আছে সব কিছু খুঁজছে। যেখানে মানুষজন পাচ্ছে তাদের টেনে টেনে আনছে। এনে লাইন করে দাঁড় করাচ্ছে। পূর্বদিকে মুখ করে লাইন করছে। সামনে মিলিটারী দাঁড়ানো এবং চারিদিকে মিলিটারী ঘুরছে। ছাদের উপর লাইন করছে কিন্তু ছাদের এতো কিনারায় যেন সবাই নিচে পড়ে যায়। সেখান থেকে একটা ছেলে লাফ দিয়ে পড়ে গেল। নাম রণদা। তারপর তাকে গুলি করা হলো। তিন তিন জন করে লাইন দিয়ে হাত উচু করে তাদের গুলি করা হলো। ঘর থেকে আমি কোন আওয়াজ পাইনি। যখন পিছনের দিকে গুলি করছিল তখন রণদা পিছন থেকে লাফ দিয়ে নীচেই পড়ে। লাফ দেওয়ার সাথেই একজন মিলিটারী ছাদের কিনারে গিয়ে তাকে গুলি করে। সে গুলি লেগেছিল রণদার। ২৭ তারিখ আমি রক্ত পেয়েছিলাম সেখানটায়। ২৬ তারিখ দুপুরের দিকে ছাদের উপরে যাদেরকে গুলি করেছিল, সুরেশ দাশ বলে এক ছাত্র ছিল, এম.এড. পড়তো, সেও ওই লাইনে ছিল। তার গুলি লেগেছিল গলায়, অনেকক্ষণ তিনি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। তখন দেখলেন ছাদে কোন মিলিটারী নেই তখন তিনি নীচে নেমে আসেন। দোতলা পর্যন্ত নেমে এলেন তারপর দোতলার বাথরুমের ভাঙা জানালা দিয়ে জলের পাইপ বেয়ে নীচে নেমে আসেন বাগানে, তারপর বাগানের গাছের ভিতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে আমার ঘরের ভিতরে এলো। আমার ঘরের সামনে এসেই আমাকে ডাকতে আরম্ভ করলো। আমি দেখলাম যে তার জামা-গেঞ্জি রক্তে মাখা। আমি তাকে ঘরে নিয়ে এলাম, জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কোথায় ছিলেন?" তিনি বললেন, "আমাকে ছাদের লাইনে গুলি করেছে।" এতোটাই রক্ত তার ঝরছে যে আমি প্রথমে তা লক্ষ্য করেনি। তখন আমাদের একটা পানের দোকান ছিল। দোকানের সমস্ত মালপত্র ঘরেই ছিল। সেখানে

সালফারডাইজিন সহ বিভিন্ন ধরনের ওষুধ ছিল, অনেক খোঁজাখুজি করে বের করে নিয়ে তাকে দিলাম। বললাম, "দেখুন কোনটা দিলে আপনার উপকার হবে।" নিজে নিজে খুঁজে একটা ওষুধ বের করে তিনি বললেন, "এটাই আমার ভালো হবে।" যখন দেখলাম সমস্ত জায়গা থেকে খুঁজে খুঁজে এনে ছাদের উপরে গুলি করল তখন ভাবলাম আমাদের আর বাঁচা হবে না। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, সারারাত ছেলেমেয়ে নিয়ে কিছুই খেতে চাইনি, এখন তুমি আমাদের চা করে খাওয়াও। ঘরের ভিতর কল ছিল, কল থেকে জল নিয়ে খুব আস্তে আস্তে চা করল। বিস্কুট ছিল, বিস্কুট দিল, সবাই চা-বিস্কুট খেলাম।

২৭ তারিখ যখন কারফিউ ছেড়ে দিল তখন আমার ঘর থেকে বের হয়ে চারিদিকে দেখছি। আমি সরাসরি বের হয়ে উত্তর বাড়ির দিকে ঢুকলাম। প্রথমে দুখীরামের ঘরের ভিতর ঢুকলাম, ঢুকে দেখি দুখীরাম পিছনে একটা চৌকির উপরে শোয়া, হাত-পা, মুখ সব পোড়া। দেখে মাথাটা ঘুরে গেল। কিছুক্ষণ পর আমি ঘর থেকে বের হয়ে আসি, এসে একতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত দেখলাম। দেখি দোতলার বারান্দায় ফোঁটা ফোঁটা রক্ত, পা ফেলবার জায়গা নেই। ৭৫ নং ঘর, ঘরটার সামনে বাগান। ঘরটা দোতলায়। ঘরটার সামনে বাগানে ঘাসের উপর এক ইঞ্চি পরিমাণ পুরু রক্ত বেশ কিছু জায়গায়। তার উল্টা দিকে পুকুরের কাছে একটা গর্ত আছে সেখানেই এরকম রক্ত জমানো আছে। এসব দেখে আবার সাইকেল নিয়ে বেরোলাম স্যারদের বাসায় বাসায় খোঁজ নিতে। প্রথমে গেলাম যতীন ঘোষের বাসায়, তারপর গেলাম ডাক্তার সাহেবের বাসায়। তারপর গোবিন্দবাবু, গোপালবাবু, পরেশবাবু, প্রশান্তবাবুর বাসায় গেলাম। সবাইকে জাগালাম। যতীনবাবুর মেয়ের গুলি লেগেছে। মেয়েকে নিয়ে হাসপাতালে আছেন তিনি। ডাক্তারসাহেবের কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না, হয়তো তিনি মারা গেছেন। সন্তোষবাবুর বাড়িরটা একটু ভিতরদিকে, তিনি এতোটা অনুভব করেনি। গুলিগোলার আওয়াজ পেয়েছেন যথেষ্ট। আমি গিয়ে দেখি উনি স্নান করে গামছা পরে বের হয়েছেন মাত্র, তখনই আমি গেছি। গিয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। উনি বললেন, "বলিস কিরে, এই সময়ের মধ্যে এতো ঘটনা ঘটে গেল, এখন কি করবি?" আমি বললাম, "আমি বলতে পারি না। সামনে আরও কি কি হবে না হবে তাও জানি না। আপনারা যার যার খুশি মতো কাজ করুন।" এ কথা বলে আমি তার ওখান থেকে চলে এলাম। আমার ভাগিনা ছিল একটা, এখানে ক্যান্টিনে ঘুমাতো, সময়ে সময়ে ক্যান্টিনে কাজ করতো। ওর কথা হঠাৎ মনে হয়ে গেল যে ওরে কোথাও দেখলাম না! মহল্লায় ফিরে এসে সবাইকে জিজ্ঞাসা করলাম আমার সেই ভাগনে সুশীলের কথা। কেউ কেউ বলল— আমরা ঠিক বলতে পারি না। সকালবেলা আমাদের সঙ্গে সে এখানেই ছিল। কোথায় সে গেছে আমরা ঠিক বলতে পারি না, তবে মেডিকেল খোঁজ করে দেখতে পারেন। সেখানে

আমাদের অনেক লোকজন আছে। গেলাম মেডিকেল, সেখানে এক ঘণ্টা-দেড় ঘণ্টা খুঁজলাম। কিন্তু কোন খোঁজ পেলাম না, ফিরে এলাম। ফিরে যখন হলে ঢুকলাম, পুকুরের কোণায় একটা লন্ড্রি ছিল সেখানে আসতেই একটা আওয়াজ পেলাম, গুলির আওয়াজ। তখন দেখলাম ইউনিভার্সিটির একটা বড়ো গুদাম আছে সেখান থেকে একটা লোক দৌড়ে উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। গুদামের পশ্চিম কোণে একটি সেগুন গাছ ছিল, সেগুন গাছটির কাছে গিয়ে লোকটি পড়ে গেল। বুঝলাম লোকটিকে গুলি করেছে। আমি ঐখানে একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলাম, তার পিছনে পিছনে আরও একটি লোক ছুটে গেল। ঐ লোকটা সেখানে মারা গেল। দেখে আমি সঙ্গে সঙ্গে বাসায় গেলাম। আমি বাসায় গিয়া দেখি আমাদের নেওয়ার জন্য দুইজন লোক, ডি জি অফিসে চাকুরী করত একজনের নাম সন্তোষ সরকার আর একজনের নাম কাজী আবদুর রব বসে আছেন। তারা বললে, এখানে তুমি থাকতে পারবে না তুমি আমাদের সাথে চল। তাদের সাথে আমি হাজিসাহেবের বাড়ি চলে গেলাম।

২৭ তারিখ যখন মাঠে গেছি, তখন দেখলাম ছোট একটা গর্ত খুঁড়ে সবাইকে পুঁতে রেখেছে। আমার তখন মাথার ঠিক নেই। যে ভাগনেকে খুঁজছিলাম তাকে পাইনি, সে মারা গেছে। জগন্নাথ হল মাঠে সে শহীদ হয়েছিল। লাশ টানার কাজে নাকি সে ছিল। লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায় তাকে গুলি করে। দেববাবুর বাসার সামনে স্টাফ কোয়ার্টার ছিল। দোতলা-তেতলায় যারা ছিলেন তারা হয়তো সবই দেখেছেন সেদিন পাক-বাহিনীরা সেই বীভৎসতা। তাদের কাছ থেকে শুনেছি দেববাবুর ডেড-বডি নাকি বিছানার পাশে পাওয়া গেছে। দরজা বন্ধ ছিল, দরজা ভেঙে ডেডবডি আনার জন্য ঢুকতে হয়েছিল। জানালা দিয়ে তাকে গুলি করে। তার একটি বিবাহিতা পালিতা কন্যা ছিল। নাম রোকেয়া সুলতানা। তার দুটো বাচ্চা। তার স্বামী বলল, ''আমরা মুসলমান, আমাদের কিছুই হবে না।'' কিন্তু দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাইরে এনে গুলি করে। রোকেয়া সুলতানা তখন ঐ বাসাতে, তার সঙ্গে নাকি পাক-সেনাদের অনেক কথা কাটাকাটি হয়েছে। ড. দেবকে গুলি করার পর ওই অল্প একটু জায়গার মধ্যে রক্ত পড়েছিল। আমি ২৭ তারিখ নয়টার দিকে তার বাসায় যাই। যেয়ে দেখি বাসা খালি, দরজা খোলা। ঘরের ভিতরে একটা টেবিলের উপরে তালা ছিল ঐ তালা দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিই। কারণ খোলা ঘর লুট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যদিও তখন তার ঘর লুট হয়ে গেছে। ঘরের মূল্যবান আসবাব যেমন সেলাই মেশিন ইত্যাদি আর্মিরা নিয়ে গেছে।

ড. রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর

প্রাক্তন প্রাধ্যক্ষ
জগন্নাথ হল

১৯৭১ সনের মার্চ মাস, তখন মুজিবর রহমান সাহেবের কথায় ইউনিভারসিটির সবাই একত্রিত হয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে চলছিল স্ট্রাইক। আমরা হলের ভিতরে খাদ্য মজুত করছিলাম, যাতে না খেয়ে মরতে না হয়। তারপরেই তো শুরু ১৯৭১ সনের সেই ভয়াবহতা, যেদিন পাক-সৈন্য আক্রমণ করল বাঙালি ব্যারাক। তার কিঞ্চিৎ পূর্বভাসে বাংলার দামাল সন্তান মুক্তি ফৌজে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ব্যারিকেড সৃষ্টি করছিল আপামর জনসাধারণ, বড়ে বড়ো রাস্তায় গাছ কেটে রেখে ট্রাক-লরি যাতে আসতে না পারে তার ব্যবস্থা করছিল। কিন্তু তবুও তো হঠাৎ আক্রমণ হয়, আর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থলই ছিল জগন্নাথ হল। পাক-বাহিনীর ধারণা ছিল সমস্ত ছাত্র একত্রিত হয়ে আক্রমণ চালাবে এখান থেকে। পূর্বদিকের রাস্তায় এসে পাক সৈন্য সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে, কোনো হুশিয়ারী ছাড়াই শুরু করল কামান ছোঁড়া। যতরকম সাঁজোয়া যান ছিল ওদের, সমস্ত গাড়ি থেকে শুরু করল গুলি ছোঁড়া। তখন আমি ছিলাম হাউজ টিউটর কোয়ার্টার্সের তিন তলায়। এই দালান থেকে হলের ভিতরে সব দেখা যেত। সেখান থেকে দেখলাম জগন্নাথ হলের উত্তর বাড়ির দিকে সমস্ত গুলিগুলো পড়ছে। বহু পরিচিত লোক মারা গেল। সব নাম এই অপ্রস্তুত অবস্থায় স্মরণ করা মুশকিল। আশেপাশের বহু শিক্ষকও নিহত হলো। যখন দেখলাম আর কোনো উপায় নেই, তখন আমি আমার দরজায় তালা দিয়ে ভিতরে কোনক্রমে ঢুকে পালিয়েছিলাম। বারান্দার নীচে শুয়ে ছিলাম এক রাত্রি। পাক সৈন্য এসে আমার দরজার বাইরে থেকে তালা দেখে বলল, ''এ শালা, আদমি ভাগ গিয়া।'' এ কথা বলতে বলতে তারা নেমে যায় সেটা টের পাই। তারপর আর কিছু টের পাই না, পরের দিনও এভাবে গেল। পরের দিন যখন কারফিউ উঠিয়ে নিল, তখন চলে আসি ঢাকারই এক কোণে। সেখান থেকে নদী পার হয়ে পালাই। বহু গ্রাম ঘুরে ঘুরে কাটে কয়েক মাস। তারপর একজন বড়ো পলিটিক্যাল লিডার শওকত আলী, যখন বহু ফৌজ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল তার গাড়িতে চড়ে পালিয়ে যাই আসাম।

এখন শুধু মনে হয়, ভগবান হোক আর ভাগ্যই হোক, বাইরে থেকে তালা দেওয়ার হঠাৎ বুদ্ধিটা মাথায় এনেই বাঁচিয়ে দিয়েছে আমাকে সেই বিভীষিকাময় রাত্রে। তালাটা দিয়ে আমার মনে হয় ভুল হয়েছে কিন্তু সেই ভুলটাই যে কত বড়ো শুদ্ধে পরিণত হয়। বাইরে থেকে তালা দিয়ে আমি ভিতরে ঢুকলাম কিন্তু দরজায় ছিটকিনি ফেলিনি। দরজায় ফাঁক ছিল। আমরা অন্য ঘর থেকে লক্ষ্য করলাম পাক-সৈন্য প্রথমে এসে দরজার ফাঁক

দিয়ে ভেতরে দেখল কিন্তু সমস্ত স্বাভাবিক দেখে তারা ফিরে গেল। ছিটকিনি দিতে আমার মনে ছিল না। কিন্তু এই মনে না থাকা ভুলটাই আবারও শুদ্ধিতে পরিণত হল। যদি ঘরে ছিটকিনি দেওয়া থাকতো তবে ওরা বুঝতে পারতো ঘরে লোক আছে। তালা ভেঙে তবে ওরা ঘরে ঢুকতো, আর.জি.সি দেব, অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, জ্যোর্তিময় গুহ ঠাকুরতার মতো আমারও সেই রাতে শেষ রাত হতো এই সুন্দর পৃথিবীতে। স্মৃতিতে তাই আজ সেই সব দিনের কথা ভেসে উঠলে মনে পড়ে স্বর্গীয় সহযোদ্ধাদের কথা। অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য তিনি এ্যাসিট্যান্ট হাউজ টিউটর ছিলেন। তাকে পাক-সৈন্য গুলি করে। তবে আমি তাদের মৃত দেহই দেখিনি। ড. জি.সি. দেবের এক পালিতা কন্যা ছিল নাম রোকেয়া, পরে আমি তার মুখে শুনেছি ড. দেবের ঘরে তখন পাক বাহিনী ঢোকে তখন এক ক্যাপ্টেন ঢুকেই প্রথমে রোকেয়ার স্বামীকে ধরে গুলি করে বুকের মধ্যে। তারপর তারা ভিতরে গেলেন, ড. দেব যেখানে ছিলেন সেখানে। তাকে সেখানেই তারা গুলি করে, পরে পায়ে মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে জগন্নাথ হল মাঠের মধ্যে নিয়ে যায়। জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে বাইরে ডেকে নিয়ে ওরা গুলি করে। গুলিটা তার কণ্ঠনালী ভেদ করে বেরিয়ে যায়, ফলে তার বেঁচে থাকা সম্ভব হলো না। হাসপাতালে চারদিনই মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি পাঞ্জা লড়ে তিনি মারা যান। পরে অবশ্য এসব কথা তার স্ত্রীর মুখ থেকে শোনা। তাকে যে জায়গায় কবর দেওয়া হয়েছিল সেই জায়গাটা আমি দেখেছি। রাত্রে শব্দ পেয়েছি জগন্নাথ হলের মাঠে কবর খোড়ার। পেট পর্যন্ত হয়তো বা বুক পর্যন্ত মাটি খুড়েছে, তারপর মৃতদেহগুলো সেই গর্তে ঢেলে ফেলে মাটি চাপা দিয়েছে। ৫৬টি মৃত দেহ গুনেছিলাম জানালা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে। তারপরের দিন কবর দিয়ে ওরা চলে গেল। মৃতদেহ মাঠে নেই বটে কিন্তু অতটুকু গর্তে এতগুলো মৃতদেহর স্থান সঙ্কুলান হয়নি ফলে কারও হাত, কারও পা, কারও কাপড়ের একটু অংশ জানান দিচ্ছিল,— 'এই তোমরা দেখ, আমার অনেকগুলো মানুষ একত্রে এখানে চির নিদ্রায় শায়িত।' কালীরঞ্জন। শীলকে লাশের সঙ্গে শুয়ে পড়তে দেখেছি। তারপর সুযোগ বুঝে যখন কোন লোকজন নেই চারিদিকে, কোথাও তখন উঠে পালিয়ে যেতে দেখেছি। নর্থ হাউজের ছাদের উপর কতগুলো ছাত্র লুকিয়ে ছিল। তাদের সেখান থেকে খুঁজে বের করে সারি দিয়ে গুলি করে। তাদের মধ্যে তখন কয়েকজন জীবিত। লোকজন দিয়ে সমস্ত আহত এবং নিহত ছাত্রদের ছাদ থেকে নামিয়ে নিয়ে এলো মাঠে। তারপর তাদেরকে গুলি করে। তাদের মধ্যে একজন দারোয়ান ছিল খুব লম্বা, প্রিয়লাল। তাকে গুলি করে প্রথমেই মারে।

ড. অজয় রায়
প্রফেসর, পদার্থবিদ্যা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক অজয় রায় ২৭শে মার্চ জগন্নাথ হলে এসেছিলেন। তিনি দেখেছেন বীভৎস দৃশ্য, গণ সমাধি, নিহত বিকৃত লাশ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জগন্নাথ হলের চিত্র— তাঁর নিজের রচনা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তৈরী করা হয়েছে।

২৬শে মার্চ সারাদিন গুলিগোলা চলল। গৃহবন্দী সমগ্র ঢাকাবাসী। দূরে এস.এম.হল, ইকবাল হল ও জগন্নাথ হল থেকে কালো ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু এত নিরাশার মধ্যেও আশার আলোর ঝলকানি বয়ে আনলো 'আকাশবাণী।' আকাশবাণী জানায় : পূর্ব পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। ঢাকার আশে পাশে, চট্টগ্রাম, রংপুর, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, যশোর এলাকায় পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে বাঙালী মুক্তি ফৌজের যুদ্ধ চলছে। রাত্রে বিবিসি ও ভয়েস অফ আমেরিকাও শোনালো একই বার্তা। এত ভয়ংকর পরিস্থিতিতেও চিত্ত আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল, আশ্বস্ত হলাম, না, বাঙালী রুখে দাঁড়িয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ, আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

পরের দিন ২৭শে মার্চ। কয়েক ঘন্টার জন্য সান্ধ্য আইন শিথিল। ছুটে বেরিয়ে পড়লাম পরিচিতজনদের খোঁজে। আমি ২৭শে মার্চ সকালবেলা জগন্নাথ হলে ঢুকি। আমার একজন সহকর্মী সঙ্গে ছিলেন। নাম রফিকুল্লাহ সাহেব। জগন্নাথ হলে দুই ট্রাক মিলিটারী দেখে আমরা ব্রিটিশ কাউন্সিলের ওখানে গিয়ে ঢুকলাম। সেখান থেকে ওরা আমাদের দেখতে পাচ্ছিল না। মিলিটারী চলে গেলে আবার আমরা জগন্নাথ হলে ঢুকলাম। জগন্নাথ হলের অবস্থা ব্যাখ্যা করা কঠিন। এটা একটা বীভৎস দৃশ্য। কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে দেখি নাই তবে এটা দেখে মনে হলো যে, যুদ্ধক্ষেত্র কাকে বলে তার একটা পরিচয় পাওয়া গেল।

প্রথমেই গেলাম জগন্নাথ হলে আমার ছোট ভাইয়ের খবরের জন্য। সারা হল এলাকা জনশূন্য, হল-ভবনগুলি বিধ্বস্ত, অগ্নিদগ্ধ, রক্তাপ্লুত। নরমেধযজ্ঞের সাক্ষাৎ হিসেবে তখনও সিঁড়িতে, ছাদে, বিভিন্ন কক্ষে এখানে-সেখানে পড়ে রয়েছে গুলিবিদ্ধ, বেয়োনেট বিদ্ধ অসংখ্য ছাত্রের লাশ। রক্ত, মৃতদেহ আর বারুদের গন্ধে বাতাস ভারী। নিঃশ্বাস নিতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। সামনে বিশাল মাঠের এক পাশে দেখলাম সদ্য খোদিত এক বিশাল গণ সমাধি- অনেকেরই হাত-পা তখনও বেরিয়ে রয়েছে। কেমন একটা আচ্ছন্ন ও মোহগ্রস্থতার মধ্য দিয়ে পায়ে পায়ে সন্তর্পণে উঠে এলাম উত্তর ভবনের দোতলায়,

ছোট ভাইয়ের কক্ষে। সারা ঘর বিপর্যস্ত, রক্তাক্ত। কিন্তু মৃতদেহের কোন সন্ধান পেলাম না। বুঝতে কষ্ট হলো না, অনেকের সাথে সেও ওই গণকবরে শায়িত। এরপর আমি উত্তর দিকে গেলাম। সেখানে দক্ষিণ বাড়ির দারোয়ান মাখনের সাথে আমার প্রথম দেখা হলো। একটা জীবিত মানুষ প্রথম আমি দেখলাম।

তারপর আমি গোপালবাবুর বাসায় গেলাম। তিনি জগন্নাথ হলের আবাসিক শিক্ষক। তাঁর একেবারে বিধ্বস্ত অবস্থা। সবাইকে খুঁজলাম। গোপালবাবু আমাকে বলে 'কি করব?' আমি বললাম যে, "এখানে তো আর থাকা যাবে না। আপনি আমাদের টিচারদের পাড়াতে চলে যান।" আমাদের তখন ভাবনাই হয়নি যে ওখান থেকে আমাদেরও চলে যেতে হবে।

আমি দোতলায় উঠলাম। ঠিক দোতলায় উঠার মুখেই একটা ডেড-বডি দেখলাম। একেবারে বেয়োনেট দিয়ে মারা। সে দৃশ্য এখনও মনে আছে। ছেলেটি লুঙ্গি পরা, গেঞ্জি ছিল। কিন্তু রক্তে কালো হয়ে গেছে তার পোশাক, আর রক্তের ধারাটা নিচে নেমে গেছে এক বিরাট স্রোতের মতো। এটি ঠিক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর মহাশয়ের দরজার সাথে লাগানো। ঘোষ ঠাকুরের বাসায় ওঠার আগেই ঘোষ ঠাকুর মশাইকে দেখা যাচ্ছিল। সাদা চেহারা কিন্তু বিবর্ণ। আমি ওখান থেকে বলার চেষ্টা করলাম যে, আপনারা কেমন আছেন। উনি এমন ইঙ্গিত দিলেন যা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। তিনি দরজা খুলে দিলেন, কিন্তু তার মুখ থেকে কোন কথা বেরোচ্ছে না। মনে হচ্ছিল যে সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ। আমি তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার জানা মতে হলে কিরকম ছাত্র আছে?" উনি বলেন, "আমি তো গিয়া দেখি নাই, গোপালবাবুও হলে ঢোকেন নাই। আমি ঠিক জানি না। তবে আমাদের হলের ছেলেরা তো বেশির ভাগই প্রাইভেট টিউশনি করে, সেজন্য অনেক ছাত্রই ছিল।" আসলে সেদিনই জগন্নাথ হলে বেশি ছাত্র ছিল। আর একটা অসুবিধা হলো যদিও এর আগের দিন রাত এগারোটায় নানা জায়গা থেকে হলে খবর পৌছে গেছে যে মিলিটারী আসবে, তবে হলের ছাত্ররা ব্যাপারটি অত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেনি। কারণ তারা মনে করেছে যে, হলে এলেও হয়তো সিরিয়াস কিছু হবে না। বেশি হলে কয়েকজন গ্রেপ্তার হতে পারে। এ কারণে ছাত্রদের অনেকেই হল ছেড়ে চলে যায়নি।

তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে আমি ড. দেবের বাড়িতে যাওয়ার চেষ্টা করি। পথেই হুদা সাহেবের বাসা। ওদের বাসায় গিয়ে স্যারের কাছে শুনলাম যে, বাসায় ঢুকে সব তছনছ করে ফেলেছে। সেখান থেকে বেরিয়ে আমি শিববাড়ির দিকে গেলাম। সেখানে যা দেখলাম তা অবর্ণনীয়। ওখনে আট/দশ জন লোক দেখলাম। জিজ্ঞাসা করলাম যে আর সকল কোথায়। কেউ বলল, " সব পালিয়েছে।" আবার বলল, "কিছু কিছু আছে আর সব মারা গেছে।" আমি ওখানে গিয়েছিলাম দুটি কারণে। ড. দেবের আর গুহ ঠাকুরতার খবর নেব। জিজ্ঞাসা করায় ওরা উত্তর দিল যে সকলকে মেরে ফেলেছে।

আবার কেউ বলল, সবাই পালিয়ে গেছে। এখান থেকে সঠিক খবর পেলাম না। ড. দেবের কথা বলল, ওদের সকলকে মেরে ফেলেছে। তারপর ড. দেবের বাসায় গিয়ে দেখলাম সবকিছু ভেঙে তছনছ করে ফেলেছে। জায়গায় জায়গায় গুলির দাগ। বুঝতে পারলাম যে বাসায় ব্রাশ ফায়ার করতে করতে ঢুকেছে। দরজায় যে লাথি মেরেছে, সেখানে বুটের ছাপগুলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। সেখান থেকে আমি ড. মফিজুল্লাহ্ কবির সাহেবের বাসায় গিয়ে দেখলাম যে, তিনি চলে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছেন। আবার পথে বের হলাম। পথে হাঁটতে হাঁটতে একজনের সাথে দেখা। সে বলল, ইন্নাস আলী সাহেব আহত হয়েছেন। ওনার বাসায় গিয়ে দেখলাম কেউ নেই, বাসার চাকরকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল সবাই হলিক্রস হাসপাতালে গেছে।

আব্দুল বারী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সলিমুল্লাহ হল
অফিসের কর্মচারী

আব্দুল বারী গণহত্যার পরবর্তী অবস্থার প্রত্যক্ষদর্শী। মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে তিনি খোঁজ করেছেন জগন্নাথ হলের ছাত্র হরিধন দাসকে। তার বর্ণনায় গণহত্যার পর জগন্নাথ হলের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা কেবল মর্মান্তিকই নয়, বিভীষিকাময়ও।

আমাদের বাড়ির পাশে র একটি ছেলে থাকতো জগন্নাথ হলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। নাম হরিধন দাস। পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র। আমি তার রুমে প্রায় আসা-যাওয়া করতাম। ২৬ তারিখ শুনলাম মিলিটারী গোলাগুলি করে সমস্ত হল ভেঙে ফেলেছে। এর আগে আমি তাকে বলেছি, চলো আমরা বাড়ি যাই। সে বলল, আমি এখন যেতে পারব না, আমি থাকব। আমি তাকে রেখেই বাড়িতে চলে গেলাম। তার বাবা-মা আমার কাছে এসে কান্নায় ভেঙে পড়লো। বলল— আর তো ঢাকায় কাউকে পেলাম না, আপনাকেই যেতে হবে। তখন আমি বললাম— ঠিক আছে, আমি যাব। আমি তখন তেইশ টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে রওনা হই। ফুলবাড়িয়া এসে যখন পৌঁছাই তখন দেখি অবস্থা বেশী ভালো নয়। আমি এসে জগন্নাথ হলে ঢুকলাম, ঢুকে দেখি চারদিকে শুধু মরা মানুষ। নর্দমার মধ্যে মানুষ পড়ে আছে, কুকুর-গরু মরে আছে। এসব দেখে ভাবলাম, যাকে খুঁজতে এসেছি তার অবস্থা না জানি কি!

জ্যোর্তিময় গুহঠাকুরতা, তার বাসায় আগে আসতাম। আমার এক ক্লাসমেইট ছিল সুধীর কুমার চক্রবর্তী। সন্তোষ ভট্টাচার্য ইতিহাসের শিক্ষক আমার ক্লাসমেইট সুধীর

চক্রবর্তীর ক্লাসমেইট। তিনি ছিলেন জগন্নাথ হলের গৃহশিক্ষক। এই হিসাবে আমি তাঁর রুমে আসতাম। এই ভদ্রলোকের রুমে বসে গল্প করতাম, এই সময় ছোট একটা বাচ্চা তার রুমে কাজ করত, বাচ্চার নামটা আমার মনে নেই। যখন হেঁটে আসছি তখন মেডিকেলের কাছে এসে দেখি একটা আমগাছ, সে গাছের একটা মাত্র ডাল আর কোন ডাল নেই। দেখি ঐ ছোট বাচ্চাটা আমগাছে ঝুলছে। বাচ্চাটা আমাকে দেখে কেঁদে ফেললো। সে আমাকে চিনতে পেরেছে। কেঁদে কেঁদেই বলল— বাবুকে মেরে ফেলেছে। তখন মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। তার কাছে বাড়ি যাওয়ার কোন টাকা-পয়সা নেই। আমার কাছে দুটাকা ছিল। তার থেকে একটা ভাঙিয়ে পাঁচ পয়সা দশ পয়সা করে দিলাম। বললাম তুই যেভাবে পারিস খেয়ে বাড়িতে যা। তার পর আমি এ্যাসেম্বলীর গেট দিয়ে জ্যোর্তিময়বাবুর বাসায় গেলাম। দেখলাম তিনি যে লুঙ্গিটা পরতেন সে লুঙ্গি টা ছেঁড়া, পড়ে আছে। তাঁদের রুমে ঢুকে দেখি রুমের জানালা-কপাট খোলা, কোন লোকজন নেই। সেখান থেকে গেলাম আমি উত্তর বাড়িতে। পুকুরের ওই কোনার রুমটায় থাকতো হরিধন। রুমের জানালায় গিয়ে দেখি যে রক্ত পিছনের দিক দিয়ে নীচে পড়েছে। আমি ভিতরে ঢুকলাম, কিছুদূর যাওয়ার পর দেখি একটা লোক পোড়া অবস্থায় পড়ে আছে। সে যে কে তা বোঝার কোন উপায় নাই। তারপর হরিধনের রুমে এসে ঢুকি, দেখি সে রুমের ভিতরে রক্ত এবং চারিদিকে রক্ত। তখন বাঁহাত দিয়ে রক্তগুলো দেখলাম যে হয়তো কাল অথবা আজকের কোন ঘটনা কিনা। পুকুরের ঘাটের কাছে একটা লোককে মরা অবস্থায় দেখলাম। কাছে গিয়ে চিনতে পারলাম— সে ছিল এখানকার দারোয়ান। তারপর যে দৃশ্য দেখলাম তার বর্ণনা করা কঠিন। মাঠের মধ্যে দেখলাম গণকবর। এই গণকবরের মধ্যে দেখলাম পাগুলো উপরে এবং মাথা নীচে রয়েছে, কোন কোন লোকের হাত দেখা যায়। বিশৃঙ্খল অবস্থায় বহু কিছু দেখলাম। শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম সেখান থেকে রক্তের স্রোত বয়ে গেছে। আমি যখন হলের ভিতরে আসি তখন একটা বিশ্রী গন্ধ পেয়েছিলাম। তখনও দেখি হলের মধ্যে চারিদিকে লেপ-তোশক পুড়ছে। এই বিশ্রী গন্ধের কারণে আমি বাড়িতে গিয়ে বমি করলাম। এখান থেকে বের হয়ে গেলাম এস.এম. হলের মধ্যে, সেখানে গিয়ে কোন লোককে দেখতে পেলাম না। তারপর আমি ভাবলাম হরিধনের কথা, সে মরল না বাঁচল, তার মা-বাবার কাছে কি জবাব দেব! এরপর গেলাম মেডিকেলের দিকে। মেডিকেলের দিকে যাওয়ার পথে শহীদ মিনারের সামনে এসে দেখা হলো এক হিন্দু ভদ্রলোকের সাথে। সে এখনো রেডিওতে গীতা পাঠ করে। এই ভদ্রলোকের কাছে কোন টাকা-পয়সা নেই, সে কি করে বাড়ি যাবে চিন্তা করছে। সে এই জগন্নাথ হলেরই ছাত্র। এই ভদ্রলোকের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, ছাত্রদের কোন খবর সে জানে কিনা, কিংবা হরিধনকে দেখেছে কিনা। সে বলল, কতগুলো লোক মেডিকেলে ভর্তি রয়েছে সেখানে

যেয়ে দেখতে পারেন। এই ভদ্রলোককে মেডিকেলের সামনে দাঁড় করিয়ে আমি মেডিকেলের ভিতর ঢুকলাম। মেডিকেলের দোতলায় যাওয়ার পর দেখা হল মেডিকেলের একজন ডাক্তার ছাত্রের সাথে। তার কাছে জিজ্ঞাসা করলাম হরিধনের কথা। সে বলল এখানে কিছু লোক ভর্তি আছে, একটু খুঁজে দেখেন পান কিনা। ১৯ নম্বর না যেন কত নম্বর ওয়ার্ডে যেয়ে পেলাম হরিধনকে। তাকে ডাক দিলাম, সে 'দাদা' বলে কেঁদে ফেলল। তখন আমি ভাবলাম তাকে কিভাবে নিয়ে যাই। সে বলল, "আমি যেতে পারব না। এখানে চিকিৎসায় আছি। বাড়িতে যেয়ে মাকে এসব বলবেন না। তাদের কাছে বলবেন আমি ভালো আছি। তারা যেন ঢাকা না আসেন।" আমি তারপর মাঝে মাঝে ঢাকায় এসে তাকে দেখা-শোনা করতাম।

মাহমুদ হাসান

প্রাক্তন সভাপতি

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ

২৮শে মার্চ তিনি ছুটে এসেছিলেন ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করতে। জগন্নাথ হলে নারকীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তিনি মুহ্যমান হয়ে যান। তার সাক্ষাৎকার ঢাকা শহরের সার্বিক অবস্থার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু এই গ্রন্থে কেবল মাত্র জগন্নাথ হলের বিষয়কে প্রাধান্য দেয়ায় তার সাক্ষাৎকারের সংশ্লিষ্ট অংশই তুলে দেয়া হল।

২৬শে মার্চ কারফিউ তুলে নেওয়া হলো আড়াই ঘন্টার জন্য। আমার গাড়ি ছিল, আর একটি মটর-সাইকেলও ছিল। আমি বুদ্ধি করে আমার সাইকেল নিয়ে আমার ছোট ভাইকে সাথে করে বেরিয়ে পড়ি দেখার জন্যে। জগন্নাথ হল পর্যন্ত পৌঁছাতে আমার কষ্ট হয়েছে। প্রত্যেকটি ব্যারিকেড এড়িয়ে মটর-সাইকেল কোন জায়গায় উঁচু করে নিয়ে, কোন জায়গায় চালিয়ে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দেখলাম থমথমে ভাব। আমার ভীষণ ভয় লাগল। লোকজনও কম, দু-একজন দেখা যায়। সবাই তো পালিয়ে গেছে। কেউ বাসার মধ্যে থাকলেও শব্দ নাই। সেখানে গিয়ে যা দেখলাম তা হৃদয় বিদারক। জগন্নাথ হলের প্রভোস্টের বাসার সামনে যে মাঠটা সেই মাঠের মধ্যে দেখলাম এক দৃশ্য। মনে হয় নতুন করে মাটি উঠানো হয়েছে। মানুষ চাপা দেওয়ার দৃশ্যটা আমাকে খুব বেশি মর্মাহত করেছে। মনে হলো এলোপাতাড়ি মাটি চাপা দেয়াতে কারো হাতের কব্জি পর্যন্ত বেরিয়ে আছে। কারও হাঁটু দেখা যাচ্ছে। কারও চুল, মাথা, কপাল ও কারও নাক দেখা যাচ্ছে। ঠিক এইভাবে ওরা মাটি চাপা দিয়ে চলে গেছে। অনেকক্ষণ হতভম্ব হয়ে

দাঁড়িয়ে থেকে আমি এটা দেখলাম। আমার মনে হয় আধ ঘন্টার মতো সময় পার হয়ে গেছে। আমার জ্ঞান হারিয়ে ফেলার মতো অবস্থা। এই ভাবে এই অত্যাচার! তারপর সেখান থেকে আমি চলে যাই।

গোপালচন্দ্র দে

বয়স-৪৫
কর্মচারী, প্রাধ্যক্ষের কার্যালয়
জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গোপালচন্দ্র দে তখন ছিলেন ড. জ্যোর্তিময় গুহঠাকুরতার গাড়ির ড্রাইভার। ২৬শে মার্চ তিনি ছিলেন বর্তমান শহীদ মিনারের উত্তর দিকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বাসভবন এলাকায়। সেখান হতে গোপালচন্দ্র দে গণহত্যার নৃশংস ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেন। গোপল চন্দ্র দে বর্ণিত পাক-বাহিনী অত্যাচারের বিবরণ মর্মস্পর্শী। ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার শেষ পরিণতি সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায় গোপাল চন্দ্র দে'র বর্ণনায়।

২৫শে মার্চ রাতে আমি ড. জ্যোর্তিময় গুহঠাকুরতা স্যারের বাসায় কর্মরত ছিলাম। এ সময় হল প্রায় খালিই ছিল। এই সময় মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং হয়েছিল এবং আমাদের কর্মচারীদেরও এই ট্রেনিং নিতে হয়েছে। এ সমস্ত ট্রেনিং আমাদের জগন্নাথ হল মাঠেই হয়েছিল। আমি ঐ দিন ট্রেনিং নিতে যাইনি। বিহারীদা অর্থাৎ রবির বাবা গিয়েছিলেন। আমার ওই দিন বাসায় কাজ থাকায় যাইনি। রাত যখন অনুমান ১২টা তখনই দেখলাম যে, রাস্তায় লোকজন বড়ো বড়ো গাছ এবং ইট-পাথর দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে, যাতে গাড়ি চলাচল করতে না পারে। আমি এবং স্যার (ড. জ্যোর্তিময় গুহঠাকুরতা— সম্পাদক) এগুলো দেখছি। এতে আমাদের হলের প্রায় ১০/১৫ জন ছাত্র ছিল। তারা রাস্তার উপর একটা বটগাছ ছিল, তা কেটে ফেলেছে এবং রাস্তায় ফেলে দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে ফেলেছে। এগুলো দেখে স্যার ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং হলের গেটে এসে সমস্ত দারোয়ানদের সাবধান থাকার নির্দেশ দিলেন। বর্তমানে জগন্নাথ হলের পূর্বদিকে ৫২ নং টিচারস কোয়ার্টারে তখন ৪র্থ তলার নির্মাণ কাজ চলছিল। স্যার থাকতেন এই ৫২ নং কোয়ার্টারের এক তলায়। স্যার আমাকে বললেন তাদের কোয়ার্টারের মেইন গেটে একটা তালা লাগাতে। তখনই তালা দিয়ে দিলাম। আমি তখন স্যারের বাসায় থাকতাম এবং স্যারের গাড়ির ড্রাইভার ছিলাম। গেটে তালা দেওয়া হলে আমি স্যারের অনুমতি নিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ি। স্যারের বাসায় তাঁর স্ত্রী এবং মেয়ে ছিল। কাজের জন্য

একটা মেয়েলোক ছিল, সেও এখনও থাকে। আমি যে রুমে থাকতাম তার পাশের রুমে ২/৩ জন লোক ছিল। রাত তখন অনুমান ২/৩টা বাজে, হঠাৎ শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। উঠে দেখি সমস্ত বাংলো মিলিটারীরা ঘিরে ফেলেছে। আমার পাশের রুমে একটা ছেলে ছিল বাংলা এ্যাকাডেমীর। আমি তাকে ডেকে তুলে জিজ্ঞাসা করলাম, "এ অবস্থায় কি করি?" সে তখন বলল, "ঘুমিয়ে পড়ো আর কি করার আছে।" তখন আমি আবার গিয়ে শুয়ে পড়ি কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে আমাকে তন্দ্রালু অবস্থা থেকে ডেকে উঠিয়ে বলল, "মিলিটারী এসে গেছে।" আমি তখন রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম মিলিটারী রাস্তার কাঠের গুড়ি সরিয়ে রাস্তা পরিস্কার করছে। স্যারের ঘরে গিয়ে দেখলাম স্যারের স্ত্রী এবং মেয়ে খুব তাড়াহুড়ো করছেন, কি করবেন। চারিদিকে খুব শব্দ হচ্ছে, বিল্ডিং-এর বহুজনকে মেরেছে। আমি পাশের বিল্ডিং-এ গিয়ে বললাম, "খোল খোল।" তারা খুলে দিলেন। কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, তিনতলার চার পাঁচজনকে রুমেই মেরেছে। কোন ডিপার্টমেন্টে চাকুরী করিতেন জানি না— মণিরুজ্জামান সাহেবকেও মেরেছে, তার ছোট বাচ্চারা কান্নাকাটি করছে। আমি উপর থেকে দেখি মিলিটারীরা স্যারের বাসার দরজায় লাথি মারছে এবং দরজা খোলার জন্যে বলছে। পিছনে একটা বটগাছ ছিল সেখান দিয়ে একটা মিলিটারী ঘরের মধ্যে ঢুকেছে। এমন সময় কাজের মেয়েলোকটা (নাম 'স্বর্ণ') এসে আমাকে বলল যে, "আমাকে একটু জল দে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে?" স্বর্ণ বলল, "বাবুকে মেরে ফেলেছে।" আসলে তখন ও হতাশ হয়ে গিয়েছিল ভয়ে। মিলিটারী ঘরে ঢোকার সময় ওর গায়ে ধাক্কা লেগেছে, ও দেখে নাই যে বাবুকে মেরে ফেলেছে। কিন্তু ভীতসন্ত্রস্ত স্বর্ণ বলেছে যে, "বাবুকে মেরে ফেলেছে, তুই আমাকে জল দে, খাব।" এর ঠিক দশ মিনিটের মধ্যেই দেখলাম গাড়ি ভর্তি সৈন্য ঘিরে ফেলেছে সমস্ত এলাকা এবং সমস্ত বাসায় বাসায় খুঁজে বের করেছে সবাইকে। আমি স্যারের ঘরে যাওয়ার সাথে সাথে স্যারের স্ত্রী আমাকে বলল, "তুমি এখান থেকে চলে যাও, তোমাকে দেখলে ওরা তোমাকেও মেরে ফেলবে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে?" তখন দিদিমণি বলেন, "তোমার স্যারকে তো ধরে নিয়ে গেছে, এখন এই রাত্রে আর কি করব, দেখি কালকে কি করা যায়। তুমি এখান থেকে চলে যাও। তিনতলার লোকজনদের মেডিকেলে পাঠাতে টেলিফোনে এ্যাম্বুলেন্সের কথা বলব, কিন্তু লাইন পাচ্ছি না।" স্যারের স্ত্রী বুঝতে পারেন নাই যে লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। তিনি ভেবেছিলেন এ্যাম্বুলেন্স এনে আহতদের সবাইকে হাসপাতালে পাঠাবেন। আমি বললাম যে সমস্ত টেলিফোন লাইন কেটে দিয়েছে। স্যারের স্ত্রী, আমার দিদিমণি বলেন, "তুমি গিয়ে স্বর্ণকে পাঠিয়ে দাও।" আমি উপরে গিয়ে স্বর্ণকে বললাম, "দিদিমণি তোমাকে ডাকছে, তুমি নীচে যাও।" স্বর্ণ নীচে দিদিমণির কাছে গেল। আমি তখন ওই কোয়ার্টারের পিছনে একটা পুকুর ছিল, সেই পুকুরের পাড়ে গিয়ে চিন্তা করছি—

কি হলো ? কি করব ? ইত্যাদি। এইভাবে পুকুরপাড় দিয়ে ঘরের দিকে গেছি এবং তখন আমার সাথের যে লোকটি ছিল তাকে আর দেখিনি। তখন লক্ষ্য করলাম যে সে মেডিকেলের রাস্তায় আর্মি ছিল না দেখেই লুঙ্গি পরা অবস্থায়ই রাস্তা পার হয়ে বাইরে চলে গেছে। আর্মি তখনও ঐ রাস্তায় যায়নি, এই সুযোগে লুঙ্গিটাকে কাছা বেঁধে এক দৌড়ে সে মেডিকেলের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। আমি তখন একা একা দাঁড়িয়ে ভাবছি প্রায় ১০/১৫ মিনিট, আর একটা তামাশা দেখছি যে আগুনের গোলাগুলি সবই আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। এমন সময় দিদিমণি আমাকে ডাকলেন, "গোপাল তাড়াতাড়ি আস, বাবুকে রেখে গেছে।" আমি যাওয়ার পরে শুনলাম যে বাবুকে গুলি করে রেখে গেছে ঘরের পিছনে। প্রফেসর রাজ্জাক এসে বলেছেন। দিদিমণি জানতেন না এই কথা। রাজ্জাক স্যারও এই কোয়ার্টারে থাকেন, তিনি দেখে এসে দিদিমণিকে বলেছেন যে, স্যারকে গুলি করে রেখে গেছে কোয়ার্টারের পিছনে। আমি, স্যারের মেয়ে দোলা, সবাই গিয়ে দেখি যে স্যার পড়ে আছেন তখনও তাঁর জ্ঞান ছিল। দেখলাম যে দুটো গুলি লেগেছে এবং ভারী মানুষ পড়ে আছেন। আমরা যাবার পর স্যার তাঁর স্ত্রীকে বললেন, "বাসন্তী, তোমাকে ডাকলাম এতক্ষণ শোননি ?" দিদিমণি বললেন, "আমাকে ডেকেছো শুনিনি। চারদিকে গুলির শব্দে কিছু শোনা যায় না।" আমরা সকলে ধরাধরি করে আনতে চেষ্টা করলাম স্যারকে। কিন্তু ভীষণ ভারী মানুষ এবং গা ছেড়ে দিয়েছেন তাই আনতে পারছিলাম না। বর্তমানে ৩৪ নং কোয়ার্টারের ঠিক সামনেই স্যারকে গুলি করে ফেলে রেখেছিলো ওরা। আমরা ওনাকে বাসায় আনার জন্য একখানা খাট নিয়ে গেলাম, কিন্তু তাতেও উঠাতে পারি না। এইভাবে আমি যখন বাইরে গিয়েছি তখন দেখেছি মণিরুজ্জামান সাহেব এবং তার ভাইকে গুলি করে মেরে দিয়েছে, বাচ্চাগুলি কান্নাকাটি করছে। রক্তে সমস্ত মোজাইক করা বাইরের জায়গাটুকু লাল হয়ে গেছে। সিঁড়ির কাছে একটা ছেলে গুলি খেয়ে পড়ে আছে। বেঁচে আছে তখনও, 'পানি' 'পানি' করছে। আমাদের এই অবস্থাতেও দিদিমণি বলল, "স্বর্ণ! একটু পানি দাও তো ওকে"। স্বর্ণ জল এনে দিলে পরে মারা গেল ছেলেটা। স্যারকে খাটেও যখন আনতে পারলাম না তখন বহু কষ্টে হাঁটাহাটি করে ঘরে এনে শুইয়ে দিলাম। দিদিমণি জিজ্ঞাসা করলেন, "মাথা ঠিক আছে তোমার ?" তখন স্যার বললেন, "মাথা ঠিক আছে, ডাক্তার ডাকো।" ডাক্তার পাবো কোথায়— গুলি চলছে সমানে চারিদিকে। স্যারের গলা হতে গুলিটা বের হয়ে গিয়েছিল কিনা আমরা কেউ লক্ষ্য করিনি। গুলিটা আসলে ছিল, বের হয়ে যায়নি। এমতাবস্থায় দেখলাম যে রক্ত বের হয়ে যাচ্ছে, ডাক্তার না পেয়ে ঘরের ফ্রিজ থেকে বরফ এনে দিতে থাকলাম। কিন্তু গুলিটা কেউ লক্ষ্য করেনি। স্যারের পাজামা-পাঞ্জাবী খুলে দিলাম, সে রাতটা তো গেল। এরপর স্যার আর দিদিমণি আমাকে বললেন যে, "গোপাল তুমি থেকো না এখানে, তোমাকে ওরা মেরে ফেলবে, তুমি সরে যাও।" আমি তখন ওই

পুকুরপাড়ে আমগাছের কাছে দাঁড়িয়ে ভাবছি যে, কোথায় যাব। চারিদিকে শুধু গুলির আওয়াজ। আমি আর কোথাও যাইনি। পরের দিন সকাল ৭/৮টার দিকে এসে দেখি যে স্যারের জ্ঞান আছে। দিদিমণি বললেন, ''দেখ, ডাক্তার ডাকা যায় কিনা।'' আমি তখনও বলছি— ''গুলি চলছে কোথায় বের হব ডাক্তার আনতে''? তখন স্বর্ণ কাঁদছে, আমাকে বলল, 'আবার মিলিটারি আসছে' আমি বাথরুমে যেয়ে লুকিয়ে থাকলাম। মিলিটারী আবার এলো চেক করতে। পাঁচ-সাতজন মিলিটারি এলো সাথে আমাদের জগন্নাথ হলের কে যেন ছিল, তা আমি ঠিক মনে করতে পাচ্ছি না। কারোর পরনে লুঙ্গি, পাজামা, শার্ট ইত্যাদি। ওদের নিয়ে চার তলায় গেল, লাশ টানার জন্যে ওদের নিয়ে এসেছে। আমি তখন আরও ভয় পেয়ে গেলাম। দিদিমণিকে বললাম বাইরে বের করে দেওয়ার জন্যে। আমি আবার বাইরে গিয়ে পুকুরপাড়ে ওই আমগাছ তলায় চুপ করে বসে থাকলাম। আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, চারিদিকে ঘেরাও করা। প্রায় বারোটার দিকে দেখলাম শহীদ মিনারে ডিনামাইট ফিট করেছে এবং উড়িয়ে দেবে শহীদ মিনার। শহীদ মিনারের পাশে কাচের ঘরগুলিতে যে লোকজন ছিল তাদেরকেও তারা মেরে ফেলল, সম্ভাবত ৩/৪ জনকে। তবে তাদের মধ্যে একজন, মিলিটারী যখন লাথি মেরে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছে এবং ভেঙে ফেলার সাথে সাথে এমন জোরে দৌড় দিল এবং দৌড়ে আমাদের কাছে পুকুরপাড়ে এসে চুপচাপ বসে পড়ল, কোন নড়াচড়া নেই। আমি যখন দেখলাম শহীদ মিনারের চারিদিকে ওদেরকে মারলো তখন ভাবলাম যে, আমাদেরও রক্ষা নেই, মেরে ফেলবেই আমাদেরও। এর মধ্যেই বিকট আওয়াজে শহীদ মিনার ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গেল। আমি তখন দেখলাম যে, আমরা যেখানে লুকিয়ে আছি ঠিক তার ২০/৩০ হাত দূরে একজনের হাতে গুলির বাক্স আর অপরজনের হাতে মেশিনগান। তখন পুকুরের মধ্যে কোন জল না থাকায় পুকুরের মধ্যে ওদের চোখ এড়িয়ে নেমে সেখানে মরার মতো শুয়ে থাকলাম আমরা তিনজন। দারোয়ান, আমি এবং শহীদ মিনার থেকে পালিয়ে আসা লোকটা। সেখান দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় ঐ গুলির বাক্স হাতে মিলিটারী বলল, ''চল চল ইধার কৈ নেহি হ্যায়।'' ঐ পুকুরের মধ্যেই থাকলাম। এক রাত্রি কোন খাবার নেই এবং খাবার জলও ছিল না আমাদের। কি করব, ভয়ে সব কোথায় যে গিয়েছিল তা জানি না। আমরা তিনজন যুক্তি করলাম সমস্ত রাত্রি কি করা যায়, এভাবে সেই রাত্রি শেষ হয়ে গেল। তারপর ২৭ শে মার্চ সকাল ৮টা বা ৯টার সময় সবাই চলে এসেছে, কারণ কারফিউ কিছু সময়ের জন্য স্থগিত করা হয়েছিল। আমরা কোন খবরাদি পাইনি, হয়তো রেডিওতে ঘোষণা হয়েছিল বলে লোকজন দেখা গেল। আমি দেখলাম কিছু লোক আসলো বাসায়, তখন আমিও উঠে বাসায় গেলাম। কোথা থেকে লোকজন আসল তা বলতে পারব না, স্যারকে নিয়ে গেল মেডিকেলে। মেডিকেলের ডাক্তাররা বলল যে, ''আমাদের এখানে কোন খাবার এবং জল সরবরাহ

করতে পারব না। যদি পারেন তো কিছু খাবার নিয়ে আসবেন।" বাসা থেকে আমরা কিছু চাল-ডাল মেডিকেলে ডাক্তারদের কাছে পৌঁছে দিলাম। এরপর ঠিক দুঘন্টা পরে যে সমস্ত ডেডবডি আসতে লাগল তা দেখে আমি আর মাথা ঠিক রাখতে পারলাম না। কারও হয়তো চোখ নেই, কান নেই বা কারও মুখ নেই— একেবারে বীভৎস দৃশ্য মেডিকেলে। ঠেলাগাড়ি, রিক্সা, ভ্যানগাড়ি যে যেভাবে পারে নিয়ে এসেছে মেডিকেলে। আমি তখন মানুষের এই বীভৎস রূপ দেখে দিশাহারা, বললাম, "আমি আর টিকতে পাচ্ছি না, চলে যাব।" স্যারকে সর্বদাই আমি বাবু বলতাম। বাবু আমাকে বললেন, "গোপাল তুমি আমাকে ফেলে যেয়ো না।" আমি দেখলাম বাবু এখনো কথা বলছে। আমি বললাম, "আমি আপনাকে ফেলে যাব না ঠিকই কিন্তু আমি আর টিকতে পারছি না বাবু। আমি আজ এখানে আর থাকতে পারব না।" আমি তখন মাত্র পাঁচটা টাকা পকেটে নিয়ে অর্থাৎ আমার পকেটে যা ছিল, তা নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। ঠিক করলাম, গেন্ডারিয়া যাব। এই ভাবতে ভাবতে তাঁতিবাজার পৌঁছালাম এবং দেখলাম লোকজন ছুটছে তো ছুটছে গ্রামের দিকে। গেন্ডারিয়া স্কুলে পৌঁছালাম এবং দারোয়ানকে বললাম, আমি আজ রাত্রে এখানে থাকবো। দারোয়ান বলল, "সাধনা ঔষধালয়ের ফ্যাক্টরীটার এখানে বোমবিং হতে পারে, তুমি থাকতে পারবে?" আমি তখন আর একটা বাড়িতে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম আমার মতো ১০/১২ জন ছেলে হাতে রাইফেল, দা, বন্দুক, ছোরা নিয়ে ঐ খালি বাড়িটায় মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং নিচ্ছে। একে অপরে কিভাবে আক্রমণ চালাবে তার পরিকল্পনা করছে। আমার তখন আরও ভয় করতে লাগল। ভাবলাম আমি ঘুমিয়ে থাকলে ওরা একটা গুলি করে পালিয়ে যাবে, তারপর আমার মরণ হবে আর কি! ২৭ তারিখ, রাত যখন বারোটা বাজে তখন ওরা গুলি করছে একে একে শুধু শুধু। রাত্রে আর কোথায় যাই, থাকলাম সেখানেই। কিন্তু পরের দিন বিকাল বেলা কি করব? ঠিক করলাম দিদিমণির বাবার বাড়ি ফতুল্লা, ওখানেই যাব। ঠিক ৪টার সময় রওনা হলাম। গেণ্ডারিয়া স্টেশনের কাছে সব ই.পি.আর এবং রাজারবাগের পুলিশ হাতে অস্ত্র নিয়ে, ছুটছে। এ দেখে লোকজন আরও ভয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল। নিরস্ত্র ই.পি.আর এবং পুলিশরা বলছে, "আপনারা ভয় পাবেন না। আমরা পালিয়ে এসেছি, আরও গণ্ডগোল হবে। আপনারা যে যেখানে নিরাপদ বোঝেন, শহর ছেড়ে চলে যান।" এভাবে ছুটতে ছুটতে ফতুল্লা গিয়ে পৌঁছালাম। স্যারের শ্বশুর বাড়ি। পৌঁছানোর সাথে সাথে মাসিমা আমাকে বলল, "তুমি এখানে আসলে কেন? আদমজী তো কাছেই, এখানেও গোলাগুলি হচ্ছে, কেউ বাঁচবে না।" রাতটা ওখানেই কাটালাম। স্যারের খবর আর কাউকে বললাম না। বুড়ো-বুড়িরা কান্নাকাটি করবে তাই জোয়ান লোকদের কাছে বললাম এবং ওনারা বারণ করলেন। ২৮ তারিখ সকালবেলা রওনা হলাম ঢাকার

দিকে। গেণ্ডারিয়া স্কুলে এসে একজন স্যারের সাথে দেখা। দেখা হলে তিনি বলেন, "গোপাল, তুমি তোমার নামটা পরিবর্তন করে অন্য নাম অর্থাৎ মুসলমানী নাম রাখো।" মুসলমান স্যার একজন আমাকে এই বুদ্ধি দিল, তখন আমি বুঝতে পারলাম না। হাঁটতে হাঁটতে নবাবপুর দিয়ে মেডিকেলে গেলাম। সেখানে একজন পরিচিত ডাক্তার, নাম আব্দুল ওয়াহেদ, আমাকে বললেন, "তুমি আজ আর কোথাও যেয়ো না, এখানেই থেকে যাও।" উনি মনে হয় বাবুর অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই আমাকে যেতে নিষেধ করলেন। বাবুকে দোতলায় রাখা হয়েছিল। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আজকে আমাকে এখানে থাকতে হবে?" ডাক্তার ওয়াহেদ বললেন, "হ্যাঁ থাকো।" রাতে সমস্ত লাইটগুলো ডিম করে রাখা হলো, ডাক্তাররা থাকতেন না ওয়ার্ডে। রাতে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল এবং সাথে সাথে গুলির আওয়াজও হচ্ছিল। দুজন নার্স এসে বললেন, "আপনারা খুব সাবধানে থাকবেন।" বাবুকে কোন কেবিনে রাখা হয়নি, জেনারেল ওয়ার্ডে রাখা হয়েছিল। নার্স দুজন সাবধানে থাকতে বলায় আমরা জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে ই.পি.আর এবং পাকিস্তানী মিলিটারির মধ্যে গোলাগুলি হয়েছে। হাসপাতালে ই.পি.আরেরা মার খেয়ে আসছে, হয়তো হাসপাতালে চেক্ হতে পারে। ভয় পেয়ে গেলাম। যাবার কোন পথ নেই, কি করব, থাকলাম হাসপাতালেই। পরের দিন সকাল ৮টার সময় দেখলাম যে বাবুর গায়ে কয়েকদিন ধরে ভীষণ জ্বর ছিল তা নেমেছে। হাসপাতালে আসার পর ওই দিনই জ্বরটা একটু নেমেছে। মুখ নেড়ে কথা বলত, তা একটু কমে এসেছে। গা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে কথা বলছিল কিন্তু পরে তা বন্ধ হয়ে গেল। কিছু খেতে পারত না; খাওয়াও অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি দিদিমণি ও দোলাকে ডাকলাম। কাজের লোক স্বর্ণ, ধীরেনদা কাছে ছিল। ডাক্তার টি. হোসেন ও আরও অনেক ডাক্তার ছিল কাছে। ঠিক হাঁ করে মুখ দিয়ে দমটা যেন বের হয়ে গেল। আর সাথে সাথে সবাই ভেঙে পড়লেন কান্নায়। তখন দিদিমণি কান্না সংবরণ করে বললেন— একটা ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য। ডেথ সার্টিফিকেট লেখা হয়ে গেল, কিন্তু সব ডাক্তার অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন সই করতে। সবাই চিন্তায় পড়ে গেলাম। এখন ডেডবডি কোথায় নেওয়া হবে। পোস্তগোলা নেওয়াও বিপদ। এরই মধ্যে ৩/৪টা মিলিটারী আসল এবং বলল হাসপাতাল চেক করা হবে। গত রাতে ই.পি.আর এবং মিলিটারীর সংঘর্ষে ই.পি.আর যারা আহত হয়ে মেডিকেলে আছে তাদের খুঁজে বের করা হবে। তখন হাসপাতালে একটা হুল্লোড় পড়ে গেল। সবাই ভালো হয়ে গেছে। হাসপাতালের বেড থেকে কানা, খোড়া সবাই উঠে পালিয়ে যাচ্ছে, কেউই আর অসুস্থ নেই এমন অবস্থা। এর মধ্যে শুনলাম ডেডবডি এবং ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না। তখন আমরা কি করব! ডাক্তার টি. হোসেনের সাথে দিদিমণির জানাশোনা ছিল বোধয়। তিনি এ্যাম্বুলেন্স করে আমাকে, দিদিমণি, দোলা এবং স্বর্ণকে নিয়ে গেলেন।

ডেডবডি রয়ে গেল, ডেডবডি নিতে পারিনি। আমি টি. হোসেনের বাসায় ছিলাম রাত্রে। মন ভালো লাগছে না। দিদিমণি এবং দোলা গেল ওয়াহেদ ডাক্তারের বাসায়। তার একটা প্রাইভেট ক্লিনিক ছিল, আমরা ওখানেই ছিলাম। উনি আমাকে বললেন,"কোন চিন্তা করো না, আমার একটা গাড়ি চালাবে আর আমার কাছে থাকবে।" সকালে দিদিমণি আমাকে বললেন, "মনটা মানে না গোপাল, তুমি গিয়ে একটু ডেডবডিটা দেখে আসবে কি অবস্থায় আছে?" হাসপাতালে এসে কে যেন একজন বিশ্বাস ডাক্তার ছিলেন তাকে বললাম যে স্যারের ডেডবডি নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি এসেছিলাম। তিনি বললেন, "ডেথ সার্টিফিকেট লেখা হয় নাই, পোস্টমর্টেম করা হয় নাই, তুমি ২/৩দিন পর আসো।" তিন দিন পর ডাক্তার বললেন, "দেখ তুমি আর এখানে এসো না, ডেড বডি পাবে না, তাতে তোমার অসুবিধা হতে পারে। তাই বলি যে তুমি আর এখানে এসো না।" ডেডবডি পাইনি, পোড়ানোও হয়নি, ডেথ সার্টিফিকেটও পাইনি। তবে স্বাধীনতার পরে ডেথ সার্টিফিকেট পেয়েছিলাম। পরে শুনেছি যে অন্যান্য ডেডবডি আঞ্জুমানের গাড়িতে করে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু জগন্নাথ হলের চিৎবল্লী সহ আরও অনেকে বলেছিল যে স্যারের লাশ পোস্টমর্টেমের ঘরের পাশে একটা গর্ত করে তার মধ্যে রেখেছিল। হাসপাতালে ডোমরা বলছিল যে এতোগুলো ডেডবডির মধ্যে একটা মাত্র ডেডবডির কিছু হচ্ছে দেখে ওদের ভীষণ দুঃখ লাগছিল, তাই আর কি করা। মোটামুটি ভাবে মাটি চাপা দিয়ে রেখেছে পোস্টমর্টেমের ঘরের পাশে একটা গর্তে। চান্দুর সাথে বাবুর একটা ভালো সম্পর্ক ছিল ফুলের বাগান করার জন্য। বাবু ভীষণ ফুল ভালোবাসতেন। বাবু মারা যাবার পর দিদিমণি বলেছিলেন, "আর কিছুই তো করার নেই, শুধু ভালোবাসতো ফুল, তাই কয়েকটি ফুল দিয়ে দাও সাথে করে।" দোলা তাই কয়েকটা ফুল এনে বাবুর বুকের উপর রেখে দিয়েছিল।

Night of Horror in Dacca's Jagannath Hall

When the barbarous hordes of president Yahya khan launched a sneaking attack on sleeping and unsuspicious populaces of Dacca at midnight of march 25, It caught them unawares. They did not expect it and they were not prepared for it, writes Mr. Banoj Kr. Chakraborti. Assistant editor. Pakistan observer, Dacca.

Mr. Chakraborti further states :

Instead of the announcement which Yahya Khan was supposed to make that night accepting Sheikh Mujib's demand for the transfer of

power to the elected representation of the people, the announcement for which the people were eagerly waiting, the Director secretly slipped out of Dacca in the darkness of night leaving orders for Tikka Khan to let loose a reign of terror in East Bengal and set such examples of wholesale killing, looting, raping and burning as would forever acts as deterrents for the Bengalis to raise their voice against West Pakistani domination and injustice. A faithful Lieutenant as he is, Tikka Khan carried out the job thoroughly and neatly.

Though the attack was sudden and unprovoked, subsequent events proved that it was planned by the Pak Army well in advance and planned with meticulous care. As a leverage for this sinister action Yahya khan popped up the charge that the Awami League in collusion with the Hindus was planning to launch an armed attack on the night of March 25 to separate east Bengal from Pakistan. this totally fictitious charge of Hindu-Awami league collusion gave the Pak Army the necessary excuse to exterminate the Hindus from East Bengal.

And Jagannath hall of Dacca university, being the residence of the minority students of the university, became easily one of the main targets of the Pak Army's barbarous attack.

What the Pakistan Army did in Jagannath Hall on the night of 25 march could only be done by the descendants of Halaku Khan, Nadir Shah and Tamarlane. No language is enough to describe that tragedy– the wholesale massacre and destruction and the savagery with which it was carried out. The massacre at My Lai was merely a child's play in comparison with the massacre at Jagannath Hall. The hour of attack was well chosen-midnight, when all the residents of the hall were sound asleep, the murderer numbering more than a hundred, stealthily entered the hall compound fully armed with machine-guns, rifles, mortars and tanks. The gates in the boundary walls were not wide enough for the tanks to enter inside. So a portion of the wall in the eastern side was blown away by mortar charge for the tanks to roll inside. The troops encircled all the buildings in the compound to make sure that none could escape.

Then hell was let loose, a hell mere savage and vicious than Daniel inferno. The trig-happy soldiers started firing, indiscriminatley from rifles,machine guns, mortars and tanks . Shells were falling everywhere like rain. The main thrust of the attack was directed towards the two three-storied buildings in the compound which housed about 500 students. Both the buildings were subjected to heavy shelling from tanks

and mortars which resulted in parts of the buildings being blown up. I could see galloping flames leaping out from both the buildings.

The blood-thirsty hounds then entered the buildings and searched every room. they dragged out each and every student they found in the buildings. I could hear the screams of those helpless youths. I could hear their loudly declaring their innocence and imploring for mercy to those barbarians. But they were replied with merciless beating and rifle shots. Then all of them were forcibly dragged into the field in front of the hostel buildings made to fall in line and then. I still shudder to think machine-gunned hellish things happen before my eyes.

MIRACULOUS

I had a miraculous almost providential escape. I am perhaps the only survivor from the wholesale massacre carried out at Jagannath Hall. But that night after the cut-throats started killing every-one they came across. I did not for a moment think that I would escape the massacre. I resigned myself to fate and was expecting death every moment. The agony of those tension-filled hours waiting for the murderer's bullet to pierce me through can hardly be described. But death missed me almost by a hair's breadth.

How I managed to do it ? The whole story would seem incredible and I still find it hard to believe that I survived while everyone else in the hall was cold-bloodedly butchered. My door locks did the trick. I used to reside in a house inside the hall compound. The house was meant for the house tutors of the hall. One portion of the house was occupied by myself and the other portion by a house tutor of the hall.That fateful night I was living alone in that house, my neighbour, that house tutor having left for his village home with his family a few days back. His rooms were under lock and key. My room I used to keep double locked when I was out. But even when I was in, I used to keep the two locks hanging from the door rings. This would give the impression, unless carefully noticed that the door was locked from outside even when it was shut from inside, and this impression saved me from certain death.

That night I had my dinner with Dr. Jyotirmoy Guhathakurta, Provost of Jagannath Hall and a Reader in English in Dacca University. We had

a long discussion about the situation in the country. None of us had the slightest inkling of what coming. I returned to my quarters at about 11 P.M. While returning I found people erecting barricades on the road. This did not give me any idea about impending tragedy, as the erection of barricades on roads was a common feature.

শ্রী পূর্ণচন্দ্র বসাক, বি.এ

পিতা মৃত শ্রী বীরচন্দ্র বসাক
১৮, তাঁতীবাজার লেন, ঢাকা -১

আমি ১৯৭১ সনের ২৫ শে মার্চ রাতে আমার ১৮ তাঁতীবাজার স্থিত বাসায় ছিলাম। রাত ১২টায় উত্তর দিক থেকে অকস্মাৎ কামানের আকাশ ফাটা গর্জন শুনে আমি তেতলার ছাদের উপর দেখলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসসমূহে আগুনের ফুলকি ও লক্ষ লক্ষ গুলির আগুনের ফুলকিতে আকাশ ভরে গেছে।

অনবরত কামানের ভয়াল ও ভয়ঙ্কর আওয়াজ আসছে। উত্তর দিকের আকাশে দেখলাম, একটা ঘোলাটে বেলুনের মতো আগুনের বিরাট পিণ্ড পশ্চিম দিক থেকে আস্তে আস্তে উঠে পূর্বদিকে দিয়ে গর্ভনর হাউসের কাছে এসে নেমে পড়ল। এই সময়ে দেখলাম— চারিদিকের জনপদ, বস্তি এলাকায় আগুন আর আগুন জ্বলছে। বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ হচ্ছে। কামানের কানফাটা গর্জন ভেসে আসছে। আমি ছাদে দাঁড়িয়ে দেখলাম গুলির আওয়াজ ক্রমে ক্রমে গুলিস্তান থেকে নওয়াবপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরই সদরঘাট খ্রীষ্টানদের গির্জার সম্মুখে সামরিক গাড়ি ও ট্যাঙ্কের ঘরঘর আওয়াজ শুনলাম। এ সময় শতকণ্ঠের, "মাগো, বাবাগো, বাঁচাও, বাঁচাও" আর্তনাদ শুনলাম। শাঁখারী বাজারের সকল হিন্দু জনতা যার যার ছাদে দাঁড়িয়ে এ বীভৎস কাণ্ড দেখছিল। কিছুক্ষণ পর সদরঘাট টার্মিনালে ভীষণ গুলিবর্ষণের শব্দ শুনলাম। রাত ২টার সময় মাইকে ঘোষণা করা হলো— রাজধানী ঢাকায় ২৬শে মার্চ ভোর পর্যন্ত কার্ফু জারি করা হয়েছে, যার যার বাড়িতে আওয়ামী লীগ ও স্বাধীন বাংলার পতাকা আছে, তা অবিলম্বে নামিয়ে ফেলে সে স্থানে পাকিস্তানের পতাকা তুলে দেয়ার নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে। রাত ২টার পর রাজধানীর পূর্বদিক থেকে আর একটি জ্বলন্ত বেলুনের মতো ঝলমলে গ্লোব পূর্ব আকাশ থেকে উঠে আস্তে আস্তে সোজা পশ্চিমে ভেসে গিয়ে মিশে যেতে দেখলাম। এরপর আর একটি গুলির আওয়াজও কানে আসে নাই। চারিদিকে নীরব, নিস্তব্ধ শ্মশানের হাহাকার। আগুন আর আগুন জ্বলছে দেখলাম রাজধানী ঢাকার চারদিকে— জনপদ ও বস্তি এলাকা

জ্বলছে।

২৭শে মার্চ সান্ধ্য আইন তুলে নেয়ার পর শুনলাম শাঁখারী বাজারের কোর্টের প্রবেশপথের একটি বাড়িতে দশ জন হিন্দুকে একই ঘরে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে এবং ড. শৈলেন সেনকে গ্রেপ্তার করে জগন্নাথ কলেজের পাক-সেনাদের ছাউনিতে আটক করা হয়েছে। ইংলিশ রোড দিয়ে অগ্রসর হয়ে দেখলাম ইংলিশ রোড, ফ্রেঞ্চ রোডের দুই পাশের কোটি কোটি টাকার কাঠের কারখানা ও মেশিনপত্র ভস্ম হয়ে পাক-সেনাদের বীভৎসতার স্বাক্ষর হয়ে পড়ে আছে— দুই পাশের বাণিজ্য এলাকার সকল দোকান ও বাণিজ্যকেন্দ্র নিশ্চিহ্ন হয়ে আছে। রাস্তা ঘাট শূন্য, কোথাও কোন মানুষ নেই। আমি কাজী আলাউদ্দিন রোড হয়ে বাবুপুরা ফাঁড়িতে দেখলাম ৮জন পুলিশী পোশাক পরা লাশ গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে ফাঁড়ির বারান্দায় ও রাস্তায় বিকৃত ভাবে পড়ে আছে। রেললাইনের দুইপাশের বস্তি এলাকা ভস্ম ছাই হয়ে পড়ে আছে। দেখলাম চারিদিক জনমানব শূন্য। আমি দ্রুত আমার বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক জি.কে নাথ, সংস্কৃতের অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ঘোষঠাকুর, সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রী পরেশচন্দ্র মণ্ডলের খোঁজে জগন্নাথ হলে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক দিয়ে প্রবেশ করে দেখলাম জগন্নাথ হলের চারদিকের দেওয়াল লক্ষ লক্ষ গুলির আঘাতে ঝাঁজরা হয়ে আছে। হলের কাচের জানালা সমূহ ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়ে আছে। হলের পুকুরপাড় দিয়ে আমি অগ্রসর হওয়ার সময় দেখলাম হঠাৎ পুকুরের মধ্য হতে একজন মানুষের মাথা উপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করছে, ভীত-সন্ত্রস্ত দিশেহারা উন্মাদের মতো হয়ে পানি থেকে মাথা তুলে ক্রন্দন ও বুকে চপেটাঘাত করতে করতে বলতে লাগলেন, "দাদা ওদিকে যাবেন না, ওরা আমাদের সব মেরে ফেলেছে।" আমি লোকটাকে উন্মাদ মনে করে তার কথায় কান দিই নাই। আমি আরও অগ্রসর হয়ে হলের কেন্টিনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একটি প্রাণীও নাই— নীরব, নিস্তব্ধ, জনমানবশূন্য। কেন্টিনের মধ্য দিয়ে হলের নর্থ হাউসে প্রবেশ করে সিঁড়ির নিকটে দেখলাম একজন হিন্দু যুবকের লাশ পড়ে আছে। মাথায় চুল আগুনে পোড়া, সারা দেহ গুলিতে ঝাঁজরা। আমি দোতলায় না উঠে সোজা রাস্তায় নেমে পড়ে হলের শহীদ মিনারের সামনে এসে দেখলাম শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়ে আছে। শহীদ মিনারের পিছনেই সদ্য মাটি তোলা একশত ফুট লম্বা এক বিরাট গর্ত দেখলাম। গর্তটি কিছুক্ষণ পূর্বেই মাটি দিয়ে ভরাট করে রাখা হয়েছে। গর্তের উপরের মাটি ভেদ করে কারো কারো হাতের পাঞ্জা, পায়ের আঙ্গুল দেখা যাচ্ছে। আমি আরও উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে হলের শেষ মাথায় লোহার গেটে পৌঁছোলে পিছন থেকে একটি দিশেহারা কর্কশ নারীকণ্ঠ চিৎকার করে বললেন, "আপ কাহা পর যাতে?" আমি সেই কণ্ঠের দিকে নজর না দিয়ে শামসুন্নাহার হলের দিকে অগ্রসর হয়ে জগন্নাথ হলের হাউস টিউটর মিস্টার জি. কে. নাথ, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর এবং পরেশ মণ্ডলের

কোয়ার্টারের প্রবেশপথে গিয়ে দেখলাম কোয়ার্টারের দরজা-জানালা সব খোলা, জনমানব শূন্য, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে দেখলাম দোতলা থেকে পচা দুর্গন্ধ ভেসে আসছে, সিঁড়ির উপর থেকে নীচ পর্যন্ত রক্তের চিহ্ন জমাট হয়ে আছে। আমি এ পচা দুর্গন্ধ দেখে আর উপরে উঠতে পারি নাই। বন্ধুদের খোঁজ করতে গিয়ে এখানেই আমি প্রথম ভয় পেলাম এবং ভড়কে গেলাম। আমার মাথা ঘুরতে লাগলো সেই বীভৎস দৃশ্য দেখে। আমার উপরে উঠতে সাহস হলো না। আমি নিচে নেমে আসলাম এবং ভীত-সন্ত্রস্ত ভাবে যে পথ দিয়ে এসেছিলাম সেই পথ দিয়ে দ্রুত ফিরে গেলাম। ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের রাস্তা ধরে দ্রুত ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ভিতরে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ পথে জগন্নাথ হলের একজন চাপরাশীর সাক্ষাৎ পেলাম। সে বললো, আমাদের হলের প্রোভষ্ট ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা গুলিবদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালের দোতলায় ৯নং কক্ষে আছেন। তিনি জীবিত আছেন। আপনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করুন। আমি হাসপাতালের দোতলায় ৯ নং কামরায় প্রবেশ করতেই হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আহত হলের একজন যুবক ছাত্র আমাকে জড়িয়ে ধরে ক্রন্দন করতে করতে বলতে থাকেন, "দাদা আমি কি বেঁচে আছি? দেখেন আমাকে ওরা গুলি করেছে। ঐ যে দেখুন জ্যোতির্ময় বাবু, তাকেও পশুরা গুলি করেছে।" আমি তাকে উন্মাদের মতো মনে করলাম, তার অসংলগ্ন কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম, সে প্রকৃতিস্থ নয়। আমি আরও অগ্রসর হয়ে দেখলাম জ্যোতির্ময়বাবু শুয়ে আছেন— জ্ঞনহারা, মাঝে মাঝে দীর্ঘ চাপা নিঃশ্বাস ফেলছেন এবং মাঝে মাঝে তিনি চক্ষু খুলে বন্ধ করে ফেলছেন। আমি অনেকক্ষণ তাঁর শয্যাপাশে দাঁড়িয়ে তাঁর করুণ অবস্থা দেখলাম। তিনি একবার আমার দিকে চেয়ে বললেন, "কে?" আমি বললাম, "আমি বসাক, আমি পূর্ণবাবু।" তিনি উত্তরে বললেন, "ও"। একটু পরেই বিড়বিড় করে বললেন, "ড. গোবিন্দবাবু ইজ প্রসিডিং ওয়েল।" এ কথা বলেই তিনি জ্ঞানহারা হয়ে গেলেন। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর এই অন্তিম দৃশ্য দেখছিলাম। একটু পরেই বারান্দা হতে তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী ক্রন্দনরতা অবস্থায় কাতর কণ্ঠে বললেন, "দাদা, আপনি এসেছেন, আমাকে একটু সাহায্য করুন। কাল থেকে এ হাসপাতালে কিছুই নাই, আমাকে একটি এক্স রে প্লেট যোগাড় করে দিন।" আমি উত্তরে বললাম, "দাস কোম্পানীর দোকান খোলা পেলে এখনি এনে দিচ্ছি।" বলে তাঁকে প্রবোধ দিলাম। আমি তাঁকে ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি সমস্ত ঘটনা বললেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম গুলি কোথায় কোথায় লেগেছে— উত্তরে বললেন, "ঘাড়ে একটি গুলিবদ্ধ হয়ে ঘাড় ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। পেটে নাভীর কাছে ব্যাথার যন্ত্রণার কথা বললেন। বোধহয় পেটের ভিতরও গুলি লেগেছে। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে চলে আসলাম। প্রবেশ পথে আসলে হলের সেই আহত গুলিবদ্ধ ছাত্রটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কি করে বাঁচলে?" সে বলতে লাগলো— খানসেনারা ভারী অস্ত্র নিয়ে

রাত বারোটার দিকে আমাদের হলের গেট ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে প্রত্যেক কামরা ও কক্ষে ব্যাপক তল্লাশী চালায়। হল বন্ধ থাকলেও কতিপয় অনার্স পরীক্ষার্থী ও এম.এ পরীক্ষার্থী প্রতিভাবান বিশ-পঁচিশ জন ছাত্র হলে অবস্থান করেছিল। প্রত্যেক কক্ষে প্রবেশ করে যাকে যেখানে পেয়েছে তাঁকে সেখানে গুলিবদ্ধ করে হত্যা করেছে, আমি সেই সময় হলের বাথরুমে পালিয়ে ছিলাম। তাঁরা আমাকে বাথরুমে ধরে ফেলে, আমাকে ওরা ধরে বলল, "তুম কো কুছ নেহি বলে গা" এবং দোতলা থেকে আরও তিনজন ছাত্রকে নামিয়ে নিয়ে এসে আবার বলল, "ইয়ে দেখ তোম লোক কো কুছ নেহি করেগা। উপর যেতনা লাশ হ্যায়, সব নিচে লে আও।" আমরা চারজন তাদের নির্দেশ মতো উপর থেকে সদ্য গুলিবদ্ধ ক্ষত-বিক্ষত শহীদদের লাশ নীচে নিয়ে আসলাম। বীর শহীদদের সব লাশ আমরা শহীদ মিনারের গর্তের সামনে নিয়ে এসে দেখলাম— পাক-সেনারা সশস্ত্র ভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। লাশগুলি ওরা গর্তের মধ্যে ফেলে মাটি চাপা দিল। হত্যাযজ্ঞ শেষে আরেক দল সৈন্য উপরে গিয়ে আবার তল্লাশী চালিয়ে ফিরে আসল— আমাদের চারজনকে লাইন করে দাঁড়াবার নির্দেশ দিল। আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম লাইন করে, এরপর আমাদের উপর ওরা গুলি বর্ষণ করতে লাগল। আমাদের উপর গুলির শব্দ হওয়া মাত্র আমি মৃতের ভান করে পড়ে গেলাম। বীর শহীদদের সেই লাশের মধ্যে পড়ে থেকে দেখলাম পাক-সেনারা আর্মি ট্রাক নিয়ে সদলবলে চলে গেল। চারদিকে চেয়ে দেখে যখন নিশ্চিত হলাম তারা আর নাই, তখন সেই লাশের মধ্য হতে উঠে এক দৌড়ে মেডিক্যালে কলেজ হাসপাতালে চলে এসেছি।

বাসন্তীরাণী গুহঠাকুরতা

স্বামী ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষয়িত্রী, মণিজা রহমান গার্লস্ হাইস্কুল
গেন্ডারিয়া, ঢাকা

১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ সেই কাল রাতে আমরা স্বাভাবিকভাবে প্রতিদিনের মতো খাওয়া-দাওয়া শেষ করে রাত ৯টার সময় রেডিও খুলে বসেছিলাম। ঢাকা রেডিও থেকে আমরা সে রাতে দুর্যোগের কোন পূর্বাভাস পাই নাই। ভয়েস অব আমেরিকার সংবাদ শুনে আমার স্বামী ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা মেয়ে মেঘনার ঘরে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ প্রিলিমিনারী এবং অনার্স পরীক্ষার্থীদের খাতা দেখতে বসলেন। আকস্মাৎ জনতার দুপদাপ শব্দ শুনে আমার স্বামী এবং আমি দেয়ালের বাইরে গিয়ে দেখলাম জনতা রাস্তায় রাস্তায় বড় বড় গাছ, পানির ট্যাঙ্ক ও ইট-পাটকেল দিয়ে প্রতিরোধ

তৈরি করছে। আমার স্বামী বিপদ বুঝতে পেরে ফ্ল্যাটের প্রবেশ পথ তালাবন্ধ করেন। রাস্তার দিকে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে ভারাক্রান্ত মনে 'বিপদ আরম্ভ হয়ে গেল' বলে আবার মেয়ের কক্ষে গিয়ে খাতা দেখতে বসে গেলেন। আমি আজেবাজে চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। রাত বারোটার দিকে অদূরে বোমার আওয়াজ শুনে জেগে উঠে দেখলাম ইকবাল হল এবং রোকেয়া হলের দিক থেকে বোমার আওয়াজ ভেসে আসছে। আস্তে আস্তে অসংখ্য লাইট-বোম আকাশকে আলোকিত করে দিচ্ছে, আলোর ফুলকিতে দেখলাম, বোমা ও গুলি বর্ষিত হচ্ছে। আমরা দুজন গুলির ও বোমার কান ফাটা আওয়াজ সহ্য করতে না পেরে খাটের তলায় বেডকভার বিছিয়ে নিরাপদে শুয়ে থেকে বর্বর পাকসেনাদের বীভৎসতার তাণ্ডব শুনছিলাম। পাশের কামরা থেকে আমাদের ঝি-কে ডাকতে গেলে সে আসে না। আমরা সবাই গুলির অবিরাম গর্জনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের ফ্ল্যাটটি কাঁপছিল। চারিদিকে দেখলাম লাইট-বোমের আলোর ঝলকানি। হিস হিস শব্দ শুনে আমার গায়ের লোম শিউরে উঠলো। আমি উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম আমার ফ্ল্যাটের প্রবেশপথে সামনে পাকসেনা ভারী অস্ত্রবাহী সশস্ত্র আর্মি-ট্রাক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অল্পক্ষণ পরেই এক পাঞ্জাবী মেজর লোহার জিঞ্জির হাত দিয়ে সজোরে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ফ্ল্যাটে প্রবেশ করে আমার মেয়ে মেঘনার কক্ষের জানালার মসকুইটো নেট বেয়োনেট দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে মাথা ঢুকিয়ে আমাকে দেখে এক দৌড় দিয়ে ঘুরে রান্নাঘরের দরজা ভেঙ্গে আমাদের ফ্ল্যাটে প্রবেশ করে। আমি আমার স্বামীকে বললাম, পাক-সেনারা আমাদের ফ্ল্যাট ঘেরাও করেছে। আমরা বিপদগ্রস্ত, বিপন্ন। আমার স্বামী আমার মেয়েকে অন্য কামরায় গিয়ে শুয়ে থাকতে বললেন, পাঞ্জাবী সৈন্যরা আমাদের কামরার দরজায় বুটের লাথি মারছিল। আমি দৌড়ে গিয়ে আমার স্বামীকে বললাম, পাকসেনারা এসে গেছে, হয়ত তোমাকে গ্রেপ্তার করবে, তুমি তৈরি হয়ে নাও— বলে একটা পাঞ্জাবী তাঁর হাতে দিয়ে মেয়েকে নিয়ে ঘরে এসে দেখলাম রান্নাঘরের পাশে বারান্দার দরজা দিয়ে প্রবেশ করে আমার আয়াকে কুনইয়ের আঘাতে সজোরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে আমার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করল, "প্রফেসর সাহাব হ্যায়?" আমি নিরুপায় হয়ে সত্য কথা বললাম। পাঞ্জাবী মেজর আবার বলল, "উনকো লে যায়েগা।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কাহা লে যায়েগা?" আমার কথায় কোন সন্তোষজনক উত্তর না দিয়ে অত্যন্ত অবজ্ঞার সুরে বলল, "লে যায়েগা?" আমার সাথে সাথে মেজর চলতে চলতে বলতে লাগল, "ফ্ল্যাটমে আওর কোই জোয়ান আদমী হ্যায়?" আমি বললাম, "নেহি তো, হামারা এক হি লাড়কি হ্যায়।" এ কথা শুনে মেজর বলল, "ঠিক হ্যায় লাড়কি কা ডর নেহি হ্যায়।" আমার সাথে আমার স্বামী যে কামরায় ছিলেন সে কামরায় প্রবেশ করে আমার স্বামী ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে বাম হাতে চেপে ধরে জিজ্ঞেস করল, "আপ প্রোফেসর সাহাব হ্যায়?" আমার স্বামী উত্তরে ইংরেজীতে

বললেন, "ইয়েস।" পাঞ্জাবী মেজর বলল, "আপকো লে যায়েগা।" আমার স্বামী মোটা গলায় অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বললেন, "হোয়াই।" মেজর তার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে টেনে বাইরে নিয়ে গেল। আমি পিছনে পিছনে কিছু দূর গিয়ে তাদেরকে আর দেখতে না পেয়ে কামরায় ফিরে এসে টেলিফোনের রিসিভার উঠিয়ে দেখলাম সব কিছু বিকল অচল হয়ে আছে। আমি এসময়ে সবই বুঝতে পারলাম— আমরা বিপদগ্রস্ত বিপন্ন। ফিরে দেখলাম উপরতলা সিঁড়ির শেষ মাথায় মিসেস মণিরুজ্জমানকে পাঞ্জাবী জোয়ানরা 'যাও, যাও, হটো' বলে তাড়া দিচ্ছে। ইতিপূর্বে পাক সেনারা মণিরুজ্জমান, তার ছেলে, তার ভাগনে এবং প্রতিবেশী যুবককে টানাটানি করে ঠেলে ধাক্কিয়ে নীচে নামিয়ে নিয়ে আসার জন্য জোরাজুরি করছিল। মিসেস জামান সিঁড়ির শেষ মাথায় এসে আমাকে বললেন, পাক-সেনারা ওদের সবাইকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি তাকে বললাম, নিয়ে যেতে দিন, ওদেরকে বাধা দিয়ে লাভ নেই। ওরা আমাদের ভাষা বোঝে না, জোরাজুরি করলে মেরে ফেলতে পারে। এ কথা বলতে বলতে বাইরে আমি দুটি গুলির আওয়াজ শুনে দৌড়ে বালিশ হাতে অদূরে দাঁড়ানো মেয়েকে ধরতে গিয়ে পর পর আটটি গুলির শব্দ শুনে অগ্রসর হয়ে দেখলাম সিঁড়ির নীচে চারজনের দেহ গুলিবদ্ধ হয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। গুলি বর্ষণ করার পরক্ষণেই পাক-সেনারা সবাইকে কার্ফু জারির কথা ঘোষণা করে দ্রুত ট্রাকগুলি নিয়ে চলে গেল। মিসেস মণিরুজ্জমান তেতলা থেকে পানি নিয়ে এসে গুলিবিদ্ধ সবাইকে খাওয়ালেন। তিনি দৌড়ে এসে বললেন, "আপনার স্বামী গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছেন, আমার সাথে কথা বলছেন, তিনি বাঁচবেন না।" এ কথা শুনে আমি এবং আমার মেয়ে মেঘনা দৌড়ে আমার স্বামীর গুলিবিদ্ধ দেহের সামনে উপস্থিত হয়ে দেখলাম আমার স্বামীর দেহ গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছে। তিনি বলছিলেন, "ওরা আমাকে গুলি করেছে, আমার শরীর প্যারালাইসিস হয়ে গেছে। আমাকে তুলে ঘরে নিয়ে যাও।" আমি কান্নার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম। শুধু হায় হায় শব্দ করছিলাম। দোতলায় যে ফ্ল্যাটে অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক সাহেব এবং অধ্যাপক আনিস সাহেব থাকতেন তাদের ব্লকের প্রবেশপথে অটোমেটিক তালা ঝুলতে থাকায় পাক-সেনারা সেখানে প্রবেশ করে নাই। পাক-সেনারা চলে যাওয়ার পরও ওরা কেউ আমাদের অসহায় চিৎকার শুনেও আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে নাই। আমরা কোনরকমে আমার স্বামীর রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহ ধরাধরি করে আমাদের ফ্ল্যাটে নিয়ে এসে বারান্দার খাটে এলিয়ে দিলাম। আমার স্বামী জ্ঞান হারান নাই তখনও। আমার মেয়ে মেঘনা মণিরুজ্জমান সাহেবের ভাগনের পানি পানি বলে অসহায় আর্তনাদ শুনে আমাকে নিয়ে তার মুখে শেষ পানি দিয়ে আসল। পরক্ষণেই ছেলেটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

দূরে-অদূরে বৃষ্টির মতো অবিরাম গুলিবর্ষণ করছিল পাক সেনারা। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম পাক-সেনারা জগন্নাথ হলের পূর্বদিকে ছাত্রদের কেন্টিনে আগুন ধরিয়ে দেয়।

মাঝে পাক-সেনাদের সামরিক ট্রাকগুলি টহল দিচ্ছিল। চারিদিকে শ্মশানের হাহাকার। পরের দিন ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ ও ২৭শে মার্চ সকাল পর্যন্ত আমার স্বামীর ক্ষত বেয়ে রক্ত ঝরছিল। বাইরে সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকায় তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তার চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করতে পারিনি।

১৯৭১ সনের ২৭শে মার্চ সকালে কতিপয় লোকের সাহায্যে আমার স্বামীকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করি। হাসপাতালে কোন লোকজন ও ডাক্তার ছিল না। দায়িত্বরত নার্সরা সাধ্যমত আমার স্বামীর সেবাযত্ন করেছে। ১৯৭১ সনের ৩০শে মার্চ বিনা চিকিৎসায় আমার স্বামী মৃত্যুবরণ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর আমি তাঁর মৃতদেহ হাসপাতাল থেকে সরিয়ে আনার অনুমতি পাই নাই। তাঁর পবিত্র মৃতদেহের সৎকার করতে পারি নাই। আমার স্বামীর মৃত্যুর পরক্ষণেই পাক-সেনারা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ঘেরাও করে। আমি স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে আসার কোন উপায় না দেখে ডাক্তারদের উপদেশে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের গভর্নর ড. মালেকের বড় ভাই আব্দুল বারি সাহেবের স্ত্রীর সাথে তাদের গাড়িতে আমাদের স্কুলের সেক্রেটারী ড. এম.এ ওয়াহিদ সাহেবের ২০ নম্বর ধানমণ্ডিস্থ বাসায় আশ্রয় লাভ করি। আমার স্বামীর লাশ চারদিন হাসপাতালে পড়েছিল। আমার ড্রাইভার ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত হাসপাতালের ওয়ার্ডের বারান্দায় আমার স্বামী ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার মৃতদেহ দেখে এসেছে।

ডক্টর দেবকে হানাদাররা কিভাবে হত্যা করেছিল

সাক্ষাৎকার : বেগম রোকেয়া সুলতানা

স্বর্গীয় ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেবের পালিতা কন্যা তিনি। ২৬ শে মার্চ সকালে হানাদার বাহিনী যখন ডক্টর দেবকে গুলি করে হত্যা করে তখন একমাত্র কন্যা রাবিয়াকে কোলে বেগম রোকেয়া দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর পালক পিতার পাশে। তার আগেই হানাদার পশুরা রোকেয়ার স্বামীকে হত্যা করেছে। কোলে শিশু নিয়ে আতঙ্কে আর বেদনায় তিনি মুহ্যমান। রোকেয়া বেগম শোনাচ্ছিলেন সেই অভিশপ্ত দিনটির কথা। টুকরো টুকরো কথায় জীবনের সেই ভয়ঙ্কর দিনটাকে বর্ণনা করেছিলেন বেগম সুলতানা।

মৃত্যুর সংজ্ঞা আমি জানি না। তবে ২৫শে মার্চের অশুভ কাল রাত আর ২৬শে মার্চ সকালে বিধ্বস্ত ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে আমারই চোখের সামনে গুলি খেয়ে ঢলে পড়েছিলেন ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেব। হানাদার পাকিস্তানী সেনারা তাঁকে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা

করেছিল। অথচ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও তাদেরকে তিনি বাবা বলে সম্বোধন করেছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন তাদের আগমনের হেতু।

মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের সময় ডক্টর দেব সুস্থ ছিলেন না। ফেব্রুয়ারী মাসে আমেরিকা থেকে পায়ে ব্যথা নিয়ে ফিরেছিলেন। মার্চ মাসে দাঁতে ব্যথা হলো। ব্যথা শেষ পর্যন্ত গলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণত ডক্টর দেব কখনও রাজনীতি সম্পর্কিত কোন আলোচনায় যোগ দিতেন না, কিন্তু মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাঁকে কখনো কখনো বিচলিত হতে দেখা যেত। বাংলাদেশের সার্বিক মুক্তি শব্দটিকে তিনি স্বাধীন বাংলার অস্তিত্ব বলে ব্যাখা করতেন। ২৩ শে মার্চ ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল কুদ্দুস মাখন ডক্টর দেবের সাথে দেখা করতে এলে তিনি স্বাধীন বাংলার পতাকা কিনতে নিজ থেকেই টাকা দিয়েছিলেন। পরে হাসি মুখে বলেছিলেন, 'এবার দেশের কিছু একটা হবেই।'

২৫শে মার্চের বিকালে অন্যান্য দিনের মতই তিনি পদব্রজে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। রাত আটটার সময় ঘরে এসে পড়তে বসলেন। স্বাস্থ্য ভালো নেই বলে আমি সকাল সকাল শুয়ে পড়তে বললাম। আমার স্বামী মরহুম মোহাম্মদ আলী ব্যাঙ্কে চাকরি করতেন। আমি বি.এড. পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। আমার কর্মক্লান্ত স্বামী আর অসুস্থ ডক্টর দেব তখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। রাত তখন প্রায় এগারোটা। হঠাৎ গুলির শব্দে আমি চমকে উঠলাম। ভয় পেয়ে আমার স্বামীকে ডাকলাম। আমরা তখন জগন্নাথ হলের সামনে একতলা এক কোয়ার্টারে থাকতাম। বাবা থাকতেন মাঝের ঘরে, আর আমরা থাকতাম শেষের ঘরটাতে। গুলির শব্দে স্বামীকে ডাকতেই তিনি উঠে বসলেন। ঠিক এই মুহূর্তে প্রবল ভূমিকম্পের মতই আমাদের বাসার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে পড়তে লাগল। থরথর করে কাঁপতে থাকে বাসাটা। চারিদিক থেকে আগত গুলি বৃষ্টি আমাদের বাসাটাকে ঝাঁজরা করে দিচ্ছিল। আমি আর আমার স্বামী বাচ্চাকে বুকের মাঝে নিয়ে বুকে হামা দিয়ে মাঝের ঘরে ঢুকলাম। সেখানে উত্তেজনায় বাবা থরথর করে কাঁপছেন। বাচ্চাকে স্বামীর কাছ দিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরলাম। উত্তেজনায় তিনি সে রাতে বেশ কয়েকবার মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন। শেষরাতের দিকে গুলির প্রচণ্ডতা এত বাড়লো যে, আমরা বাবাকে নিয়ে কোণের ছোট ঘরটাতে আশ্রয় নিলাম। এ সময় গুলির সাথে সাথে মুখে মাইক লাগিয়ে হানাদার বাহিনী সারেন্ডার করার জন্য ইংরেজিতে আদেশ দিচ্ছিল। সকাল হওয়ার সাথে সাথে গুলির প্রচণ্ডতা কমে আসতে লাগলো। সমস্ত রাত্রি জাগরণের পরে ক্লান্তিতে নুয়ে পড়েছিলেন বাবা। তবুও আমাকে বললেন, "উপাসনার সময় হয়েছে। একটু স্থান করে দে মা।" গুলির শব্দ প্রায় থেমে গেছে। মাঝের ঘরটাতে বাবার বিছানাটা ঝেড়ে উপাসনার স্থান ঠিক করে দিলাম। সমস্ত বাড়িটার 'পরে বয়ে যাওয়া গত রাতের তাণ্ডবে তখন ঘরের কোন স্থানে পা রাখা অসম্ভব। দেয়াল ফুটো হয়ে চুন-বালি খসে

হানাদার পাকবাহিনীর নির্যাতন

শিশু কন্যাটির মা-বাবা অবরুদ্ধ বাংলাদেশে নিহত।

শরনার্থীদের কেউ তাকে সীমান্ত পার করে নিয়ে আসে। কিন্তু সে এখন মৃত

— আলোকচিত্র : ডেইলি টাইমস জুন ৩ ১৯৭১

পাক হানাদার বাহিনী পরিবারের সকলকে হত্যা করেছে।

পরিবারের একমাত্র জীবিত সদস্য এই শিশুটি।

— আলোকচিত্র : নিউজউইক, ২ আগস্ট ১৯৭১

মা তাকিয়ে মৃত সন্তানকে দেখছেন।
অবরুদ্ধ বাংলাদেশে কিছুই করার ছিল না আর।

একজন হিন্দু বিধবার অসহায় দৃষ্টি, অবরুদ্ধ বাংলাদেশে

— আলোকচিত্র : কিশোর পারেখ ১৯৭১

শরনার্থী শিবিরে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী
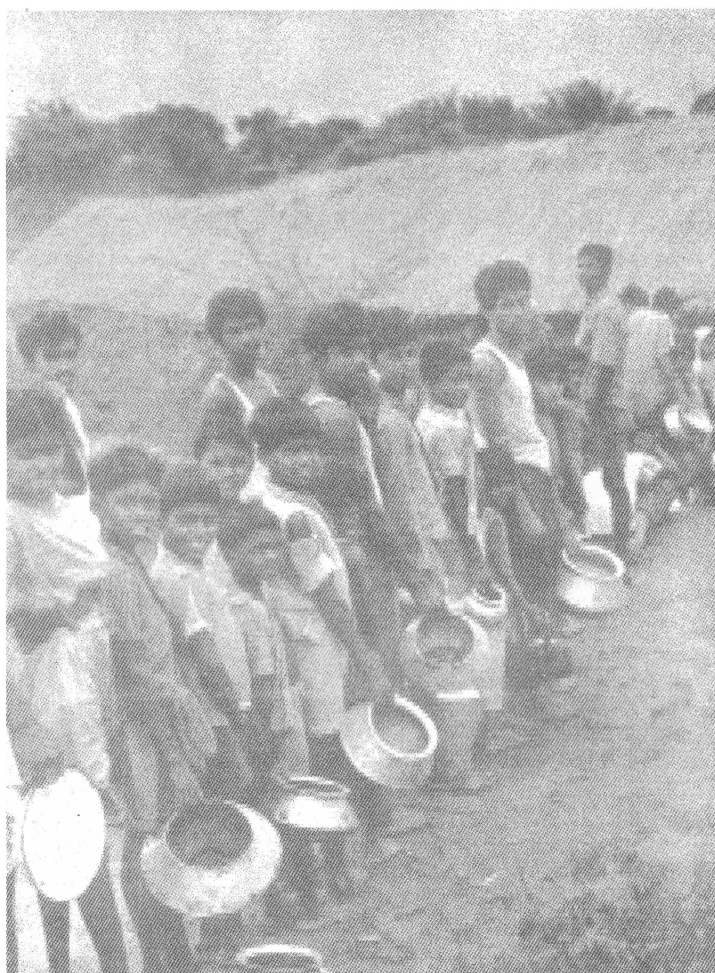
শরনার্থী শিবিরে রেশনের জন্য লাইন

শরনার্থী শিবির, ত্রিপুরা

পড়েছে। যে কোন মুহূর্তে ঘরটা হয়তো ভেঙ্গে পড়বে।

গুলির শব্দ থেমে যাওয়াতে আমার স্বামীও বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়েছিলেন। আমি ফ্লাস্কে রাখা গরম পানি দিয়ে কোনমতে এক কাপ চা বানিয়ে বাবার ঘরে নিয়ে এলাম। চা খেয়ে তিনি বেশ কিছুটা সুস্থ হলেন বলে মনে হয়।

শেষ পর্যায়ে অশুভ অভিশপ্ত সেই ক্ষণটার কথা বলতে যেয়ে শোকার্ত দেখালো বেগম রোকেয়াকে। চার বছরের বাচ্চাকে বুকে চেপে ধরে বললেন আমার বাবুও জানে তার দাদুর মৃত্যুর ক্ষণটাকে। ও তখন আমার কোলে বসেছিল। ওর সামনেই হানাদার দস্যুরা ওর বাবাকে, ওর দাদুকে হত্যা করেছে। আজও সবসময় ও সে কথা বলে আর প্রতিশোধ নিতে চায়।

২৬ শে মার্চের সেই অভিশপ্ত সকাল। জগন্নাথ হলের সামনে শুধু সৈন্য আর সৈন্য। মাঠের মাঝে ফেলে রেখেছে রাতের হামলায় আহত ও নিহতদের দেহ। আশপাশের বাড়ি থেকে অত্যাচারিত নারীকণ্ঠের আর্তনাদ ভেসে আসছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় আমরা সবাই মাঝের ঘরটিতে জড়ো হয়েছি। ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে দরজায় আঘাত পড়লো— “মালাওন কি বাচ্চা দরজা খোল দো।” আদেশ নয় যেন বাঘের হুংকার। ভয়ে উত্তেজনায় বাবা আবার উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে জোর করে বসিয়ে দিলাম। দরজায় ততক্ষণে লাথির পর লাথি মারছে ওরা। আমার স্বামী বাচ্চাকে আমার কোলে দিয়ে বাবাকে সামলে রাখতে বলে চলে গেলেন দরজা খুলতে। তিনি দরজার কাছে যেতেই দরজাটি ওদের লাথির আঘাত সহ্য করতে না পেরে ভেঙে পড়লো তার গায়ে। তিনি উঠে দাঁড়াতেই একজন রাইফেলের বাট দিয়ে তাঁকে আঘাত করলো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে দূর থেকে একটা গুলি এসে তার বুকে বিঁধতেই তিনি ছুটে সরে এলেন কয়েক পা। তারপর লুটিয়ে পড়লো তাঁর দেহ। আমরা মাঝের ঘরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি, বাবা আর আমার খুকু। ঠিক এমনি মুহূর্তে শান্ত ভাবে বাবা বললেন— “বাবারা কি চাও এখানে?” ব্যাস, এই ছিল তাঁর শেষ কথা। বাবার কথা শেষ না হতেই ওরা গুলি করেছিল। দুটো গুলি লেগেছিল কানের পাশ দিয়ে মাথার মধ্যে, আর অনেকগুলি বিঁধে ছিল তার বুকে। চোখের পলকে লুটিয়ে পড়লো তাঁর দেহ। আমাকেও ওরা রাইফেল দিয়ে মারলো। বার বার প্রশ্ন করতে লাগল আমাদের ঘরের রাইফেলগুলো কোথায়। বাবার মৃতদেহটাকে ওরা বেয়নেট দিয়ে বারে বারে বিদ্ধ করে বিদ্রূপ করতে লাগল। বুটের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগল তাঁর পবিত্র দেহটা। মানসিক বিপর্যয়ে ওই বাচ্চাটাকে বুকে চেপে একবার শুধু চীৎকার করে উঠেছিলাম— “আল্লাহ”। জানি না সে কারণেই কিনা, আমাকে ওরা মারলো না। শুধু আমার স্বামীর আর বাবার দেহটাকে নিয়ে গেল হলের সামনে মাঠে সাজিয়ে রাখা শত শত শহীদের মাঝে।

২৫শে মার্চের কালো রাতে জগন্নাথ হল

গোপালকৃষ্ণ নাথ

কত মার্চ মাস এসেছে এবং কত মার্চ মাস অতীতের গর্ভে বিলীন হয়েছে, কেউ তার হিসেব রাখেনি বা রাখার প্রয়োজন মনে করেনি। কিন্তু ১৯৭১-এর মার্চের কথা স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ কোনদিন ভুলতে পারবে না। এই মার্চের সেদিনে বাংলা গণবিপ্লব লাভ করেছিল সর্বোচ্চ ভরবেগ, শুরু হয়েছিল বাঙালীর স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, উড়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা। গণবিপ্লবের জোয়ারে যে কোন মুহূর্তেই ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল পাকিস্তানী শাসকবর্গের বালির বাঁধ। এই মার্চেই মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার হার মানিয়েছিল আদিম যুগের বর্বরতাকেও। এই মার্চেই রক্তপিপাসু পাকিস্তানী হায়েনার দল রাতের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিরীহ নিরপরাধ শান্তিপ্রিয় বাঙালী নরনারীর উপর, ওরা মেতেছিল বাঙালীর রক্তে হোলি খেলায়, তাই মার্চকে ভোলা যায় না, ভোলা সম্ভব নয়।

এই মার্চেরই ২৫ তারিখ, বৃহস্পতিবার অন্যান্য দিনের ন্যায় সেইদিনও ঢাকার বুকে নেমেছিল ছোট-বড় অসংখ্য গণমিছিল, বসেছিল গণসঙ্গীতের আসর। মহল্লায় মহল্লায় চলছিল আসন্ন স্বাধীনতার সংগ্রামের মহড়া, ঐ মহড়ায় অংশগ্রহণকারীদের একটা বিরাট অংশ ছিল মেহনতি মানুষ। এমনি এক মহড়ার জন্য সেদিন বিকেলেও জগন্নাথ হলের মাঠে জড়ো হয়েছিল একদল কষ্টক্লিষ্ট মানুষ। অন্তহীন উদ্যমে চলছিল কুচকাওয়াজ। এদের বেশিরভাগই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী। ওদের শীর্ণ হাত-পা বহন করছিল পুষ্টিহীনতার স্বাক্ষর। দেখে মনে হচ্ছিল না দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে ওরাই গড়ে তুলবে প্রতিরোধের দুর্ভেদ্য ব্যূহ একদিন। কিন্তু ওদের মুখে ছিল সুদৃঢ় প্রত্যয়ের স্পষ্ট ছাপ, চোখে ছিল স্বাধীনতার অনির্বাণ শিখা। সংগ্রামের জয় সুনিশ্চিত— এই আশাতেই স্পন্দিত হচ্ছিল ওদের হৃৎপিণ্ড। ওদের শ্বাস-প্রশ্বাসে ছিল বিপ্লবের অগ্নিকাণ্ড। কিন্তু সে মুহূর্তে বোধ হয় ওদের কেউ ভাবতেই পারেনি যে, কয়েকঘন্টা পরেই বর্বর হানাদার পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে ওদের উপর, জ্বালিয়ে দেবে ওদের যথাসর্বস্ব, আর ওই প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাই হবে এদেশের স্বাধীনতার পূত মোহশিখা। সেদিন হয়তো ওরা ভাবেনি পরিবার-পরিজন সহ চিরদিনের মতো বিদায় নিতে হবে এই সুন্দর পৃথিবী থেকে ওদের অনেককে। প্রতিদিনের মতো সেদিনও সূর্য যথা নিয়মে অস্ত গেল পশ্চিম আকাশে। ঢাকার বুকে নেমে এল রাত্রির অন্ধকার। কর্মক্লান্ত মানুষ ফিরে গেল নিজ নিজ ঘরে। কলকোলাহল মুখরিত ঢাকা ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়লো নিস্তব্ধতার কোলে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই উঠে বসলাম। রাত তখন আনুমানিক বারোটা। চারদিক থেকে বিরাট হৈ চৈ শুনতে পেলাম। মুহূর্তের মধ্যে নানা দুশ্চিন্তা এসে মাথায় ভিড় জমালো। একটা আসন্ন বিপদের আশংকায় রীতিমত ভয় পেয়ে গেলাম।

জগন্নাথ হলের গৃহশিক্ষক হয়ে তখন সপরিবারে গৃহশিক্ষকদের পুরাতন বাসভবনের নীচতলায় থাকি। আমার শ্যালক মাণিক তখন ড্রয়িংরুমে পড়ালেখা করছিল। অন্যান্য সকলে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। মাণিককে নিয়ে দক্ষিণ দিকের দরজা খুলে বাইরে গেলাম। হল থেকে উত্তর দিকে বের হবার রাস্তার পূর্ব পাশে ছিল একটা পান-বিড়ির দোকান। দোকানী ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু দোকানের পাশ দিয়ে হলের মাঠ থেকে শামসুন নাহার হলে গৃহশিক্ষকদের বাসভবন পর্যন্ত জলের পাইপ বসানোর কাজ অত রাত্রিতেও চলছিল। ঠিকাদারের বেশ কয়েকজন লোক পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে রাস্তা কেটে পাইপ বসাচ্ছিল। হাঁটতে হাঁটতে ওদের কাছে গিয়ে চারিদিকে হৈ চৈ শব্দের কারণ জিজ্ঞেস করলুম। কিন্তু ওদের কাছ থেকে কোন কিছু জানা গেল না। ওরা বিভোর ছিল নিজ নিজ কাজে। হৈ চৈ-এর কারণ জানার মতো ওদের সময় ছিল না। হায় অদৃষ্ট! ওরা কি কেউ তখনো বুঝতে পেরেছিল যে, ওদের জীবনের আর মাত্র ১৫/২০ মিনিট বাকি আছে? ওদের জন্য প্রেরিত যমদূত ওদের কাছ থেকে মাত্র ২০০/৩০০ গজ দূরে ইউ.ও.টি.সির সম্মুখের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে!

এ সময় রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে কিছু কিছু লোক ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। অনেক ছাত্রও হল ছেড়ে গিয়েছিল। মনে হয় কয়েকশোর বেশী ছাত্র তখন হলে ছিল না। গৃহশিক্ষকদের মধ্যে রঙলাল বাবু (বর্তমান হল প্রাধ্যক্ষ) ও পরেশবাবু এবং সহকারী গৃহশিক্ষক পরিমলবাবুও ঢাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এরা পরিস্থিতির গুরুত্ব সঠিক উপলব্ধি করে নিরাপত্তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তৎকালীন হল প্রাধ্যক্ষ স্বর্গত ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, গৃহশিক্ষক ঘোষঠাকুর মহাশয় এবং আমি থেকে গেলাম ঢাকাতেই। বিপদের আশঙ্কা আমাদেরও ছিল। কিন্তু অদৃষ্টের লিখন নাকি খণ্ডন করা যায় না। তাই এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কাউকে দিতে হল জীবন আর কাউকে হতে হলো নৃশংস হত্যাযজ্ঞের নীরব দর্শক।

খবরাখবর জানাবার জন্য হলের দারোয়ানদের প্রতি বিশেষ নির্দেশ ছিল। এমন কি রাত্রিতে ঘুম থেকে জাগিয়েও ওরা আমাদেরকে পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখার চেষ্টা করত। আমার ঘরের দরজা খোলা দেখে তৎকালীন দারোয়ান সীতানাথ, মাখন ও প্রিয়নাথ বাসায় এলো। ওদের কাছ থেকে জানা গেল যে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু এর কারণ সম্বন্ধে তারা কিছুই বলতে পারল না। হলের ছাত্রদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে আসার জন্যে বলে পায়চারি করতে লাগলাম। একটা আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় এতটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম যে নিজে এগিয়ে খোঁজ নেয়ার সাহস হচ্ছিল না।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সীতানাথ ও মাখন ফিরে এসে সংবাদ দিল যে, হলের ছেলেরা হলের দক্ষিণ দিকের রাস্তায় গাছের ডাল দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করছে। তারা বলেছে, একটা বড় রকমের গণ্ডগোলের সম্ভাবনা আছে। এ অবস্থায় কি করা উচিত স্থির করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই দারোয়ানদেরকে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের অবস্থা জেনে এসে সংবাদ দেওয়ার জন্য বলে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। চারিদিকের হৈ চৈ যেন ক্রমশ বেড়েই চলছিল।

আলো নিভিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। মুহূর্তের মধ্যে কত দুশ্চিন্তা যে মাথায় এলো তার হিসাব রাখা সম্ভব হয়নি। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম দারোয়ানদের খবরের জন্য। মনে হয় এবারে ২/৩ মিনিটও অতিবাহিত হয়নি। হঠাৎ কান ফাটা এক বিরাট আওয়াজে মাথার কাছে জানালার সবগুলো কাঁচ ভেঙে পড়ে গেল। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নীচে নেমে এলাম। ছেলে-মেয়ে সহ অন্য সকলে চিৎকার দিতে দিতে আমার শোবার ঘরে জড় হলো। প্রথমত শব্দটাকে হাত বোমার শব্দ বলে ভুল করেছিলাম। কারণ ঐ সময়ে ঢাকায় এ রূপ বোমার শব্দ প্রায়ই শোনা যেত। কিন্তু ভুল ভাঙতে বেশী সময় লাগল না। স্পষ্ট শুনতে পেলুম কে যেন মাইক বা ওই জাতীয় কিছুর সাহায্যে ঘোষণা করছে, "Surrender or You Shall be Killed" শব্দগুলো এসেছিল খৃ.ক.উ.-র দিক থেকে এবং বুঝতে আদৌ কষ্ট হল না যে, জগন্নাথ হলের ছাত্রদের উদ্দেশ্য করেই কথাগুলো বলা হচ্ছিল। আরো দু-তিনটি গুলির আওয়াজ এল। ঘোষকের শব্দ থেকে বুঝা যাচ্ছিল যে, সে গাড়ির উপর থেকে ঘোষণা করছে। কারণ গড়গড় শব্দে গাড়িটা হলের মধ্যে প্রবেশ করছিল এবং ঘোষণার শব্দগুলোও পশ্চিম দিকে উত্তর বাড়িকে লক্ষ্য করে এগোচ্ছিল। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম কারা গুলি চালাচ্ছে এত রাতে। গত কয়েকদিন ধরে যে অজানা বিপদের আশঙ্কায় সদা সন্ত্রস্ত ছিলুম এখন আমরা সে বিপদের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ঘনঘন গুলি চলতে লাগল। সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না যে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী রাতের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নিরীহ বাঙালী নর-নারীর উপর।

প্রথম গুলি চালিয়েছিল ঠিকাদারের লোকগুলোকে লক্ষ্য করে। ওদের ধারণা ছিল ঐ লোকগুলো রাস্তায় ব্যারিকেড দিচ্ছে। মনে হয় জগন্নাথ হল এলাকায় বর্বর পাকিস্তানীদের নগ্ন হামলার প্রথম শিকার হয়েছিল, এই হতভাগ্য লোকগুলিই। ক্ষণিকের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলুম। হিংস্র পাকিস্তানী পশুদের হাতে বিনাদোষে অসহায়ভাবে সপরিবারে প্রাণ হারাতে হবে ভাবতেই যেন সবকিছু গোলমাল হয়ে গেল। আমাদের বাসার পূর্ব পাশের ৮নং বাংলোতে তখন থাকতেন এম.এন. হুদা সাহেব। সম্বিৎ ফিরে পেতেই সকলকে নিয়ে বাসা ছেড়ে হুদা সাহেবের বাসায় অথবা উত্তর দিকের ইশা খাঁ রোডের আবাসিক এলাকায় চলে যাওয়ার কথা চিন্তা করতে লাগলুম। ঘোষক এতক্ষণে

মাঠের শহীদ মিনারের কাছাকাছি এসে গেছে এবং ঘনঘন হলের দিকে গুলিবৃষ্টি চলছে। এ সময় আমাদের বাসার উত্তর দিকের রাস্তায় ও যানবাহন চলাচলের এবং গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। রোকেয়া হল এবং শামসুন নাহার হলের দিক থেকেও গুলির শব্দ আসতে লাগল। মনে হল কয়েকটা গুলি পূর্বদিক থেকে আমাদের বাড়িতেও আঘাত করল। একটা দল হলের গৃহশিক্ষকদের নতুন বাড়িটি যেখানে অবস্থিত, সেখানে অবস্থান নিয়ে হলের দিকে আক্রমণ চালাতে লাগল।

ঘটনাপ্রবাহ এতো দ্রুত এগিয়ে চলছিল যে, কোনপ্রকার সিদ্ধান্তই নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তবে বুঝতে পেরেছিলাম যে আমরা চারিদিক থেকেই পাকিস্তানী দ্বারা বেষ্টিত এবং এই চক্রব্যূহ থেকে বের হবার কোন পথ খোলা নেই। তখনকার মনের অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করা সত্যিই দুরূহ। অগত্যা ঘরের একটা নিরাপদ স্থানে সকলকে নিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়লুম। যাতে গুলি সরাসরি আঘাত করতে না পারে এবং মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করতে লাগলুম। মোট কথা নিজেদেরকে সম্পূর্ণ রূপে ভগবানের হাতে সঁপে দিলাম। আজ অবাক হয়ে ভাবি, সেদিন নিশ্চয় ভগবান আমাদের নিঃশব্দ আকুল আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন, তা না হলে এখন ১৯৮০-তে বসে সেদিনের স্মৃতিচারণ করা আদৌ সম্ভব হতো না।

জগন্নাথ হলে অপারেশন চালানোর জন্য পাকিস্তানীদের প্রধান ঘাঁটি ছিল মাঠের উত্তর-পূর্ব কোণের ৭নং বাংলোর পিছনে। ওই সময় ৭ নম্বর বাংলোয় থাকতেন প্রফেসর নফিস আহমেদ সাহেব। ওরা দ্বিতীয় অবস্থান নিয়েছিল আমাদের বাসার পশ্চিমে পাশে। কোড নম্বরের মারফতে ওরা অন্যান্যের সাথে সংযোগ রক্ষা করে চলছিল। মেঝেতে শুয়ে শুয়ে আমরা কোড নম্বরগুলো শুনতে পারছিলাম। কিছুক্ষণ এভাবে থাকার পর আমি আস্তে আস্তে ড্রয়িংরুমে গেলাম। সবগুলো জানালাই ছিল খোলা। জানালা দিয়ে হলের দিকে তাকাতে লাগলুম। গোলার আঘাতে হলের দেওয়ালে আগুন জ্বলে উঠছিল। একটা প্রচন্ড গোলার আঘাতে উত্তর বাড়ির সম্মুখস্থ আমগাছের একটা বড় ডাল ভেঙে পড়লো। মাঠে মিলিটারীর গাড়ি চালানোর শব্দ শোনা চাচ্ছিল। কিন্তু অন্ধকারের জন্য মাঠের মধ্যে কিছু দেখা যাচ্ছিল না।

জানালায় বেশিক্ষণ দাঁড়াতে সাহস হচ্ছিল না। আবার মেঝেতে শুয়ে পড়লুম। সৈন্যদের বুটের শব্দ শুনে মনে হচ্ছিল এই বুঝি ওরা বাসায় ঢুকে পড়ল। হঠাৎ উত্তর পাশের রোকেয়া হলের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কোয়ার্টার হতে হৈচৈ ও কান্নার শব্দ শোনা গেল, গুলির শব্দও হচ্ছিল। মনে হল পাকিস্তানী সেনা ওদের কোয়ার্টারে ঢুকে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে। ধারণাটা আমাদের অমূলক ছিল না। সত্যি সত্যিই ওই সময় পাক-বাহিনীর লোকেরা ওদের অনেককেই হত্যা করেছিল। আবার ড্রয়িংরুমে গিয়ে জানালা দিয়ে তাকাতে লাগলুম। দেখলুম কে যেন মশাল নিয়ে উত্তর বাড়ির তিনতলায়

দক্ষিণ দিকের করিডোরে কিছু খুঁজছে। মনে হল সৈন্যরা হলের ভিতর ঢুকে ছেলেদের খুঁজছে। তখন চারদিকেই গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

রাত আনুমানিক সাড়ে তিনটে। মাঠের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত হলের দারোয়ান—বেয়ারাদের ঘরগুলোতে ওরা আগুন লাগিয়ে দিল। এক নিষ্ঠুর পৈশাচিক প্রতিহিংসায় যেন মেতে উঠেছিল বর্বর পাকিস্তানী সৈন্য। জানালা দিয়ে দেখলুম আগুনের গগনচুম্বী লেলিহান শিখায় সমস্ত মাঠ আলোকিত হয়েছে। ওই আলোতে মাঠে সৈন্যদের চলাচল দেখতে পেলাম। আরও দেখতে পেলাম মাঠের এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে আছে ছোট-বড়ো বেশ কয়েকটি সাঁজোয়া গাড়ি, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম জ্বলন্ত ঘরগুলির দিকে। পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল ঘরগুলি একের পর এক। কেউ কেউ জ্বলন্ত ঘর থেকে কিছু কিছু জিনিসপত্র সরিয়ে এনে মাঠে জড়ো করছিল। ওদের অধিকাংশই ছিল মেয়েলোক এবং ছোট ছেলে-মেয়ে। আগুনের হাত থেকে বাঁচার জন্য গরুগুলো 'হাম্বা, হাম্বা' করতে করতে ছুটে এলো মাঠের উত্তর দিকে। উত্তর বাড়ির মধ্যে সৈন্যদের যাতায়াত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। দক্ষিণ বাড়ি থেকে ভেসে আসা শব্দে বুঝতে পারলুম পাকিস্তানী পশুর দল সেখানেও অমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছে। পাকিস্তানী সৈন্যদের এই তাণ্ডব লীলা দেখছিলুম আর অনেক কিছুই ভাবছিলুম। ভাবছিলুম হলের ছাত্রদের কথা; ভাবছিলুম মাখন, রামবিহারী, সীতানাথ, ধীরেন প্রভৃতির কথা। ওদের পরিজন পরিবারের কথা। ভাবছিলুম জ্যোতির্ময়বাবু, গোবিন্দবাবু, অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যের কথা। ভাবছিলুম নিজের ছেলেমেয়েদের কথা। এদিকে রাত্রি শেষ হয়ে আসছিল। কেন যেন মনে হচ্ছিল নিশা অবসানের সাথে সাথে হয়তো পাকিস্তানীদের ঐ তাণ্ডবনৃত্যের অবসান হবে। আবার ছেলেমেয়েদের মুখে দেখতে পাবো মৃত্যুর বিভীষিকার পরিবর্তে বাঁচার আনন্দ। তাই অধীর ভাবে অপেক্ষা করছিলুম কখন রাত্রি শেষ হবে।

অবশেষে ২৫শে মার্চের ভয়াল রাত্রির অবসান হল, পূর্ব দিগন্তে দেখা দিল ২৬শে মার্চের সূর্য। কিন্তু অবসান হয় না পাকিস্তানী সেনার তাণ্ডবনৃত্যের। বরং সূর্য যতই উপরে উঠতে লাগল পাকিস্তানীদের তাণ্ডবনৃত্যও যেন ততই নারকীয় রূপ ধারণ করতে লাগল। রাত্রির অন্ধকারের তাণ্ডবলীলা যেন ওদের পশু প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করতে পারেনি। তাই চৈত্রের উজ্জ্বল সূর্যালোকে জগন্নাথ হলের মাঠে নিরীহ বাঙালী নিধনের তাণ্ডব নৃত্যে মেতে উঠেছিল ওরা।

অন্ধকার কেটে যেতেই আবার ড্রইংরুমের জানালায় গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলুম মাঠের শহীদ মিনার থেকে ১৫/২০ হাত পূর্বদিকে টারপলিন বা ওই জাতীয় মোটা কাপড় দিয়ে কি যেন ঢেকে রাখা হয়েছে। প্রথমে ভেবেছিলুম মেশিনগান বা অন্য কোন যুদ্ধাস্ত্র ঢেকে রাখা হয়েছে। কারণ মেশিনগানের নলের মতো একটা কিছু দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু অচিরেই সে ভুল ভাঙল। দেখলুম একজন সিপাহী পা এবং অন্য একজন সিপাহী হাত ধরে

একজন দীর্ঘাকৃতি লোককে উত্তর বাড়ি থেকে বয়ে নিয়ে এলো ঐ টারপলিন দ্বারা ঢাকা জিনিসগুলোর কাছে। ওকে তখনও জীবিত বলে মনে হল। দেহটা মাটিতে রাখার পর তার পা নড়ছিল বলে মনে হল। লম্বাকৃতি ফর্সা গড়ন দেখে মনে হল ও ছিল সম্ভবত মৃণাল বোস। ওরা ওকেও টারপলিনের নীচে রাখল। টারপলিনের নীচে আরও বেশ কয়েকজনকে দেখা গেল। এবারে পরিষ্কার হয়ে গেল টারপলিন দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে যুদ্ধাস্ত্র নয়; গত রাত্রিতে ওই যুদ্ধাস্ত্রের শিকার জগন্নাথ হলের নিরীহ ছাত্ররা-যাদের অনেকেই হয়তো তখনও জীবিত ছিল। আরও বুঝতে পারলুম যে ওরা মৃত বা জীবিত সকলকেই এইভাবে মাঠে নিয়ে আসবে। নিজের পরিবারের লোকের কথা ভাবতেই সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো। তাড়াতাড়ি গিয়ে সকলের সাথে মেঝেতে শুয়ে পড়লুম।

এদিকে চলমান গাড়ি থেকে বার বার প্রচারিত হতে লাগল পতাকা নামিয়ে ফেলুন নইলে বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। ঐ সময়ে প্রায় সকল বাড়ির উপরই উড়ছিল কালো পতাকা বা 'জয়' 'বাংলা' পতাকা। আমাদের বিল্ডিং-এর উপর ছিল কালো পতাকা। অতি সন্তর্পণে নামিয়ে আনা হল পতাকা। ঘরে ছিল, 'জয়বাংলা' পতাকা। নষ্ট করে ফেলা হয় ওটা। রান্না ঘরের জানালা দিয়ে উত্তর পাশের রাস্তার দিকে তাকাতেই যা দেখতে পেলুম তাতে শরীরের রক্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। দেখলুম ১৫/১৬টি মৃতদেহ জড়ো করে রাখা হয়েছে। কি ভয়াবহ নৃশংসতা! ২/৩ মিনিট যেন পাথরের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

বেলা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কখনও বাথরুমের ভেনটিলেটরের মধ্যে দিয়ে ইউ.ও.টি.সি-র সম্মুখস্থ রাস্তায় মিলিটারী যানবাহনের চলাচল লক্ষ্য করছি, আবার কখনো জানালা দিয়ে মাঠের দিকে তাকাচ্ছি। কিন্তু বেশিক্ষণ জানালার কাছে দাঁড়াতে সাহস হচ্ছিল না। অধিকাংশ সময়ই অন্যান্যদের সাথে মেঝেতে শুয়ে কাটাচ্ছিলুম। মাঠের দক্ষিণ দিকে বেশ কয়েকজন পুরুষ-স্ত্রী লোক ও ছেলেমেয়ে ছিল। গত রাত্রে এদেরই ঘরদোর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবার লক্ষ্য করলুম ৪/৫জন সিপাহী ৩/৪ জন সাধারণ লোককে নিয়ে খ্.ক.উ-র দিক থেকে মাঠে প্রবেশ করল এবং ওদেরকে নিয়ে দক্ষিণ দিকে লোকগুলোর নিকট গেল এবং প্রায় সবগুলো পুরুষলোককে নিয়ে ই ন ব ঠ ফ হ-র দিকে গেল। ওদেরকে দিয়ে বিভিন্ন স্থান থেকে মৃত এবং আহত লোকগুলোকে মাঠে আনা হয়েছিল।

বেলা আনুমানিক ১০টা। ভেনটিলেটরের মধ্যে দিয়ে ইউ.ও.টি.সি-র দিকে তাকিয়ে আছি। মেডিকেল কলেজের দিকে থেকে একটা মিলিটারীদের জিপ এসে ইউ.ও.টি.সি-র সামনে দাঁড়াল। সঙ্গে ছিল একটা কি দুটো সৈন্য বোঝাই ট্রাক। জীপ থেকে একজন অফিসার বের হয়ে মাঠের দিকে লক্ষ্য করে একটা ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাঠে একটা গুলির আওয়াজ হলো এবং এ্যাসেম্বলীর দিক থেকে ভেসে এলো অনেকগুলি

স্ত্রীলোকের কান্না ও আর্তনাদের শব্দ। দেখলুম ৩/৪ জন সিপাহী মাঠ থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তার উপরে অপেক্ষমান ট্রাকে উঠল এবং জিপ ও ট্রাকগুলো রোকেয়া হলের দিকে চলে গেল।

আমিও তাড়াতাড়ি ড্রইংরুমে গেলুম এবং জানালা দিয়ে মাঠের দিকে তাকাতেই যে নারকীয় দৃশ্য চোখে পড়ল তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ঘটনার নৃশংসতা দেখে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছিল, গলা শুকিয়ে আসছিল। তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে মেঝেতে বসে পড়লুম। অন্যান্যরা তখনও ঘুমাচ্ছিল। মাণিককে জাগিয়ে তুললুম এবং এক গ্লাস জল খেলাম। কয়েক মিনিট পর মাণিককে নিয়ে আবার জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম। রাত্রিতে যেখানে কতগুলি মৃতদেহ জড়ো করে রাখা হয়েছিল সে বরাবর উত্তর-দক্ষিণে পড়ে আছে আরও অনেক লোক। মনে হল লোকগুলোকে উত্তর-দক্ষিণে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হয়েছিল। কিছুক্ষণ আগেও যেখানে গরুর হাম্বা রব আর কাকের কা কা শব্দ ভিন্ন অন্য কোন জনপ্রাণীর কোন রূপ সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না—এখন সেখানকার আকাশ-বাতাস ভরে উঠেছিল পাকিস্তানী পশুদের শিকার— নিরীহ মৃতপথযাত্রী বাঙালীর আর্তনাদে। হ্যাঁ, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পশুর চেয়েও অধম ছিল, কেননা কোন মানুষের পক্ষেই সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে অন্য মানুষের উপর এমন বীভৎস ও জঘন্য অত্যাচার চালানো সম্ভব নয়। যাদের গুলি করা হয়েছিল তাদের অনেকেই তখনো জীবিত ছিল। 'জল-জল' চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! দুই-এক জন দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে গেল। কেউ কেউ ২/৩ পা হেঁটে গিয়ে আবার ঢলে পড়েছিল মাটিতে। কেউ কেউ মাথা উঁচু করে চারিদিকে তাকাচ্ছিল। তখন মাঠে কোন সৈন্য ছিল না। শুধু দক্ষিণ দিকে কতগুলো স্ত্রী লোক দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। ওদের আত্মীয়-স্বজন ছিল ঐ মৃত ও আহতদের মধ্যে। আহতদের মধ্য থেকে হঠাৎ ২/৩ জন উঠে দক্ষিণ দিকে দৌড়ে গেল। এবং দুই জন দৌড়ে এলো আমাদের বাসার দিকে। একজন 'স্যার, স্যার' বলে ডাকতে লাগল। কিন্তু দক্ষিণ বা পশ্চিম দিকের দরজা খুলে ওকে সাহায্য করার সাহস হল না। লোকটা দৌড়ে বাড়ির পূর্বদিকে গেল। আমরাও ছুটে গিয়ে পূর্বদিকের দরজা খুলে দিলুম কিন্তু লোকটার আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। এই লোকটি ছিল হেমলাল মালী। সে আজও বেঁচে আছে। আমাদের কোন সাড়া না পেয়ে সে গাছের আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছিল।

আবার ফিরে গেলুম জানালায়। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম মাঠের মানুষগুলোর দিকে। যতদূর গুনতে পেরেছিলাম তাতে লোকগুলোর সংখ্যা ৮০-এর মতো মনে হলো। তবে স্তূপের মধ্যে অনেক দেহ ছিল। কি হৃদয় বিদারক দৃশ্য! মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল হয়তো আমাদেরকেও ওখানে নিয়ে এভাবে গুলি করে মারবে। দেখলুম কজন স্ত্রীলোক ২/৩জনকে দক্ষিণ দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ওরা ছিল হয়তো ওদের আপনজন এবং

তখনও জীবিত ছিল। কাছাকাছি যখন কোন পাক-সৈন্য দেখা যাচ্ছিল না, তখন মেয়েলোকগুলো জল খাওয়াচ্ছিল। সবই নাকি ভগবানের লীলাখেলা, আর সেটাই বোধহয় পরম সত্য— নইলে এই মানবনিধনযজ্ঞ থেকে আমরাই বা বেঁচে থাকলুম কিরূপে।

বেলা আনুমানিক ৩টা। হঠাৎ শুনতে পেলুম কে যেন কাতরাচ্ছে 'স্যার জল, স্যার' জল। দরজার কাছে এগিয়ে বুঝতে পারলুম শব্দটা আসছে তেতলার সিঁড়ির কাছ থেকে। মনে হলো গুলির আঘাতে আহত কোন ছাত্র পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে ওখানে। কিন্তু নীচ তলা থেকে তাকে কোন জল দেওয়া বা সাহায্য করা সম্ভব হয় না। কারণ উপরে যাওয়ার জন্য দরজা খুললেই মুসলিম হলের গেট পর্যন্ত দেখা যায় এবং তখনও আমাদের পাশের রাস্তা দিয়ে মিলিটারির টহল চলছিল। প্রকৃত পক্ষে ওই লোকটি হলেরই ছাত্র ছিল। আঘাত লেগেছিল তার হাতে এবং রক্তক্ষরণের দরুন সে মারা যায়। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল যেন একটা শ্মশানভূমিতে নীরব দর্শক রূপে দাঁড়িয়ে আছি আমরা, চারিদিকে পড়ে রয়েছে মৃতদেহ। বেলা ৪টার দিকে মাঠে প্রবেশ করল একটা বিরাট বুলডোজার। মৃতদেহগুলি যেখানে পড়েছিল তার পাশ ঘেঁষে উত্তর-দক্ষিণ দিকে খোঁড়া হতে লাগল একটা গর্ত। বুঝতে এতোটুকু কষ্ট হলো না যে, ঐ গর্তে মাটি চাপা দেওয়া হবে ওই লোকগুলোকে যাদের মধ্যে ছিলেন হলের প্রভোষ্ট স্বর্গত ড. গোবিন্দ দেব, সহকারী গৃহশিক্ষক স্বর্গত অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, দারোয়ান প্রিয়নাথ ও দুখীরাম এবং হলের অনেক ছাত্র। হায় জগন্নাথ হল! পাক-বাহিনীর মৃত্যুছোবল হতে আত্মরক্ষার মতো নিরাপদ আশ্রয় সে দিতে পারেনি এ মানুষগুলোকে। কিন্তু হলের সাথে যে নিবিড় সম্পর্ক ছিল, সেটা ছিন্ন করা কিছুতেই সম্ভব হয়নি বর্বর পাক বাহিনীর পক্ষে। তাই মৃত্যুর পর এরা চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন জগন্নাথ হলের কোলে, হলের মাঠে।

সাড়ে পাঁচটার দিকে ড্রইংরুমের জানালা দিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখলুম গর্ত খোঁড়া হয়েছে, পাশেই রয়েছে উঁচু মাটির স্তূপ। লোকগুলোর মধ্যে তখনও কেউ কেউ জীবিত ছিল। বুলডোজারটি একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে, ড্রাইভারের পাশে বসে ছিল একজন সিপাহী। হঠাৎ নজর পড়লো একজন সৈন্যর উপর। সে আমার জানালা থেকে ১০/১২ হাত দূরে বাসার দক্ষিণ পাশে বেড়া ঘেঁষে আমাদের বাড়ির দিকে একটি মেশিনগান তাক করিয়ে রেখেছে। এই অবস্থায় রীতিমত ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হলো সৈন্যটি হয়তো আমাকে দেখে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি জানালা থেকে সরে গিয়ে খাটের নীচে মেঝেতে শুয়ে পড়লুম। আবার বুলডোজারের শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দ আমাদের কানে বাজছিল আশু মৃত্যুধ্বনিরূপে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। মনে মনে ভাবছিলুম আমাদেরকেও নিয়ে গিয়ে ওদের সাথে মাটি চাপা দেওয়া হবে। এখন ভাবতে অবাক লাগে যে সেদিন এতো বিপদের মধ্যেও চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়ে নি। কিন্তু দশ বৎসর পরে আজ সেদিনের কাহিনী লিখতে বসে দেখছি দুই চোখের পাতা ভিজে উঠেছে।

এ সময় মাঠের মধ্যে ট্রাক জাতীয় ভারী যানবাহন চলাচলের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এ সকল যানবাহনে করে চারিদিক থেকে আরও মৃত বা আহত লোকদের মাঠে আনা হচ্ছিল। আমরা সকলে ভিতরের ঘরে খাটের নীচে মেঝেতে গাদাগাদি করে পড়েছিলাম। সারাদিন খাবারের মধ্যে ছিল মুড়ি আর জল। বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগের একমাত্র অবলম্বন ছিল রেডিও। কানের সাথে রেডিও ঠেকিয়ে শুনলাম বি.বি.সির খবর এবং অন্যান্য স্টেশনের খবর। দেশের তৎকালীন পরিস্থিতিরও একটা আন্দাজ করা গেল। এ সময়ে ঢাকা রেডিও থেকে ঘোষণা করা হলো শনিবার সকাল আটটায় কারফিউ তুলে নেওয়া হবে। হিসেব করে দেখলুম আর ১২/১৩ ঘন্টা বাকি। আরও মনেপ্রাণে ভগবানকে ডাকতে থাকলুম। রাত আনুমানিক আটটা। মাঠ থেকে বুলডোজার ইত্যাদি যানবাহন বের হয়ে গেছে, কারণ ওগুলোর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। বুঝলাম মাটি চাপা দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। পাকিস্তানীরা ধর্ম নিয়ে বড়াই করত। কিন্তু সে দিন কি দেখলুম জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলিম মৃত-জীবিত সকলকে ওরা বুলডোজারের আঘাতে একই গর্তে ফেলে মাটি চাপা দিল। মৃতের দাফন বা সৎকারের কোন ধর্মীয় আচারের ব্যবস্থা কি সেদিন করেছিল ওই পাকিস্তানী বর্বরের দল? অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! আজও ওরা জোর গলায় প্রচার করছে— ওদের মতো ধর্মভীরু জাতি পৃথিবীতে খুব কমই আছে!

কিছুক্ষণ পরেই উত্তর দিকের রাস্তায় বুলডোজারের শব্দ শোনা গেল। শামসুন নাহার হলের গেটের সামনে গর্ত করে অনেকগুলো লোককে মাটি চাপা দেওয়া হলো। কাজটি চলল রাত ১০টা পর্যন্ত।

রাত বাড়তে লাগল। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম কখন রাত শেষ হবে। এক একটা মিনিট এক একটা ঘন্টার মতো মনে হচ্ছিল। রাত একটার দিকে আবার বুলডোজার অন্যান্য যানবাহনের সাথে মাঠে ঢুকলো। মনে হল মাঠে আর একটা গর্ত খোঁড়া হচ্ছে। থেকে থেকে মনে হচ্ছিল এই বুঝি বুলডোজার বেড়া ভেঙে বাসার মধ্যে ঢুকে পড়ল। রাত আনুমানিক চারটার দিকে বুলডোজার আর অন্যান্য যানবাহন মাঠ ছেড়ে চলে গেল। আমরাও অনেকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভোরের অপেক্ষা করতে লাগলুম। রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে মিলিটারী গাড়ি চলাচলের শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। ধীরে ধীরে অন্ধকার কেটে গিয়ে ২৭ শে মার্চ শনিবার ভোরের আবির্ভাব ঘটল। জানালা দিয়ে মাঠের দিকে তাকালুম। সেখানে কোন সৈন্য দেখা গেল না। যেখানে মৃতদেহগুলো মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল সেটা দেখা গেল। বেলা বাড়তে থাকলো।

রেডিওতে আবার ঘোষণা করা হলো ৮টা থেকে কারফিউ উঠে যাবে। আটটা বাজল। কিন্তু বাইরে কোন লোকজন দেখা গেল না। সাড়ে আটটার দিকে একটা লোককে

মেডিক্যাল সেন্টারের নিকটে রাস্তা পার হতে দেখলুম। দক্ষিণ দিকের দরজা খুলে ছোট্ট বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালুম। মনে হল যেন পুনর্জন্ম পেয়েছি। যাদের মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল তাদের দু-একটা হাত-পা উপরে দেখা যাচ্ছিল। একটা লোক এসে কেঁদে পড়ল— ওর পরিবারের কারোও খোঁজ নেই। ধীরেন এসে জানাল ড. গুহঠাকুরতা আহত হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়ছেন, গোবিন্দবাবু বেঁচে নেই, অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যও নেই। নেই প্রিয়নাথ এবং আরও অনেকে। হুদা সাহেবের বাসার কাজের ছেলেটি এল আমাদের খোঁজ নিতে। আরও অনেকের নিহত ও আহত হওয়ার কথা শুনলুম। ইতিমধ্যে বহু লোক মাঠে ভিড় করেছে। হতভম্বের ন্যায় সবকিছু দেখছিলাম আর শুনছিলাম। সম্বিৎ ফিরে পেলুম বড়ো ছেলে সমীরের ডাকে। সে বলল, বাসায় আর এক মিনিটও থাকা নিরাপদ নয়। পরিবারের সকলকে নিয়ে চলে গেলাম পাশের কলোনীতে। কিন্তু একটা প্রশ্নের জবাব আজও জানিনা। কেন সেদিন পাকিস্তানী সৈন্য জগন্নাথ হলের গৃহশিক্ষকদের বাসভবনে ঢোকেনি?

২৫শে মার্চে জগন্নাথ হলের সেই ভয়াল রাতের স্মৃতি

কালীরঞ্জন শীল

১৯৭১-র ২৫শে মার্চ। এ দিনটার কথা ভাবতেই আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। প্রতিবছর মার্চ মাস আসে আর মনে পড়ে ২৫ শে মার্চের সেই ভয়াল রাতটার কথা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের উপর পাক-বাহিনীর বর্বর হামলার আমি একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী। সেদিন জীবনটা যেতে যেতেও রয়ে গেছে কোনরকমে। ভাবতেও অবাক লাগে— আমি বেঁচে থাকবো, বেঁচে আছি! এখনো মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয় না। একি সত্যি, না স্বপ্ন, না কোন ঘোরের মধ্যে সে সময়টা কাটিয়েছি! আমি থাকতাম জগন্নাথ হলের দক্ষিণ ভবনের দ্বিতলে, ২৩৫ নম্বর কক্ষে। মার্চের শুরুতেই ঢাকা শহর উত্তপ্ত ছিল। ঘটনাপ্রবাহ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছিল। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মানুষ নতুন নতুন খবর শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত। শহরে নানারকম জল্পনা-কল্পনার মধ্যে ওই দিনটিও গড়িয়ে যাচ্ছিল। আমি সমস্ত দিন মিটিং, প্যারেড, মিছিল করে রাত দশটার দিকে হলে ফিরলাম। খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম অল্পক্ষণের মধ্যে। হঠাৎ মাথার কাছাকাছি বোমার এক বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। সজাগ হয়েই শুনি চর্তুদিকে শুধু গগনবিদারী টর-টর-টর শব্দ আর মাঝে মাঝে সে শব্দকে ছাপিয়ে গুর-গুর-গুরুম শব্দ এবং দালানকোঠা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। মনে হচ্ছিল হলের পুরনো দালান বুঝি এখুনি ভেঙে পড়বে। এমন

গোলাগুলির শব্দ জীবনে শুনিনি, কল্পনাও করতে পারিনি। এ অবস্থার মধ্যে পড়ে প্রথমে একটু ঘাবড়িয়ে গেলাম। কি করা দরকার বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল। সঠিক কিছু স্থির করতে না পেরে রুম থেকে বেরিয়ে পড়লাম। নুয়ে নুয়ে দক্ষিণ দিকের সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠলাম। সেখানে সিঁড়ির কাছে আরো কয়েকজন ছাত্র জড়ো হয়েছিল আগেই। সুশীলকে খুঁজছিলাম। দেখলাম তিনতলা সিঁড়ির কাছে তার রুম তালা বন্ধ। সুশীল ছিল আমাদের হলের সহ-সম্পাদক। পরে শুনেছি সে গোলাগুলির শুরুতেই মেইন বিল্ডিং-এ (উত্তর ভবনে) চলে গিয়েছিল এবং সেখানে মারা গিয়েছিল। কেউ কেউ ছাদে ওঠার কথা বলল আমাকে। কিন্তু ওদের কাছ থেকে আমি তিনতলার বারান্দা দিয়ে নুয়ে নুয়ে উত্তর দিকের ল্যাট্রিন ও বাথরুমের কাছে গেলাম। দেখি উত্তর বাড়ির সমস্ত আলো নিভানো। মিলিটারী হলে ঢুকে টর্চের আলোতে ছাত্রদের খুঁজে খুঁজে বের করে এনে সামনের মাঠে শহীদ মিনারের কাছে গুলি করে মারছে। এক একটা ব্রাশ ফায়ার করছে আর চিৎকার করে কতগুলি তাজা প্রাণ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিল। কেউ দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করলেই তাকে সে অবস্থায় গুলি করে মারছে। এখনো ভাবতে পারি না এ দৃশ্য এতো বাস্তব ও জীবন্ত, তবু মনে হয় স্বপ্ন। মাঝে মাঝে দালানের উপর ভারী কামানের গোলা বর্ষণ হচ্ছে। কোন কোন স্থানে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। এ সময় এ্যাসেম্বলীর সামনে ডাইনিং হলটি জ্বলতে দেখলাম। মাঝে মাঝে উপর থেকে নীচে সবুজ ও লাল রঙের আলোর গোলা নামতে দেখছি। তখন চর্তুদিক আলোকিত হয়ে উঠছিল। সেই আলোতে দেখা গেল উত্তর বাড়ির সামনের মাঠে শত শত মিলিটারী মেশিনগান ও ভারী কামানের গোলাগুলি বর্ষণ করছে নির্বিচারে। এক সময়ে দেখলাম এক-একটি গাড়ির বহর হেড়লাইট বন্ধ করে থেমে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ থেকে আবার চলে যাচ্ছে। সম্ভবত দেখে নিচ্ছে ঠিক ঠিক গুলি হচ্ছে কিনা, মানুষ মরছে কিনা। হঠাৎ এক সময় দেখা গেল সলিমুল্লাহ হলের দিক থেকে ৪০/৫০ জন মিলিটারী দক্ষিণ বাড়ির ঘরের দিকে এলো এবং দরজা ভেঙে খাওয়ার ঘরে ঢুকল। খাওয়ার ঘরে আলো জ্বালালো এবং এলোপাথাড়ি জানালা-কবাটের উপর গুলি ছুঁড়তে লাগল। কয়েকজন চিৎকার করে মারা গেল বুঝতে পারলাম। এমন সময় দক্ষিণ বাড়ির দারোয়ান প্রিয়নাথকে নিয়ে বেরিয়ে এলো মেশিনগানের মুখে। তাকে দিয়ে হলের মেইন গেট পশ্চিম দিক দিয়ে খুলিয়ে ঢুকে পড়ল হলের মধ্যে। তখন আমি মিলিটারীদের দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমি প্রথমে ল্যাট্রিনে ও সেখান থেকে জানালা পেরিয়ে তিনতলার কার্নিশে গেলাম এবং শুয়ে পড়লাম। সেখানে কয়েকটি শাল গাছ ছিল। একটি মোটা ডাল (শাখা) কার্নিশের কাছে নুয়ে ছিল। একবার ভাবলাম গাছে উঠি। শেষ পর্যন্ত গাছে না উঠে কার্নিশেই শুয়ে পড়লাম। হলের মধ্যে থেকে শুধু গুলির শব্দ আর চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। একতলা, দোতলা করে এভাবে ওরা তিনতলায় উঠল বুঝলাম। এক সময় আমার কাছে কয়েকটা

গুলির শব্দ হলো। আমার মাথা সোজা দেওয়ালে, বিপরীত দিকে একটা লোক গোঙাচ্ছে শুনতে পেলাম। আমি তখন ভাবছি কখন আমাকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসে। কিন্তু আমাকে ওরা দেখেনি বুঝতে পারলাম। বুঝলাম ওরা নেমে গেল। নিচ থেকে 'ফরিদ,' বলে ডাক দিল। একজন সৈন্য সাড়া দিয়ে দৌড়ে নেমে গেল। যেভাবে ছিলাম সেভাবে শুয়ে থাকলাম কিছু সময়। এক সময় কার্নিশ থেকে উঠে এসে আবার ল্যাট্রিনে ঢুকলাম এবং সেখান থেকে উত্তর বাড়ি, তার সামনে মাঠ ও সলিমুল্লাহ হলের যে অংশ দেখা যাচ্ছিল সেখানে মিলিটারী তাণ্ডবলীলা দেখতে লাগলাম আর কখন এসে আমাকে ধরে নিয়ে গুলি করে সেই মুহূর্ত গুণতে লাগলাম। এক সময় দেখা গেল সলিমুল্লাহ হলের দিকে আগুন। সলিমুল্লাহ হলের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বড়ো একটি গাছে ও আগুন জ্বলতে দেখলাম। মাঝে মাঝে উত্তর বাড়ির পশ্চিম দিকে আকাশ লাল হয়ে উঠেছিল আর বুঝতে পারছিলাম ওদিকে কোথাও আগুন লাগিয়েছে পাক সেনারা। বাইরের মত হলের মধ্যেও চললো সারারাত গোলাগুলি আর আগুন। এক সময় কোন একদিকে আজানের শব্দ শুনতে পেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে আরও কয়েকদিকে আজান শোনা গেল। মনে হলো আজানের এমন করুণ সুর, এতো বিষণ্ণ সুর আর কোনদিন শুনিনি। গোলাগুলির শব্দ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু বন্ধ ছিল মুহূর্তের জন্য মাত্র। আবার চলল গোলাগুলি পুরো দমে। ভোরের দিকে মাইকে কারফিউ জারির ঘোষণা শুনলাম। তখন ভাবলাম বেলা হলে বোধহয় এমন নির্বিচারে আর মারবে না। কিন্তু একটু ফর্সা হয়ে যেতেই দেখা গেল এখানে সেখানে পালিয়ে থাকা ছাত্রদের ধরে এনে গুলি করছে। যেন দেখতে না পায় আমাকে এভাবে মাথা নিচু করে ল্যাট্রিনের মধ্যেই বসে রইলাম। বেলা হল। এক সময় আমার কাছাকাছি বারান্দায় অনেকের কথা শুনতে পেলাম। ছাত্ররা কথা বলছে তা নিশ্চিত হয়ে আমি ল্যাট্রিনের দরজা খুলে বেরোলাম। বেরিয়েই দেখি সিঁড়ির মাথায় মেশিনগান তাক করে মিলিটারী দাঁড়িয়ে আছে। আর কয়েকজন ছাত্র একটি লাশ ধরাধরি করে নামাবার চেষ্টা করছে। রাতে আমার কাছে দেওয়ালের ওপাশে যে গোঙাচ্ছিল এটা তারই লাশ। এবং সে আর কেউ নয়, আমাদের হলের দারোয়ান, সবার প্রিয়নাথদা। তাকে দিয়ে মেশিনগানের মুখে সব পথ দেখে দেখে নিয়ে নামার মুহূর্তে এখানে গুলি করে রেখে গেছে। আমিও আর নিষ্কৃতি পেলাম না। আমাকেও ধরতে হলো লাশ। তিনতলা থেকে দোতলা, সেখান থেকে একতলা এবং দক্ষিণ দিকের ভাঙা গেট দিয়ে ব্যাঙ্কের (এখন যেটা সুধীরের ক্যান্টিন ওটা ছিল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তান) উত্তর পাশে নিয়ে রাখলাম। আরও লাশ জড়ো করা হলো সেখানে। ওখানে আমাদের বসার নির্দেশ দিল একজন পাক সেনা।

তখন ছিলাম আমরা কয়েকজন ছাত্র, কয়েকজন মালী, লণ্ড্রীর কয়েকজন দারোয়ান, গয়ানাথের দুই ছেলে শঙ্কর ও তার বড় ভাই, আর সবাই ছিল সুইপার। লাশগুলির পাশ

ঘিরে আমরা সবাই বসে ছিলাম। সুইপাররা ওদের ভাষায় মিলিটারীদের কাছে অনুরোধ করছিল ওদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য। বলছিল, ওরা বাঙালী নয়। সুতরাং ওদের কি দোষ? একজন মিলিটারী ওদের আলাদা হয়ে বসতে বলল আমাদের কাছ থেকে। ওদের নিয়ে কয়েকজন মিলিটারী সোজা উত্তর বাড়ির মাঠে চলে গেল। ভাবলাম ওদের ছেড়ে দেবে। আমাদের আবার ওই লাশগুলো বহন করার আদেশ দিল। লাশগুলি নিয়ে এ্যাসেম্বলীর সামনের রাস্তা দিয়ে সোজা পূর্ব দিকের গেটের বাইরে চলে গেলাম। গেটের বাইরে দক্ষিণ পাশে একটি বড় গাছের গোড়ায় জড়ো করলাম লাশগুলো। এই সময় আমাদের সাথে প্রায় সমান সংখ্যক মিলিটারী ছিল। তারা সবাই ছিল আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। ওখানে যেয়ে মিলিটারীরা দাঁড়াল অনেকক্ষণ। একজন সিগারেট বের করে দিল সবাইকে। আমাদের কেউ বসে, কেউ শুয়ে থাকলো। আমিও কাত হয়ে ছিলাম গাছের শিকড়ের উপর। এখানে পাক-সেনারা আমাদের উদ্দেশ্যে বিশ্রী ও অকথ্য ভাষায় ক্রমাগত গালাগালি করছিল। যতটা বুঝতে পারছিলাম তাতে বুঝলাম, শালা! বাংলাদেশ স্বাধীন করিয়ে দেব। বল একবার শালারা জয় বাংলা। শেখ মুজিবকেও বাংলাদেশ স্বাধীন করিয়ে দেব। আরও নানা অশ্লীল গালাগালি দিচ্ছিল। এ সময় একটি গাড়ির বহর রেসকোর্সের দিক থেকে এসে ওখানে থামলো। আমাদের সাথের মিলিটারী একজন সামনের একটি জীপের কাছে গেল। তাকে কিছু নির্দেশ দেওয়া হলো বুঝলাম।

সেখান থেকে আমাদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন দিকে নিয়ে গেল লাশ বয়ে আনতে। আমাদের অংশটিকে নিয়ে গেল ড. গুহঠাকুরতা যে কোয়ার্টারে থাকতেন সেই দিকে। সেই বিল্ডিং-এর সিঁড়ির কাছে অনেকগুলি লাশ পড়েছিল। সিঁড়ির কাছে এনে গুলি করেছে বোঝা গেল। একটি লাশ দেখলাম সাদা পাজামা-পাঞ্জাবী পরা, মাথায় টুপি, পাতলা চেহারা। সেখান থেকে নিয়ে গেল দোতলা, তিনতলা ও চারতলায় লাশ বয়ে আনতে। প্রতিটি তলায় ওরা খোঁজ নিচ্ছিল কোন জীবিত প্রাণী আছে কিনা। আর খুঁজছিল দামী মালামাল ঘড়ি, সোনাদানা ইত্যাদি। চারতলায় একটি রুমে ঢুকতে পারছিল না। কারণ রুমের দরজা বন্ধ ছিল ভিতর থেকে। দরজা ওরা ভেঙে ফেলল । ঢুকে কাউকেই পাওয়া গেল না। কতকগুলি এলোমেলো কাপড়-চোপড় বিছানা-পত্র ছাড়া কিছুই ছিল না সেখানে। একজনকে ছাদে উঠে কালো পতাকা এবং স্বাধীন বাংলার পতাকা নামাতে বলল। পতাকা নামিয়ে আনলে মিলিটারীদের একজন নিয়ে নিল সেগুলো। আমাকে নীচে নামতে বলল। নীচে নামলাম আমরা। সিঁড়ির কাছের লাশগুলো নিতে বলল। অনেক লাশ রাস্তায় আগেই জমা করা ছিল। বয়ে আনা লাশগুলি জড়ো করলাম এগুলির পাশে। পরে নিয়ে গেল ঐ বিল্ডিং-এর সামনে দোতলা বাংলো বাড়িটিতে (তখনকার এস.এম.হলের প্রভোস্টের বাড়ি) সামনে দিয়ে ঢুকতে না পেয়ে পিছন দিয়ে ঢুকলাম ঐ বাড়িতে। নিচতলা, দোতলার সবগুলি রুমেই খুঁজলাম। এলোমেলো কাপড়-

চোপড়, সুটকেস, বাক্স, খোলা ফ্যান ছাড়া কিছুই দেখা গেল না সেখানে। মিলিটারীরা দামী জিনিসপত্র খুঁজে খুঁজে নিয়ে নিল। কোন লাশ কিংবা রক্তের দাগ ছিল না ঐ দালানে। নেমে আসলাম আমরা সবাই এবং জড়ো হলাম আবার লাশের কাছে। মিলিটারীরা কালো পতাকা এবং স্বাধীন বাংলার পতাকা পোড়ালো। আমাদের আবার লাশ নিতে বলল। রাস্তা দিয়ে সোজা উত্তর দিকে অধ্যাপক গোবিন্দ দেবের বাসার সম্মুখ দিয়ে ইউ.ও.টি.সি. বিল্ডিং-এর সামনে জগন্নাথ হলের মাঠের পূর্বদিকের ভাঙা দেওয়াল দিয়ে ঢুকতে বলল। হলের মেইন বিল্ডিং-এর সামনে শহীদ মিনারের সংলগ্ন লাশগুলির কাছে জড়ো করতে লাগলাম লাশগুলি। লাশ যখন নিচ্ছিলাম তখন দেখলাম ডক্টর দেবের বাসা থেকে বের করে নিয়ে আসছে সেলাইয়ের মেশিন ও অন্যান্য ছোট ছোট জিনিসপত্র। রাস্তার পাশে অনেকগুলি মিলিটারী ট্রাক যুদ্ধের বিভিন্ন সরঞ্জাম নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। শিববাড়ির রাস্তার তিনামাথায় অনেকগুলি মর্টার চর্তুদিকে তাক করে রেখেছিল। দুই, তিনজন করে আমরা এক-একটা লাশ বহন করছিলাম। কোন জায়গায় বসলে কিংবা ধীরে ধীরে হাঁটলে গুলি করার জন্যে তেড়ে আসছিল। সব সময়েই আমরা সবাই গা ঘেঁষে বসছিলাম ও চলছিলাম।

কতগুলো লাশ এভাবে বহন করেছি ঠিক মনে নেই। শেষ যে লাশটা টেনেছিলাম তা ছিল দারোয়ান সুনীলের। তার শরীর তখনও গরম ছিল। অবশ্য রৌদ্রে থাকার জন্যও হতে পারে। লাশ নিয়ে মাঠের মাঝামাঝি যেতেই হঠাৎ কতকগুলি মেয়েলোক চিৎকার করে উঠল। দেখি মাঠের দক্ষিণ দিকের বস্তিটির ছেলেমেয়েরা মাঠের দিকে আস্তে চাচ্ছে আর পাক সেনারা মেশিনগান নিয়ে ওদের তাড়াচ্ছে। সামনে চেয়ে দেখি সুইপারদের মাঠে এনে দাঁড় করিয়েছে গুলি করার জন্য। এই সব সুইপারদেরই ব্যাঙ্কের কাছ থেকে আলাদা করে এই মাঠে নিয়ে এসেছিল ওরা। সুইপারদের গুলি করে মারছে আর ওই ছেলেমেয়েরা চিৎকার করছে এবং ছুটে যেতে চাচ্ছে ওদিকে। বুঝলাম এবার আমাদের পালা। আমাদের আগে যারা লাশ নিয়ে পৌঁছেছিল তাদেরও দাঁড় করিয়েছে। তাদের মধ্যে একজন খুব জোরে জোরে কোরানের আয়াত পড়ছিল। ব্যাঙ্কের কাছে যখন বসেছিলাম তখন জেনেছি এই ছেলেটি জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। কিশোরগঞ্জে ছিল তার বাড়ি। আগের দিন বিকালে আর এক বন্ধু সহ এসে উঠেছিল তার হলের এক বন্ধুর রুমে। গুলি করল তাদের সবাইকে। আমরা কোনরকমে দুজনে লাশটা টানতে টানতে নিয়ে এসেছি। সামনেই দেখি ড. গোবিন্দ দেবের মৃত দেহ। ধুতি পরা, খালি গা ক্ষতবিক্ষত ও বিকৃত সারা শরীর। পশ্চিম দিকে মাথা দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে। আমার সাথে যে ছেলেটি লাশ টানছিল সে গোবিন্দ দেবের লাশটি দেখে বলল, দেবকেও মেরেছে! তবে আমাদের আর মরতে ভয় কি? কি ভেবে আমি দেবের লাশের পশ্চিম পাশ ঘেঁষে সুনীলের লাশসহ শুয়ে পড়লাম। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থা আমার ছিল

না। চোখ বুজে পড়ে থেকে ভাবছিলাম এই বুঝি লাথি মেরে তুলে গুলি করবে। এক সময় ভাবছিলাম তবে কি আমাকে গুলি করেছে? আমার তখন কোন অনুভূতি নেই। কি হচ্ছিল বুঝতে পারছিলাম না। এই মরার মতো অবস্থায় কতক্ষণ কেটেছে বলতে পারি না। এক সময় আমার মাথার কাছে ছেলে মেয়ে ও বাচ্চাদের কান্না শুনতে পেলাম। চোখ খুলে দেখি সুইপার দারোয়ান ও মালীদের বাচ্চারা ও মেয়েছেলে গুলি খাওয়া মৃত স্বামী কিংবা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করছে। তখনও অনেকে মরেনি। কেউ পানি চাচ্ছে। তাদের কেউ কেউ পানি খাওয়াচ্ছে। এই সময় দেখলাম কে একজন গুলি খেয়েও হামাগুড়ি দিয়ে শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। মাথা তুলে দেখি যেদিকে মিলিটারীর গাড়ি ও অসংখ্য মিলিটারী ছিল, সেদিকে কোন গাড়ি বা মিলিটারী নেই। চতুর্দিকে এক নজর দেখে নিয়ে মেয়েছেলে ও বাচ্চাদের মধ্য দিয়ে নুয়ে নুয়ে বস্তির মধ্যে গেলাম। প্রথমে গিয়ে ঢুকি চিৎবালীর ঘরে। চিৎবালী ঘরে ছিল না। এক মহিলা ভয়ে কাঁপছিল। তার কাছে পানি খেতে চাইলে সে একটি ঘটি দেখিয়ে দিল। পানি খেয়ে ওর ঘরের কোণে যে ঘুঁটে ছিল তার নীচে লুকিয়ে থাকতে চাইলাম। মহিলাটি আমাকে তখনই সরে যেতে বলল। তখন আমি বস্তির পাশে ল্যাট্রিনে ঢুকে পড়ি।

এক সময়ে রাজারবাগের দিকে গোলাগুলি হচ্ছিল। এক-একটা প্রচণ্ড শব্দ। থেমে থেমে গোলা বর্ষণ হচ্ছিল। একটু বাদেই দুটি প্লেন উড়ে গেল বুঝতে পারলাম। এভাবে অনেকক্ষণ কাটালাম সেখানে।

এক সময়ে একটা লোক এসে ল্যাট্রিনে দরজা নাড়া দিল। দরজা নাড়া শুনে ভাবলাম এবার শেষ। মিলিটারীরা নিশ্চয় এসেছে। খুলে দেখি একটা লোক, মিলিটারী নয়। লোকটি বলল তার নাম ইদু। পুরনো বই বিক্রি করে রাস্তার ওপারে। বলল, সে হলে এসেছিল মেয়েছেলেদের মিডফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে যেতে। আমি আছি শুনে আমাকেও নিয়ে যাবে। প্রথমে যেতে চাইনি। বুঝতে পারছিলাম না কি করবো। বলল সে সাথে যাবে। রাস্তা এখন পরিষ্কার, কোন মিলিটারী নেই। গায়ে সেই চাপ চাপ রক্ত নিয়ে ওর সাথে বেরিয়ে পড়লাম। বকসীবাজারের কাছ দিয়ে যেতে দেখি ওদিকে কোন মিলিটারী যায়নি। অনেকে অজু করছে নামাজ পড়ার জন্য। সেদিন ছিল শুক্রবার এবং জুম্মার নামাজের সময়। ইদু আমাকে জেলখানার পাশ দিয়ে দিয়ে বুড়িগঙ্গার পাড়ে নিয়ে এক মাঝিকে অনুরোধ করায় সে নদী পার করে দিল। নদীর ওপারে দেখা আমাদের হলের এক প্রাক্তন ছাত্র সুনির্মল সিংহ রায়চৌধুরী সাথে। সে নিয়ে গেল তার কর্মস্থল শিমুলিয়ায়। সেখান থেকে প্রথমে নবাবগঞ্জ ও পরে নিজ গ্রাম বরিশালের ধামুরাতে চলে যাই।

যে ভয়াল রাতে জগন্নাথ হলের যে হত্যাযজ্ঞ হয়েছিল এখন সে দৃশ্য কল্পনা করলে আমার সমস্ত মানবিক অস্তিত্ব মুর্হূতে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এখনো আমি নিজেকে বিশ্বাস করতে পারি না। আমি বেঁচে আছি। এ কি সত্যি! ভাবতে গেলে তখন সবকিছু যেন

তছনছ হয়ে যায়, সবকিছুই স্বপ্নের মত মনে হয়। আমি কি কোন এক নেশার ঘোরে সেদিন হল জীবনের নিত্যসঙ্গী ও বন্ধু-বন্ধুবান্ধবদের লাশ টেনে নিয়ে গিয়েছিলাম? মার্চের শুরুতে এখনো মাঝে মাঝে ওই দিনের কথা ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে যাই। সে ঘোর এখনো আমার অস্তিত্বে তীব্র কশাঘাত করে।

জগন্নাথ হল : সাতাশে মার্চ, ১৯৭১

নির্মলেন্দু গুণ

মাত্র কয়েকঘন্টার জন্য কার্ফ্যু তুলে নেওয়া হলো
দেড় দিন দেড় রাত্রি গৃহবন্দী থেকে আমরা দুজন
নগরীর রূপ দেখতে বাইরে বেরুলাম।
আজিমপুরের মোড়ে বেয়োনেট বিদ্ধ এক তরুণের লাশ
স্বাগত জানালো আমাদের। তারপর বৃদ্ধ একজন।
অগ্নিদগ্ধ, মর্টার বিধ্বস্ত এই প্রাচ্য নগরীকে
মনে হলো প্রাণস্পন্দনহীন এক মৃত প্রেতপুরী,
অপসৃত অদম্য প্রাণের গর্ব, ডানে বাঁয়ে
সর্বত্র মৃতের হাতছানি।

যুবতী কন্যাকে নিয়ে পালাচ্ছেন পিতা
মার কোলে দুগ্ধপোষ্য শিশু।
প্রিয়জনদের খোঁজে উদ্বিগ্ন মানুষ ছুটছে সতর্ক
যেমন সন্ত্রাসবিদ্ধ বনের হরিণ ক্ষিপ্ত হিংস্র নেকড়ের
তাড়া খেয়ে ছোটে। কারো পুত্র, কারো বন্ধু, কারো পিতা
কারো ভাই হয়ে পথে পথে শুয়ে আছে ছিন্ন ভিন্ন লাশ।

নগরীতে কারা বেশী, যারা মরে গেছে তারা?
নাকি মেশিনগানের গুলি থেকে বেঁচে গেছে যারা?
সাতাশে মার্চের ভোরে এ প্রশ্নের মেলেনি উত্তর।

হত্যা ক্লান্ত পাক সেনা বাঙ্গালীর রক্তে স্নান করে
সহাস্যে নগর পথে বেরিয়েছে প্রমোদ টহলে

সাথে তাক করা নির্দয়, নিষ্ঠুর স্টেনগান।

জহুর হলের মাঠে শুয়ে আছে একদল সারিবদ্ধ যুবা,
যন্ত্রণা বিকৃত মুখ তবু দেশমাতৃকার গর্বে অমলিন।
জগন্নাথ হলের চত্বরে সবুজ ঘাসের বুকে
আক্রোশে খামচে ধরা ট্যাঙ্কের দাঁতের কামড়।

নৃশংসতার আরেক স্বাক্ষর ভারতেশ্বরী হোমস
(নিজস্ব নিবন্ধ)

উনিশশো একাত্তরের মে মাসে যখন জল্লাদ বাহিনী হোমস আক্রমণ করে তখন তাদের সাম্প্রদায়িক মনোভারের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। বাংলাদেশে গণহত্যার কাপালিক দলের অন্যতম জল্লাদ ক্যাপ্টেন আয়ুব হোমসে ঢুকেই তীব্র ঘৃণাভরে তাচ্ছিল্যের সাথে বলেছিলো এটা হিন্দু তৈরীর কারখানা। অথচ জাতিধর্মবর্ণের এখানে কোন প্রশ্ন নেই। জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে এখানে সবাই জ্ঞান অর্জন করতে পারে। সে বলেছিলো এ কারণে যেহেতু সংখ্যালঘু তথা হিন্দুদের সম্পর্কে তারা এলার্জিক, তা ছাড়া ২৫শে মার্চ রাতে যখন তাদেরকে হত্যাযজ্ঞে পাঠানো হয়, তখন হত্যাযজ্ঞের পাণ্ডা কুখ্যাত টিক্কা খান বলেছিলো— শেখ মুজিবের নেতৃত্বে এ দেশের সব মানুষ হিন্দু হয়ে গেছে, অতএব তাদেরকে শায়েস্তা করতে হবে, মুসলমান বানাতে হবে। মানবতা বিবর্জিত এ সব পাকিস্তানীরা তাদের স্বাক্ষর রেখে গেছে বাংলাদেশের সর্বত্র।

ক্যাপ্টেন আয়ুব আরো বলেছিল, পাকিস্তান মুসলমানদের জন্য— হিন্দুস্থান হিন্দুদের জন্য, বার্মা বৌদ্ধদের জন্য। পাকিস্তানে থাকতে হলে সবাইকে মুসলমান হতে হবে। এক পর্যায়ে হোমসের ছাত্রীদের সে নামাজের সুরাহ কেরাত জিজ্ঞাসা করে। স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুরা তার জবাব দিতে পারেনি। আয়ুব তখনও রাগে থর থর করে কাঁপছিলো। তার মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরিয়ে আসছিল। বলছিল, সবাইকে নামাজের সুরাহ কেরাত শিখাতে হবে। চোখে কাজল আর কপালে টিপ দেয়া চলবে না। আর তার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল হোমসের ভাইস প্রিন্সিপাল মিস সালমা রহমানের উপর। আয়ুবের সাহায্যকারী স্থানীয় জামাতে ইসলামের কুখ্যাত পাণ্ডা মওলানা অদুদের জনৈক ছেলে তাকে বলেছিল, "এদেরকে শায়েস্তা করতে হবে, ইসলামকে বাঁচাতে হলে এসব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে ফেলতে হবে।" প্রিন্সিপাল মিসেস মুৎসুদ্দীকে শাসিয়ে বলেছিল, "তোমরা

হিন্দু, তোমরা ভারতের চর, আওয়ামী লীগের সমর্থক।''

তিনি দেখেছেন কিভাবে পাক বর্বর বাহিনী মির্জাপুরের অসহায় নিরীহ বাঙালীদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, লাইন করে মেশিনগান দিয়ে শত শত বাঙালীকে হত্যা করেছে। বাড়ীঘর লুটপাট করেছে। পশুরা হোমসের সকলকে শাসিয়েছে। ধমকিয়েছে। ভয় দেখিয়েছে। যাওয়ার আগে হোমসের আর হাসপাতালের ক'জন দারোয়ানকে হত্যা করে গেছে।

''অরা ছবাইকে গুলি করে মেরেছে''

মোঃ কামারুজ্জামান প্রদত্ত

ঢাকা ঘোড়দৌড় ময়দানের দক্ষিণ প্রান্তে কালীবাড়ির ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে সেদিন আমাকে শুনতে হয়েছিল তাদের কথা— লালমোহন মালী ''হামি তখন পালাইয়া গেছি। অরা ছবাইকে গুলি করে মারে। নন্দনের গায়ে পাঁচটি গুলি লেগেছে।''

রামপ্রসাদ— হামার পোলাভি মারা গেছে। এখন শুধু তিনটি মাইয়া আছে, সাদিবি হয়নি।

শোভারাণী মজুমদার— ছাব-হামারভি ছেলে মারা গেছে।

লক্ষীরাণী ঘোষ— আমার স্বামী, আর দুটি মেয়ে মারা গেছে।

সোনিয়া— হামার ছামী, এক পোলা, দুই মাইয়া মারা গেছে। এক পোলা কোলে আছে।

পুরান দাস— হামার ছেলে মারা গেছে।

লিলিয়া— হামার ছামীভী মারা গেছে দুইটা মাইয়াভি মারা গেছে।

বেচন— হামার ভাগনা সুরুজ ভল্লী মারা গেছে। ও যেদিন মারা গেছে ছেদিন তার মাইয়া পার্বতীর জনম হইছে।

বৃদ্ধা— নন্দুর পোলা গেছে।

সকলের কণ্ঠে— ছামীভি মারা গেছে ছাব। আরো অনেক, অনেকের কণ্ঠে শুনছিলাম আমি সেদিন কালীবাড়ীর ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে— লিলিয়া, সোনিয়া, লক্ষীরাণী, পুরান দাস, আর শোভারাণীর মত আপনজনদের হারিয়ে যাওয়ার বেদনমিশ্রিত কথা।

কিন্তু আমি অপারগ। তাদের সকলের নাম আর কথা সেদিন লিখে রাখতে পারিনি। সবার তো একই কথা— কারো ছেলে, কারো স্বামী, কারো বা মেয়ে, আবার অনেকেই স্বামী, পুত্র, সবাইকে হারিয়েছে। তারা তাদের আপনজনকে হারিয়েছে নরপিশাচ পাক

জল্লাদদের হাতে। ২৫শে মার্চের কাল রাতে হানাদার বাহিনী ধ্বংস অভিযান ঢাকা শহরের সর্বত্র শুরু করে। তাদের তাণ্ডবলীলা থেকে প্রাচীন মন্দিরও রেহাই পায়নি। রমনার কালীবাড়ীর মন্দিরটি হানাদাররা ২৭শে মার্চের রাতে ট্যাঙ্কের সাহায্যে ধ্বংস করে দেয়।

মন্দিরসহ পুরা কালীবাড়ী আজ রমনার মাঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এর সাথে কালীবাড়ীতে আশ্রিত মোট ৫০ জনের প্রাণনাশ করেছে জল্লাদ সেনারা। আমি সেদিন রমনার কোরবানির হাটে ছবি, আনতে গিয়েছিলাম। কিন্তু হাটের ছবি আর আনতে পারিনি, এনেছি তাদের ছবি যারা হারিয়েছে তাদের আপনজনকে। তারা আজ সবাই মুক্ত আকাশের নীচে আশ্রয় নিয়েছে—তাই সেদিন আমার সাথে তাদেরই একজন লালমোহন মালীকে কথা বলতে দেখে মনে করেছিলো— আমি হয়তো রিলিফ সম্পর্কে তাদের নাম ঠিকানা লিখছি। তাই অনেক নারী-পুরুষ আমাকে ঘিরে বলেছে— ও ছাব হামার নাম লিখেন, হামার স্বামী, হামার ছেলে...ইত্যাদি ইত্যাদি। রমনা কালীবাড়ীতে মোট ৭০০ নারী-পুরুষের বাসস্থান ছিল। তাদের মধ্যে স্বামীজী-প্রেমানন্দগিরি সহ মোট ৫০ জনকে হত্যা করা হয়েছে। স্বামীজীর বয়স প্রায় ৭০ বছর হয়েছিল। তাকে রমনার মাঠে অন্যান্যদের সাথে লাইনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হয়েছে ২৮শে মার্চে। তার স্ত্রী এবং তিন বছরের শিশুসন্তান ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল।

পিতার মৃত্যুর দিন— পার্বতীর জন্মদিন। কালীবাড়িতেই আশ্রিত ছিল সুরুজভল্লী। সুরুজভল্লী সেদিন ২৭শে মার্চের রাতে অনেকের সাথে সারিতে দাঁড়িয়েও মনে করেছিল তাঁর স্ত্রীর প্রসব বেদনার কথা— নবজাত পার্বতীর পিতা আর নেই, আছে রমনার কালীবাড়ীতে পিতার জমাট বাঁধা রক্ত।

ঝরছে অশ্রু অবিরল

কালীবাড়ীর এক বৃদ্ধা নাম প্রিয়বালা ঘোষ। বয়স ষাট বছরের মত। দুই গণ্ড বেয়ে ঝরছিল শুধু অশ্রুর ফোঁটা। আমার কাছে আসতে পারেনি ভিড় ঠেলে। তাই অনেক পরে সবার শেষে আমি তার নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম "আপনি এমন করে কাঁদছেন কেন?" উত্তরে হতবাক। কিছুই প্রথমে বলতে পারেনি। তখন চোখের পানি যেন বাঁধ ভাঙ্গা স্রোতের মত বইছিল। বৃদ্ধার পাশেই দাঁড়িয়েছিল একটি ফুটফুটে রক্তগোলাপের মত শিশুকে কোলে নিয়ে তার পুত্রবধূ লক্ষীরাণী ঘোষ।

কেউ কিছু বলছে না। আমার দ্বিতীয় প্রশ্নে ৫ বছরের শিশু মন্টুচন্দ্র ঘোষ আমাকে উত্তর দিল—"আমার বাবাকে মেরে ফেলেছে সে জন্য ঠাকুর-মা কানছে।" আঁচলে চোখ মুছে বৃদ্ধা প্রিয়বালা তখন ছেলে বউ আর পাঁচটি শিশুসন্তানকে দেখিয়ে আমাকে

বলল, সবাইকে ভাসিয়ে আমার মাণিক (ছেলে সন্তোষ ঘোষ) গুলি খেয়ে মারা গেছে। দু'টি নাতনী মঞ্জু, সঞ্জুও মারা গেছে। বৃদ্ধা এর বেশি আমাকে আর কিছুই বলতে পারেনি। শিশুর মত কেঁদে উঠেছিল সেদিন রমনার মাঠে দাঁড়িয়ে। পুত্রহারা জননীর কান্নায় আমিও আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারিনি।

প্রতিদিন বধ্যভূমি থেকে ভেসে আসতো মানুষের মরণ চীৎকার সাধুবাবা আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে তা-ই শুনতেন

... আজ থেকে প্রায় সত্তর-আশি বছর আগের কথা। আমাদের গুরু এসে আস্তানা পেতেছিল বগুড়া জেলার বাগবান কাবরার একটি বটগাছের ছায়ায়। বগুড়া শহর বলতে তখন কিছুই গড়ে ওঠেনি। একটা টিনের ঘরে থানা এবং ফুলবাড়ীর রমজান মণ্ডলের একটি কাঠের কারখানা বোধহয় ছিল। আজকের সাত-মাথা তখন ছিল গাছপালা আর জঙ্গলে ভরা। আমাদের গুরু আনন্দ গোস্বামী এবং ভেরগু গোস্বামী এই পৃথিবী ছেড়ে অনেক পূর্বেই বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু সেদিন এক সঙ্গে চলে গেল আমার তিন ভাই। হাত বেঁধে বগুড়ার সেইজগাড়ীর আনন্দ আশ্রমে সকালবেলা বসে বসে এই সাধুবাবা সব ঘটনা বলছিলেন। হানাদার পাকবাহিনী বগুড়া দখল করার পরও আশ্রমে চারজন সাধু ও তিনজন মাতা ছিলেন। হানাদার বাহিনী তিনজন সাধুকে বগুড়া রেলষ্টেশনের পশ্চিম দিকে ডিগ্রি কলেজের সড়কের পার্শ্বে গুলি করে হত্যা করে। এদের ভিতর ছিলেন সুন্দর সাধু, মঙ্গল সাধু, এবং স্থানীয় বাদুরতলার একজন বৃদ্ধ মুনেন্দ্রনাথ সরকার। তিনজনই ছিলেন বগুড়ার প্রাক্তন অধিবাসী। এই তিন সাধুর... বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন সাধুবাবা। বগুড়ার অতীত ইতিহাসকে বুকে নিয়ে এই সাধুবাবা আজও বেঁচে আছেন। বগুড়ায় এমন লোক কমই আছেন যারা এই সাধুবাবাকে চেনে না। পাক-দস্যুদের জঘন্য নৃশংসতার পরও আজ সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে আছেন এই সাধুবাবা। যুগলকিশোর গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি বাঁচলেন কেমন করে? হেসে তিনি বললেন, "ওরা আমাকে কেন যে হত্যা করেনি তা আমি বলতে পারবো না। আমার তিন ভাই তখন খেতে বসেছিল। হঠাৎ সেই মুহূর্তেই বাড়ির ভিতর ঢুকলো কয়েকজন অবাঙালী। ওরা আমাদের ভাইদের খেতে দেয়নি। এসেই ভাইদের হাত বেঁধে ফেললো। ওদের নিয়ে যাওয়ার সময় আমি বললাম, আমাকে মার, ওদের নিয়ে যেয়ো না। বৃদ্ধ বলেই বোধহয় আমাকে ওদের সঙ্গে নেয়নি। কিন্তু আমার ভাইয়েরা আর ফিরে আসেনি।

একদিন এক ধাঙ্গড় এসে আমাকে জানালো, পাক সেনারা রাস্তার ধারের গর্তে আমার ভাইদের পুঁতে রেখেছে।" সাধুবাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনারা সবাই আগে পালালেন না কেন? সাধুবাবা প্রত্যুত্তরে বললেন, সে অনেক কথা বাবু। প্রায় সকলেই তখন শহর ছেড়ে চলে যান। ভক্তরা এসে আমাদের অনেক অনুরোধ করেছেন। কিন্তু সংঘের সাধুমাতারা নিষেধ করেছিল। আমরা কোনো অন্যায় করিনি। ওরা নিষ্ঠুর, ওরা কাল, ওরা অনেক অন্যায় করেছে— কথা বলতে বলতে মিষ্টভাষী সাধুবাবার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছিল। সাধুবাবা বললেন, 'ওরা আমাকেও ছাড়েনি।' মাঝে মাঝে পাক সেনারা আশ্রমে অন্যায় ভাবে প্রবেশ করত। আমার সামনে বন্দুক ধরে বলত, 'টাকা কাঁহা— টাকা দো'— ওরা আমার পাঁচ শত টাকা আগেই নিয়ে গেছে, কিন্তু তারপরেও আসত টাকার খোঁজে। এই দেখুন আমার পিঠে রড দিয়ে অনেক মেরেছে। সব সময় ওরা আমাকে ছোরার ভয়ে কাবু রেখেছে। একদিন ওরা এবার আমাকে মন্দিরের সামনে দাঁড় করিয়ে বলল, কুয়া কাহা হ্যায়? আমি ভেবেছিলুম ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। ওরা আমাকে বলল, বুড্ডা তুম কলেমা পড়ো। এরপর হঠাৎ জানি না ওদের কি মনে হওয়াতে আমাকে ছেড়ে দিল। আমি বেঁচে আছি, কিন্তু ওরা আমাকে যেমন অত্যাচার করেছে, তাতে বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্য। জানতে চাইলাম, নয়টি মাস আপনার ও মাতাদের খাবার সংগ্রহ করলেন কোথা থেকে? তিনি বললেন অনেক কষ্ট করেছি। ভিক্ষা করেছি। পাশের গ্রামে গিয়েছি। একটু আধটু যা পেতাম তাই খেয়ে বাঁচতাম। আমাদের দশ মণ চাল, আটটা গরু, প্রায় হাজার টাকার বাসনপত্রাদি সব লুট করে নিয়ে গেছে ওরা। চোখের সামনে দেখতাম কিন্তু কিছুই বলতে পারিনি। মাঝে মাঝে ভক্তরা গোপনে কিছু সাহায্য দিয়ে যেত। তাই চালিয়ে নিয়েছি।

আশ্রমের পূর্ব দিকের বাগান (গুরুর প্রথম আস্তানা) দেখিয়ে সাধুবাবা বললেন— ওই যে ওখানে একটা বদ্ধকূপ আছে। প্রায় প্রতিদিনই করুণ কান্নার আওয়াজ আমি শুনেছি। একদিন এক ছোট শিশু—, বাবা-মা, বাঁচাও বাঁচাও বলে চীৎকার করছিল। ওই ছেলেটাকে জবাই করে কূপে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আমি প্রায় প্রতিদিনই এরকম চীৎকার শুনেছি। সাধুবাবার অনুরোধে আমি বদ্ধ কূপে হিংস্রতার অনেক চিত্র দেখেছি। আজও এই বাগানে একটি ঘরের দেওয়ালে মানুষের রক্ত লেগে আছে। কূপে নরকঙ্কাল আর মাথার খুলিগুলো এখনো দেখা যায়। কত নিরপরাধ, নিষ্পাপ মানুষ এখানে জল্লাদের হাতে বলি হয়েছে কে তার হিসাব দিতে পারে।

বগুড়া শহরের অতি পুরাতন এবং সবার পরিচিত সাধুর আশ্রম আজ আবার ভক্ত আর গুণগ্রাহীদের আগমনে ভরে উঠেছে। কিন্তু আশ্রমে সেই পরিচিত মুখগুলো আর নেই। জিজ্ঞাসা করলাম— দেশ সম্বন্ধে। আপনি কি ভাবছেন? উত্তরে তিনি শুধু বললেন, 'ওরা খুবই বেআইনি কাজ করেছে। ওরা গণভোট মানে না। মুজিবকে ক্ষমতা না দিয়ে

তারা খুবই অন্যায় করেছে। ওরা অত্যাচারী। অত্যাচারীকে শাস্তি ভোগ করতেই হবে।'

আশ্রমের মন্দিরে গুরুর আস্তানা দেখিয়ে সাধুবাবা বললেন, ''আমার হারিয়ে যাওয়া ভাইয়েরা এমনিভাবেই থাকত। কিন্তু দস্যুরা তাদের নির্দয় ভাবে হত্যা করেছে। মাথায় তার ছোট ঝুঁটি বাধা। সামান্য সাদা কাপড়ের একটি গামছা তার পরনে। তিনি বললেন, পরের অন্যায় করা আমাদের নীতি নয়। তবু ওরা আমাদের মেরেছে। বৃদ্ধ সাধু যুগল-কিশোর গোস্বামী শুধু তার ভাইকে হারান নাই, বগুড়াবাসীও হারিয়েছে তাদের পরিচিত শ্বেতবস্ত্রধারী তিনটি ভাইকে। তারা আর আসবে না।

বগুড়া রেলষ্টেশনের চারপাশেই ছিল জল্লাদদের কসাইখানা

''তখন জুন মাসের বোধ হয় প্রথম সপ্তাহ। রাত্রিবেলা শুয়ে আছি। হঠাৎ ইন্টার ক্লাশ ওয়েটিং রুম থেকে ভেসে আসলো মানুষের করুণ আর্তনাদ। 'আমাকে বাঁচাও' করে কে যেন চিৎকার করছিল। একটু পরেই থেমে গেল। বুঝলাম, ''সে আর নেই'' কথাগুলো বলতে বলতে শিউরে উঠছিলেন বগুড়া রেলওয়ের একজন পদস্থ বাঙালী কর্মচারী। জানতে চাইলাম আপনি দস্যুদের আর কি নৃশংসতা দেখেছেন। উত্তরে তিনি জানালেন, ''কি দেখি নাই বলুন। ওরা সব করেছে। বাঙালীরা সবাই ছিল ওদের শত্রু। কেননা, যে বাঙালীই রেলষ্টেশনের আশপাশে আসতো তাকেই তারা হত্যা করেছে। একদিন একজন নিরীহ বাঙালীকে দিয়ে কয়েকজন মিলিটারী তাদের মালপত্র ট্রেনে উঠালো। তারপর কাজ শেষ হলে শুরু হলো তার উপর অমানুষিক অত্যাচার। একজন মিলিটারী লোকটাকে ওয়াগানের পিছনে নিয়ে দু'পা সমান করে পায়ের সঙ্গে মাথা লাগিয়ে বসিয়ে রাখলো। তারপর একজন উঠলো তার পিঠের উপর। জোর করে ওরা জীবন্ত মানুষটার হাড়গুলো এমনি করে ভেঙে দিল। মানুষটার অনুরোধ আর মিনতি ওরা শুনে নাই। এরপর লোকটাকে তার ভাইদের মত হত্যা করা হলো। পাকদস্যুরা ষ্টেশনের আশপাশে অহরহই মানুষদের এমনি নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করে হত্যা করতো।''

জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের ওরা কিছু বলে নাই? উত্তরে তিনি বললেন, ''বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেওয়া বাঙালী কর্মচারীদের ওরা ক্ষমা করে নাই। যারা সরতে পারে নাই তাদের মৃত্যু ছিল ওদের হাতে।'' প্রসঙ্গক্রমে তিনি বললেন, ''একদিন মেজর জাকী সামরিক হেডকোয়ার্টারে আমাকে ডাকলো। তারপর পাশের রুম থেকে রক্তমাখা কাপড় পরিহিত একজন বাঙালীকে ডেকে আনা হলো। তার হাত বাঁধা ছিল এবং মুখ ছিল রুমাল দিয়ে বাঁধা। আমাকে মেজর বললো, এ-দেখো। এরপর কড়া

মেজাজে হুকুম হলো— আভি তোম যাও। আমি মেজর জাকীর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি বটে, কিন্তু ঐ রক্তমাখা ভাইটি বেঁচে আছে কিনা জানি না। শেষের দিকে (বগুড়া ছাড়ার পূর্বে) ওরা রেলওয়ের বাঙালী কর্মচারীদের হত্যা করারও ষড়যন্ত্র করেছিল। রেলষ্টেশনের আশপাশে নিরীহ বাঙালীদের হত্যা করেও ওদের রক্ত পানের তৃষ্ণা তখনও মেটেনি। বগুড়া ছাড়ার পূর্বে ওদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হওয়ায় আমরা বেঁচে আছি। কিন্তু রেলষ্টেশনের বধ্যভূমিতে হারিয়ে যাওয়া ভাইরা আর আসবে না। রেলষ্টেশনের সুইপার দশীন (৭০) জমাদার সতর্কতার ইঙ্গিত দিয়ে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু এই বৃদ্ধের সাতটি মাস কেটে গেছে ষ্টেশনের আশপাশের মৃত বাঙালীদের কবর দিতেই।

বগুড়া রেলওয়ে ষ্টেশনের একজন সুইপার। বয়স প্রায় সত্তর বছরের বেশী। এই বৃদ্ধ তার সাতটি মাস কাটিয়ে দিয়েছে বর্বর পাক দস্যুদের হত্যা করা লাশ সরিয়ে। দস্যুদের হত্যাযজ্ঞের সে একজন নীরব সাক্ষী। "আমি পূর্বে আরও মোটাসোটা ছিলাম স্যার। আমি লাল টকটকে ছিলাম। কিন্তু বগুড়া ষ্টেশনের আশপাশের বাঙালী ভাইদের রক্ত দেখে আমি খুব রোগা হয়ে গেছি। আমার শরীরে আগের মতো মাংস নেই। আপনিই বলুন, একজন মানুষ শত শত রক্তমাখা লাশ সরালে আর কি করে বাঁচার আশা রাখে! জীবন নিয়ে খেলা হয়েছে সাহেব। আপনারা কিছুই জানেন না। আমি কেমন করে বেঁচে আছি জানি না— ওরা কত জবাই করেছে, কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারিনি। মুক্তি আর ইণ্ডিয়ার সৈন্যরা আমাদের রক্ষা করল হুজুর...।" বগুড়া রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে প্রায় তিন'শ গজ দক্ষিণে একটি বদ্ধ কূপ দেখাতে গিয়ে সুইপার দশীন কথাগুলো বলছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বগুড়া রেলওয়ের এস ডি ও সাহেব পরিবার সহ এই প্রথম আসলেন তার বাংলোতে। পাক বাহিনীর আমলে তার বাংলোটা সম্পূর্ণভাবে সামরিক দস্যুদের হাতে ছিল। তার এই দু'তলা বাড়ীটি ব্যবহার করতো কসাইখানা হিসাবে। নিরীহ বাঙালীদের পাকদস্যু আর তার সহযোগীরা ধরে আনতো, তারপর এই বাড়ীতেই জবাই করা হতো, বাড়ীর সংলগ্ন একটা বৃহৎ কূপে হত্যা করার পর মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হতো। বাড়ীটার আউট কিচেনে সবচেয়ে বেশী হত্যা করা হতো বলে মনে হয়। কারণ এখান থেকে কূপটি মাত্র বিশ গজ দূরে। বাড়ীটার চারদিকে দীর্ঘ নয় মাসে ঘাস আর জঙ্গলে প্রায় ভর্তি হয়েছিল। পাকবাহিনী সেগুলো পরিষ্কার করতো না। কারণ জঙ্গলের মাঝে এই রকম একটা বাড়ীতে তাদের বাঙালী নিধনের নেশা খুবই বেড়ে যেত। শুধু তাই নয়, বর্বর পাক সেনারা এই বাড়ীটাতে মদ আর জুয়ার আড্ডাও বসাতো। দিনে রাতে তারা এখানে আসর জমাতো নির্বিঘ্নে। ওদের কেউ বাধা দিতে পারে নাই। রক্তের নেশায় বর্বররা হন্যে হয়ে বাঙালীদের খুঁজে আনতো। দশীন জমাদারকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কতজন বাঙালীদের মৃতদেহ এই কূপে ফেলেছো? ..."কি আর বলবো হুজুর! বিশ্বাস করবেন না! আমার হাতেই কমপক্ষে চার-পাঁচ শত লাশ এই

কুয়ায় ফেলেছি। জল্লাদরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো হুজুর, আমি কি করি। আমি লাশগুলো পুঁতে রাখতে চাইতাম। কিন্তু ওরা দেয় নাই। ওরা আমাকে বলতো, 'তু' শালা হিন্দু হায়। এইসে দরদ কিউ লাগতা!'' জানতে চাইলাম, ''তোমার সামনেই কি ওরা হত্যা করতো?'' বৃদ্ধ বলে চলছিল, ''কি বলেন সাহেব! আমাকে ওরা ভয় পেত না। প্রথমে বাঙালীকে ধরে আনতো, তারপর হাত বেঁধে মুখের ভিতর কাপড় গুঁজে দেয়। এরপর হয় পেটের ভিতর চাকু মারে, না হয় জবাই করে। কোনটার আবার পিছন দিক থেকে ঘাড়ে ছুরি বসিয়ে জবাই করতো। ওদের দয়া নাই। কান্নাকাটি অনুরোধ কিছুই শুনেনি। কত বাঙালী যে কাঁদতো হুজুর, কি করবো। মিলিটারীরা খুশিমত মানুষকে গুলি করতো। তারপর আমাকে বলতো 'ইছি কো হঠাদো।' আমি বাধ্য হয়ে কাজ করেছি হুজুর। কিন্তু ওরা আমাকেও ছাড়ে নাই। রেল ষ্টেশনের বাঙালীদের আমি আগেই বলতাম তোমরা সরে যাও। আমি ওদের এই দিকে আসতে দেইনি। গোপনে গোপনে আমি অনেক বাঙালী সাহেবকে সাবধান করেছি। কিন্তু মিলিটারীরা এটা জানতে পেরে আমাকে সন্দেহ করে ঘাড়ে রাইফেল দিয়ে মারে। শুধু লাশ সরাবার জন্যই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ওরা হুজুর বড় বড় সাহেবকেও জবাই করেছে— গুলি করেছে।'' পাশে পার্ক-রোডের একটি ড্রেন দেখিয়ে বলল, ''এখানে তিনটা, ওখানে একটা, এই রকম অনেক সাহেবের লাশ এই ড্রেনেই আছে হুজুর। ওরা ভালভাবে পুঁতে রাখতেও আমাকে দেয়নি। আমাকে সন্দেহ করে খুব মারতো, তার উপর আমার চাকুরী নষ্ট করে দিল সাহেব। কয়েক মাস ধরে না খেয়ে আছি।'' ঝাড়ুদার দশীন পাক বর্বরদের বুলেটের সামনে না খেয়েই দিন কাটিয়েছে। চাকুরীতে পুনর্বহালের কথা সেদিন সে মুখে আনতে পারে নাই। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যারা এমনিভাবে শত শত মানুষকে হত্যা করতে পারে তাদের এক মুঠো ভাতের অভাবে এই গরীবের জন্য চিন্তা করার সময় কোথায়? বগুড়া রেল এস ডি-ও বাংলোর পূর্বদিকের মাঠটা এখন কবরস্থানে পরিণত হয়েছে। বগুড়া শহর শত্রুমুক্ত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই বাংলোর প্রতি ঘরের মেঝে আর দেয়ালে মানুষের রক্তে ভেজা বহু কাপড়-জামা ইত্যাদি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিল। বাংলোর উপর তলার হাউজে বর্বরতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া যায়। এই হাউজটি ছিল সম্পূর্ণ মানুষের রক্তে ভরা। রক্তগুলো জমা হয়ে ক্রমশঃ জমাট বেঁধে যায়। কোদাল দিয়ে মাটি কাটার মত জমাট বাঁধা রক্ত কেটে এই হাউজ পরিষ্কার করা হয়েছে। জবাই করা মানুষের রক্তের স্রোত দেখার জন্যই বোধ হয় হাউজে রক্ত জমা করতো। রক্ত দেখেই হয়তো রক্তপানের তৃষ্ণা জল্লাদদের বাড়তো বেশী। বগুড়া রেলষ্টেশন আর ষ্টেশন সংলগ্ন রেললাইনের আশেপাশে কত নিরীহ বাঙালীকে যে পাকসেনা আর তার সহযোগীরা হত্যা করেছে তার হিসেব নেই। কত নিরীহ মানুষ যে এই দস্যুদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন করেছে একান্ত অসহায়ভাবে মৃত্যুকে মেনে নিয়েছেন কেউ বলতে পারেনা। বগুড়ায় পাক দস্যুরা

বাঙালীদের বলতো, 'ইছিকো খরচা খাতা মে (মৃত্যু খাতা) উঠা দেও।' ... বোধ করি রেলষ্টেশনের ও তার আশপাশের নিষ্ঠুর বর্বরতা আর হত্যাযজ্ঞের দ্বারাই তাদের খরচের খাতা পূর্ণ হয়ে গেছে।

মরণপুরী ভোলা ওয়াপদা কলোনী

হাবিবুর রহমান

ভোলায় বর্বর হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার দ্বিতীয় পর্যায়ের হত্যাকাণ্ডের অধিনায়ক নরপশু ক্যাপ্টেন মুনির হোসেন ও সুবেদার সিদ্দিক। এদের গণহত্যা আর জঘন্য পাশবিকতা যে বিভীষিকা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল তা অবর্ণনীয়। গত জুন মাসের প্রথম দিকে এই নরপশু আর তার দোসর সুবেদার ভোলাতে আসে। সে এখানে এসে প্রথম অতি স্বাভাবিকতা দেখাতে আরম্ভ করে।

মাইক্রোফোনে শান্তিকমিটির মাধ্যমে কেবলই ঘোষণা করতো যে, আপনাদের কোন ভয় নেই। অকুতোভয়ে প্রত্যেকে কাজকর্ম করে যান। আর হিন্দুদের উদ্দেশ্যে বলা হতো আপনারা গ্রাম ও চরাঞ্চল হতে শহরে প্রত্যেকে নিজ বাড়ীঘরে ফিরে আসুন। প্রেসিডেন্ট আপনাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা করেছেন। নির্দেশিত সময়ের মধ্যে ফিরে না এলে অতঃপর বিনা বিচারে গুলি করে হত্যা করা হবে।

এ আহ্বান আর জল্লাদ ইয়াহিয়ার সাধারণ ক্ষমার অন্তরালে ছিলো নারীধর্ষণ, অর্থ সংগ্রহ ও লুটতরাজ এবং নরহত্যার পরিকল্পনা। এ ফাঁদের মাধ্যমেই তাদের ঘৃণ্য কামনা, বাসনা ও উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছিল। প্রথমতঃ যে পরিবারে সুন্দরী মেয়ে ছিল তার অভিভাবককে শান্তিকমিটির পাণ্ডা বা রাজাকার দিয়ে সামরিক বাহিনীর দফতর ওয়াপদা কলোনীতে ডাকা হতো। ডাকার পূর্বেই তার বাড়ীঘরের চারদিকের পলায়ন পথে রাজাকার আর দালালরা সাধারণভাবে ঘুরাফেরা করতো, যেন কোথাও পালিয়ে যেতে না পারে।

অতঃপর উপায়ান্তর না দেখে দালালদের সহায়তায় মরণপুরী ওয়াপদা কলোনীতে যেতে হতো। সেখানে নরপ্রকৃতি পশু মুনির আর সুবেদার বুকের কাছে বন্দুক আর বেয়নেট ধরে জিজ্ঞাসা করতো—"ভারত মে তোম হত্যারা লাড়কা গিয়া, আওর মুক্তিবাহিনীকো হামারা খবর পৌছাতা"। এমনি করেই দু'এক ঘন্টা আটকিয়ে রেখে দালালদের মাধ্যমে প্রথমতঃ টাকা, তারপর মেয়ে দাবী করতো। এ দু'টির একটিকে পূরণ করতেই হতো। তা না হলে রাতের অন্ধকারে নরপশুদের বেয়নেটের আঘাতে মরতে হতো। এ পরিকল্পনার শিকারে যে পড়তো কেবল সেই জানতো। এ হত্যাকাণ্ড ও

পাশবিকতার নীরব প্রত্যক্ষদর্শী ওয়াপদার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ খালেদ, টেকনিক্যাল অফিসার জনাব সিরাজুল ইসলাম, সাবডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার জনাব আবু তাহের ও মনসুর আলী এবং সহকারী ইঞ্জিনিয়ার ওয়াহিদউদ্দীন।

সাহেদ হোসেন ও আবদুর রব খান। তাঁরা গত ৪ঠা মে হতে চার দেয়ালে ঘেরা এ ওয়াপদা কলোনীর একটি দালানে বলতে গেলে অন্তরীণ অবস্থায় ছিলেন। নিতান্ত প্রয়োজনে বাইরে যেতে হলে অনুমতি নিতে হতো এবং তাদের গতিবিধির প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখা হতো। এ কলোনীতে নরপিশাচ ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীর আর পদলেহী দালালদের পাশবিকতা ও নরহত্যার কাহিনীর এমন কোন ভাষা নেই যে পুরোপুরিভাবে রূপ দেয়া যেতে পারে। আমরা কলোনীর বাইরে বাসা নিয়ে থাকবো এবং সেখান হতে এসে অফিস করার অনুমতি চেয়েছিলাম।

কিন্তু পিশাচরা এতে আমাদের উপর বিক্ষুব্ধভাবে পোষণ করল। তারপর প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর দিন গুনছিলাম। এ ঘটনার কয়েকদিন পর আমাদের স্পীডবোট ড্রাইভার আতাহারকে ধরে নিয়ে অপর দিকের দালানে ৭ দিন পর্যন্ত আটকিয়ে রাখে। আতাহারের নারকীয় মৃত্যু কাহিনী বলতে গিয়ে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জনাব খালেদ অশ্রুসজল বাকরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন— আমি ওকে বাঁচাতে পারলাম না। আমি জানতাম হয়তো আমরা কেউ বাঁচবো না। ভাবলাম অনুরোধ করলে হয়ত সাধারণ কর্মচারী হিসেবে ছেড়ে দিতে পারে। এ বিশ্বাস নিয়ে মেজর জেহানজেব খানকে অনুরোধ করলে এ কলোনীর গোপন তথ্য যারা ফাঁস করেছে তাদের কেউ বাদ যাবে না বলে দৃঢ়কণ্ঠে জানায় এবং সে রাতেই ওকে মেরে ফেলে। তখন আমাদের নিশ্চিত মৃত্যুই ভেবেছিলাম। এমন কোন রাত ছিল না নরপশুরা দশ-বারজনকে হত্যা না করেছে। বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারতো আর উল্লাসে ফেটে পড়তো।

কলোনীর রেস্টহাউস ছিলো পাশবিকতার কেন্দ্রস্থল। রাতের পর রাত দোসর সুবেদার কত মেয়ের যে সর্বনাশ করেছে, কত নারী যে নিধন করেছে, কত হতভাগিনীকে উন্মাদে পর্যবসিত করেছে তার সীমা নেই। মণির হোসেন লুণ্ঠন চালিয়েছে নির্বিকারে। নিজে গ্রহণ করেছে স্বর্ণ, নগদ টাকা প্রভৃতি মূল্যবান জিনিস, আর তার অনুচরদের দিয়েছে বাকী মালামাল।

এ ছাড়াও শান্তিকমিটির যোগসাজশে যাকে তাকে ধরে আটক করে, শান্তিকমিটির মাধ্যমে মোটা অঙ্কের নগদ অর্থের বিনিময়ে দু'একজনকে ছেড়ে দিয়েছে। অনেক সময় টাকা গ্রহণ করেও তাকে হত্যা করা হয়েছে। দুলারহাটের মোহাম্মদ উল্লাহ কন্ট্রাক্টর তাদের একজন। চরফ্যাশনের শান্তিকমিটির পাণ্ডা রাজাকার ও পুলিশ দিয়ে ওকে ধরিয়ে দেয়। এমনি করে সমগ্র মহকুমায় হিংস্র নখর বিস্তার করে পাশবিকতা আর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিলো।

অগ্নিদগ্ধ লুণ্ঠিত ধর্ষিত কাশিয়াবাড়ী

গোবিন্দলাল দাস

অজপাড়া গাঁ হলেও কাশিয়াবাড়ী একেবারে ছোট্ট গাঁ নয়। গাইবান্ধা মহকুমার পলাশবাড়ী থানার এই গাঁটাতে ছিলো সাতশো গৃহস্থবাড়ী। হিন্দু-মুসলমানের বাসস্থান। মিলেমিশে ছিলো তারা এই গাঁয়ের মাটিতে। এক সম্প্রদায়ের সাথে ছিলো আরেক সম্প্রদায়ের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। পার্শ্ববর্তী গাঁয়ের অবাঙালীরা কত সময় কতবার চেষ্টা করেছে এখানে দাঙ্গা বাঁধাবার কিন্তু কোনবারই তাদের সে চেষ্টা সফল হতে পারেনি। এ গাঁয়ের সাতশো হিন্দু-মুসলিম গৃহস্থ এক পরিবারের ছেলে মেয়ে, ভাই-বোন মা, বাবা।

স্বাধীনতা আন্দোলনের এক পর্যায়ে বর্বর পাকবাহিনী অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা চালিয়ে পার্শ্ববর্তী থানা ঘোড়াঘাটে এসে আস্তানা গেড়ে বসে। এখান থেকে মাইল চারেক পথ ঘোড়াঘাট। একদিন এ গাঁয়ের লোক জানতে পারলো শীঘ্রই ওই পশুগুলো আশপাশের গাঁ-গুলোতে অত্যাচারের বিভীষিকা রাজত্বের সৃষ্টি করবে। কথাটা ঠিকই ফললো। কদিনের মধ্যেই ঘোড়াঘাট সংলগ্ন বিভিন্ন গ্রামে অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা শুরু হলো।

ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে ছাই করতে লাগলো। মা, বোনদের ইজ্জত নষ্ট করতে লাগল। মানুষ ধরে ধরে গুলি করে পাখী শিকারের মতো মারতে লাগলো। ঘরের জিনিসপত্র লুটতরাজ করে নিয়ে যেতে লাগলো। লোকগুলো দিশেহারা হয়ে পড়লো। অত্যাচারের বীভৎস হাওয়া কাশিয়াবাড়ীতেও একদিন এসে ধাক্কা দিল। ঘোড়াঘাটে ছিলো অবাঙালীদের এক কলোনী। ওই অবাঙালী কলোনীর দুষ্কৃতীকারী পাকবাহিনীর সাহায্য সমর্থন পেয়ে রাইফেল এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হানা দিতে লাগলো কাশিয়াবাড়ীর শ্যামল মাটির বুকে।

কিন্তু হারেস মিয়া বাড়ী থেকে পালায়নি। তার বিশ্বাস ছিলো পাকবাহিনী কাউকে মারবে না। শান্তি কমিটির সেদিনের সভাতে সে আশ্বাসই তো বক্তারা দিয়েছিলো। কিন্তু হারেস মিয়া জানতো না ওদের কথার উপর বিশ্বাস করে বাঁচবার কারো উপায় নেই। তাই হারেস মিয়া বাঁচেনি। কাশিয়াবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী হারেস মিয়াকে ছোরা দিয়ে জবেহ করেছে।

জবেহ করেছে স্কুলের শিক্ষক গোলজার মিয়াকে এবং আরো অনেককে। ধর্ষণ করেছে ফুলবানু, গিরিবালাকে। সাত মাসের গর্ভবতী ফুলবানুর উপর এক এক করে ওই পশুগুলো ধর্ষণ চালালে ফুলবানু অতিরিক্ত স্রাবে সেদিনই মারা যায়। পেট থেকে গড়িয়ে পড়ে একটি ছোট্ট মৃত শিশু। আর গিরিবালাকে ধর্ষণ করার পর হাত উঁচু করে খুঁটির সাথে বেঁধে বেয়োনেট দিয়ে বুক চিরে মেরে ফেলে। গ্রামটা আগুন লাগিয়ে মাটির সাথে

মিশিয়ে দিয়েছে নরপশুরা।

তখনো যারা পালাতে পারেনি তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরে ফেলে। প্রায় সাত শত লোককে স্কুলের মাঠে নিয়ে এসে বেদম প্রহার শুরু করে। —তোমহারা গাঁওমে মুক্তি ফৌজ হ্যায়। —নেই স্যার। —ঝুট বোলতা। তোমহারা গাঁওমে গোলিকা আওয়াজ শোনাথা। আওর হামারা পাশ ইনফরমেশন হ্যায়। এর কদিন বাদেই এ গাঁয়ে তথাকথিত শান্তি কমিটির তরফ থেকে মিটিং করতে এলো জামাতে ইসলাম আর মুসলিম লীগের লোকেরা। তারা আশ্বাস দিয়ে গেলো এ গাঁয়ের লোকদের। আপনারা পালাবেন না কোথাও। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আপনাদের ধ্বংস করতে আসেনি। আপনাদের খুশী করাই তাদের কাম্য। গাঁয়ের সরল নিরীহ লোকগুলো ভাবলো কথাটা হয়তো ঠিকই বলেছে। এবার থেকে হয়তো অত্যাচারের পালা শেষ হবে। দেশে শান্তি আসবে। কিন্তু কি যে শান্তির দিন তাদের সামনে অপেক্ষা করেছিল— একদিন আগেও তারা তা বুঝতে পারেনি। কিন্তু যেদিন তারা বুঝলো সেদিন আর আত্মরক্ষার পথই তাদের সামনে থাকলো না। ১১ই জুন কাশিয়াবাড়ির সরল লোকগুলো দেখলো পিল পিল করে পায়ে হেঁটে কয়েকশো পাক সৈন্য দ্রুত তাদের গাঁয়ের দিকে ছুটে আসছে।

পালাও, পালাও, যে যেখানে পারো পালাও। ওই যে দূরে দস্যু পাকবাহিনী ছুটে আসছে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সারা গ্রামটায়। মেয়ে-পুরুষ- বুড়ো-জোয়ান যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। তাড়া খাওয়া হরিণের মতো, অন্য কোনদিকে না তাকিয়ে সবাই গাঁয়ে পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র নদীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে ওপারে পালাতে থাকে। আবার অনেকে ধানের-পাটের ক্ষেতে শুয়ে লুকিয়ে পড়ে। শিশুর কান্না থামাতে মাকে পাগল হতে হয়। সবাই আত্মগোপনে ব্যস্ত।

বাড়ি বাড়ি ঢুকে গরু-ছাগল, চাল-ডাল থেকে শুরু করে সামনে যা পেত তাই ছিনিয়ে নিয়ে চলে যেত। প্রতিরোধের সর্বপ্রকার উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও এই হিংস্র পশুগুলোকে কোন বাধা দেওয়ার সাহস পায়নি কাশিয়াবাড়ীর অসহায় লোকগুলো। অবাঙালীদের এ ধরনের অত্যাচারে ভীত হয়ে পড়লো গাঁয়ের হিন্দুরা। তারা গাঁ ছেড়ে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পরিকল্পনা করতে লাগল। কারণ তাদের উপরে ঐ দস্যুদের অত্যাচারের মাত্রা ছিল বেশী। ঠিক এমনি সময়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন দারাজ কবিরাজ এবং গাঁয়ের অন্যান্য মাতব্বররা। তোমরা যাবে না এখান থেকে। আমাদের ত্যাগ করে চলে যেয়ো না তোমরা। আমাদের জান দিয়ে হলেও তোমাদের আমরা রক্ষা করবো।

থমকে দাঁড়িয়েছিল হিন্দুরা। তাই তো, এদের ছেড়ে আমরা কেমন করে যাই। এরা কোনদিন তো তাদের ত্যাগ করেনি। কোনদিন তো বেইমানি করেনি। তবে কেন এই দুর্দিনে তাদের ছেড়ে তারা পালাবে। যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে হিন্দুরা গাঁয়ের মাতব্বরদের সিদ্ধান্ত মতে। হিন্দুদের মূল্যবান জিনিসপত্র মুসলমানদের ঘরে ঘরে এনে জমা রাখা

হলো যাতে অবাঙালীদের কোপদৃষ্টি থেকে জিনিসপত্রগুলোকে বাঁচানো যায়। সবাই মিলে অবাঙালী কলোনীর সেই দুষ্কৃতীদের হামলাকে প্রতিরোধ করবার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুললো।

অতঃপর আরেক দিন সেই দুষ্কৃতীরা এ-গাঁয়ে হামলা চালাতে আসতেই চারিদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেললো গাঁয়ের লোকেরা। তোমরা এভাবে আর আমাদের জান-মান লুটতরাজ করতে পারবে না। আমরা তোমাদের ক্ষতি করিনি। আমাদের তোমরা বাঁচতে দাও। ফুঁসে উঠেছিল সেই অবাঙালী দুষ্কৃতীরা কিন্তু সেই দিন কিছু করবার সাহস তারা পায় নি। কারণ সেই দিন যার যা ছিল তা-ই নিয়েই তৈরী হয়েছিল গাঁয়ের লোকেরা। কিন্তু সেদিন গাঁয়ের লোকেরা ভাবতে পারেনি যে, দুষ্কৃতীরা তাদের জীবনে সর্বনাশ ঘটাবার জন্য কি জঘন্য ষড়যন্ত্র করে বসেছে।....

গত বছর এইদিনে খান সেনারা তাঁকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছিল

দানবীর নূতন চন্দ্র সিংহ

তাঁর একমাত্র ইচ্ছা ছিল তিনি যেন দেশের মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারেন। সে ইচ্ছা তার পূরণ হয়েছে। দেশের মাটিতে তিনি মরতে পেরেছেন। তবে বড়ো নিষ্ঠুরভাবে প্রাণ দিতে হয়েছে তাঁকে— কখনো কেউ যা কল্পনাও করেনি। .

গত বছর ১৩ই এপ্রিল চট্টগ্রামের অদূরে নিজের হাতে গড়া কুণ্ডেশ্বরী ভবনে তাঁকে হত্যা করা হয়। কুণ্ডেশ্বরী বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা বাবু নূতন সিংহের কথা বলছি। বাবু নূতন সিংহ তখন মন্দিরে প্রার্থনা করছিলেন। স্বাধীনতা ঘোষণার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সাতচল্লিশ জন অধ্যাপক সস্ত্রীক আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে। সৈয়দ আলী আহসান, ডক্টর এ.আর. মল্লিক, ডক্টর আনিসুজ্জামান, ডক্টর কোরাইশী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। চট্টগ্রাম থেকে আগরতলা যাওয়ার পথে জনাব এম. আর সিদ্দিকীও কুণ্ডেশ্বরীতে আশ্রয় নিয়েছিল।

পাকবাহিনীর অগ্রগতির খবর শুনে সবাই কুণ্ডেশ্বরী ছেড়ে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। বাবু নূতন সিংহকে যাওয়ার কথা বললে তিনি রাজী হননি। বলেছিলেন, যদি মরতে হয় দেশের মাটিতে মরবো। অনেক পীড়াপীড়ির পরও তাঁকে রাজী করানো গেল না। এদিকে পাকবাহিনী এগিয়ে আসছিল। ১৩ ই এপ্রিল পাকবাহিনী কুণ্ডেশ্বরী ভবনে প্রবেশ করে।

ছেলেরা আগেই পালিয়ে গিয়েছিল। বাবু নূতন সিংহ তখন মন্দিরে প্রার্থনা করছিলেন। জনৈক সালাউদ্দিন তাঁকে সেখান থেকে টেনেহিঁচড়ে বাইরে নিয়ে এসেছিল। তাঁর চোখের সামনে মন্দির উড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর তাকে হত্যা করা হয়েছিল নৃশংসভাবে। মেজর তিনটে গুলি করার পরও সালাউদ্দিন রিভলভারের গুলি ছুঁড়ে ছিল নূতন বাবুর দিকে। তিনি লুটিয়ে পড়েছিলেন। তেমনি মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন তিনদিন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

নূতন বাবুর জন্ম ১৯০১ সালে। শৈশবে তিনি মাতৃ-পিতৃহারা হন। আট বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন। তিনি নয় বছরে বার্মা যান। সেখানে মুদির দোকানে চাকুরী করেন। ১৯২২ সালে চট্টগ্রাম ফেরেন এবং বিয়ে করেন। তারপর কলকাতা যান। ১৯৪৬ সালে ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিহারে বৈদ্যনাথ ধামে গিয়ে কুণ্ডেশ্বরী মায়ের কবচ গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে আবার চট্টগ্রামে ফিরে আসেন।

কুণ্ডেশ্বরী বিদ্যাপীঠ

নিজের মেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে পারেননি তিনি। সেইজন্য একটা ক্ষোভ ছিল মনে। তখন রাউজান থানায় কোন বিদ্যালয় ছিল না। রাউজান থানায় মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য তিনি গড়ে তুলেছিলেন কুণ্ডেশ্বরী বালিকা মন্দির। পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিদ্যালয় ছিল এটি। শুধু রাউজান থানা নয়, দেশের সব এলাকা থেকে ছাত্রীরা যায় সেখানে লেখাপড়া করার জন্য। বিদ্যালয়ের নিজস্ব ডাকঘর, সরাসরি টেলিফোনে যোগাযোগ, পানির পাম্প, জেনারেটর, বাস ইত্যাদি ছিল। মোট প্রায় দুই লাখ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে সেখানে।

কেউ ভাবতে পারেনি যে যোগেশবাবুকে এভাবে হত্যা করা হবে

শ্রী যোগেশচন্দ্র ঘোষ। একটি নাম। একটি ইতিহাস। দুঃস্থ অসহায় মানুষের কল্যাণে নিবেদিত একটি প্রাণ। তাঁর জীবনের একমাত্র সাধনা ছিল 'সাধনা ঔষধালয়'। যে ঔষধালয়ের বাংলাদেশ ছাড়াও সমগ্র বিশ্বজোড়া রয়েছে খ্যাতি। এমনি নব নব সৃষ্টির মাঝেই যোগেশবাবু বেঁচে ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই বাঁচতে পারেননি। বর্বর খান সেনাদের হাতে তাঁকেও প্রাণ হারাতে হলো। নরপিশাচদের হাতে অবসান হলো এক অমূল্য জীবনের।

সহকর্মীদের সবাই সেই কাল রাত্রিতে কোন গতিকে প্রাণ নিয়ে বেঁচেছিল। প্রাণের মায়ায় পালাতে বাধ্য হয়েছিল তারা। শুধু যোগেশবাবুর পোষা প্রিয় বানরটা তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যায়নি। প্রভুর সমূহ বিপদের আশঙ্কায় সেদিন বনের পশুটি পর্যন্ত চিৎকার দিয়ে ঘোষণা করেছিল বিপদবার্তা। কিন্তু যোগেশবাবু তেমনি রইলেন। পালানোর সামান্যতম চেষ্টাও করেননি তিনি। বিপদের আশঙ্কায় তিনি শঙ্কিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু আকস্মিক ভয়াবহ মৃত্যুর কথা বোধহয় ভাবতে পারেননি।

২৫ শে মার্চ। ভয়াল বীভৎস রাত। এই দিন বাংলার বুকে নরপশু খান সেনারা যে হত্যালীলা চালিয়েছিল তার করুণ কাহিনী ইতিহাসের পাতায় কালো কালিতে বাঁধা থাকবে। রাজধানী ঢাকার সমস্ত শহরটা ভয়ে প্রকম্পিত। গ্রামে পালিয়ে যাচ্ছে নগরবাসী। সবাই পালাচ্ছে— দূরে, অনেক দূরে, নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। বর্বরদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার প্রত্যাশা প্রত্যেকের।

পুরানো ঢাকার সূত্রাপুর এলাকার অনেকেই এরই মধ্যে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। সমস্ত এলাকার মাঝে শুধু একটি মাত্র বাড়ী, যেন একমাত্র প্রহরী। স্তব্ধ, নিঝুম পরিবেশ। বিরাট এলাকা জুড়ে একটা কারখানা— সাধনা ঔষধালয়। সমস্ত বাড়িটার প্রহরী যোগেশবাবু। কারখানার নির্জন প্রকোষ্ঠে তিনি কাটিয়েছেন জীবনের সুদীর্ঘ কাল। তাঁর একমাত্র সাধনাস্থল এই কারখানা। নিঃসঙ্গ জীবনে একমাত্র সাথী ছিল কারখানার শ্রমিকরা। দিন শেষে পড়ন্তবেলায় শ্রমিকরা সবাই যখন একে একে চলে যেত, তখন রামপাল আর সুরুজ ছিলো তাঁর একমাত্র সাথী।

রামপাল ও সুরুজ কারখানার দারোয়ান। তারা দীর্ঘ সতের বছর ধরে বাবুর সাথে কাটিয়েছে। ২৫ শে মার্চের পরে সবাই যখন একে একে চলে গেল— তখনও ওরা বাবুকে ছেড়ে যায়নি। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও ওরা তাঁর কাছে ছিল। রাত দুপুরে বাবু যখন উন্মনা হয়ে উঠতেন— তখন ওরাই ছিল তাঁর একমাত্র সাথী— নিঃসঙ্গ জীবনের দীর্ঘদিনের সহচর।

আলাপ করছিলাম দারোয়ান দু'জনের সাথে। তখন সূর্যদেব সবে বিদায়ের তোড়জোড় করছিলেন। আধো আলো আধো আঁধারে এক প্রকোষ্ঠের মধ্যে বসে কথা হচ্ছিল।

২৫ শে মার্চের পরের ঘটনা। সম্ভবত এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ অথবা মাসের শেষের দিকে। সেই দুর্যোগ রাতের সঠিক তারিখ আজ নাকি ওদের কারোর মনে নেই। স্মরণ নেই সেই ভয়াবহ তারিখের কথা। নিস্তব্ধ নগরী। রাত নিঝুম। সাধনা ঔষধালয়ের গেটে প্রহরারত দারোয়ান— রামপাল, ইউসুফ মিস্ত্রি, ভূমি সিংহ, সুরুজ সেই ভয়াল রাতের প্রহরী। সেই থমথমে পরিবেশে হঠাৎ এক মিলিটারী জীপ এসে থামলো। তখন রাত দুপুর। পাঁচ ছয় জন সশস্ত্র সৈনিক গাড়ি থেকে নামলো। তাদের সবার হাতে ভারী অস্ত্র।

একে একে গেটের তালাগুলো আঘাতে ভেঙ্গে ফেললো ওরা। তারপর কয়েক রাউণ্ড ফাঁকা গুলি ছুড়লো। দোতলায় যোগেশবাবু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। সুরুজ পাহারাদারও সন্ত্রস্ত। বর্বরদের বিরুদ্ধে তার বন্দুকটা গর্জন করে উঠলো। পর পর কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়লো সে এলোপাথাড়ি। জল্লাদ খান সেনাদের উদ্যত রাইফেল গর্জে উঠলো। গুলির মুহুর্মুহু আওয়াজের রাতের নিস্তব্ধতা যেন ভঙ্গ হলো, সারা এলাকাটা যেন কেঁপে উঠলো। উভয় পক্ষে বেশ কিছুক্ষণ হলো গুলি বিনিময়ে। সে রাতে খান সেনারা সুবিধা করতে পারলো না। সামান্য একজন অস্ত্রশিক্ষণীয় বাঙালী পাহারাদারের কাছে পরাজিত হলো খান সেনারা। কি যেন ভেবে তারা পালিয়ে গেল।

বাঙালী বীর সুরুজ সেই স্মরণীয় রাতেই বাবুকে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে বলেছিল। বাবু তখনও তার কথায় কর্ণপাত করেননি। ভেবেছিলেন হয়তো— মরতে যদি হয়, জন্মভূমিতেই মরবো।

পরের দিন সকাল। রাতের সেই ভয়াবহ ঘটনা তখন চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। সন্ত্রস্ত যোগেশবাবু ও তার ভীত সহকর্মীরা ঘটনাস্থল দেখতে নীচে নেমে এলো। সকাল তখন প্রায় সাড়ে সাতটা। যোগেশবাবু নীচে নেমেছেন, সবে গত রাতে খান সেনারা যে ধ্বংসের সাক্ষ্য রেখে গেছে তা অবলোকন করছেন। এমনি সময়ে তিনটি মিলিটারীর জীপ কারখানার সামনে এসে থামলো। গাড়িগুলি ভর্তি সশস্ত্র সৈনিক। খান বর্বরদের সাত সকালে আগমনে বাবু আরও ভীত হয়ে উঠলেন। এক অজানা আশঙ্কায় মনটা যেন দমে গেল তাঁর। যদিও তিনি নাকি কখনও মৃত্যুকে ভয় করেন না। তার সঙ্গীসাথী (সহকর্মীরাও) কেমন যেন মুষড়ে পড়লেন। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন তারাও। জল্লাদ খান সেনারা নীচে সবাইকে লাইন করে দাঁড় করালো। বর্বরদের কয়েকজন যোগেশবাবুকে নিয়ে গেলেন উপরে। উদ্যত রাইফেলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অশীতিপর বৃদ্ধ সেদিন কি বলেছিলেন কেউ জানতে পারেনি।

এদিকে নীচে সবাই ভাবলো এ হয়তো সময়। মোক্ষম সুযোগ। প্রথমে একটি বাড়িতে সুযোগ বুঝে পালালো ওরা। হয়ত বর্বরদের চোখে পড়ে নি। তাই সেই দিন তারা কয়েকজন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেল। কিন্তু একজন বাঁচতে পারলো না। যিনি ভালোবাসতেন এ দেশকে। এদেশের মাটিকে। দেশের জনগণকে। যোগেশচন্দ্র ঘোষ নিহত হলেন বর্বরদের হাতে। জল্লাদরা তাদের হিংস্র বেয়নেটের আঘাতে একটা অনন্য জীবনের অবসান এনে দিলো।

সাথীরা সেই দিন সবাই প্রাণ নিয়ে বেঁচে ছিল সত্যি। কিন্তু ফিরে এসে তাদের মনিবকে পায়নি তারা আর। পরে বর্বর খান সেনা চলে গেলে অনেকে এসেছিল। এসেছিল সহকর্মীরা। পাড়াপড়শীরা তাদের প্রাণপ্রিয় যোগেশবাবুকে একবার দেখতে। না, শ্রদ্ধাভাজন যোগেশবাবুকে তারা আর দেখতে পারেনি। ওরা যখন দেখতে এসেছে

ডোমেরা তখন যোগেশবাবুর লাশ নিতে এসেছে।

অবশেষে তাঁর দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হল রান্নাঘরে মেঝেতে। উপুড় হয়ে পড়েছিলেন। বুকে তার সঙ্গীনের ক্ষতচিহ্ন। রক্ত ঝরার ধারা ততক্ষণে শুকিয়ে গেছে। শুকনো কালো রক্তের মাঝখানে তিনি পড়ে আছেন। বর্বররা তাকে শুধু হত্যা করে ক্ষান্ত হয়নি, তারা বাবুর সারা জীবনের অর্জিত সকল ধনসম্পদ নিয়ে গেছে লুণ্ঠন করে।

সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য

সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুরাগীরা তাকে বারবার অনুরোধ করেছিল। দেশ ছেড়ে চলে যেতে। কিন্তু তিনি যাননি। স্বাধীনতা দেখে যেতে চেয়েছিলেন এখান থেকে।

জীবনের শেষ দিন সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য বেশ ভোরেই ঘুম থেকে উঠেছিলেন। যথারীতি নাস্তা করে রেডিও শুনছিলেন। তারপর আহ্নিক করতে বসেছিলেন। সকাল তখন সাড়ে আট কি নয়। আহ্নিকে বসার আগে মেয়ে স্বপ্নাকে ডেকে বলেছিলেন, দেশ স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে রে মা, তুমি শীঘ্রই তোর দাদাকে দেখতে পারবি। স্বপ্নার দাদা অর্থাৎ সন্তোষবাবুর বড়ো ছেলে কলকাতায় থাকতেন।

সন্তোষ ভট্টাচার্য আহ্নিকে ব্যস্ত এমন সময় দরজায় ধাক্কা। দরজা খুলে দিলে ভিতরে ঢুকলো এক বাঙালী যুবক। কাঁধে স্টেন।

উর্দুতে জিজ্ঞাসা করল, "কোহি হ্যায়?"

এমন সময় সন্তোষবাবু বেরিয়ে এলেন্। যুবকটি তার নাম জিজ্ঞেস করে তাকে নিয়ে যেতে চাইলো। সন্তোষবাবু জিজ্ঞাসা করলো, "আমার কি অপরাধ?"

'চুপ, বেশী কথা বলবেন না।'

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

'যেখানে খুশী।'

'তারা তাকে বাসা থেকে টেনে বাইরে নিয়ে গেল। চোখ বাঁধলো এবং সেই শেষ বাসে নিয়ে তুললো।'

FATHER R.W. TIMM

I returned home to Notra Dame College feelng sick in mind and heart because of the seeming world ,and especially American indeifference to so many atrocities. The **Time** and **Newsweek** cover stories on genocide in East Pakistan came out soon afterwards and, although banned in Pakistan, bootlegged copies were quickly circulated. They probably did more to arouse world opinion than anything else except **'The Rape of Bangladesh,'** a book by a West Pakistani journalist, the late Tony Mascarenhas, who was allowed in by the government because they expected him to share the official viewpoint. Instead, he got his family out to London and then published his timely expose.

The college had opened a week before my arrival in Dacca with only 21students, most of whom had come out of curiosity. Dacca university had no students at all, while government announced that Rajshahi University had a majority of its students come back. It was conveniently far enough away, so that no one could easily check.One Urdu-speaking (West Pakistan) student of Notre Dame complained that he had a right to have classes,so Fr.Wheeler told him that if his father would pay tutorial fees he would be taught. The Army was coming every day to check on the number of teachers and students, but Fr.Wheeler convinced them that he could not run a college with oniy 21students. Intermediate examinations were to be held in the second week of August and our college was to be a centre for our own studentes and those of some small colleges as well, But the Mukti Bahini was out to stop the examinations.At nearby T and T college (Telephone and Telegaph) onAugust 8, a large section of the building was blasted out.The explosion could be heard for five miles. We had good relations with the Mukti Bahini, however,and were not worried about being blasted. As a principal of the college I did receive a death notice, allegedly form the Mukti Bahini, but a leader of the Mukti assured me that we were on their protected list, since I had secretly provided funds for medical work.

My Boss in CRS was Andy Koval, who had come to work with CORR on its three cyclone rehabilitation projects in Noakhali, Barisal and Patuakhali Districts. Like the rest of us, he was soon caught up in war activities. When Fr. Goedert at Nagori,about 25 miles form Dacca, began

giving sanctuary to Hindus of 65 burned out villages, he appealed to CRS for help. Andy arranged for boat shipmens to carry out food and supplies to Nagori , with one bag marked "enriched flour." This one contained the money. Fr. Goedert used to keep us entertained at the CORR office in Kakrail with his almost daily accounts from Satanabad and Dismalabad (takeoffs on the Pakistan capital of Islamabad).

Fr. Goedert collected his writing at the end of the war and hoped to publish a book entitled **Paint the White House Black** but could not get any American publisher.

The treatment of the Hindus was one of the most depressing features of the whole war. After the initial weeks, when the Army attacked villages indiscriminately, the full force of their wrath fell on the Hindus or Kafirs (non-believers). And when Muslims (except the Awami League) saw that they were safe, many of them joined in the persecution. In 1978, I gave a review of M.A. Muhith's (later Finance Minister) book **Bangladesh : Emergence of a Nation** at the publication ceremony held by Bangladesh Books, I pointed out that the real history of the war inside the country would probably never be written. My reason was that it was too shameful to bring to light. For a short time after independence almost all of those who remained in the country during the civil war were considered to be "collaborators." The Mukti Bahini and the government-in-exile in Calcutta were the real "heroes." There were, indeed, many collaborators and their crime should not go unnoticed. Just as the continuing consciousness of the horror of the Nazi concentration camps helps to prevent a repetition of the same, so the revealation of a communal guilt in 1971 should serve as a salutary lesson for the future in Bangladesh.

In the third week of August, I made a quick trip to Bhola with two CARE people and heard there the encouraging news that the government had done away with discrimination against Hindus in agricultural loans as a result of my intervention. On the way back from Bhola our steamer out of Barisal was fired on by the Mukti Bahini. I heard bullets pinging on tin as we hurriedly dived out of our bunks onto the floor. Lying on the side near the corridor I felt safe, since other bodies were lying between me and the firing. After two or three minutes I got back on my bunk while everyone else yelled "Get down, get dwon!" I replied : "We're already well past the firing point." In the morning my confidence of the night before was greatly shaken. Our room was the first one off

the lounge and bullets from a previous firing had passed through the corridor at an angle and through the wall right where I had been lying. I requested CRS to get some bullet-proof vests, but Andy thought that I was only joking. I told him that one of the reasons I wanted my nephew to work with me was that he is 6'4" and weighs 225 pounds, so I could hide behind him.

In a lengthy report to the Rohdas on September 2, after returning from a week's trip in Patuakhali with a Caritas Germany representative, I emphasized that in spite of a VOA (Voice of America) analysis of the situation in Bangladesh which I had heard the previous night, the big cities were not "fast returning to normal." Eighty percent were supposed to have turned out for the re-opening of schools but the fact was that no schools were running in Dacca District outside of Dacca Town. For the Intermediate Examination at Notre Dame College there was only 20% attendance, high for Dacca. For the Matriculation Examination of Dacca Board of Education only 13,000 out of 72,000 candidates sat for the exams. Most of those sat only because their fathers, government employees, had to fill out a questionnaire asking, among other outrageous items, how many children they had and which exams they were eligible for in 1971. The fathers got the message, but many of children reported "sick" after a day or two of examinations.

On the U.N. involvement in Bangladesh I wrote on September 2:

The UN food distribution is necessary but will only succeed, if the Army is completely out of it. Much more important for the UN to do right now in a humanitarian way is to guarantee the protection of the Hindus. Either they should get a government declaration in East Pakistan for all government and military officials that Hindus are citizens of East Pakistan and not "enemies of the people" and therefore, anyone attacking them without cause is subject to the full rigours of Martial Law, or, they should get government to allow a general exodus to India under UN, auspicious for all Hindus who want to leave. That would surely be embarrassing for the government, since about 99% would leave immediately.

...UN observers are not liable to be of much help. They don't know the language, they don't know the people, they can't live "off the land" in the village areas, they will be "taken in" by the government sources.

Bangladesh has warned them that their life will be in danger, since their activities in Bangladesh are frowned on. They deserted the Bengalis for four months while they were being slaughtered by the thousands and now they come in to bolster the government position. They can't consult foreigners who have long been in the country and know what is going on because they are "neutral" I don't expect much from the UN except distribution of food.

The Mukti Bahini were already enjoying much success in the rural areas but were tightly controlled in the cities. Large numbers of Hindus who had fled joined the Mukti Bahini and came back to fight for the establishment of Bangladesh. Whenever the Mukti Bahini entered a village they seized the looters of Hindu homes and forced them to restore everything. The razakers (armed collaborators with the Pakistan Army) were a special target of the freedom fighters.

The poor razakers who were singed up by the Army for a Rs. 50 bonus and Rs. 3 per day, plus (it is said) relief food, Now find themselves being used as suicide squads by the Army. In any road patrol they are in the leading jeep to set off the road mines and in any villages action they have to go in first. They won't last long in the villages after the Army leaves, since the Mukti Bahini invariably clean them out as soon as they come into a new area.

One important observation I kept repeating in all my communications abroad :

The one big point foreign observers don't seem to realize is that, although the big cities and government offices may seem to be restored to normality (and they didn't know what normal was before), every last Bengali hates the Army and in the villages everyone is for Bangla Desh except Muslim leaguers and Jamaat-e-Islami, who are relatively few and whose influence is rapidly waning as the Mukti Bahini move in.

I requested the Rohdes to let me know "what sort of materials you would like to have for the future, since I should now be roaming about the whole country, more or less, and can acquire all kinds of information"

Shortly thereafter I got the news that Ted Kennedy and Nevin Scrims haw of MIT would be visiting Bangaladesh and that they had read some of my letters and would be contacting me. They made it only to the

camps in India and to the Bangladesh border, but Ted was convinced that the U.S. should call a complete halt to its involvement, in spite of using Pakistan as a hopping-off point for Nixon and Kissinger's "China opening."

Dr. Lincoln Chen and Dr. Jon Rohde published on September 11 an article in **Lancet** the premier British medical journal, on **"Famine and Civil War in East Pakistan."** They tried to show that the U.S. policy was fostering famine. I tried in a letter of September 7, before getting the news of the actual publication, to head them off, since a famine did not seen to be shaping up. I had a two-hour discussion with a man from Granada TV (British Independent TV) who was assessing the possibility of a film on the situation up to the aman harvest in November-December. After consulting widely, he felt that the food situation would depend strongly on whether the refugees returned in large numbers or not.

Again, I emphasized the difficult situation of the Hindus :

One thing you can certainly emphasize right now and that is that, there are Hindus starving right now because they have been thrown out of their homes or had their homes burned and they lost all their possessions through looting. They are wandering around looking for sympathetic people to take them in and feed them. The ones who have returned to their home area have nothing. Bishop Blair (Anglican Bishop of Dacca) made a tour of three weeks in Faridpur and Barisal Districts three weeks ago and he said people had enough food for only one month. Some Faridpur Hindus are known to have shown up in several of our Dacca District missions becauac they had nothing to eat at home. Fr. Goedert is still feeding over 2,000 Hindus at Nagori, in spite of the fact that it is over a month since these people were first driven out of their homes nearby. We are of the opinion that in the big Hindu areas the Muslims will not be hard-up, since they have looted everything from the Hindus– cows, food, furniture, money when the Army left any, etc.

On Mukti Bahini activities I wrote in part :

I wrote to you last about the Mukti cleaning out the dacoits at Narikelbari. On September 1 the Army came there 200 strong, shooting indiscriminately, and killed an old woman. The next morning they

left, taking three christian fishermen who were fishing nearby. One did not move fast enough and they shot at him, hitting his son in the head. Bishop Joachin (of Chittagong) and Fr. Demers were in the mission and they were blamed by the Army for taking care of the wounded. I told Bishop Joachin, he should have told the Army that even Hitler took care of wounded women and children.

On September 11, I wrote to my Indiana Senators Birch Bayh and Vance Hartke a resume of some of the important recent developments :

I am a Holy cross priest from Michigan City Indiana. I am writing to thank you for your co-sponsorship of the Saxbe-Church amendment (S#1657) to the Foreign Assistance Act of 1971. There is still great need today of following a "hands off" Policy until a favourable climate is created for the return of the Bengali refugees from India. I have seen in the Local Papers that Mr. Rogers is asking for a lifting of the temporary ban on developmental aid to Pakistan. There are certain recent developments in East Pakistan which may trick the outside world in to thinking that conditions have changed substantially in recent times and that American aid given now would no longer be in support of a fascist militarist regime. These developments are that lifting of press censorship and that proclamation of a general amnesty. However, just the day before lifting of press-censorship, Martial Law Order No. 89 was promulgated, which forbide the publication or dissemination of anything which can in any way be interpreted as prejudicial to the welfare of Pakistan, i.e., of the military regime. The General Amnesty was proclaimed on September 5th and a photo was published in the papers the following day showing prisoners who had allegedly been released. However, no one has seen a single one of these prisoners. Pressmen have not been able to learn from the government, the name of a single person who had been given amnesty. Moreover and this is far more serious, the slaughter of caste Hindus as enemies of the people continues unabated. Yesterday I returned from a tour of Tangail and Mymensingh Districts in my capacity as Field Coordinator of Relief Programmes of the Catholic Relief Services. I saw entire Hindu villages which had been looted and burned out, large centuries- old Hindu temples wantonly destroyed, and heard gruesome tales of torture of those Hindus who had refused to become

Muslims. A prominent Hindu of Modhupur (Amulya Babu) is on the blacklist for extermination who previously had been given one of the highest award of the Pakistan government (Tamgha-i-Kidmat) and thrice had been named Union Council Chaiman of the Year for Tangail District. He was outstanding in loyalty and in development work and he was a supporter of the Muslim League rather than of the outlawed Awami League. His only "crime" is that he is a Hindu. He is now in hiding and his family is living at the Jalchatra mission. This is only a small example but one which I can vouch for personally.

I am not concerned with the political solution of the "Bengali problem" But I can tell you some things which the 3-day visitor and foreign journalists cannot easily find out : 1) every Bengali hates the Army, since everyone has been affected in some way by their attrocities; 2) every Bengali lives in mortal fear of the Army and what it might do to him and his family. There may be millions of Bengalis who still stand for a united Pakistan but at least they are all united in rejecting the military oppression, which continues unabated, as if the only possible solution to the problem is to crush by military might.

In mid-September the Pakistan government began proclaiming amnesty for those who had gone to India. A few days before, I had gone with Fr. Homrich to the jail at Muktagacha, Mymensingh District to try to get the release of a tribal boy who was being held because he was alleged to have gone to India. Fr. Homrich had been five times to the jail previously and took four Muslim witnessed to prove that the boy had never left home. He was in a cell with five other men, but it was only big enough for one to lie down at a time. We did not get the boy's release, in spite of the amnesty.

On the same trip we visited Shibganj in Tangail District, where 120 Hindu baris had been destroyed about a month before. the Hindus were living elsewhere with Muslims, Garos or other Hindus. One of them, a teacher who was a final year M.A. candidate, told us that the Muslim headmaster had warned him to flee because they were going to cut and salt him if he didn't become a Muslim. We saw a Hindu doctor in Fulbaria bazar wearing a prayer cap and looking as if had lost his soul; He was a "convert," The Muslims told us, though,that there is no conversion "by the sword," since Muslims had never done this in their history. They made a fine pharasaical distinction. The Hindus were threatened with torture and if they hadn't "converted"by the time the armed forces ar-

rived it was too let. They couldn't convert at the point of a gun.

Thoudands of Hindus came to Catholic missions begging to become Christians. The Catholic policy was to enroll "in the community," give them a cross to wear and tell them that when things settled down they could make up their minds about accepting baptism and becoming Christians. (I don't know of any who did.) the military commander of Mymensingh spoke to Fr. Jacob Dessai (without objecting) about taking in Hindus, but asked him why they couldn't become Muslims!

On the way back to Dacca from Tangail we passengers had to get out of the bus at three bridges, undergo a body-search and cross the bridge on foot. The West Pakistan police were getting very "jumpy." In spite of road blocks thrown up all over Dacca by Army and West Pakistan police to try to restrain the Mukti Bahini, on September 12 in the Motijheel business district near our college a big car stopped and its occupants disarmed six razakers and carried off five of them. They left the other one with a note that they could do this any time they pleased right in the heart of town.

In mid-September I read an aphorism: "The pity of death decreases in direct ratio to the progression of its mass." How true this was of the Bangladesh situation. The death of thousands hadn't created as much stir as the death of tens in northern Ireland.

Briefing visiting journalists and lining up interviews (with the interviewers wearing blindfolds) and sites to visit was as important a part of our work as setting up rehabilitation projects and sending out of formation reports. In the third week of September we suggested that the NBC news team (Rogers Unit) visit the Christian village of Doripara near Arikhola Station, where 119 houses had been burned out. The Pakistan Military could not catch the culprits of nearby railroad bombing so they punished the innocents. NBC was interested in seeing a mass grave but I told the team that it would be difficult to provide such a delicacy, since the Army was not anxius to leave any traces of massacres lying around. The last guide who pointed out a mass grave to foreign journalists (in Jhalakati, Barisal District) through our arrangement was killed by the Army four days later, and we did not want that to happen again.

In my weekly report of September 26, I noted that Rhonda Schwartz, who had been sent to us by the Rohdes, was not able to get people to talk for TV, since they were clearly watched by the Army. They would have liked to interview one of the college Fathers if one came out of the

country in the near future. Fr. Banas remarked that he thought he would ask permission of our General Superior to join the Freedom Fighters. Sometimes I felt that way myself, but seeing up close the results of warfare and hatred was the surest path to non-violence.

The representative of the U.N. Secretary General In Dacca, Bahgat El-Tawil, an Egyptian, called a meeting of the few voluntary agencies then in the country at Notre Dame College in late August from India and wanted to know what could be done for them. We felt that he was too weak and inefficient for the job and he was soon replaced.

On September 20, I wrote to the Rohdes :

Today I took the UN liaison officer to the Narinda Trade School to see the Hindu house which the Army took away for installing Muslim squatters from along the railroad tracks. I have selected this area for the test case, since the people are still available, they are willing to come back, they have their land documents and it is a small area (15-20 houses), which we could repossess as a unit, hopefully, tomorrow I meet the UN Representative (acting, since El-Tawil left on Saturday and has not been replaced yet) on this problem. I am not barging right ahead in the energetic direct-action manner you people have made famous because I have investigated all the little loopholes and want to have an airtight case before I get charged with false accusations, or perhaps sent dozens of Hindus to their destruction. If the UN cannot get involved, I will approach the new Minister for Relief and Rehabilitation, since his ministry includes the people affected by the recent disturbances. Unfortunately, he is a former Awami Leaguer, who was just released from the Cantonment in time for his swearing in. He would be awfully embarrassed by my case as one of his first acts. I suppose I will eventually have to carry it to Dr. Malik (the Governor) and say : "Here is what you said; did you really mean it? We will probably be told to have the Hindus bring a court case to recover their houses. One Hindu in Narinda got his house back this year after a 7-years court case; he was ousted in the anti-Hindu riots of 1964. I will keep you informed of progress.

There were two Quakers in town for a week or so; one of them went with me to Mymensingh and Tangail Districts last week They were wondering what they could do, so I suggested their opening a centre in

Dacca and taking up this matter of getting property back for the Hindus. They were enthusiastic about the idea and will propose it when they return to England.

After our visit to Narinda I submitted a Memo to the UN on the Hindu housing operation in Dacca.

On September 25, I heard a denunciation of Mahbub Alam on Radio Pakistan. They said that he is not a true Mussulman and even called him by a Hindu name; they said he had given his daughter a Hindu name. Last week I heard of a teacher at Rajshahi University who was so incensed over what the Army was doing in the name of Islam that he changed his name to a Hindu name. The army came and asked for him by his Muslim name and he said that there was no one there by that name and gave his Hindu name. They took, beat him and knocked out all his teeth. There is going to be a real crisis of religion among the Muslims soon, because of the growing Muslim fanaticism. The new cabinet are mostly Allahwallahs with long beards – three are moulanas and two are from the Jamaat-e-Islami Party.

Becaouse of his interest in the relation between religion and the conflict in East Pakistan, Fr. John Haughey, S.J., one of the editors of America magazine, visited Dacca. He wanted to write two articles, one on the relief efforts and another on Islam as a factor in the civil war. I took him to meet Abul Hạshem, the blind director of the Islamic Academy and fermer Secretary for the Muslim league in undivided Bengal. His first words astonished us : "I hate Muslims!" He want on to distinguish: "I love Islam but I hate Muslim for what they are doing to us in the name of religion." He then made a second startling staement : "The only ones who are practicing true Islam today are the christians. "Fr" Haughey did not refer to this interview in the articles he wrote.

By september 29, 70 UN personnel were in Dacca with UNEPRO (UN Relief Operation in East Pakistan). U-Thant, the Secretary General of the UN, called for more, a limit of 157, as I recall, but I heard from a UNICEF person that Government had set a ceiling of 38. They were limited to Dacca, Chittagong and Khulna, and to go anywhere they had to give a 5- day notice so that the Army could arrange protection for them.

The food problem was one of the most crucial. By September we were getting many reports of people hurting for lack of food. The late Bro. Donald Schmitz, by then the Field coordinator for HELP in Manpura,

wrote that after the northern embankment fell into the river through erosion at Hatiya, thousands were rendered homeless. Government was doing nothing for them and they were getting desperate. At Gournadi, north of Barisal, the Hindus would not come into get their ration cards or rations because the Army was there, where the food officials would not send food outside of town since the Union Council Chairmen were all hold up in Barisal Town to escape the Mukti Bahini.

We at CRS felt that there would be plenty of food coming in from outside, though we felt less and less as time went on, that it would ever reach the people who were actually starving. The New York office of CRS sent a cable: " We are sending 100,000 tons high protein food." When we enquired why, we were information that if we kept up with the New York Times we would know that there was starvation in Bangladesh. We turned down the CRS offer.

The food situation also formed a part of my September 20 report :

The U.S is swamping this place with food and transport. If anyone starves, it will only be for political reasons. I got words (and this comes from the Red Cross) that relief food will be given only to "loyal citizens of Pakistan" and we all know that this dose not include Hindus. At the local levels, where the razakers rule supreme, anything can be done against anyone and on one has any redress. Judging from the amounts of food coming in from the various countries, there will be more than the port facilities can handle. Distribution to the local level will be the big problem, since in many areas this intermediate area has broken down completely. This is the big problem with insecticides. We have evidence of severe insect damage in many districts. There are 19,000 tons of insecticides setting in Chittagong and 16,000 sprayers, but they cannot be put on the road... There are large depots of insecticides in Dacca and the Districts headquarters and thousands of sprayers, but they are not moving. There are seven planes at the airport but government is not doing aerial spraying this year because they can-not afford it. (AID is not supporting this programme because govern-ment did not manage it right in previous years). So because of the money going into the military effort and the transprot going into the military effort foreign countries will have to provide food for months, which they could easily save for themselves by insect proitection. There

are so many different ways in which the Army is ruining the country.

I also mentioned that all 400 UNICEF vehicles had been seized by the Army and only about 48 recovered. UNICEF was bringing in more vehicles rather than forcing the Pakistan Army to return theirs. On the day I wrote, I saw, in company with a UN person, a car on the street in Dacca with the UNICEF insignia rubbed out, so we took the licence number. In the next week I spotted two more UNICEF vehicles with their insignia rubbed out and a UN jeep full of armed soldiers, which stopped at farm Gate to let the soilders out. This was completely countrary to the UN agreement, which would not allow armed protection for UN relief distribution.

In late September, at the instigation of Ted Kennedy. Lou Hunter from the Inspector General's office in Washington, D.C. came out to check whether cyclone relief was being abused and whether the present relief operation was liable to be. Andy Koval and I talked to him for $2^1/_2$ hours. I was very emphatic about the order given out that only loyal Pakistan citizens would be given any relief food and that it would probably not apply to Hindus. Relief food was to be distributed through the government system of fixed price shops and in most villages they did not exist. Undesirable people would not get a ration card.

After the visit, I sent out word to several cities where CORR was carrying out relief programmes and asked them to take up test cases : to have Hindus apply for ration cards, ration shop food, etc., and see if there was any discrimination against them.

On October 6, I sent this report to the Rohdes :

I wrote a paper on the problems of food distribution for UNICEF after talking at length last week with Schonmeyer from Geneva, who is said to be the most knowledgeable of the UN people. We were impressed with his igorance. At least he had the good sense to try to find out what is going on. He said that Labouisse, head of UNICEF, has issued instructions that all UN personnel are to be concerned not only with their jobs but also with violations of human rights. I gave him a number of instances of broken agreements on the food distribution and they are starting to exert a little pressure. For example, they are not following the government requirement to give 5-day notice before traveling anywhere, but are going out on their own. I am now investigating some cases of food distribution which may hurt the Army very badly when we get all the facts down cold. Last month when I was in Barisal

there was a UN boat with food grains at the Army anchorage. I heard via the Commissioner for the whole division that these food grains were unloaded by the Army and kept by them at Martial Law headquarters and did not get to the government Food Department Centres. I have got a good man on that case now.

... We now have 30 projects of relief going under CORR and a new problem is arising- the thousands of people who are out of work and living in the villages are just now beginning to hurt as their reserves of food are exhausted. They had to feed many more people than usual in the village in April and May and many of them have given refuge or food both to Hindus for some months. The food coming in can, easily be used as a political weapon to put pressure on men to come back to work. Fortunately, the UNICEF-CARE feeding programme for primary school children has been able to dissociate itself (in written agreement) from requirements for school attendance. Their food goes to all children independent of school operations.

With my roport of October18, I sent out copies of a report on prejudiced food distribution in Dinajpur, a letter to Bill McCaw, Chief of mission of the UN and letter to the Big Powers.

I got a good reception from a couple Consuls, but no comment from the American one. He is the perfect replacement for the emotioal Arch Blood, since he is either constitutionally imcapable of registering a facial expression or he has never experienced any passion in his in life, grand or otherwise. I think that there is something horribly warped about a person who cannot smile. At any rate, Washington will never be able to accuse him of emotionalism and if he gets convinced that the U.S. is desperately wrong here they may just slightly listen to him did you know that Yahya in his radio address of October12 referred to his good friends China and US (in that order)? It's haed enough living here without having to feel apologetic about your own country.

The new American Consul General, Herdert D. Spivale, a Catholic, did conplain to General Niazi about the attacks on Christian villages. Niazi was indignant and said that the army had orders to spare the Christians. Like all alleged orders during the war, this one also does not seem to have reached the ranks. Niazi challenged the Consul General to show him any Christian village which had been hit and he would take him there by helicopter. We furnished the names of several places and the contact persons to see there.

By Novermber it was obvious that the food situation gave no cause for alarm. The aman crop was looking great and there was promise of a bumper harvest in all the areas that had not been flooded. There were two days of heavy "Puja rains" towards the end of October, which were highly beneficil because so much of the aman crop was transplanted lete. Plenty of food was coming in to the country and several coasters were available to transport grains to the river ports. The big problem was transport to the interior, since Food Department Officials would not move the food into Bangladesh (Liberated) territory.

The army wants to give protection but the UN has told them "Strictly hands off"-they are very stern about no associations with the army. They have some good UN observers here and they are moving around and are eager to learn what is going on. The UNICEF-CARE child feeding programme is going on in many schools, particularly in larger cities but they are not yet reaching the needy children. There are no sings of malnutrition in the children under six even in the devastate Hindu areas.I think that the UN is gradually making itself felt,any foreign presence in an area makes the oppressors think twice. Since everyone is affraid of someone higher up. They made such a stink about UNICEF vehicles which disappeared since March that I do not think, the army will try to take any of their new vehicles which are very conspicuously marked UN.

In the same letter, of November 2, to John and Barbara Thomas, after Dr. Rohde had left for Calcutta to set up medical programmes in the OXFAM relief camps I reported that the relief commissioner had told the Director of CARE that he was instructed to issue word that relief food is to go only to loyal citizens of Bangladesh.

On october 31, I sent a report to the UN in Dacca on some personal investigations at Chalna port.

On october 26, the Navy Commandant of Khulna sector came in four gunboats at 8 a.m. to Chalna Port from Khulna accompanying a troop steamer and barjes of ammunition. The gunboats made a sweep of the Chalna area burning a village (Dhainmare) right across the river including 22 Christian homes. Four Christian fishermen were taken in a boat with their net and on protesting that they were Christians and that the harbour master knew them, they were taken a board and tied so tightly that their circultion was cut of. The witnessed the shooting up of two boats of five fishermen who apparently did not

know the appropriate response when the gunboat fired warning shots at a distance. The two boats were sunk and the men shot in the water. I went to help obtian the release of the four Christian fishermen that evening but they had just been released after interrogaton. At 10.30 that night, there was intense shelling and machine gun firing for a half- hour but apparently it was only a cover for the unloading of the ammunition barjes between 10 P.M. and 2 A.M. This was reported to me by a Christian workman conscripted for labour and by a Yugoslav engineer who lives right at the wharf. Both said that there was firing from the other side.

A mission worker of Shelabunia village just at Chalna port told of reports from muslim dock workers who were involved in the work and the same report came to the Parish priest from a Christian employee at the dock. They said that a shipment of releaf rice was tranasferred to a ship going to Karachi.

Unfortunately I could not interview any of these men or learn any more details. The parissh who was has been there 15 years was convinced of the veracity of the witnesses but thinking that nothing could be done about it, did not pursue the matter further.

By the 19th of November, I had written that :

The food distribution has broken down almost completely. 50% of the UN personnel I have moved out and all the field hands have been drawn in. They are now turning over blankets and food to us since we are the only ones who can still reach the devastated people. I now have 50 projects going but unfortunately my CRS boss evacuated with his family last week. I hope we get a replacement soon. The food boats have been held up due to mines and even when the food comes through it goes to Army and razakers first. We have two reports of razakers doing business in food and the Bengalis are still geting nothing as of last week. I just heard today that the Mukti are near Dinajpur and that all the richer people are fleeing the city. Biharis form Jessore and Dinajpur are pouring in to Mohammadpur Dacca, they are the smart ones, since in to the event of an army pullout their life would bed in jeopardy. On this score I asked my Mukti informer about what would happend in the event of a sudden Mukti takeover. He said that they had received orders to spare all captives since they are concerned over the

EBRs (East Bengel Rifles) and the large number of Bengalis in west Pakistan. However when a Punjabi was captured at Srinagar Dacca district the people beat him to death.

During the second weekend of October, I went out to Nagori with Ray Kennedy and Mick Doheny, two Holy Spirit Fathers working with Irish CONCERN. I recorded a tape for the Fathers which they were going to use on Irish TV and radio. Mr. Mike had received much publicity in Ireland some weeks before when he was arrested for crossing the nothern border into East Pakistan. While we were at Nagori :

Fr. Geodert distributed food to 6,400 people yesterday at the mission. The Muktis had blown up a train two days before and everyone was momentarily expecting retaliation. Two of our Fathers were on a train which over turned (Fr. Zimmerman and Fell) but were unhurt. Four people were killed. The Muktis had warned people not to take that train. Today's and yesterday's trains were almost empty. This morning the Army hit Pubail with gunfire but all the people had pulled out. Our boat could not come in to the ghat at Gulshan because the razakers had shot two men there just an hour before.

On October 17, I got a reluctant partial account from Bro. Donald Becker on the killings at the Cantonment. He would not allow release of the story for fear of retaliation against the witnessed, who were eight Hindu sweepers hired by the Army to drag dead bodies to mass bulldozed graves and throw them in. They were paid 0.25 paisa per body and one man had earned Rs. 82 in a single day.

On October 11 Dr. Rohde had written that :

It is impossible to express the value of your letters to the efforts here. Eact one, appropriately edited, forms the basis of a fresh assault on Capitol Hill and forces the administration to be a little more honest for a few more days... We are distraught, but making one further assault in two days trying to show how foolish is continued U.S. support - using your last letter as the prime evidence of sustained Army terror. Good timing! ...Your accounts have been superb, precise and detailed, and form the only factual basis for our work here.

On november 7, I returned to Manpura for a quick visit. On the way down I saw a UN Mini-Bulker at Chandpur with an armed guard on it. I

fearfully took a picture and sent it out of the country later with Ray Kennedy, who accompanied me to Manpura. Only two days before I had sent out word to radio Bangladesh, at the urging UNROD, asking them to publicize the fact that no UN boats have armed protection and that their vehicles won't pickup any army personel.

Ray Kennedy was intersted in providing me with a couple of Irish volunteers to run a health dispensary on Manpura. On our returm trip to Dacca we waited 30 hours on Hatiya for the Chittagong steamer, sleeping in a tea stall at night, then caught an open ferry boat to Char Jabbar, where we got a ramshackle bus to Maijdi Courts. Retuming to Dacca by bus, we had just crossed the river at Daudkandi by ferry when we got word that Dacca was under all day curfew. The bus and ferry returned but Ray refused to go back and continued sitting on the ground. I jumped off the ferry just as it was pulling out and we went by rickshaw up to the Meghna river, where no ferry was available for crossing. Ray made me call several large cargo boats but they paid no attention. In a tea stall I heard that we could walk two miles down the river and catch a small boat to Narayangang at a village. As we came towards the village I saw furtive slinking of men around corners, but one came out to meet us and quickly helped us to get on a boat. After a short distance out of the village we were hailed from the shore. Several heavily armed freedom fighters seated on the boat but the second one was a former student of mine. They were nervous because they had killed two armed guards at the ferry they previous night. They were proud to show us their camp and then sent us on our way.(This was my second ambush. The first was near Jalakati in Barisal District when Mukti Bahini suddenly spring up from the hogla (cattails) On both sides of the small stream down which our CORR speedboat was moving. Again a former student "saved" me.) When we got to Narayanganj, Ray wanted to press on but we stayed overnight and the next day returned to Dacca after a trip of 4½ days.

Back in Dacca I prepared a two-month report on the CORR project for victims of the civil disturbances. Andy had asked me to do this, while he would write up the cyclone projects. Fr. Ben Labbe, the CORR Director, was still weak in English at that time. Andy came in the next morning with 50 hand-written pages, while I had only two. Andy said: "You have to expand your report," while I relied : "Whoever is going to read all your garbage?" I expanded my report to seven pages and our 50-page

cyclostyled report went out to the donors. After a few weeks a letter came back from Caritas Germany: "Marvelous reports! Beautiful detail! It makes us if we were right there."

On November 13, one of our American Holy Cross Fathers, Fr. Bill Evans, met a tragic death at Nawabganj, Dacca District. His death received worldwide attention, unlike the deaths of an Italian Father in Jessore and a Santal tribal priest in Dinajpur, who were killed in cold blood by the Pakistan army in April. Clare Hollingworth of the **Daily Telegraph** was in the locality and was present at Fr. Bill's funeral. The Military had stopped him and questioned him. Five soldiers then brought him out and led him to the river bank where they beat his head with rifle butts, slashed him with bayonets, shot him twice and threw his body in the river. His body was found five miles downstream by the Mukti Bahini, who had witnessed his killing from across the river, and brought him to Golla Church for burial. About 5,000 Christians, Muslims and Hindus attended his funeral, because he was widely loved and revered as a holy man. Every year a Fr. Evans Shaheed (Martyr) Basketball Tournment is held in Dacca in his memory.

On November 19, I reported to the Thomases about continuing activities against the Hindus :

Just before I left (for Manpura) I visited several Hindu houses in Dacca where the people had gotten their house back two month after they petitioned and with the payment of reasonable bribes. The group I had written about orignally at Narinda still hesitated to apply for their house, and, as it turned out, with good reason. Last Saturday nine Hindus were shot and killed by the razakers in that area. I have many other reports about continued atrocities against the Hindus. On October 11, at Shosha near Jamalpur (Mymensingh District) the Razakers went to the home of a Hindu lawyer and rounded up 12 Hindu men and shot them outside the house. The people found nine bodies, two are missing and the lawyer was taken to Mymensingh hospital. On November 10, after the Muktis hit Muktagacha (near Mymensingh) the previous night, the razaker rounded up 20 people, mostly Hindus, and shot them Sunday morning. Among the escapees was a Hindu woman with five bayonet wounds in the neck. Some Hindu starvation cases were reported from near there. People who cannot

stay and who can no longer get out of the country. last night the Pak government announced that they have asked the UN observers to disprove India's baseless allegations that more refugees are coming over the border. I can give them the names of places refugees are coming over the border. I can give them the names of places where the people would certainly like to cross the border but are prevented from doing so.

Just before Andy koval left East Pakistan with his wife Cherifa and daughter Natasha, I had dinner with them in Banani, near the cantonment. Driving home at 11p.m. in the rain, I was looking intently through the windscreen when I saw two men with guns out of the corner of my eye on the centre strip of Mymensingh road I slammed on the brakes and two army men came running up. One said: "you go 100 yards, I shoot." I retplied: "I go 100 feet." Again, in front of the Sheraton hotel, a young soldier stopped me and addressed me in Pashto, thinking I was a pathan. When he found out the that I know a little Urdu (which I had brushed up on for such emergencies) we talked amiably in the middle of the road for about 10 minutes. After the war, when I was delivering some Biharis to the Cantonment who had taken refuge at Notredame college, this same soldier came running up to greet me. I was pleased to see that he had survived the war.

After Andy's deparpure the CRS operation was suspended and I transferred my allegiance to CORR as Planning officer.

The return of the refugees was the trump card of the government in proving to the outside world that normality had been restored and that people were returning joyfully and peacefully to their homes. At our first meeting at Notredame college with John Kelly, representative of the UNHCR (U.N. High Commissiom for refugess).I was totally exasperated. He seemed completely convinced that the refugees were geneunely returning in large numbers and that the Government was not pulling off a hoax. He said he had seen them coming across the border with his own eyes. I asked him: "What was the composition of the group ? "And he replied:"Women and children, but the men were coming back letter." I told him that no Bengali men would send their women and children on ahead. Later on we were able to convince him because he kept an open mind, possibly because he was a good Irish Catholic and was brought

up to pay heed to the Fathers !

I paid a visit to the big refugee central at Jhikergacha Jessore district, where visiting delegates, such as the Aga Khan, were brought. The fathers of near by Shimulia Mission told me that local people had been rounded up before the visit and paid to stay at the centre. All this news was passed on to John Kelly personally.

From the biased reports of Indian border provocations in the local papers, it seemed only a matter of days before India would cross the Pakistan borders. But Pakistan struck first on December 6, 1971. The first I knew about the war was when I was awakened at night by a spectacular arial barrage. Indian bombers were raiding the airport and the Pakistan defences threw up everything they had into the sky. The next morning we watched dogfights in the sky from our roof at Mathis House. A rocket which had apparently fallen from an Indian plane exploded in mid-air not far from Notredame College.

In the early afternoon I got a phone-call from the Bottomley Home Orphanage at Tejgaon that seven empty shells had fallen on their property near the airport and could we evacuate their children to a safer place, because they were afraid. I called Henry Selz, Director of CARE, who offered to help, and then set out for the orphange in the college microbus. Near the Sonargaon Hotel, where the railroad tracks used to cross the airport road, soldiers in the road waved me over to the side and began shooting at Indian planes which came in directly over our heads, flying very low in order to rocket the airport. Fortunately, the Indian planes did no'strafing. After the attack I moved on to the orphanage, where I found Henry and a truck loaded with children. We dropped off the boys at Notredame College and the girls were harboured at St. Francis Xavier Convent in Luxmi Bazar.

After the airport was completely put out of action and the Pakistan air force destroyed, Dacca was still not completely at peace. The "Mad Bomber," as we christened it, began flying at night, a light plane carrying plywood frames with bomb racks attached. The whole frame was held together with straps and was dropped after the bombs were released.One night the old Remshackle Orphanage in Kawran Bazar was bombed and Pakistan blamed it on India, saying that 200 orphans had been killed. Acctually it was a hideout for the Mukti Bahini. A bomb frame fell in the grounds of Holy Cross College and another in front of the UNEPRO headquarters. The UN got the feeling that their turn might be next, so

they requested me if they could move their headquaters over to Notre Dame College with all their radio equipments. This they did, 44 of them, and the college property became a UN-Red Cross protected zone. Paul-Marc Henry, on loan from the French Foreign Sevice and Assistant Secretary General In Charge of UNEPRO at UN headquaters, who had come to Dacca on December 2, and had been trapped there by the war, also took up rasidence at Mathis House. Every evening before supper he and I set in the Fathers recreation room before dinner, listening to Max Bruch's violin concerts at least twice, and talking about everything under the sun. This was followed by dinner accompanied by a bottle of French wine.

We lived three in a room, with one or two in beds and the others sleeping in the floor. Night was the time for UN socializing, which meant mostly playing poker and drinking. The sale of empty bottles after the war brought in a tidy sum.

Paul-Marc called on me as his personal adviser to sit in on the meetings of ambassadors and high commissioners at the UN headquarters to discuss evacuation of foreigners. We considered moving out to the Bay of Bengal by boats and meeting the U.S. fleet there, moving out of Dacca to a big centre somewhere in the countryside, etc. PaulMarc was so rich in ideas and expansive about possibilities that the British High Commissioner got annoyed and at the third meeting walked in and announced decisively that four British Royal Air Force (RAF) planes were coming in to evacuate foreigners to Singapore.

In a book **The United Nations in Bangladesh** (Princeton Univercity Press, Princeton, N.J., 1973) Tom Oliver describes me as "the savior of UNEPRO." I had little to do with their "salvation" other than putting them up at the college residence during the war.

Previous evacuation attempts on December 6th and 7th day by Canadian C-30 had failed.Our entire contingent of UN personeal had gone to the airport to be evacuated. PaulMarc turned over to me all their cash money, a considerable sum, to be used in relief operations if the UN could not return. The next attempt was indefinite and I arrived to celebrate mass at 9 a.m. For the Catholics on Sunday morning, December 12. at the Sharaton Hotel (then the Intercontinental), where most of the evacuees were being put up for convenience.Just before 9 a.m. RAF C-130 planps were heard and we all rushed to windows or the roof to watch their descent. A huge cloud of dust went up and it seemed at first as if

one plane, at least, had cracked up. But there had not been time to clean up the airport landing strip and at the last minute even journalists carried chunks of blasted concrete off the strip. As the evacuees rushed of to the airport I remarked to Peter Khan of the **Wall Street Journal** (Later to be the first aditor of the Asian edition):" now I know what a bride feels like to be left the altar. He included this in his **Dacca Diary** which won a Pulitzer Prize the next year.

At the airport two British gentlemen stood at the door and announced to the large Russian contingent: "Women and friendly nation first." Since passengers were restricted to one bag and since the Russians insisted on carrying a lot of heavy equipment out with them, they were left behind. It gave them a head start on scoring points with government after independence. The planes took off successfully with 387 evacuees in spite of the shortened runway, leaving dozens of cars whose owners had driven them.

At Notredame College 36 of the U.N. personnel who did not evacuate settled in to wait for the end. Volleyball and Basketball games every afternoon relieved the tension and tedium, though the next Sunday a projectile whistled over our heads during a volleyball game and landed in Fakirapul Bazar nearby. We had an exciting rooftop view of the rocketing of the Peelkhana Barracks by the Indian Air Force and a short time later, as I was driving up to the gates of the college, the planes came low over head moving in to rocket the Governor's House. No one would open the gate for me because they were all in the trenches.

Earlier that morning Henry Selz had moved over to the college with the wife of Dr. Guha Thakurta, a professor of Dacca University who had been killed on the night of March 25, and her daughter Meghna (who later got a First Class First in her M.A. examinations and a Ph.D. in England). Henry had been giving them refuge in Dhanmondi but they were afraid because of the airport attacks. Less then one hour after they were installed at Notredame came the Indian attack. They packed up right away and returned to Dhanmondi.

We learned from Peter Wheeler of the World Food Programme when he returned to the college that he and John Kelly had been talking to the Governor, Dr. A.M. Mallik, trying to persuade him to resign when the rockets hit the Governor's House. When they returned from the trenches where they had taken refuge the Governor submitted his resignation. Later he was escorted to the Intercontinental Hotel and on Victory Day

he was removed to the Cantonment for his safety.

Whom the Yugoslav doctor with, WHO was able to do some doctoring at the college of people in the neighborhood had been wounded by stray bullets. One day the Russian ambassa dor, Popov, came to talk to Paul-Marc and as he was leaving I said to him : "Do svidanya." He asked the Yugoslav doctor in Russian : "Does he speak Russian?" He replied, "Oh, yes," fluently. Popov probably thought that I was the head of the CIA in Bangladesh, something that I had been accused of in a Bengali newspaper about ten years previously.

* Rev. R. W. TIMM -এর 'Forty Years in Bangladesh' গ্রন্থের Dhaka During the War' chapter

ডক্টর অজয় রায়

২৫শে মার্চে কাল রাত্রিতে ইয়াহিয়ার সামরিক চক্রের চাতুরীতে ঢাকায় শিল্পী কামরুল হাসান অঙ্কিত ইয়াহিয়ার জানোয়ার মুখ উন্মোচিত হলো। শুরু হলো অপারেশন সার্চ লাইট, নয় মাস ব্যাপি গণহত্যাযজ্ঞের উদ্বোধন-বাংলার রক্তে, বাঙালীর রক্তে।

কামান, মর্টার আর মেশিনগানের বিকট কানফাটা গর্জনে সে রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে গিয়েছিল জানালার কাচ। আর্ত মানুষের অসহায় চিৎকারকে ছাপিয়ে সারা রাত ধরে শুনেছিলাম আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ, ট্রাক ও ট্যাঙ্কের পদচারণ ধ্বনি। শঙ্কিত চিত্তে আমরা অপেক্ষা করছিলাম যে কোন মুহূর্তে পৈশাচিক বাহিনীর উপস্থিতি। বুঝতে কষ্ট হয়নি সারারাত ধরে কিসের হোলি উৎসবকাদের রক্তে ঢাকার রাজপথ পরিণত হচ্ছে রক্তনদীতে।

যা আমরা আশঙ্কা করেছিলাম অবশেষে তাই ঘটল। সারা দেশের সাথে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসমাজও অপেক্ষা করছিলাম উদ্বেগ ব্যকুল চিত্তে ইয়াহিয়া-মুজিবের আলোচনার ফলাফল। অসহায়ভাবে লক্ষ্য করছিলাম, ইয়াহিয়া সরকারের সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি। আমরা আশঙ্কা করছিলাম, এ ধরনের এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, অনুমান করেছিলাম আসন্ন গণহত্যার পূর্বাভাস। তাই মার্চের ২২/২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসমাজ ও দেশের বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে গণহত্যার পূর্বাভাস জানিয়ে আমরা প্রেরণ করেছিলাম জরুরী বার্তা ইউ.এন.ও-র সেক্রেটারী জেনারেল ও বিশ্বের অন্যান্য নেতৃবর্গের কাছে। আমাদের আশঙ্কা অমূলক ছিল না।

সে রাত্রে পাকিস্তানের বীর জোয়ানেরা কত বাঙালীকে হত্যা করেছিল তার সংখ্যা

হত্যাকারীরাও বলতে পারবে না। শুধু এটুকু জানি রাজারবাগে শত শত পুলিশ প্রতিরোধ যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে নীলক্ষেত,কমলাপুর এলাকার শত শত বস্তিবাসী, জীবন দিয়েছে জগন্নাথ হল ও ইকবাল হলের অসহায় ছাত্ররা, রাস্তার অসহায় নিরস্ত্র মানুষ আর রাস্তায় রাস্তায় বেরিকেড তৈরী রত শত শত সাধারণ মানুষ ও অকুতোভয় শ্রমিকেরা।

সব রাতের শেষ আছে। ২৫শে মার্চের কালো রাত্রিও এক সময় পোহালো। দূরাগত আজানের ধ্বনি ভেসে আসলো। না-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ থেকে সেদিন আজানের ধ্বনি উচ্চারিত হয়নি— সাহস পাননি নামাজের আহ্বান জানাতে ধর্মপ্রাণ মোয়াজিন। যেন মনে হলো দূরাগত ঐ আজানের ধ্বনির মধ্যে সারা বাংলাদেশের কান্না ঝরে পড়ছে। এমন বিষাদ আর ক্রন্দনময় আজান ধ্বনি জীবনে শুনিনি।

রাত পোহালো, সকাল হলো, ২৬শে মার্চের সকাল। সূর্যদেব কি সেদিন আমাদের সাথেও কেঁদেছিল, না, রোষে গর্জন করে ছড়িয়ে ছিল দাবাগ্নি! পর্দা সরিয়ে দেখলাম আমাদের এলাকায় বেশ কিছু সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের উপস্থিতি। দেখলাম মাঠের এক কোণে জড়ো করা কয়েকটি মৃত দেহ, চোখের সামনে টেনে নিতে দেখলাম পাশের ভবনের এক তলার অধিবাসী মুক্তাদিরের মৃতদেহ। কর্কশ কণ্ঠে নির্দেশ এলো এলাকা-বাসীদের প্রতি অবিলম্বে কালো পতাকা আর বাংলাদেশের পতাকা নামিয়ে ফেলার। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম জনৈক সৈনিক আমাদের ভবনশীর্ষ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। ভবনটি কেঁপে উঠলো। মনে পড়ে গেল আমাদের ভবনশীর্ষেও বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে, ছেলেরা ২৩শে মার্চ তারিখে উত্তোলন করেছিল আর নামায়নি। অতি সন্তপর্ণে মিলিটারীর চোখ পেরিয়ে ছাদে উঠে হামাগুড়ি দিয়ে পতাকাকে ধীরে নামিয়ে আনলাম। মুহূর্তে চিত্ত বেদনায় উদ্বেলিত হয়েছিল। ভেবেছিলাম এই পতাকা কি আবার কোনদিন তুলতে পারবো!

দেখলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক ডক্টর মুর্তজাকেও আরও কয়েকজনকে নিয়ে আমাদের ভবনের দিকে এলো। আতঙ্কে অপেক্ষা করছিলাম যে কোন মুহূর্তে মৃত্যুদূতের আগমন। নীচের তলায় লোকজন ছিল না। কিছুক্ষণ দরজায় লাথি মারলো, সৌভাগ্য ওরা চারতলা পর্যন্ত উঠে এলো না। একটু পরে লাশগুলো নিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে পুনর্বার সাবধানবানী উচ্চারণ করে ওরা স্থান ত্যাগ করলো। আমরা বাঁচলাম।

রেডিওতে ঘোষিত হলো, অবাঙালী কণ্ঠে, কর্কশ আর ভাঙা বাংলায়, সারা দেশে কঠোর ভাবে সান্ধ্য আইন বলবৎ করা হয়েছে; রাস্তায় বা ঘরের বাইরে দেখামাত্র গুলি করা হবে। পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী প্রতিরোধ আন্দোলনকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ম্লান মুখে সহধর্মিনী পাশে এসে দাঁড়াল। উদ্বেগ ব্যকুল স্বরে জিজ্ঞেস করলো—-'বঙ্গবন্ধুর' খবর কি? কি জবাব দেবো! আমিও ভাবছিলাম তার কথা। পেরেছেন কি নিজেকে বাঁচাতে? নিরাপদ স্থানে সরে গিয়েছেন কি! ভাবছিলাম অন্যান্য রাজনৈতিক

নেতৃবৃন্দের কথা, ছাত্রনেতাদের কথা। পরে সন্ধ্যায় শুনলাম পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার রেডিও-ভাষণ— সমগ্র পরিস্থিতির জন্য বাঙালী, আওয়ামী লীগ ও বঙ্গ বন্ধুকে দায়ী করে কুৎসীত ও অশালীন ভাষায় আক্রমণ করলো। সেদিন বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিয়ে স্বয়ংসিদ্ধ প্রেসিডেন্ট কর্কশ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন, "The man and his party are the enemies of Pakistan. ....he had attacked the solidarity and integrity of Pakistan– this crime will not go unpunished." সেই কণ্ঠ এতো দিন পরে আজও আমার কর্ণে ধ্বনিত হয়।

এতো নিরাশার মধ্যেও আশার ঝলকানি বয়ে আনলো 'আকাশবাণী'— ভেসে এলো রেডিও তরঙ্গে মধুর আশ্বাসবাণী— "সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি"। আকাশবাণী জানাল পূর্বপাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ঢাকার আশেপাশে, রংপুর, দিনাজপুরে, কুষ্টিয়া, যশোর, চট্টগ্রামে পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে বাঙালী মুক্তিফৌজের যুদ্ধ চলছে। রাত্রে বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকাও শোনালো একই বার্তা। এত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও আশ্বস্ত হলাম, না, বাঙালী রুখে দাঁড়িয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

পরদিন ২৭শে মার্চ। কয়েক ঘন্টার জন্য সান্ধ্য আইন শিথিল। ভীত সন্ত্রস্ত চিত্তে ছুটে গেলাম জগন্নাথ হলে—ছোট ভাই বাবুর খোঁজে। বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র— ছাত্রলীগের একজন সক্রিয় কর্মী। সারা হল এলাকা জনশূন্য— হল ভবনগুলি বিধ্বস্ত, অগ্নিদগ্ধ, রক্তাপ্লুত। নরমেধযজ্ঞের সাক্ষ্য হিসাবে তখনও সিঁড়িতে, ছাদে, বিভিন্ন কক্ষে— এখানে সেখানে পড়ে রয়েছে গুলিবিদ্ধ, বেয়নেটবিদ্ধ অসংখ্য ছাত্রদের লাশ। রক্ত, মৃতদেহ আর বারুদের গন্ধে বাতাস ভরপুর। সামনের মাঠে সদ্যখোদিত এক গণকবর— অনেকেরই হাত-পা বেরিয়ে রয়েছে। তখনকার মনোভাব আজ আর বুঝাতে পারবো না, কেমন একটা আচ্ছন্ন ও মোহগ্রস্থতার মধ্য দিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম বাবুর দোতলার ঘর পর্যন্ত। সারা ঘর বিপর্যস্ত, রক্তাক্ত। পেলাম না তার মৃতদেহের সন্ধান। বুঝলাম বাবু আর অনেকের সাথে গণকবরের অভ্যন্তরে শায়িত।

দেখা করলাম তখনও জীবিত গৃহশিক্ষকদের সাথে— রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক গোপালকৃষ্ণ নাথ, জগন্নাথ হলের নরমেধযজ্ঞের একজন নীরব সাক্ষী, দেখা হলো সংস্কৃতির অধ্যাপক রবীন্দ্র ঘোষঠাকুরের সাথে। মুখে কারো কথা নেই, এরা সবাই দিশেহারা, স্তব্ধ জীবন্মৃত। দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বলে পথে নেমে পড়লাম। ওই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা— জগন্নাথ হল, শহীদ মিনার এলাকা, ইকবাল হল, নীলক্ষেত এলাকা ঘুরে দেখলাম। খবর সংগ্রহ করলাম যথাসাধ্য। সব এলাকা অত্যাচার ক্লিষ্ট। রমনা কালীবাড়ি, আনন্দময়ী আশ্রম, শিববাড়ী, কোন এলাকাই রেহাই পায়নি। রেহাই পায়নি রোকেয়া হল সংলগ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর আবাসিক এলাকাও।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাবভবনও শক্তির দাপটের সাক্ষ্য বহন করেছে।

পথে পথে মিলিটারী— চোখে চোখে তাদের দানবীয় দৃষ্টি। দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে ঘৃণা। তার মধ্য দিয়ে ক্লান্ত— ম্লান-বিষণ্ণ মুখে ফিরে এলাম বাসায়। এলাকা প্রায় জনশূন্য। সহকর্মীরা চলে গেছেন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। উদ্বিগ্না মাতা, উৎকণ্ঠিতা স্ত্রী জানতে চাইলেন আমরা কোথায় যাব? বুঝতে পারছিলাম নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়া উচিত, কিন্তু কোথায় যাব? ঢাকার, বাংলাদেশের কোন স্থান আজ নিরাপদ? একবার ভাবলাম নদীর ওপারে জিঞ্জিরার দিকে যাওয়া, যেদিকে সবাই যাচ্ছে। কিন্তু মিলিটারী চক্রব্যূহ ভেদ করে হাঁটা পথে সদরঘাট পর্যন্ত যাওয়ার ঝুঁকি অনেক, আর সেদিকেরও যে কি অবস্থা কে জানে। পরে শুনেছিলাম পলায়নপর নিরস্ত্র জনতার ওপর সদরঘাট এলাকায় নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেছে বহুসংখ্যক নরনারী— এই পিশাচবাহিনী।

বেলা বারটার দিকে এলেন সহকর্মী অধ্যাপক রফিকুল্লাহ আমাদের খোঁজে। জানালেন তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন ওর বড়ো ভাইয়ের ওখানে— আমাদেরকেও সেখানে নিয়ে যেতে এসেছেন। আর আধঘন্টার মধ্যেই পুনরায় কারফিউ জারী হবে। অতএব আর দ্বিধা না করে একরকম এক বস্ত্রেই গৃহত্যাগ করলাম।

সেই কাল রাত্রিতে ও পরদিন জগন্নাথ হল ও তার আশেপাশের এলাকায় যে নির্মমতম হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল তার প্রত্যক্ষদর্শী জগন্নাথ হলের তৎকালীন ছাত্র কালীরঞ্জন শীল হলে থেকেও সেদিন আলৌকিক ভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন।

শ্রী শীল সেই রাত্রে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হলেও পরদিন সকালে মিলিটারীর হাতে ধরা পড়ে যায়। তাকে ও অন্যান্য অনেককে দিয়ে জগন্নাথ হল ও আশেপাশের এলাকা থেকে লাশ বহন করানো হয়েছিল। মিলিটারী আনাগোনা কমলে সে সুইপারদের বস্তিতে একটি বাথরুমে লুকিয়েছিল। পরে জনৈক ব্যক্তি সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে বুড়ী গঙ্গার তীরে পৌঁছে দেয়। জগন্নাথ হলে আক্রমণের আর একজন সাক্ষী ওই হলের গৃহশিক্ষক শ্রী গোপালকৃষ্ণ নাথ।

সেদিন ২৫শে মার্চের রাত্রিতে 'অপারেশন সার্চ লাইটের' মেঠো কর্মীরা ও অধিনায়কগণ অপারেশন সম্পর্কে অয়ারলেসের মাধ্যমে কথোপকথন করেছিলেন তা জনাব জামিল চৌধুরী ও আরও কয়েকজন রেকর্ড করেন।

২৭শে মার্চ থেকে শুরু হলো আমার পলাতক জীবন, আত্মগোপনের পালা। ঢাকার নানা স্থানে-কখনও সপরিবারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পালিয়ে বেড়িয়েছি। পরে জেনেছি বিশ্ববিদ্যালয় আবাসে একাধিক বার মিলিটারী আমার সন্ধানে গিয়েছিল। বহুবার বিপদের মধ্যে পড়েছি। তবু সাহস করে ঢাকার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেছি সে সময়, দেখেছি ওদের অত্যাচারের নানান রূপ অসহায়ভাবে। ওদের নারকীয় কাণ্ডকারখানা আর অত্যাচার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছি। সেই দুঃসময়ে ঢাকায় আত্মগোপনে যারা

নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও আমাকে এবং আমার পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছিল, নানা ভাবে সাহায্য করেছিল, তাদের কথা কোনদিন ভুলবো না। ভুলবো না ডক্টর আজাদের কথা, ডক্টর ওবায়দুল হকের কথা, ডক্টর মুর্তজার কথা, অধ্যাপক এ.বি.এম হাবিবুল্লাহর কথা।

অনেকবার বিপদের মধ্যে পড়েছি। একদিনের কথা বলি— দিনটা ছিল ১১ই এপ্রিল। ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকায় এক পরিচিত বন্ধু পাট ব্যবসায়ীর ওখানে সপরিবারে আশ্রয় নিয়ে ছিলাম কয়েকদিন আগে। বিকাল সাড়ে তিন বা চারটের দিকে একটি মিলিটারী জীপ কয়েকজন সেপাই ও অফিসার সহ বাসায় এলো। আমরা উৎকণ্ঠিত ও শঙ্কাকুল চিত্তে অন্দরমহলে অপেক্ষা করছি। এই বুঝি ধরা পড়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে ওরা চলে গেল। গৃহকর্তা জানালেন, ওরা, জানতে চাইলো, এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অধ্যাপক আশ্রয় নিয়েছে কিনা। গৃহকর্তা অনেক কষ্ট করে তাদের বিদায় করতে সমর্থ হয়েছেন অন্তত সাময়িকভাবে। তিনি আরও জানালেন আমাদের এখানে আর থাকাটা নিরাপদ নয়। ভাবলাম আবার যদি তারা ফিরে আসে তবে সবাই বিপদে পড়ব। এদিকে বিকাল পাঁচটায় আবার কারফিউ বলবৎ হবে, নতুন আশ্রয়স্থল খোঁজার সময় নেই। বন্ধুকে জানালাম যে, আজ রাতের জন্য আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাস হবে সবচাইতে নিরাপদ স্থান, কেননা, যদি ওরা আমার সন্ধানে এসে থাকে তাহলে নিশ্চয় তারা ওখানে প্রথম খোঁজ করে এসেছে। পাঁচটার একটু আগে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসায় এসে আশ্রয় নিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় তখন শ্মশানের নীরবতা, জনপ্রাণী নেই, দুই একটা কুকুর কেবল ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন বাতি না জ্বালিয়ে সেই রাত আমরা কাটালাম ভয়ে ভয়ে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কোন বিপদ ঘটেনি। পরদিন আবার নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। আবার একদিনের কথা। আজিমপুর এলাকায় একটি গলির ভিতর একটি মেসে আশ্রয় নিয়েছি একা। রাত এগারটার দিকে বেশ হৈ চৈ-চারিদিকে ছোটাছুটি, বন্দুকের গুলি। কিছুক্ষণ পর বোঝা গেল সমস্ত এলাকা মিলিটারী কর্ডন করেছে। ঘরে ঘরে তল্লাশী চলছে। মেসের অধিবাসী আমরা কজন আতঙ্কিত হয়ে অপেক্ষা করছি। কখন দুশমনদের আর্বিভাব ঘটে। কিন্তু আমাদের মেসে ওদের পর্দাপণ ঘটেনি। পরদিন সকালে জানা গেল আশেপাশের এলাকা থেকে বেশ কয়েকজন যুবক ও ছাত্রকে তারা ধরে নিয়ে গেছে। ভাবলাম এদের মধ্যে কজন জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারবে?

২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় বিবিসি রেডিও অস্ট্রেলিয়ার বরাত দিয়ে জানালো যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এবং তিনি চট্টগ্রামে রয়েছেন। অপর দিকে রেডিও পাকিস্তান কদিন ধরেই বলে চলেছে শেখ সাহেবকে ২৬শে মার্চ তার বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ২৮শে

মার্চ বিকালে স্বাধীন বাংলা বেতার-কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণার কথা (শেখ সাহেবের পক্ষে) আমরা শুনলাম। এই দুটি ঘোষণাই আমাদের বন্দী অসহায় জীবনে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল বলা বাহুল্য।

প্রায় প্রতিদিন কোন কোন এলাকায় নরহত্যা সংঘটনের খবর পেতে থাকলাম। শুনলাম ২৯শে মার্চ রাত্রে শাঁখারীবাজার ও তাঁতিবাজার এলাকায় হিন্দু নরনারীদের শেয়াল-কুকুরের মতো হত্যা করা হয়েছে। এপ্রিলের মাঝামাঝিতে একদিন সাহস করে একা তাঁতি বাজার এলাকায় গেলাম। সেখানে আমার পূর্বপরিচিত জগন্নাথ কলেজের প্রধান ইতিহাসের অধ্যাপক নারায়ণ সাহা থাকেন তাঁর সন্ধানে। দেখলাম সারা এলাকা নিস্তব্ধ। ওর বাড়ি ফাঁকা। গলির মোড়ে এক পান-বিড়ির দোকানে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ওদের কথা। জানালো— ওরা জিঞ্জিরায় চলে গেছে। নদীর ওপারে। সে আরও জানালো যে, তাঁতিবাজার আর শাখারীবাজার এলাকায় এখন অবাঙালীদের দখলে অধিকাংশ হিন্দুদের পরিত্যক্ত বাড়ি। আমাকে ওদিকে যেতে নিষেধ করলো। শাখারীবাজার এখন 'টিক্কা খান রোড।'

২৮শে মার্চ রাত্রে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারকে তোপ দেগে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো। আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনার প্রতীক-আমাদের সংগ্রামের প্রতীক এখন মসজিদে রূপান্তরিত। রিক্সা করে একদিন ঐ পথ দিয়ে যাওয়ার কালে দেখলাম কারা যেন সবুজ রঙে বাংলা ও উর্দুতে বড়ো বড়ো হরফে লিখে রেখেছে ''মসজিদ-মসজিদ''। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে এক রাত্রে ডিনামাইট দিয়ে ঐতিহাসিক রমনা কালীমন্দির উড়িয়ে দেওয়া হলো— ধূলিসাৎ করা হলো আনন্দময়ী আশ্রম। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে খবর পেলাম মোহাম্মদপুর এলাকার অনেক বাঙালীকে হত্যা করা হয়েছে। শোনা যেতে লাগল প্রতি রাত্রে কোন না কোন অঞ্চল থেকে লোক নিয়ে যাওয়া হচ্ছে— এর সাথে চলছে লুটপাট, আর নারী নির্যাতন। শিশুরাও বাদ পড়ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ-স্কুলের ছাত্রীরাও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। সারা ঢাকা শহর ক্রমশঃ পরিণত হচ্ছে একটি বন্দীশালায়।

এর মধ্যে আর একটি বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছিল। অবাঙালীদের পাশাপাশি প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলসমূহ প্রতিদিনই মিছিল ও শোভাযাত্রা বের করতে শুরু করেছে পাকবাহিনী ও সরকারের সমর্থনে। এদের অনেকেই চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে সংঘটিত নৃশংসভাবে অবাঙালী হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে অতিরঞ্জিত খবর পরিবেশন ও বক্তৃতা, বিবৃতি দিতে শুরু করল। এর প্রতিক্রিয়ায় ঢাকাতে অনুসৃত হল আরও বাঙালী নিপীড়ন, হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে। শোনা যাচ্ছিল নারায়ণগঞ্জে শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী নদীতে, ঢাকায় বুড়িগঙ্গা নদীতে প্রতিদিনই অসংখ্য লাশ একত্রে বাঁধা অবস্থায় ভেসে যায়। ঢাকা অবরুদ্ধ, বাংলাদেশ বাইরের জগত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। স্থির করলাম বাংলাদেশের প্রকৃত শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি সম্পর্কে, গণহত্যা সম্পর্কে বহির্বিশ্বকে

যে করেই হোক জানাতে হবে। নরহত্যা ও নির্যাতন সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যের একটি প্রতিবেদন তৈরী করলাম উপরোক্ত মেসের একজন রুমমেটকে দিয়ে। তার অফিস থেকে গোপনে কয়েক কপি টাইপ করলাম। যে করেই হোক এই প্রতিবেদন বাইরে পাঠাতে হবে। ডাঃ আজাদের সাথে যোগাযোগ করলাম— তাঁর প্রতিষ্ঠানে তখনও ২/১ জন বিদেশী রয়েছেন যারা এখনও ঢাকা ত্যাগ করেননি, তবে শীঘ্রই করবেন। একদিন বিকালে ওদের একজনার সাথে ডাঃ আজাদ সহ দেখা করলাম। সব কিছু জানালাম এবং এ ব্যাপারে তার সহায়তা কামনা করলাম। তিনি সানন্দে রাজী হলেন এবং আমার প্রতিবেদনের এক কপি রাখলেন। জানালেন তিনি নিজেও একটি প্রতিবেদন তৈরী করেছেন এবং কিছু ছবিও তুলেছেন। এ সবই তিনি আমেরিকায় পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন এবং যাওয়ার সময় আরও তথ্য প্রদান করলে নিয়ে যাবেন, সেখানে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টির সহায়তায়। এভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আমাদের প্রথম কাজ শুরু হলো। তিনিও জানালেন তিনি চলে গেলেও একজনকে বলে যাবেন আমাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য।

এদিকে ২৬শে মার্চ থেকেই নরহত্যার পাশাপাশি বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্ব শুরু হয়ে গেছে। ঢাকা ছাড়া বাংলাদেশের সর্বত্র পাকবাহিনী প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে। ইপিআর, পুলিশ, ইবিআর, প্রাক্তন সৈনিক, ছাত্র, জনতার মধ্যে থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্থানীয় মুক্তিফৌজ গড়ে উঠেছে। স্বাধীন বাংলা বেতার মারফৎ স্বাধীনতাযুদ্ধের কথা দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। চট্টগ্রাম ও পারিপার্শ্বিক এলাকায় মেজর জিয়াউর রহমান ও ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙা-মেহেরপুর সীমান্তে মেজর ওসমানের নেতৃত্বে; ময়মনসিংহে মেজর সফিউল্লাহের নেতৃত্বে; ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আখাউরা এলাকায় মেজর খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে; সিলেট অঞ্চলে মেজর দত্তের নেতৃত্বে প্রতিরোধ যুদ্ধ চলছে। এই নামগুলো সেদিন অবরুদ্ধ ঢাকাবাসীর কাছে ছিল প্রেরণার উৎস। তখনই স্থির করেছিলাম পাকিস্তানী অধিকৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর চাকুরী নয়, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যেকোন কাজ করাই হবে পবিত্রতম কর্তব্য। প্রথমদিকে স্থির করেছিলাম ঢাকাতেই আত্মগোপন করে অবস্থান করে স্বাধীনতাযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার চেষ্টা করব সীমিত সাধ্য নিয়ে। কেননা এটি ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে আমাদের প্রাথমিক প্রতিরোধ টিকবে না, ভেঙে পড়বে। গেরিলা যুদ্ধই হবে আমাদের ভরসা, আর এই জন্যে প্রয়োজন দেশের অভ্যন্তরে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও থেকে যাওয়া। তাই সেই দুর্যোগকালেও কয়েকজনের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম— ঢাকায় থেকে প্রতিরোধের স্বপক্ষে কোন কিছু করা যায় না কি না। কিন্তু অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে লাগল। কারোর সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছিল না। ঢাকায় অবস্থান করাও অসম্ভব হয়ে উঠছিল। প্রতি রাতেই

ঢাকার কোন কোন এলাকা পাকিস্তানী হামলার শিকার হচ্ছিল।

বুঝতে পারছিলাম সপরিবারে ঢাকায় আর থাকা নিরাপদ নয়। শুভানুধ্যায়ীরা বিশেষ করে ডাঃ আজাদ পরামর্শ দিলেন ঢাকা ছেড়ে মুক্ত অঞ্চলে চলে যাওয়া। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অসুস্থ স্ত্রী আর বৃদ্ধা মাতাকে নিয়ে। ১১ই এপ্রিল আকাশবাণীর মারফৎ জানলাম মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার কথা। ইতিমধ্যে স্বাধীনতার কথা ঘোষিত হয়েছে, যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। পরে আগরতলায় আমার এক ছাত্র মুক্তিযোদ্ধা— সঞ্জয়ের সাথে দেখা হয় তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তারা নোয়াখালি শহরে কিভাবে স্বাধীনতার কথা জানতে পারে। সে আমায় জানিয়েছিল যে, ২৭শে মার্চ সকাল থেকে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। এ সম্পর্কে মাইকযোগে প্রচার করতে থাকে এবং বঙ্গবন্ধুর বাণী সম্বলিত একটি হ্যান্ডবিল জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তার মতে বঙ্গবন্ধুর এই বাণীটি টেলিগ্রাফ অফিসের কর্মচারীরা পান এবং তারা নেতৃবৃন্দকে জানান। এ ঘটনা থেকে আমার মনে হয় বঙ্গবন্ধুর বাণীটি চট্টগ্রামে গৃহীত হওয়ার পর টেলিগ্রাফ ও ওয়ারলেসের কর্মচারীবৃন্দ বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন। তারা আবার অন্যান্য স্থানের সাথে যোগাযোগ করে। এই বাণী এইভাবেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচারিত হয়। আরও অনেকের কাছ থেকে একই ধরনের কথা শুনতে পাই।

২২শে এপ্রিল অধ্যাপক হাবিবুল্লাহ যোগাযোগ করলেন— একটি দুস্থ অসহায় হিন্দু পরিবারের জন্য আশ্রয় খুঁজতে হবে। ভদ্রলোক একজন সরকারী চাকুরে। তাকে কয়েকদিন হলো মিলিটারী ধরে নিয়ে গেছে। আর ফিরে আসেনি। সকন্যা মহিলা বিপদে পড়েছেন। কন্যাটির প্রতি মিলিটারীর নজর পড়েছে। মিলিটারীর লোকজন প্রতিদিনই আগাগোনা করছে, আর ভয় দেখাচ্ছে। টাকা দাবী করছে বাবাকে ছেড়ে দেবে এই বাবদে। মিসেস আব্বাসের সাথে যোগাযোগ করে ওদের একটি আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলাম। আজিমপুরায় আমার এক পরিচিত হিন্দু সরকারী কর্মচারী— পালাতে পারেননি, সরকারী নির্দেশে আবার কাজে যোগ দিয়েছেন। কয়েকজন অবাঙালী তাকে ভয় দেখাচ্ছে, তারও কলেজে পড়ুয়া কন্যা রয়েছে। সেই সূত্রে কয়েকজন মিলিটারী অফিসার তার বাসায় যাতায়াত করে বৈকালিক চা-পানের উদ্দেশ্যে। খবর পাঠিয়েছেন মেয়েটির জন্য কিছুদিনের জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের। সুলতানার সাথে যোগাযোগ করলাম। ও রাজী হলো মেয়েটির একটি সুব্যবস্থা করার। আজিমপুরায় যে মেসে থাকতাম সেখানকার একজন একদিন সন্ধ্যায় জানালো— তাকে তার অফিসে জনৈক অবাঙালী কর্মচারী ভয় দেখাচ্ছে যে তিনি মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগ রাখছেন— টাকা চাইছে। স্থির করেছেন মুক্ত অঞ্চলে চলে যাবেন, মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিবেন। সব ঠিকঠাক করে ফেলেছেন। পর দিন সকালেই চলে যাবেন। সকালে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায়

নিলাম। তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

স্থির হয়েছিল এপ্রিলের শেষে ঢাকা ত্যাগ করব। পুরানো এক রাজনৈতিক কর্মীবন্ধু ম্যাসেজ পাঠিয়েছেন অবিলম্বে মুক্ত অঞ্চলে সরে যাওয়ার জন্য। আমার জন্য ঢাকায় থাকা আর কিছুতেই নিরাপদ নয়। বার্তাবহ সব ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু উদ্যোগ ব্যর্থ হলো। মিলিটারী ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না। অর্ধপথ থেকে ফিরে এলাম আবার ঢাকায়। এবার অন্য সূত্র ধরলাম। দাউদকান্দি থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে ভিতরে এক গ্রামে আমার স্ত্রীর দুরসম্পর্কের এক মামা থাকেন। সেখানে যাওয়া স্থির করলাম। ডাঃ ওবায়দুল হকের অফিসে ওই অঞ্চলের কর্মচারীর সন্ধান পাওয়া গেল। সে খবর নিয়ে জানালো আমাদের আত্মীয়রা গ্রামে আছেন— ও দিকে মিলিটারীর দৌরাত্ম নেই। মুক্ত অঞ্চল বলা চলে। সে আমাদের ওখানে নিয়ে যেতে রাজী হলো। ওর নাম নুরুল ইসলাম। স্থির হলো নারায়ণগঞ্জ থেকে লঞ্চ বা নৌকায় আমরা ওই গ্রামের দিকে যাব। ডাঃ আজাদ পরামর্শ দিলেন হিন্দু পরিচয়ে কিছুতেই যাওয়া যাবে না। যেতে হলে মুসলমান পরিচয়ে কিন্তু বিপত্তি হলো মাকে নিয়ে। মা কিছুতেই প্রথম জিজ্ঞাসাতে মুসলমান নাম বলতে পারেন না, মুখ দিয়ে আসল নাম বেরিয়ে আসে অতএব স্থির হলো আমরা রাস্তায় জিজ্ঞাসাবাদের পাল্লায় পড়লে নেটিভ ক্রিশ্চিয়ান পরিচয় দেব। নাম স্থির করার প্রয়োজন নেই। ক্রিশ্চিয়ানরা বাংলা নামেই পরিচয় দেয়। হলিক্রস কলেজে পরিচিত এক সিস্টারের কাছ থেকে 'ক্রশ' কিছু বাংলা ও ইংরাজী বাইবেল ও অন্য পুস্তক জোগাড় হল। মা ও স্ত্রী 'ক্রশ' ঝুলালেন গলায়। স্থির হলো ১৫ই মে আমরা ঢাকা ত্যাগ করবো। ডাঃ আজাদ ওর প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী হিসাবে পরিচয়পত্র জোগাড় করে দিলেন।

ঢাকা ত্যাগের কয়েকদিন আগে চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ আলীম চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করলাম। তিনি পূর্বপরিচিত— অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে তার সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। তাকে সব জানালাম। তিনি সেদিন বলেছিলেন যে তার প্রকাশ্য রাজনৈতিক কোন পরিচয় নেই উপরন্তু তিনি চিকিৎসক, কাজেই ঢাকায় থাকা তার জন্য অতটা বিপদজনক নয়। স্থির হলো তিনি ঢাকায় আগত গেরিলাদের যোগাযোগকারী ব্যক্তি হিসাবে কাজ করবেন। তাদের আশ্রয়ের, প্রয়োজনে চিকিৎসা ও ঔষধপত্র যোগানের ব্যাপারে অন্যান্যদের সহায়তায়। ডাঃ আজাদের সাথে যোগাযোগ রাখার কথা তাকে বললাম। আরো কয়েকজনের সাথে এ ব্যাপারে দেখা করলাম। সরকার ঘোষণা করেছে পয়লা জুলাইয়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের জন্য। যাওয়ার কয়েকদিন আগে বিভাগীয় প্রধান ইন্নাস আলীর সাথে দেখা করলাম তার আজীমপুরস্থ স্থায়ী বাসভবনে। তিনি পাকিস্তানীদের গুলিতে আহত হয়েছিলেন, তখন নিরাময়ের পথে। সাশ্রুনেত্রে বিদায় জানালেন। মাথায় হাত রেখে আর্শীবাণী উচ্চারণ করলেন।

বিদায়ের মুহূর্ত এগিয়ে এলো। ডঃ আজাদ ও ডঃ হক নিবিড় অলিঙ্গনে বিদায়

জানালো— আশার বাণী উচ্চারণ করলো আবার দেখা হবে— হয়তো মুক্ত দেশে। ডঃ আজাদকে আরো একটি প্রতিবেদন হস্তান্তরিত করলাম বাইরে পাঠাবার জন্য। দেশ মুক্ত হবার পর অনেকের সাথে দেখা হয়েছিল কিন্তু এই নীরব দেশকর্মীর সাথে আর দেখা হলো না। চিরতরে তিনি হারিয়ে গেলেন। পথে কোন বিপদ হয়নি। কেবল পাগলার ওখানে আমাদের গাড়ি আটকিয়ে জনৈক মিলিটারী অফিসার আমার পরিচয় ও কোথায় যাচ্ছি জিজ্ঞেস করেছিল। মাকে দেখিয়ে বলেছিলাম ওকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় আনিয়েছিলাম— গ্রামে ফিরে যাচ্ছেন। আমরা মুক্তি পেলাম। নদীর ধারে গেলাম। অসংখ্য লাশ পড়ে রয়েছে। চারিদিকে শকুনের উল্লাস। অনেকগুলি নারায়ণগঞ্জ অভিমুখী বাস আটকানো— যাত্রীরা পথের পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো। শেষ পর্যন্ত ওদের কি হয়েছিল জানি না।

অবশেষে নারায়ণগঞ্জ থেকে লঞ্চ ও নৌকাযোগে আমরা আমাদের উদ্দিষ্ট গ্রামে পৌছালাম নুরুল ইসলামের সহয়তায়। আসবার সময় শীতলক্ষ্যা ও ধলেশ্বরীতে ভেসে যেতে দেখলাম অসংখ্য মৃতদেহ। নুরুল ইসলাম জানালো দিন কয়েক আগে নারায়ণগঞ্জ ও আশেপাশে এলাকায় মিলিটারী অপারেশন হয়েছে— এ তারই ফলশ্রুতি।

আমাদের আত্মীয়রা আমাদের গ্রহণ করলো সাদরে। অনেকদিন পর মায়ের মুখে দেখলাম আশ্বস্তির ঝিলিক। দাউদকান্দি থেকে বেশ কয়েক মাইলের গভীরে এই গ্রামটি। যাতায়াতের সুবিধা নেই। তাই আপাতদৃষ্টিতে নিরাপদ। অন্যদিকে মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের একটি ভালো আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠতে পারে। গ্রামবাসীদের অনেকে এবং আশেপাশের গ্রাম সহ বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ-পলাতক এবং স্থানীয় ছাত্র আমার সাথে যোগাযোগ করলো— ঢাকার অবস্থা জানতে চাইলো। ওরা জানালো যে আশেপাশের গ্রাম মিলে ওরা একটি ছোটখাটো মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রের বড্ড অভাব। পরামর্শক্রমে ঠিক হলো আপাতত সশস্ত্র প্রতিরোধ সম্ভব নয়। এখন কেবল সংগঠন গড়ে তোলা আর চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা বিশেষ করে দাউদকান্দিতে ঘাঁটি স্থাপন করা পাক বাহিনীর গতিবিধির উপরে। স্থির হলো ১০/১২ জনের একটি ছোট দল ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র নিয়ে চলে আসবে। ওরা ফিরে এলে আর একটি দল যাবে এবং ক্রমান্বয়ে এই প্রক্রিয়া চলবে যতদিন না স্থানীয় ভাবে প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তোলা যায়।

কয়েকদিন গ্রামে কাটালাম। একদিন রাতে দাউদকান্দি-কুমিল্লা মহাসড়কের দুপাশে কয়েকটি গ্রামে মিলিটারী অপারেশন চালালো। এর ঢেউ আমাদের গ্রামে এসে লাগলো। গ্রামবাসীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লো। বিশেষ করে হিন্দু জনসাধারণ। আমার আত্মীয়রা স্থির করলো ওরা ভারতে চলে যাবে কিছুদিনের মধ্যে। তাই স্থির করলাম ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করা। স্থির করলাম ২২শে মে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করব।

স্থানীয় মুক্তিবাহিনীর একটি ছোট দলও আমাদের সাথে যাবে, তবে ওরা ভিন্ন পথে। আমরা মিলিত হবো সি এণ্ড বি রোড পার হয়ে গোমতী নদীর ওপারে। গভীর রাতে একজন পথপ্রদর্শক সাথে নিয়ে আমরা আবার পথে নামলাম। দীর্ঘ পথ কখনও হেঁটে, কখনও নৌকাযোগে পেরিয়ে আশ্রয় নিলাম চান্দিনার কাছে এক গরীব নাপিতের বাসায়। পরদিন রাতে আমরা অতিক্রম করলাম সবচাইতে বিপদজনক পথ চান্দিনা-কুমিল্লা রোড এবং পরে সি এণ্ড বি রোড। অতিক্রম করলাম গোমতী নদী, ওপারে মুক্তিবাহিনীর দলটির সাথে দেখা হলো। আমরা সেখান থেকে বুড়িচং হয়ে নয়নপুরের কাছ দিয়ে ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করলাম। প্রণাম জানালাম দেশের মাটিকে। চোখে জল এলো। ভাবছিলাম এবার আর কি ফিরে যেতে পারবো জন্মভূমির কোলে। ২৪শে মে দুপুরে আমরা পৌঁছালাম সীমান্তশহর সোনামোড়ায়। ছোট শহর। ভরে গেছে বাংলাদেশ থেকে আগত হাজার হাজার শরণার্থীতে। আপাতত আশ্রয় পেলাম স্ত্রীর দূরসম্পর্কের বোনের বাসায়। দেখা হলো আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক সংসদ সদস্য অধ্যাপক খুরশিদ আলমের সাথে। তিনি পূর্বপরিচিত। মুক্তিবাহিনীর ছোট দলটির আগমনের উদ্দেশ্য ওকে জানালাম, ওরা আশ্রয় পেল যুব শিবিরে। কয়েকদিন অধ্যাপক আলমের সাথে কাজ করলাম রিক্রুটিং সেন্টারে। দলে দলে যুবকরা আসছে সীমান্ত পেরিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য। এদের রাজনৈতিক মতবাদ ভিন্ন, কিন্তু মাতৃভূমি উদ্ধারে দীপ্ত শপথে সকলেই বলীয়ান। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সদাসতর্ক, যেন উদ্বাস্তুদের সাথে পাকিস্তানী চর বা গোয়েন্দা অনুপ্রবেশ না করতে পারে। একদিনের ঘটনা— বিকালে থানা থেকে জনৈক পুলিশ এসে আমাকে জরুরী প্রয়োজনে থানায় নিয়ে এলো। থানার অফিসার জানালেন যে তারা গোয়েন্দা সন্দেহে কয়েকজনকে আজ আটক করেছে— সবাই পরিচয় দিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বলে। আমি শনাক্ত করতে পারি কিনা। সন্দেহের কারণ ওদের সাথে রয়েছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরের রাস্তাঘাট ও নদীপথের মানচিত্র। আমার সাথেও এ ধরনের ম্যাপ ও কাগজপত্র ছিল। ড. আজাদ অন্যান্যদের সহযোগিতায় জোগাড় করে ঢাকা ত্যাগের সময় আমাকে দিয়েছিল মুক্তিবাহিনীর লোকজনদের কাজে লাগাতে পারে এই ভরসায়। ছাত্রদের সাথে থানা হাজতে কথা বলে সন্দেহমুক্ত হলাম, ওরা প্রকৃতই ছাত্র। কয়েকজন আমাকে চিনতেও পারলো। ওরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে এসেছে। অফিসারকে বলায় ওরা মুক্তি পেল কিছুদিন পরে।

মুক্তিযুদ্ধে আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করতে চাই। তারপর দিন আমরা চলে এলাম আগরতলায়। সপরিবারে আশ্রয় নিলাম আগরতলার কলেজের উদ্বাস্তু শিবিরে। কলেজের হোস্টেলে একটি কামরায় আমাদের স্থান করে দিলেন সুপার শ্রী সত্য ভট্টাচার্য। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে এবং উদ্বাস্তুদের দেখাশোনার ব্যাপারে শ্রী ভট্টাচার্য যে অমূল্য অবদান রেখেছেন তা আমি আজও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। হাজার হাজার শরণার্থী

সাধারণ মানুষ, ছাত্র, শিক্ষক। দেখা হলো ছাত্রনেতা আব্দুল কুদ্দুস মাখন সহ বেশ কয়েকজন ছাত্রনেতার সাথে, দেখা হলো জনাব জিল্লুর রহমান ও কয়েকজন আওয়ামি লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। নেতাদের জানালাম যে আমি ভারতে এসেছি উদ্বাস্তু হিসাবে থাকার জন্য নয়, মুক্তিযুদ্ধে কাজ করতে।

সে দিন বিকালে ভারতীয় চলচ্চিত্রে, ডকুমেনটেশন বিভাগ আমার একটি সাক্ষাৎকার চিত্রায়িত করলো। ঢাকা ও বাংলাদেশে যে গণহত্যা চলছে তার একটি বিশদ বিবরণ দিলাম। এই চিত্রায়ন পরে ভারতের নানা স্থানে প্রদর্শিত হয়েছিল। পরদিন ছিল নজরুল জয়ন্তী, সত্যবাবুর উদ্যোগে উদ্বাস্তু ও যুবশিবিরে ছাত্ররা অনুষ্ঠান করলো। আমরা অনেকেই বক্তৃতা করলাম। দেখা হলো চট্টগ্রামের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগের নেতা এম.আর সিদ্দিকীর সাথে। তাঁকে সব জানালাম। তিনি পরামর্শ দিলেন কলকাতায় যাওয়ার জন্য। সেখানে মুজিবনগরস্থ বাংলাদেশ সরকার ও ডঃ এ.আর মল্লিকের সাথে দেখা করার জন্য। সেখানে আমাদের মতো লোকের নাকি বিশেষ প্রয়োজন।

স্থির করলাম কলকাতায় চলে যাওয়ার। কয়েকদিন শরণার্থীর শিবির ও যুবশিবিরে ঘুরে ঘুরে বাংলাদেশ থেকে আগত বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজনদের কাছ থেকে পাক বাহিনীর অত্যাচার সম্পর্কিত বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করলাম। দেখা হয়েছিল দেবদাস চক্রবর্তী ও ডঃ এস. আর বোসের সাথে। সমস্যা দেখা দিলো অসুস্থ স্ত্রী ও মাকে নিয়ে। ওদের চিকিৎসা ও বিশ্রামের প্রয়োজন। স্থির হলো আসামে শিবসাগরে কর্মরত বড়ো ভাইয়ের কাছে মা ও স্ত্রীকে রেখে আমি কলকাতায় চলে যাবো। চিঠি লিখলাম কলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনে ডঃ এ.আর মল্লিকের কাছে আমার আসামের ঠিকানা জানিয়ে। প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় আসামে পৌঁছালাম কয়েকদিন পরে। কিন্তু আসামে এসে বিপদে পড়লাম। আসাম কর্তৃপক্ষ আদেশ জারী করেছে উদ্বাস্তুদের সবরকম চলাচল নিষিদ্ধ করে। বড়ো ভাই চেষ্টা করতে লাগলেন আমার কলকাতায় যাওয়ার অনুমোদন লাভে। দেরি হচ্ছিল। এরই মধ্যে ডঃ আনিসুজ্জামান এবং ডঃ মল্লিকের পক্ষ থেকে তার কন্যা আমার ছাত্রী সেলিনার চিঠি পেলাম। ত্বরিত কলকাতা যাওয়ার কথা দুইজনই লিখেছে। অনেক নাকি কাজ। আসাম সরকারেরও অনুমতি পাওয়া গেল।

কলকাতার পথে গৌহাটিতে একদিন অবস্থান করলাম। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালী শিক্ষকদের সাথে দেখা করলাম। ওদের আসামে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টির প্রয়াসে কাজ করার আবেদন জানালাম। তড়িঘড়ি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরা একটি সভার আয়োজন করলো— বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বক্তব্য রাখলাম, আসামবাসীদের সহযোগিতা কামনা করলাম। আসাম থেকে এলাম উত্তরবঙ্গে। শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ প্রভৃতি সীমান্তে অবস্থিত শরণার্থী শিবির ও মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ইত্যাদি ঘুরে দেখলাম।

যতদূর পারি বিভিন্ন অঞ্চলে তথ্যসংগ্রহ করতে চেষ্টা করলাম। বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে ঘুরে দেখার আরো একটি উদ্দেশ্য ছিল পিতৃদেবের সন্ধান। মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে তার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ২৫শে মার্চ তিনি ছিলেন দিনাজপুর, আর আমরা ঢাকায়। কোথাও তার সন্ধান মিলল না। অবশেষে দিনাজপুর সীমান্তের কাছাকাছি মুক্তিযোদ্ধাদের এক শিবিরে তার সন্ধান পেলাম। দিনাজপুর শহরে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা জানালো যে বাবা গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। তারা আরও জানালো যে, সেই গ্রামটি বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ভালো আশ্রয়স্থল— বাবা মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয়দান ইত্যাদি কাজে ব্যাপৃত রয়েছে।

অবশেষে কলকাতায় পৌঁছালাম জুন মাসের মাঝামাঝিতে। আশ্রয় পেলাম মাসিমার ভবানীপুরস্থ বাসায়। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের সাথে দেখা করলাম, তিনি আমাকে বাংলাদেশ সরকারের প্লানিং সেলের সাথে যুক্ত থেকে কাজ করার নির্দেশ দিলেন। যোগাযোগ হলো ডঃ এ.আর মল্লিক, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ খান সারওয়ার মুর্শিদ, অধ্যাপক আলী আহাসান, ও অন্যান্য অনেকের সাথে। মুক্তিযুদ্ধের কাজে সর্বাত্মক ভাবে নেমে পড়লাম। ডঃ আনিসুজ্জামান সরকারের বিশেষ কাজে জড়িয়ে পড়ায় মে মাসে গঠিত বাংলাদেশের শিক্ষক সমিতির সম্পাদকের দায়িত্ব আমার উপর বর্তালো।

অবরুদ্ধ ঢাকায় অবস্থানকালে ও বিভিন্ন শরণার্থীর থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নারকীয় হত্যার একটি প্রতিবেদন আমরা তৈরী করেছিলাম। তার সংক্ষিপ্তসার এখানে উল্লিখিত হলো। এই প্রতিবেদন আমরা পাকিস্তান সহ বিভিন্ন দেশ, বহু ব্যক্তি, সংগঠন ও সরকারের কাছে প্রেরণ করি।

ঢাকার ঘটনা : ২৫শে মার্চ জগন্নাথ হল ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় সংগঠিত হয় সবচেয়ে বড়ো নরহত্যা। জগন্নাথ হলে যেসব নিহত ছাত্র ও কর্মচারীর নাম সংগ্রহ করা হয়েছিল— সর্বশ্রী স্বপন চৌধুরী (ছাত্রনেতা), গণপতি হালদার, সুশীল দাস (সহ-সাধারণ সম্পাদক), রমণীমোহন ভট্টাচার্য, রণদা রায়, সুভাষ চক্রবর্তী, প্রবীর পাল, কিশোরী মোহন সরকার, ভবতোষ ভৌমিক, বরদাকান্ত তরফদার, সত্য দাস, কার্তিক শীল, পন্টন দাস, কেশবচন্দ্র হালদার, নির্মলকুমার রায়, সুজিত দত্ত, রবীন্দ্র রায়, বিধান ঘোষ, মৃণাল বোস (ছাত্রনেতা), শিবকুমার দাস, শিশুতোষ দত্তচৌধুরী, উপেন রায়, সন্তোষ রায়, জীবন সরকার, নিরঞ্জন সাহা, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, অজিত রায়চৌধুরী, সত্য নাগ, রূপেন্দ্র সেন, মুরারী বিশ্বাস, বিমল রায়, প্রদীপনারায়ণ রায় চৌধুরী, নিরঞ্জন চন্দ্র, সুব্রত সাহা, প্রিয়নাথ (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী), দুখীরাম (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী), সুনীল দাস (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী), শঙ্কর মোদক (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী), শিবু মোদক (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী), সুশীলচন্দ্র দাস (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী), খগেন্দ্রচন্দ্র দে (৪র্থ শ্রেণীর

কর্মচারী), মতিলাল দে (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী), বোধিরাম (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী), দাশুরাম (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী), ভীরু রাম (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী), মনভরণ রাম (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী), জহরলাল (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী), মণিলাল (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী), রাজভর (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী), লতিফুর রহমান (অতিথি ছাত্র), বদরুদ্দোজা (অতিথি ছাত্র), মহতাব উদ্দিন (অতিথি ছাত্র), এবং আরো বহু ছাত্র যাদের নাম সংগ্রহ করা আর কোনদিনই হয়তো সম্ভব হবে না।

এছাড়া ইকবাল হলেও বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী এবং আশ্রয়প্রার্থী ও বস্তি এলাকার অসংখ্য নরনারী।

এই গণহত্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও যেসব কর্মচারী নিহত তারা হলেন : মধু দে-সকলের মধুদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনের মালিক ও তার স্ত্রী, বড়ো ছেলে এবং পুত্রবধূ, ননী রাজভর রোকেয়া হলের দারোয়ান ও স্ত্রী এবং সকল সন্তান-সন্ততি, খগেন দে দর্শন বিভাগের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী, শামসুর মোল্লা ইকবাল হলের দারোয়ান, রোকেয়া হলের দারোয়ান মইনুদ্দিনের স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ও পুত্রবধূ, চুনু মিয়া রোকেয়া হলের মালী, আব্দুল খালেদ রোকেয়া হলের মালী, পিয়ার মোহাম্মদ রেজিষ্ট্রার অফিসের পিয়ন ২৭শে মার্চ ঢাকা থেকে পালাতে গিয়ে রাস্তায় নিহত হয়।

এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাবভবনে পাঁচটি মৃতদেহ পাওয়া যায়। এদের চারজন হলো ক্লাবের বেয়ারা, অন্য জনের পরিচয় পাওয়া যায়নি— সম্ভবত ওদের কারো অতিথি। আব্দুল মজিদ, সিরাজুল হক, সোহরাব হোসেন, আলী হোসেন।

২৫শে মার্চ থেকে ২৯শে মার্চের মধ্যে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে হত্যা বা আহত করা হয়েছিল :

প্রফেসর গোবিন্দচন্দ্র দেব, উপমহাদেশের প্রখ্যাত দার্শনিক ও দর্শন বিভাগের প্রধান। ২৬শে মার্চ প্রাতঃকালে প্রার্থনারত অবস্থায় প্রথমে বন্দুকের গুলিতে পরে সঙ্গিনের খোঁচায় হত্যা করা হয়। তার মুসলিম পালিত পুত্রকেও হত্যা করা হয় একই সাথে। মোহাম্মদ মণিরুজ্জামান, পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান, তাকে তার ভাই, এক ছেলে ও ভাইপো সহ ২৬শে মার্চের সকালে হত্যা করা হয়। মোহম্মদ মুক্তাদির, ভূতত্ত্ব বিভাগের সিনিয়ার লেকচারার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোড আবাসিক এলাকায় তার বাসভবনে ২৬শে মার্চ সকালে হত্যা করা হয়। শ্রী অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, লেকচারার ফলিত পদার্থ বিভাগের গৃহশিক্ষক জগন্নাথ হল। হলের মধ্যে তার বাসভবনের বাথরুমে লুকিয়ে ছিলেন, ২৫শে মার্চ রাতে সেনাবাহিনীর লোকজন ওখানে তাকে হত্যা করে। ডঃ জ্যের্তিময় গুহঠাকুরতা, রিডার ইংরেজি বিভাগ, প্রভোষ্ট জগন্নাথ হল; ২৬শে মার্চ ভোররাতে বাসা থেকে ডেকে এনে বাসার সামনে গুলি করা হয়। পরে অধ্যাপক রাজ্জাক ও মিসেস

গুহঠাকুরতা তাকে বাসায় নিয়ে আসেন। তিনি জীবিত ছিলেন— ২৭শে মার্চ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, ২৯শে মার্চ হাসপাতালে মারা যান। মোহাম্মদ সাদেক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষক, ফুলার রোড এলাকায় তার বাসভবনে তাকে হত্যা করা হয়। ২৭শে মার্চ সকালে তাকে বাসভবনের পিছনের মাঠে কবরস্থ করা হয়। ডঃ ফজলুর রহমান, মৃত্তিকা-বিজ্ঞান বিভাগের সিনিয়ার লেকচারার, তাকে এবং তার ভাইপোকে নীলক্ষেত এলাকায় তার বাসভবনে হত্যা করা হয়। একই সাথে ঐ ভবনের ছাদে আশ্রয় নেওয়া অসংখ্য বস্তিবাসীকে হত্যা করা হয়। ওই সব লাশ দীর্ঘ দিন ধরে ছাদে পড়েছিল। জনাব এ.আর খান খাদিম, পদার্থবিদ্যা বিভাগের লেকচারার, ঢাকা হল (শহিদুল্লাহ হল) সংলগ্ন কর্মচারীদের আবাস স্থলে তাকে ২৬শে মার্চে হত্যা করা হয়। জনাব সরাফাৎ আলী লেকচারার গণিতবিভাগ, একই স্থানে একই সময়ে তাকেও হত্যা করা হয়। এছাড়া এই স্থানে আরও তিনজনকে হত্যা করা হয় যাদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। ড. মোহাম্মদ সাহাদাত আলী, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সিনিয়ার লেকচারার, ২৬শে এপ্রিল ঢাকা থেকে তার বাড়ি নরসিংদী যাবার পথে বর্বর পাক ফৌজের হাতে নিহত হন।

ঐ কালরাত্রিতে এবং তৎপরবর্তী সময়ে নিম্নলিখিত শিক্ষকগণ মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলেন:

প্রফেসর এম ইন্নাস আলী, পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। অধ্যাপক ও তদীয় পুত্র ফিরোজ আলীকে পাক বাহিনীর একটি দল ২৫শে মার্চ রাত্রে নীলক্ষেতস্থ বাসভবনে প্রবেশ করে তাদের প্রতি লক্ষ্য করে গুলী করে। এর ফলে তারা উভয়েই আহত হন। পরে তাদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেখানে আরোগ্য লাভ করেন। অধ্যাপক এ.কে.রফিকুল্লাহ রিডার পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ৩১শে মার্চ জিঞ্জিরা থেকে সপরিবারে নৌকাযোগে পলায়ন কালে পাক বাহিনীর গুলিতে স্ত্রী ও পুত্র সহ আহত হন। এছাড়া অধ্যাপকের ভ্রাতা জনাব এন. হামিদুল্লাহর স্ত্রী তৎক্ষণাৎ বন্দুকের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন। প্রফেসর এম.এন হুদা অর্থনীতির অধ্যাপক, ২৫শে মার্চ রাত্রে জগন্নাথ হলের নিকট তার বাসভবনে ঢুকে তার প্রতি গুলি ছোড়া হয়— সৌভাগ্যবশত তিনি রক্ষা পান। প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর, ইতিহাসের অধ্যাপক ও সলিমুল্লাহ হলের প্রভোষ্ট, শহীদ মিনারের নিকট তার বাসভবনে ২৫শে মার্চ গভীর রাত্রে সেনাবাহিনী সদস্যরা প্রবেশ করে লুণ্ঠন চালায়— অধ্যাপক বাসার পশ্চাতে লাকড়ির গাদার মধ্যে সপরিবারে আত্মগোপন করে রক্ষা পান। অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক; ২৫শে মার্চ রাত্রে শহীদ মিনারের নিকটস্থ তার বাসভবনে একটি কক্ষে আত্মগোপন করে অলৌকিকভাবে রক্ষা পান।

সে সময়ে ঢাকায় আর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি নিহত হয়েছিলেন: কামান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, তথাকথিত আগরতলা মামলার ২নং আসামী। ২৫শে মার্চ কালরাত্রিতে তাকে

তার বাসভবন থেকে টেনে বের করে এনে উন্মুক্ত রাজপথে গুলি করে মারা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনা উদ্দীপনায় কামান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের অবদান অমূল্য। অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, বিখ্যাত সাধনা ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা; ৩১শে মার্চ গেন্ডারিয়ার তার বাসভবনে এই অশীতিপর বৃদ্ধকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ডঃ এস. দে বিসিএসআইআর প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী; এপ্রিল মাসে গেন্ডারিয়ার বাসভবনের কাছে তাকে হত্যা করে তার মৃতদেহ লোহার পুলের কাছে ফেলে রাখা হয়। ডঃ শৈলেন ভদ্র, শল্য-চিকিৎসক, শাঁখারীবাজারেব. নিকটে তার বাসভবনে ৩১শে মার্চ পাক বাহিনী তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। দানবীর রণদাপ্রসাদ সাহা মির্জাপুর হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা, সম্ভবত এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে তাকে ও তার পুত্রকে গভর্নর ভবনে ডেকে আনা হয়। সেখান থেকে বের হবার পর সেনাবাহিনীর লোকজন ওদের ধরে নিয়ে যায়। সম্ভবত ক্যান্টনমেন্টে পিতা-পুত্র উভয়কে হত্যা করে। শহীদ সাবের, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক কিছুদিন যাবৎ মানসিক রোগে ভুগছিলেন। ৩১শে মার্চ সকালে সংবাদ অফিস ভবনে অগ্নিসংযোগ করে পাকবাহিনীর সদস্যরা তাকে পুড়িয়ে মারে। জহিরুল ইসলাম, ঔপন্যাসিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক, জিঞ্জিরায় ২রা এপ্রিল তারিখে পাকবাহিনী যে বর্বর নরহত্যাকাণ্ড চালায় তাতে তিনি অন্য অনেকের সাথে নিহত হন। মেহরুন্নেসা, কবি ও রেডিও-মেকানিক, ২৭শে মার্চ তাকে বর্বর পাকবাহিনীর সদস্যরা মা ও ছোট ভাই সহ নির্মম অত্যাচারের পর হত্যা করে। আবু তালিব, দৈনিক ইত্তেফাকের সাংবাদিক, ২৯শে মার্চ মীরপুর এলাকার পাকবাহিনীর কতিপয় অবাঙালী অনুচরদের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। ডঃ আজহার আলী, রেডিওলজিস্ট, নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে খুব সম্ভব ১৬ই নভেম্বর তাকে পাকবাহিনীর অনুচরেরা বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। তার মৃতদেহ ফকিরাপুলের কাছে পাওয়া যায়। ডঃ হুমায়ুন কবির, সদ্য পাশ করা ডাক্তার, ডঃ আজহার আলীর সাথে একই সময়ে তাঁকে হত্যা করা হয়। এই দুটি হত্যার খবর আমরা কলকাতায় পাই— ঢাকায় যোগাযোগ রক্ষাকারীর গেরিলা ইউনিটের কাছ থেকে নভেম্বরের শেষে। ২৮শে মার্চ থেকে ৩১শে মার্চের মধ্যে ইত্তেফাক, পিপলস ও সংবাদ অফিস ভবন পাকবাহিনীর আক্রমণের শিকার হয়। বেশ কজন লোক এই সব অফিসে নিহত হয়। ঢাকা থেকে আগত লোক মারফৎ খবর পাওয়া গেল নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ঘোড়াশাল ন্যাশনাল জুট মিলের বেশ কজন বাঙালী কর্মচারীকে পাকিস্তানী সৈন্যরা গুলি করে মেরেছে।

অন্যান্য অঞ্চলে অনুষ্ঠিত গণহত্যার স্বাক্ষর

নানা সূত্র থেকে আমরা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে অনুষ্ঠিত নারকীয় হত্যাকাণ্ডের সংবাদ সংগ্রহ করি :

চট্টগ্রাম ও আশপাশের অঞ্চল : শ্রী পি.সি বর্মন, লোকহিতৈষী চট্টগ্রাম শহরের অধিবাসী, চট্টগ্রামে মার্চের শেষের দিকে সশস্ত্র সংগ্রামের সময় তার বাসভবনে পাক বাহিনী তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তার পুত্র সম্ভবত নিহত হয়। জনাব আলী ইমাম, চট্টগ্রাম স্টেট ব্যাঙ্ক শাখার কর্মচারী; মার্চ-এপ্রিলে পাক বাহিনীর হাতে নিহত হন কাজী হাসান, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ছাত্র; প্রতিরোধ যুদ্ধকালে লালখান বাজারে স্বীয় বাসভবনে পাক হানাদারদের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। শ্রী নূতনচন্দ্র সিংহ, কুণ্ডেশ্বরী ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা একই সময়ে স্বীয় প্রতিষ্ঠানের এই সত্তর বছর বয়স্ক বৃদ্ধকে বর্বরভাবে হত্যা করা হয়। মোজাফ্ফর আহমেদ, প্রাক্তন রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী; চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করা হয়। কাউসার আহমেদ, চট্টগ্রাম সিআইএ অফিসের তরুণ কর্মচারী বর্বর পাক বাহিনীর সদস্যরা বিমানবন্দর থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। সঠিক সময় জানা যায়নি। শ্রী বীরেন্দ্রলাল চৌধুরী প্রবর্তক সঙ্গের নিবেদিতপ্রাণ বৃদ্ধ পুরুষ; এপ্রিল-মে মাসে এই সংসারত্যাগী বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে পাকবাহিনীর জল্লাদেরা নির্মম ভাবে হত্যা করে। শ্রী শান্তিময় খাস্তগীর, কানুনগো পাড়া কলেজের অধ্যক্ষ; কলেজের অফিসে কর্মরত অবস্থায় পাকবাহিনীর নির্মম জল্লাদদের গুলিতে শহীদ হন। ঘটনাটি ঘটে ৩১ শে জুলাই। শ্রী অবনীমোহন দত্ত, চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে দর্শনের অধ্যাপক; অবরুদ্ধ অবস্থায় চট্টগ্রাম শহরে আটকা পড়ে গিয়েছিলেন। পালাননি বা পালিয়ে যেতে পারেননি। বাসা থেকে তাকে ও তার ভাইপোকে জল্লাদেরা ধরে নিয়ে যায় আর ফিরতে পারেননি। চিরতরে হারিয়ে গেছেন। সামসুদ্দিন আহমদ, ইঞ্জিনিয়ার কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান কর্মকর্তা, সম্ভবত জুলাই-আগস্ট মাসে বর্বর পাক সৈন্যের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। জনাব সামসুল হক, চট্টগ্রামের এস.পি; স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথমদিকে চট্টগ্রামে তাকে পাক সৈন্যরা হত্যা করে। শ্রীখগেন্দ্রনাথ সিংহ, চট্টগ্রাম সিগনেট লাইব্রেরির মালিক। এপ্রিল-মে মাসের দিকে তিনি পাকবাহিনীর ঘাতকদের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। জনাব আব্দুল খালেক, চট্টগ্রাম কোতোয়ালীর তরুণ ও.সি, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। ইপিআর বাহিনী পশ্চাদপসরণ করলে তিনি চাচার বাসায় আশ্রয় নেন গ্রামে। সেখান থেকে ১৬ই এপ্রিল ধরে নিয়ে এসে অত্যাচারের মাধ্যমে তাকে ২২শে এপ্রিল হত্যা করা হয়। শ্রী সুধাংশু ভট্টাচার্য; তরুণ সাংস্কৃতিক কর্মী, এপ্রিলের দিকে তাকে পাকবাহিনী ধরে নিয়ে যায়, আর কোনদিন ফিরে আসেননি। জয়নাল আবেদিন, চট্টগ্রাম

হাবিব ব্যাঙ্ক শাখার একজন অফিসার; তাকেও ধরে নিয়ে গিয়েছিল পাকবাহিনীর সৈন্যরা এপ্রিল-মে মাসের দিকে ফিরতে পারেননি। ডা. সফি, দন্তচিকিৎসক, মার্চ-এপ্রিলে পাকবাহিনীর জল্লাদেরা তার জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত করে দেয় বন্দুকের গুলিতে।

অবরুদ্ধকালে কুমিল্লা শহরে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি পাকবাহিনীর হাতে নিহত হন তাদের মধ্যে সে সময় আমরা যাদের নাম সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম তারা হলেন :
শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ; মার্চ মাসে তাকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। শ্রী অতীন্দ্র ভদ্র, শহরের বিশিষ্ট আইন ব্যবসায়ী; একই সময়ে তাকেও ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে হত্যা করা হয়। শ্রী অসীম রায়; কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের পদার্থ বিদ্যা বিভাগের ল্যাবশিক্ষক, প্রবীণ রাজনীতিবিদ অতীন রায়ের পুত্র, একই সময়ে পাক বাহিনীর হাতে ধৃত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। শোনা গিয়েছে কুমিল্লার তৎকালীন পুলিশ সুপার ও ডিসি নিহত হন সে সময়ে।

অন্যান্য অঞ্চলে নিহত বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ : অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের প্রধান, ১৬ই এপ্রিল তাঁকে সেনাবাহিনীর লোকজন ধরে নিয়ে যায়। আর ফিরে আসেননি। শ্রী সুখরঞ্জন সমাদ্দার, সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪ই এপ্রিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় স্বীয় বাসভবন থেকে তাকে চিরকালের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। জনাব মামুন মাহমুদ, ডিআইজি, রাজশাহী, ২৬শে মার্চ তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে পাক জল্লাদ বাহিনী তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। জনাব নজমূল হক সরকার, রাজশাহী বারের এডভোকেট, জেলা আওয়ামি লীগের সহসভাপতি, ২৫শে মার্চের পরে কোন এক সময়ে পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে নিহত হন। লেঃ কর্ণেল মঞ্জুরুর রহমান, অধ্যক্ষ ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ; ১৮ই এপ্রিল তারিখে তার কলেজের বাংলোর সামনে মাঠের মধ্যে তাকে বর্বর পাক বাহিনী হত্যা করে। জনাব হালীম খাঁ, অধ্যাপক ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, একই তারিখে একই স্থানে এই অধ্যাপককেও হত্যা করা হয়। এ সময়ে একই সাথে কলেজের কয়েকজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে হত্যা করা হয়। জনাব মাসুকুর রহমান, গণিতজ্ঞ, চট্টগ্রামে একটি বিমা কোম্পানীর পদস্থ অফিসার ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনকালে যশোরের বাড়িতে চলে যান! মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে সশস্ত্র সংগ্রামে শহীদ হন। জনাব আব্দুল জব্বার, বগুড়া শহরের এডভোকেট; ১৭ই মে তাকে পাক হানাদার বাহিনী তার গ্রামের বাড়িতে হত্যা করে। ড. জিকরুল হক, সৈয়দপুর শহরবাসী, সংস্কৃতিবান, আওয়ামী লীগ সদস্য, এপ্রিল মাসে তাকে আরও কয়েকজন সহকর্মীর সাথে পাক হানাদার বাহিনী সৈয়দপুর সেনানিবাসে বন্দী করে রাখে, ১২ই এপ্রিল এদের সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

লেঃ মোহাম্মদ আনোয়ারুল আজীম, উত্তরবঙ্গস্থ গোপালপুর সুগার মিলের প্রশাসক, ৫ই মে ঐ মিলে দ্বিশতাধিক শ্রমিক ও কয়েকজন অফিসার সহ তাকেও পাক বাহিনীর বর্বর সদস্যরা হত্যা করে। ড. সামসুদ্দিন, সিলেট মেডিকেল কলেজের প্রফেসর , ৯ই এপ্রিল আরো কয়েকজন হাসপাতাল কর্মীর সাথে তাকে পাক বাহিনীর ঘাতকরা হত্যা করে। এদের মধ্যে ছিলেন ড. শ্যামলকান্তি লালা। ড. লেঃ কঃ জিয়াউর রহমান, সিলেট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, জুলাই মাসের শেষ দিকে পাক হানাদার বাহিনী তাকে তার বাসভবন থেকে ধরে নিয়ে যায়, আর ফিরে আসেননি। ড. লেঃ কঃ নুরুল আবসার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর; ৩০শে মার্চ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বাসা থেকে তাকে ধরে নিয়ে যায় পাক সৈন্যরা। আর ফিরে আসেননি। খুব সম্ভব তাকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে হত্যা করা হয়। মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়া, রংপুর শহরবাসী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের সদস্য, ৩০শে মে আরো কয়েকজন পরিবারের সদস্যদের সাথে তিনি পাকবাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন। এছাড়া এপ্রিল মাসে শহরের এগারোজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে একত্রে বেঁধে হত্যা করে নরপিশাচেরা। জনাব মসিউর রহমান, যশোরে বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা; ৪ঠা এপ্রিল তিনি পাকবাহিনীর হাতে ধরা পরেন। বেশ কিছুদিন তাকে যশোর ক্যান্টনমেন্টে অমানুষিক অত্যাচারের পর সম্ভবত ২৮/২৯ এপ্রিল নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। যশোর শহরের পলিটেকনিক স্কুলের অধ্যক্ষকে ৬/৭ এপ্রিলে হত্যা করা হয়। একই সাথে তার বন্ধু ড. ওবায়দুল হককেও গুলি করে মারে পাক জল্লাদরা। জেলা জজ সাহেবের নাজির; তাকে একই সাথে পথিমধ্যে পাকবাহিনীর সৈন্যরা হত্যা করে। জনাব আহসানুল্লাহ, খেজুরাগ্রাম, সম্ভ্রান্ত কৃষক, এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ঐ গ্রামে প্রবেশ করে পাক সৈন্যরা সস্ত্রীক আহসানুল্লাহকে হত্যা করে এবং তার বাড়ি লুট করে। যশোরের কসবা এলাকায় পোস্টাল সুপারিনটেন্ডেন্টের পুত্রসহ সাতজনকে একই সাথে গুলি করে মারে পাক সৈন্যরা এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে। জনাব এ করিম, সাবইন্সপেক্টর অব পুলিশ, যশোর, এপ্রিল মাসে তাকে কোর্টের সামনে গু লি করে হত্যা করা হয়। একই সময়ে জনৈক বৃদ্ধ উকিলকেও নিহত করে পাক সেনারা। বসন্ত কুমার দাস, সাবজজ, যশোর; পয়লা মে তারিখে আরো এগারোজন ব্যক্তির সাথে পাকবাহিনীর জনৈক ক্যাপ্টেন তাকে গুলি করে হত্যা করে। এছাড়া যশোর শহরের আরও সতেরজন বিশিষ্ট নাগরিককে হত্যা করে এপ্রিল-মে মাসের মধ্যে। জনাব আহসান আলী, জামালপুরবাসী, ন্যাপ নেতা ও সাংবাদিক, ২৮শে জুলাই পাকবাহিনীর কুখ্যাত অনুচর আলবদরের হাতে তিনি নির্মমভাবে নিহত হন। অধ্যাপক মোয়াজেম হোসেন, বাগেরহাট পিসি কলেজের অর্থনীতি অধ্যাপক; মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ২৮শে অক্টোবর নিহত হন পাকবাহিনীর অনুচরদের গুলিতে। অধ্যাপক ফজলুল হক, গণিতের অধ্যাপক, রাজশাহী সরকারী মহাবিদ্যালয়, ২৫শে এপ্রিল তার নওগাঁর বাসভবনে পাক হানাদার বাহিনীর হাতে

মৃত্যুবরণ করেন। জল্লাদেরা একই সাথে তার মা, বোন ও ভাইকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। জনাব আব্দুল কাইয়ুম মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; নভেম্বর মাসে তাকে পাক হানাদার বাহিনীর নরপশুরা বাসা থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, দর্শনের অধ্যাপক, কুষ্টিয়া কলেজ; ২৮শে জুন তারিখে তাকে পাকিস্তানী সৈন্যরা গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। আর কোনদিন ফিরে আসেননি। জনাব মোহসিন আলী দেওয়ান, বগুড়া-শেরপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ৩রা জুন বগুড়ার বাস ভবন থেকে বর্বর পাক সেনারা তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, আর ফেরেননি। শ্রী সুমঙ্গল কুণ্ডু, দিনাজপুর বারের এডভোকেট, ৯/১০ই এপ্রিল দিনাজপুর শহরের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিকের সাথে তাকে পাকবাহিনীর অনুচরেরা নির্মমভাবে হত্যা করে। এছাড়া দিনাজপুর শহরের আশপাশে অনেক গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয় এবং অসংখ্য নারী-পুরুষকে মেশিনগানের গুলিতে সারিবদ্ধভাবে হত্যা করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশের সর্বত্র হাজার হাজার লোক ঐ সময় পাকিস্তানী বর্বর সেনাবাহিনীর গুলির শিকার হয়েছেন, বহু নারী নির্যাতিতা ও ধর্ষিতা হয়েছেন। সে হিসাব হয়তো আর কোনদিনই পাওয়া যাবে না।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির কর্মতৎপরতা : "বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি," একাত্তরের মে মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এ সর্বস্তরের দেশত্যাগী শিক্ষকদের সমাবেশে গঠিত হয়। সে সভায় একটি কার্যকরী সংসদও নির্বাচিত হয়। সভাপতি ড. এ. আর মল্লিক, উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। কার্যকরী সভাপতি : জনাব কামরুজ্জামান। ঢাকা জুবিলি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং সংসদ সদস্য। সহ-সভাপতি : ড. ফারুক খলিল, অধ্যাপক গণিত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও অধ্যক্ষ দেওয়ান আহমেদ। সম্পাদক : ড. আনিসুজ্জামান, রিডার বাংলাবিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। পরে জুলাই মাস থেকে ডঃ অজয় রায়, রীডার, পদার্থ বিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সহসম্পাদক : জনাব গোলাম মুর্শিদ, শ্রী রাম বিহারী ঘোষ ও জনাব এস.এম আনোয়ারুজ্জামান। কোষাধ্যাক্ষ : ড. খান সারওয়ার মুর্শেদ, অধ্যাপক ইংরাজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সদস্য ১২ জন।

এই সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল : (১) মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক শক্তি হিসেবে সর্বস্তরের শিক্ষক সমাজকে সংগঠিত করা এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যে নিয়োজিত করা। (২) ভারতবর্ষসহ দেশ-বিদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা। (৩) মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ সম্পর্কিত তথ্যমূলক রচনা, পুস্তকাদি প্রকাশ করা ও অন্য সংগঠনকে প্রকাশ করতে সহায়তা করা। (৪) শরণার্থী শিক্ষকদের অস্থায়ীভাবে পুনর্বাসনের চেষ্টা ও সম্ভাব্য আর্থিক অনুদান প্রদান। (৫) প্রয়োজনে মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সহায়তা দান

এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনীয় বেসামরিক উপকরণ সংগ্রহ ও বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রেরণ করা। (৬) প্রচারণা ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে সহায়তা করা।

ইতিপূর্বে এপ্রিল মাসে ''কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি'' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের উদ্যোগে গঠিত হয়। এ সমিতির প্রধান কর্মকর্তারা ছিলেন ; সভাপতি : অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ, উপাচার্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কার্যকরী সভাপতি : অধ্যাপক পি.কে, বোস, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কোষাধ্যক্ষ : শ্রী এইচ. এম মজুমদার, উপ-উপাচার্য (অর্থসংক্রান্ত), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সম্পাদক : অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী, অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ, সিটি কলেজ, কলকাতা। এখানে উল্লেখ্য যে, এই দুই সহযোগী প্রতিষ্ঠান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একত্রে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করে যায়। প্রায় একই সাথে সকল স্তরের বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন 'বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল অব ইন্টেলিজেন্টস' গড়ে তোলা হয়। এর সভাপতি ছিলেন ড. খান সারওয়ার মুর্শিদ, সম্পাদক ও সহসম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে চলচ্চিত্র পরিচালক জহির রায়হান ও ড. বেলায়েত হোসেন। এখানে উল্লেখ্য যে, এই সংগঠনের প্রযোজনায় জহির রায়হান 'Stop Genocide' ছবিটি নির্মাণ করেন। তরুণ লেখক ও সংস্কৃতিসেবীদের উদ্যোগে গঠিত হয় ''বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সংগ্রাম শিবির''— এর সভাপতি ড. অজয় রায়, সম্পাদক আহমদ ছফা। এছাড়া চিত্রশিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী, অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস প্রমুখ অনেকেই এর সাথে যুক্ত ছিলেন। এই সংগঠন মূলত কাজ করেছে— যে সব স্থানের শরণার্থীরা আশ্রয় নিয়েছে তাদের সাথে স্থানীয় জনগণের শান্তি, সম্প্রীতি ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য বজায় রাখার লক্ষ্যে, তারা নানা স্থানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা প্রচার করত। এছাড়া গঠিত হয় ''সাংবাদিক সমিতি'' চলচ্চিত্র শিল্পীও কুশলী সমিতি' 'বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার্স কোর' প্রভৃতি।

শিক্ষক সমিতি গঠিত হওয়ার সাথে সাথেই প্রতিনিধিরা শরণার্থী শিবিরসমূহে ঘুরে এবং ঘোষণার মাধ্যমে শরণার্থী শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ করতে থাকে। যারা সমিতির সাথে যোগাযোগ করেছেন এবং তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন এদের মধ্যে : বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ১৫০; কলেজ শিক্ষক ১০৫০; স্কুল শিক্ষক ৫০০০। সমিতি গঠিত হওয়ার সাথে সাথেই দুটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সরকার ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ কামনা করে সমিতির সভাপতি প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠি প্রেরণ করেন।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারী প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন : বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির পক্ষে ডঃ এ আর মল্লিক ও ডঃ আনিসুজ্জামান, আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির পক্ষে ডঃ অনিরুদ্ধ রায়, অধ্যাপক অনিল সরকার, সৌরিন্দ্র ভট্টাচার্য ও বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের সাথে যে

প্রতিনিধিদলটি সাক্ষাৎ করেন এতে ছিলেন : ডঃ এ আর মল্লিক, ডঃ আনিসুজ্জামান ও জনাব কামরুজ্জামান।

বিশ্বব্যাপী শিক্ষকদের সহযোগিতা কামনা করে সমিতি একটি ছাপানো আবেদনপত্র বিভিন্ন দেশের শিক্ষকদের ও শিক্ষক সংগঠনের কাছে প্রেরণ করে। আবেদনটি ছিল নিম্নরূপ :

BANGLADESH SIKSHAK SAMITI
(Bangladesh Teachers Association)
Darbhanga Building, Calcutta University, Calcutta-12, India

July 1.1971

Dear Friend,

Perhaps you are aware that in the face of unparallaled atrocities committed by the Pakistan Army on the people of East Pakistan , now Bangladesh, a large number of teachers of all levels has crossed into India. Since the commities of teachers had played a significant role for over two decades in the movement for democracy, secularism and a just social order in the country, its members became naturally enough a special target of the Pakistan Army. Many teachers have been killed, others who are trapped in the occupied zones are being harassed and persecuted, a few have been forced at gun point to issue statements in support of the Pakistan Army. As a result, members of this harassed community are treking into India everyday. The teachers from Bangladesh, now in tempoary exile in India, have formed an association of their own, on whose behalf we are writing you today.

About 100 Univercity teachers, 1000 college teachers, and 3000 school techers have registered their names with us, several thousand others in different bordering state of India are yet to make contact with the Association. Most of these teachers have come with their families and all are without any means to support themselves,

Having regard to the contribution that this community has made in the past and their expectant role in the reconstruction of society as and when the country achieves freedom, it is felt that we make all efforts to save it from impending doom. We have drawn up a number of schemes for providing the teachers with temporary academic occupation-research Publication and teaching the evacuee children in the refugee camps. The execution of this programme will require financial assistance from

non-Government sources, in addition to what the Government of India and the Government of Bangladesh may be in a position to make.

In the circumstances we appeal to you the members of the academic community the world over to contribute generousily to the funds of our association. Contributions may be sent to the Bangladesh Sikshak Samiti, Darbhanga Building, Calcutta University, Calcutta 12, India.

Sincerely yours

Dr. A .R. Mallik
Vice-Chancellor.
University of Chittagong
and
Bangladesh Sikashak Samiti.

সমিতি বিভিন্ন সময়ে ভারতের নানা স্থানে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি ও সহায়তা কামনায় বিভিন্ন প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : জুন মাসে প্রেরিত উত্তর ভারত প্রতিনিধিদল। ডঃ এ. আর মল্লিক, ডঃ আনিসুজ্জামান ও জনাব সুবিদ আলী এমপিএ। এই দলটি এলাহাবাদ, আলিগড়, দিল্লী-আগ্রা ও লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি অঞ্চল সফর করে। জুলাই মাসে প্রেরিত মধ্যপ্রদেশ প্রতিনিধিদল ঃ মজহারুল হক, ডঃ অজয় রায়, অধ্যাপক সামসুল আলম সাঈদ। এঁরা জব্বলপুর, ভুপাল, উজ্জয়িনী, রেয়া, রায়পুর প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। সেপ্টে স্বর মাসে প্রেরিত মহারাষ্ট্র প্রতিনিধিদল : ডঃ এ আর মল্লিক ও অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বম্বে সহ মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। এছাড়া ঐ মাসে অধ্যাপক মজহারুল ইসলাম কেরালা ভ্রমণ করেন। এ ছাড়াও বাংলাদেশ সম্পর্কিত নানা সভা ও সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষক সমিতি প্রতিনিধি প্রেরণ করে। বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘে যে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন এতে সমিতির ডঃ এ আর মল্লিক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

শরণার্থী শিক্ষকদের অস্থায়ী পুনর্বাসনের জন্য সমিতি কিছু প্রকল্প গ্রহণ করে :

(১) শরণার্থী শিবিরসমূহে ক্যাম্প স্কুল স্থাপন আগরতলা সহ মেঘালয়, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত শরণার্থী শিবিরসমূহে সমিতি বেশ কিছু ক্যাম্প স্কুল স্থাপন করে এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্কুল ও কলেজ শিক্ষকের অস্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়। এই প্রকল্পের পরিচালক ছিলেন জনাব কামরুজ্জামান। এছাড়া প্রতি এলাকায় একজন করে উপপরিচালকও ছিলেন। সার্বিক

দায়িত্ব ও সমন্বয় সাধনের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি ছিল, যার সদস্য ছিলেন ডঃ অজয় রায়, জনাব নূর মোহাম্মদ মিয়া এবং শ্রীমতী সুচন্দ্রিমা রায়।

(২) যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প : এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল উদ্বাস্তুদের সমস্যা সংক্রান্ত তথ্য আহরণ ও যুদ্ধ শেষে উদ্বাস্তুদের ত্বরিত পুনর্বাসনে সহায়তা দানের জন্য কর্মপন্থা নির্ধারণ। এই প্রকল্পের পরিচালক ছিলেন প্রফেসর মোশাররফ হোসেন।

(৩) উদ্বাস্তু ও যুবশিবির সমূহে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতিময়তা (Socio-Cultural Dynamics) : এর পরিচালক ছিলেন ড. এ আর মল্লিক এবং উপ-পরিচালক ছিলেন শ্রী অনুপম সেন।

(৪) বাংলাদেশ স্কুল ও কলেজ স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষাদান সমস্যা : পরিচালক ছিলেন ড. অজয় রায়।

(৫) উদ্বাস্তু শিবিরসমূহ থেকে লোকসাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ : পরিচালক ড. মজহারুল ইসলাম।

বাংলাদেশ সরকারের প্ল্যানিং সেলের সহযোগিতায় এইসব প্রকল্প তৈরী করা হয়। এই সব প্রকল্পের মধ্য দিয়ে সমিতি বিপুল সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুল শিক্ষকদের অস্থায়ীভাবে পুনর্বাসন করতে সক্ষম হয়। আমাদের এই সব কর্মসূচীতে আর্থিক ও উপকরণ দিয়ে সহযোগিতা করেছিল ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি (আই.আর.সি) যার স্থানীয় প্রতিনিধি ছিলেন শ্রী তরুণ মিত্র, শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি সার্ভিসের ভারতীয় জাতীয় শাখা।

এতদ্ব্যতীত সমিতি ভারতবর্ষে ও বিদেশে কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষককে অস্থায়ীভাবে নিযুক্তিতে সহায়তা করে। সমিতি মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনায় বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা দানের জন্য বেশকিছু স্কুল ও কলেজের শিক্ষকের নাম সরকারের কাছে প্রেরণ করে। এদের অনেকেই মুক্তাঞ্চলে গিয়ে প্রশাসনিক কার্যে অংশগ্রহণ করেছিল।

দেশে-বিদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি ও বাংলাদেশ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সমিতি কতিপয় প্রকাশনা বের করে এবং অন্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশনার ব্যাপারে তথ্য সরবরাহ করে। এই সব প্রকাশনায় বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় অংশগ্রহণ করে। কতিপয় প্রকাশনার নাম এখানে উল্লেখিত হল ঃ

(১) Bangladesh : A Reality, (২) Report On Bangladesh (৩) মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি। এই তিনটি বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত। (৪) Bangladesh- The Truth (৫) Conflict in East Pakistan (৬) মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ (৭) আমাদের

বাঁচার দাবী ৬ দফা কর্মসূচী— শেখ মুজিবুর রহমান (৮) Bangladesh-Thrones of A New Life (৯) Pakistanism and Bengali Culture (১০) Bangladesh-Through the lens (১১) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। (১২) Bleeding Bangladesh (১৩) Bangladesh : The Background, পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত (১৪) রক্তাক্ত বাংলা, মুক্তধারা (স্বাধীনবাংলা সাহিত্য পরিষদ) কর্তৃক প্রকাশিত; (১৫) জাগ্রত বাংলাদেশ— আহমদ ছফা, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সংগ্রাম শিবিরের উদ্যোগে মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত; (১৬) এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম— গাজীউল হক, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং কলকাতা, প্রকাশিত। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে সমিতি বাংলাদেশ সম্পর্কিত তথ্য ও মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতি ও গণহত্যা সম্পর্কিত প্রতিবেদন বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সংবাদপত্র ইত্যাদিতে প্রেরণ করে। আমাদের এই কর্মতৎপরতার ফলে বিশ্বব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে ওঠে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির সক্রিয় সহযোগিতা ও উদ্যোগে আমরা কতিপয় প্রতিনিধি দল বিদেশেও প্রেরণ করি বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন পাওয়ার উদ্দেশ্যে। এই দুই সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত শিবনাথ ব্যানার্জী (১৯২২ সালে কাবুলে 'মকতবই হাবিবিয়ার' শিক্ষক ছিলেন।) আফগানিস্তান গমন করেন ১৯৭১-এর অক্টোবর মাসে। তিনি সেখানে বাদশা খান ও তদীয় পুত্র ন্যাপ নেতা ওয়ালী খানের সাথে, আফগান পার্লামেন্টের সদস্যদের সাথে, বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনায় মিলিত হন এবং বাংলাদেশের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন লাভে চেষ্টা করেন। এ ছাড়া তিনি কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকের সাথে আলোচনায় বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য ও মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা ও চিত্র তুলে ধরেন। এই দুই সমিতির পক্ষ থেকে শ্রী বংশীভাই মেহতা ও শ্রীমতী সুশীলা মেহতা ইউরোপ এবং অন্য একজন প্রতিনিধি শ্রী পূর্ণেন্দু নারায়ণ রায় ইউরোপ-আমেরিকা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রচারণার কাজে পরিভ্রমণ করেন। এছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউরোপীয় ভাষাসমূহের বিভাগের প্রধান ফাদার পি ফালোঁ (P.Fallon) আমাদের দুই সমিতির পক্ষ থেকে জুন মাসে ভ্যাটিকান শহরের মহামান্য পোপের সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে পোপকে জ্ঞাত করান এবং আমাদের সমর্থনে বক্তব্য তুলে ধরেন। পরে তিনি একই উদ্দেশ্যে ইউরোপের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেন।

সমিতি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য, পুস্তক, দলিল, ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ আর্কাইভস কমিটি গঠন করে। এর পরিচালক ছিলেন অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান। এছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির উদ্যোগে ও

সহযোগিতায় আমরা 'বাংলাদেশ তথ্য ব্যাংক' গঠন করি। এই ব্যাংক দেশী-বিদেশী দৈনিক পত্রিকা, জার্নাল প্রভৃতি থেকে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ও আনুষঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করার কাজে ব্যস্ত থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ জন ছাত্র-ছাত্রীকে এই কার্যে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন জনাব জামিল চৌধুরী। পরে ডঃ এ আর মজুমদারকে এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই প্রকল্পে আমরা প্রবীণ ভারতীয় সাংবাদিক শ্রী দুর্গাদাস তরফদার এবং শ্রী রাম রায়ের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পাই। যুদ্ধ শেষে ব্যাংক সংগৃহীত সমগ্র তথ্যাবলী ঢাকা যাদুঘরকে হস্তান্তর করা হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশ আর্কাইভস সংগৃহীত কাগজপত্রাদি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

অন্যান্য সহযোগী সহায়ক সংগঠনের সহায়তায় আমরা মুক্তিযুদ্ধে তিন প্রকার সহায়তা দানের চেষ্টা করি।

(১) সীমিত সাধ্যে কিছু কিছু মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক অনুদান। (২) মুক্তিযুদ্ধে প্রয়োজনীয় বেসামরিক উপকরণ যেমন কম্বল, শীতবস্ত্র, পোশাক, জুতা ইত্যাদি সংগ্রহে ও বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধা যুবশিবির সমূহে প্রেরণের ব্যবস্থা। (৩) যুদ্ধে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনীয় জীবন রক্ষাকারী ঔষধপত্র ও চিকিৎসা সামগ্রী সংগ্রহ ও বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রেরণ। এ ব্যাপারে আমরা বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার্স কোর-এর সাথে একসঙ্গে কাজ করেছি। এ প্রসঙ্গে ঐ সংগঠনের পরিচালক জনাব আমিরুল ইসলাম ও উপপরিচালক জনাব মামুনুর রশীদের কর্মতৎপরতার কথা স্মরণযোগ্য।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির উদ্যোগে গঠিত মেডিকেল ইউনিট এ ব্যাপারে আমাদের সর্বাধিক সহায়তা করে। শ্রীমতী মৃন্ময়ী বোসের নেতৃত্বাধীন পরিচাল্লিত এই ইউনিট ভারতীয় রেড ক্রসের সহযোগিতায় এবং শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে ঔষধ ও চিকিৎসা-সামগ্রী সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। শিক্ষক সমিতির পক্ষে এই প্রচেষ্টার নিরলসভাবে কাজ করেন বেশ কিছু সদস্য এদের মধ্যে নিত্যগোপাল সাহা, সুকুমার বিশ্বাস, ইমরুল কায়সার প্রভৃতির নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে।

সমিতি গোপনে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টাতেও সহযোগিতা করেছে। যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যাপক লতিফ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সহায়ক সমিতি যে অর্থ সংগ্রহ করে তা অস্ত্র সংগ্রহের কার্যে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে। এই উদ্দেশ্যে ঐ সংগঠনের একজন প্রতিনিধি কলকাতায় আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। আমরা মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধির সাথে তার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেই এবং স্থির হয় যে, বাংলাদেশ সরকারের আমেরিকায় প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ করে এ ব্যাপারে সঠিক কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি সহায়তা প্রদানের জন্য ওয়ার্ল্ড ইউনিভারসিটির ভারতীয় জাতীয় কমিটির কার্যকরী সম্পাদক শ্রী ভি এন থিয়াগ রাজন

আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি ও মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমরা তার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেই। তিনি এ ব্যাপারে সর্বাত্মক ও কার্যকরী সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন।

উপরিল্লিখিত কর্মতৎপরতা ও প্রচেষ্টায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতি ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ সংগ্রাম সহায়ক সমিতি, ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি ফর বাংলাদেশ, শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু পরিচালিত বাংলাদেশ এইড কমিটি আমাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে।

শিবির কর্মাধ্যক্ষদের শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু স্কুল ও কলেজের শিক্ষককে আমরা প্রেরণ করি। নিযুক্ত শিক্ষকগণ নিষ্ঠার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া মাঝে মাঝেই সমিতির প্রতিনিধিরা বিভিন্ন রণাঙ্গন পরিদর্শন করে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের কাজও করেছেন। এ ব্যাপারে অধ্যাপক আবদুল হাকিমের নাম শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ্য। আমি নিজেও সমিতির সম্পাদক হিসাবে সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত মুক্তিযোদ্ধা শিবির পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ করেছি। একদিনের ঘটনা আমার বেশ মনে পড়ে। শিবিরটি মুর্শিদাবাদের লালগোলা সীমান্তে। আমরা ক'জন কিছু ঔষধ ও অন্যান্য বেসামরিক উপকরণ সরবরাহ করতে গিয়েছিলাম। দিনটি ছিল ২২শে নভেম্বর। শিবিরে শোকের ছায়া। রাজশাহীর নবাবগঞ্জ থেকে তিন মাইল দূরে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। আমরা হারিয়েছি সাতজন মুক্তিযোদ্ধাকে আর আমাদের বাহিনী পঁচিশটি বাঙ্কার ধ্বংস করেছে ও অসংখ্য পাক সৈন্যকে হত্যা করেছে, আর বারোজন রাজাকারকে ধরা হয়েছে। বন্দী রাজাকারদের দেখলাম। এর দিন কয়েক আগে নায়েক কাসেম শান্তি-কমিটির চেয়ারম্যান সহ দু'জন রাজাকারকে গ্রেফতার করে। ক্যাপ্টেন গিয়াস এই সেক্টরে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। নায়েক কাসেম ওইদিন বাঙ্কারে অবস্থিত পাক বাহিনীর একজন মেজর ও ক্যাপ্টেনকে ধরতে গিয়ে নিহত হন। এছাড়া ঐ দিনের যুদ্ধে আমাদের পক্ষে আর যারা শাহাদৎ বরণ করেছিলেন তারা হলেন— মোহর আলী (ইপিআর), নিযামউদ্দিন (ইপিআর), জিল্লুর রহমান (মুজাহিদ), আবদুল হক (ছাত্র) এবং আরও দু'জন ছাত্র। বেশ ক'জন আহত হয়েছেন। আমরা আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করলাম। একজন ছাড়া আর কারও মৃতদেহ নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। আমরা অভিবাদন জানালাম সেই বীর শহীদদের।

মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ও প্রচারণা কাজেও সমিতির সদস্যগণ বাংলাদেশ সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে। ডঃ বেলায়েত হোসেন এ কাজের সাংগঠনিক দিকের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।

সরাসরি মুক্তিযুদ্ধেও বেশ কিছু শিক্ষক যোগ দিয়েছিলেন। সে সময় আমরা যাদের নাম সংগ্রহ করেছিলাম তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম মনে পড়ছে। অধ্যাপক আব্দুল

মান্নান (কমার্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), আবুল কালাম আজাদ (সমাজ বিজ্ঞান, ঢা.বি.), গৌরাঙ্গ মিত্র (নটরডাম কলেজ), নূরুন্নবী (ফার্মেসী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), মোয়াজ্জেম হোসেন (বাগেরহাট কলেজ), আবু বকর সিদ্দিকী (আয়ুব ক্যাডেট কলেজ, রাজশাহী), হামিদুল হক (কচুয়া হাইস্কুল) এবং অধ্যাপক হান্নান প্রমুখ। এদের মধ্যে জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন ও জনাব আবু বকর সিদ্দিকী শাহাদৎ বরণ করেছিলেন, আমরা সে সময় সংবাদ পেয়েছিলাম।

আন্তর্জাতিক উদ্ধার কমিটি (International Rescue Committee) : জুন মাসে এই কমিটির পক্ষে অ্যাম্বেস্যাডার অ্যাঞ্জিয়ার বিডল ডিউক (Ambassador Angier Biddle Duke), মর্টন হামবুর্গ (Morton Hamburg, General Counsel–IRC) মিসেস লীথ (Mrs. Lee Thaw–Director, IRC), ডঃ দানিয়েল এল. ওয়াডনার (Dr. Daniel L. Wadner–Prof. of Surgery, Albert Einst College of Medicine N. Y.) এবং মিঃ টমাস ডব্লিউ ফিপস (Mr. Thomas W. Phipps–an author) আমাদের সাথে আলোচনায় মিলিত হন। IRC আমাদের বিভিন্ন প্রকল্পে বিশেষ করে ক্যাম্প স্কুল প্রকল্পে সহায়তা দানে সম্মত হয়।

জাপানে গঠিত 'বাংলাদেশ সলিডারিটি ফ্রন্ট'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সেৎসুরে সুরুসিমা (Setsure Tsurushima), 'জাপান-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ অ্যাসোসিয়েশন'-এর কার্যকরী সংসদের একজন সদস্য মিঃ টি. সুশুকি এবং মিঃ তেমিসুকা আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত করান হয়।

ইতিহাসবিদ অধ্যাপক এ এল বাসাম (অস্ট্রেলিয়া ন্যাশনাল ইউনিভারসিটি) জুন মাসের দিকে আমাদের সাথে আলোচনায় মিলিত হন এবং আমাদের সমস্যা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করানো হয়। তিনি অস্ট্রেলিয়ায় আমাদের হয়ে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন।

'ওয়ার্লড কাউন্সিল অব ওয়ার্লড ফেডারেলিস্ট অ্যাসোসিয়েশন'-এর মিঃ জ্যাক ল্যাকশির্ক সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে আমাদের সাথে এক আলোচনায় মিলিত হন। তাঁদেরকে কয়েকটি শরণার্থী শিবির ঘুরিয়ে দেখান হয়।

স্ক্যান্ডেনেভীয় দেশগুলির কয়েকজন সাংবাদিক এস এ নেলসন (ষ্টকহোম), এ এম স্কিপার (A.M.Skipper Denmark), ভি এস বি বলকার্ট (V.S.B. Balkert-Denmark), এম. আই.ওজহা (M.I.Ojha-Sweden), আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সার্বিক পরিস্থিতি জানতে চান। তাঁরা মুক্তাঞ্চল পরিদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁদের মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয়।

নভেম্বর মাসের ৩০ তারিখে নিউজিল্যান্ড ইয়ুথ ইন্টারন্যাশনাল কমিটির সম্পাদক

ও সহসভাপতি যথাক্রমে অ্যালভিন এফ.আনর্ল্ড (Alvin F. Arnold) ও ট্রেডন জে. ওয়াল্টন (Travon J. Walton) আমাদের সাথে দেখা করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের একাত্মতা প্রকাশ করেন।

সুদীর্ঘ নয় মাসব্যাপী যুদ্ধে বহু সহায়ক সংগঠন আমাদের সাথে নানাভাবে সহযোগিতা করেছে— তাদের সকলের নাম লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও তার ভূমিকার কথা আজ সবারই জানা। শরণার্থী প্রায় সকল শিল্পীই এই কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষকরাও এই কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছেন।

অবরুদ্ধ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে : নানা অসুবিধার মধ্যে থেকে এবং বিপদকে মাথায় নিয়ে বুদ্ধিজীবীরা নানা ভাবে দেশের অভ্যন্তরেও প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশ নিয়েছে। বিভিন্নভাবে গেরিলা ইউনিটের সহায়তায় আমরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে সচেষ্ট হই ও তথ্য সংগ্রহ করি।

ঢাকায় ডঃ আজাদ ও অন্যান্যদের সাথে আমাদের যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। সংবাদ পাচ্ছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কজন শিক্ষক প্রতিরোধ-আন্দোলনে যুক্ত রয়েছেন। শত বিপদের মধ্যেও তাঁরা একটি কাগজ গোপনে বের করেছেন। নাম **'প্রতিরোধ'**। ঢাকায় আমার আর একটি যোগাযোগ বিন্দু সুলতানা (ছদ্মনাম)। তিনি আমাদের লন্ডন যোগাযোগ বিন্দুর মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর নিয়মিত পাঠাতেন। তাঁর প্রেরিত খবরে জানা গিয়েছিল ১লা জুলাই তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল শিক্ষককে যোগদান করতে বলা হলেও বেশ কিছু শিক্ষক ওই আদেশ উপেক্ষা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপস্থিতি খুব কম। তাঁর মাধ্যমে ও অন্য সূত্র থেকে তখন যে খবর আমরা পেয়েছিলাম : অনুপস্থিত শিক্ষকদের একটি তালিকায় শহীদ শিক্ষকদেরও অনুপস্থিত হিসাবে দেখানো হচ্ছে। ভারতে আশ্রয়প্রার্থী শিক্ষকদের তালিকার সাথে মিলিয়ে দেখা গেল বেশ কজন শিক্ষক দেশের অভ্যন্তরে আত্মগোপন করে আছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন : ড. আহমেদ শরীফ, ড. মনিরুজ্জামান ও অধ্যাপক আক্রাম হোসেন (বাংলা বিভাগ), শহীদুল হক মুনসি, অধ্যাপক নূরুন্নবী ও অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন।

নতুন উপাচার্য হয়েছেন ড. সাজ্জাত হোসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রায় প্রতিদিন চলেছে গেরিলা অপারেশন। সাথে সাথে পাকিস্তানীদের অত্যাচার।

রশিদুল হাসান ও আহসানুল হক (ইংরেজী বিভাগ), সাদউদ্দিন আহমদ (সমাজ বিজ্ঞান), ড. আবুল খায়ের (ইতিহাস), রফিকুল ইসলাম (বাংলা) আ ন ম শহীদুল্লাহ (গণিত)-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ক'জন শিক্ষক ও বেশ ক'জন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী করে রাখা হয়েছে। সরকারী পদস্থ

অফিসারদের মধ্যে রয়েছেন লোকমান হোসেন, (টেলিফোন বিভাগ), জনাব ইউসুফ (শিক্ষাবিভাগ)। বহু শিক্ষক ও ঢাকার বিশিষ্ট নাগরিক। পাক বাহিনীর অনুচরেরা প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে চিঠি প্রদান করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত কয়েকজন শিক্ষককে চাকুরী থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে : অধ্যাপক এবিএম হাবিবাউল্লাহ (ইসলামের ইতিহাস), অধ্যাপক্ষ মুহম্মদ এনামুল হক (অতিরিক্ত শিক্ষক বাংলা বিভাগ), ড. মুহম্মদ মণিরুজ্জামান (বাংলা বিভাগ)। আর কয়েকজন শিক্ষককে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে : অধ্যপক মুনীর চৌধুরী, ড. নীলিমা ইব্রাহিম (বাংলা), ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (ইংরাজী)। এছাড়া ১লা জুলাই থেকে অনুপস্থিত সকল শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়েছে।

নভেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে তিনদিন তিনরাত্রি ধরে ঢাকার আশেপাশের গ্রামে বুড়িগঙ্গার ওপারে কামরাঙ্গীর চর, নান্দাইল, কামার খাঁ, রুহিলা, রইৎপুর প্রভৃতি এলাকায় অসংখ্য নরনারী, শিশু ও বৃদ্ধকে হত্যা করা হয়। হত্যাকাণ্ডে অংশ নেয় পাক সৈন্যরা ও তাদের অনুচর রাজাকার বাহিনী। সাথে সাথে চলে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ। সংবাদদাতার মতে প্রায় হাজার খানেক নরনারীকে হত্যা করা হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোয় গঠিত Friends of the Bangladesh Movement- এর পক্ষ থেকে মিসেস এভেলিন চৈৎকিন (Evelyn Chaitkin) কোলকাতায় এলে তাঁকে আমাদের বিভিন্ন ক্যাম্পে স্কুল ঘুরিয়ে দেখান হয়। তিনি এই প্রকল্পে আমাদের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

খবর পাওয়া গেল ঢাকাবাসীরা, বিশেষ করে নিম্ন আয়ের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানী দ্রব্য বর্জন করেছে, ঢাকায় 'জয়বাংলা' বাজার বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেছে।

অন্যান্য অঞ্চল থেকে খবর : আমরা নিয়মিতভাবে খবর পাচ্ছিলাম যে, টাঙ্গাইল এলাকার বিরাট মুক্তাঞ্চল গড়ে তুলেছে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তিবাহিনী। আগস্টের শেষে খবর এলো যে, এই বাহিনী সিরাজগঞ্জ ঘাটে একটি অস্ত্র জাহাজ দখল করেছে। আমরা জানতে পেরেছিলাম এই বাহিনীর সাথে অধ্যাপক নূরুন্নবী ছাড়াও আরও কয়েকজন অধ্যাপক সঙ্গে রয়েছেন। এরা হলেন কাগমারী কলেজের অধ্যাপক নূরুল আমিন ও অধ্যাপক রফিক আজাদ।

বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা খবর পাচ্ছিলাম সংখ্যালঘু নাগরিকদের উপর আবার নতুন করে অত্যাচার শুরু হয়েছে তথাকথিত সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরও। তথাকথিত ক্ষমা ঘোষণায় বিশ্বাস করে যেসব সংখ্যালঘু সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে তাদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। এছাড়া যেসব সংখ্যালঘু বিশিষ্ট নাগরিক পালিয়ে আসতে পারেনি তাদের উপর নানাবিধ অত্যাচার

করা হচ্ছে, তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হচ্ছে, জমিজমা- বাড়িঘর দখল করা হচ্ছে, জোর করে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টাও চলছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর পাওয়া গেল যে নিম্নলিখিত কয়েকজন ব্যক্তি বাধ্য হয়েছেন সপরিবারে মুসলমান নাম গ্রহণ করতে :

শ্রী জয়ন্ত চক্রবর্তী, অধ্যাপক (পদার্থ বিদ্যা), ময়মনসিংহে এ এম কলেজ, শ্রী রবীন্দ্র চক্রবর্তী অধ্যাপক, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজ, ময়মনসিংহ, শ্রী পূর্ণচন্দ্র দত্ত, প্রভাষক (মনস্তত্ত্ব), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রী সুখেন্দু সোম, অধ্যাপক (গণিত), বরিশাল কলেজ, শ্রী নিত্য গোপাল, অধ্যাপক (বাণিজ্য) নাসিরাবাদ কলেজ ময়মনসিংহ।

খবর এলো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষক-জনাব মুজিবুর রহমান (গণিত) এবং জনাব সালেহ্ আহমেদ (সংখ্যাতত্ত্ব)-কে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং মাসের পর মাস ধরে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালানো হচ্ছে।

ময়মনসিংহে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভূমিকা : ২৩ শে এপ্রিল (১৯৭১) পর্যন্ত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উড়েছিল স্বাধীন বাংলার পতাকা। সেদিন হানাদার বাহিনী রুখতে ছাত্র ও সৈনিকদের সাথে এগিয়ে এসেছিলেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ। উপাচার্য ড. কাজী ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে তারা গড়ে তুলেছিলেন সংগ্রাম পরিষদ। এই পরিষদ একদিকে মেজর সফিউল্লাহর নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছে, অন্য দিকে অরক্ষিত অসহায় অবাঙালী নাগরিকদের রক্ষার দায়িত্ব পালন করেছে। সেদিন এই প্রতিরোধ যুদ্ধে ছাত্র ছাড়াও যেসব শিক্ষক কর্মচারী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন : ড. শামসুল ইসলাম, ড. আবদুল ওয়াদুদ, মোস্তফা হামিদ হোসেন, ড. আবদুল লতিফ মিঞা, জনাব শামসুজ্জামান খান, আর কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন মোহাম্মদ হোসেন, শরিয়তউল্লাহ, চাঁদ মিয়া, সৈয়দ নাজমুদ্দিন হোসেন। কিন্তু প্রতিরোধ ভেঙে পড়লো- ২৩ শে এপ্রিল পাক বাহিনী প্রবেশ করলো ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। হানাদার বাহিনী যেসব শিক্ষককে লাঞ্ছিত ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করেছিলেন তাঁরা হলেন ঃ ১। উপাচার্য ড. কাজী ফজলুর রহমান ২। ডীন ডঃ শামসুল ইসলাম, ৩। ড. শামসুদ্দিন, ৪। জনাব আহম্মদ সফি, ৫। ড. আমির হোসেন তালুকদার, ৬। ড. শফিকুর রহমান, ৭। ড. মুস্তফা হামিদ হোসেন, ৮। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক জনাব জাহিদুর রহিম, ৯। কর্মচারী জনাব জলিল ও মিস্টার ডেভিড।

আর অধিকৃত আমলে যেসব শিক্ষক ও কর্মচারী জল্লাদ বাহিনীর হাতে সেদিন নিহত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন :

জনাব আশরাফুল ইসলাম ভুঁইয়া, শিক্ষক; মুহাম্মদ আব্বাস আলী, ছাত্রাবাস কর্মচারী; মধুসূদন, মৎস্যবিভাগের কর্মচারী; মুহম্মদ নূরুল হক, ছাত্রাবাস কর্মচারী, গাজী ওয়াহিদুজ্জামান, কর্মচারী, মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন ১৫ই নভেম্বর; মুহম্মদ হাসান আলী,

কীটতত্ত্ব বিভাগের ল্যাব অ্যাসিস্টেন্ট; গিয়াসউদ্দিন, ছাত্রাবাস কর্মচারী।

কিন্তু এতেও পিছপা হননি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ। গোপনে সহযোগিতা ও প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন অবরুদ্ধ এলাকা থেকে। এর ফলে চাকরিচ্যুতির নির্দেশ আসে অনেক শিক্ষকের প্রতি। চাকরিচ্যুত হন উপাচার্য স্বয়ং। শিক্ষকদের মধ্যে : অধ্যাপক মোস্তফা হামিদ হোসান (পদার্থ বিদ্যা), জনাব আলী নেওয়াজ (বাংলা), জনাব শামসুজ্জামান খান (বাংলা), জনাব আবদুর রাজ্জাক (বাংলা), এ আর এম মাসুদ (পদার্থবিদ্যা), নূরুল ইসলাম নাজমী (ইংরেজী), আব্দুল বাকী (উদ্ভিদবিদ্যা), আবদুল হক (উদ্ভিদবিদ্যা), আবদুল হালিম (কৃষিশিক্ষা) মুহম্মদ হোসেন (পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীদের গ্রেপ্তারের সংবাদে বিচলিত হয়ে পড়লাম। ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটির (IRC) স্থানীয় প্রতিনিধি শ্রী তরুণ মিত্র, আমেরিকান মহলের সাথে বেশ জানাশোনা তাঁর। তাঁর সাথে দেখা করে সহকর্মীদের নাম দিলাম। অনুরোধ করলাম আই আর সি-র কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ঢাকা কর্তৃপক্ষকে চাপ দিতে- অন্ততঃ তাদের জীবন যেন নিরাপদ থাকে। কথা দিলেন যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। মেসেজ ত্বরিত পাঠাবেন আই আর সি-র হেড অফিসে। তাছাড়া যোগাযোগ করবেন আমেরিকার দূতাবাসের সঙ্গেও। সমিতির সম্পাদক হিসাবে বিভিন্ন দূতাবাসে ও বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে (জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল সহ) জরুরী বার্তা পাঠালাম।

জয়নুল আবেদীন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক, ঢাকা থেকে চলে এসেছেন। ওঁর কাছ থেকে ঢাকার বিস্তারিত খবর পাওয়া গেল। ঢাকায় গেরিলাদের কর্মতৎপরতার কথা জানা গেল। খবর পাওয়া গেল মুনির চৌধুরীর, অধ্যাপক হাবিবুল্লাহর, কবি শামসুর রহমানের, হাসান হাফিজুর রহমানের। তিনি আরও জানালেন, ঢাকার কয়েকজন বুদ্ধিজীবী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন সাহসিকতার সাথে।

ঢাকা থেকে আমার ছাত্র ও সহকর্মী ড. একরামুল ইসলামের কাছ থেকে বার্তা এসেছে, ও জামালপুরের একটি স্থানীয় গেরিলা ইউনিটের সাথে কাজ করছে। ঢাকা থেকে টাকা-পয়সা, ঔষধপত্র সরবরাহ করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু অস্ত্রের বেশি প্রয়োজন। যথাস্থানে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো।

অবশেষে এলো সেই দিন ৩রা ডিসেম্বর। সন্ধ্যা সাতটায় এলগিন রোডে নেতাজী ভবনে সম্বর্ধনা সভা-উত্তর ইউরোপীয় কয়েকটি দেশের ডেমোক্রেটিক সোসালিস্ট একটি প্রতিনিধি দলের আগমনের উপলক্ষ্যে। বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অবহিত করানো হচ্ছে তাঁদের। হঠাৎ শিক্ষক সমিতির জনৈক কর্মী সভা থেকে আমাকে ডেকে নিয়ে এলো। জানালো, পাকিস্তানী বিমান ভারতের গভীরে নানা স্থানে হামলা চালিয়েছে। অনন্দে চিৎকার করে উঠেছিলাম সেদিন। আমাদের স্বাধীনতা আসন্ন। যুদ্ধ শুরু হলো।

ভারতীয় বাহিনী যোগ দিলেন আমাদের সাথে মিত্র বাহিনীরূপে।

তারপর সাফল্য আর সাফল্য। প্রতিদিনই পতন হতে লাগল বিভিন্ন শহর। ওই স্বাধীনতা। ঢাকা আর কত দূর। যশোর মুক্ত। মুক্ত দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও। মুক্ত জামালপুর, ময়মনসিংহ। ঢাকা অবরুদ্ধ। মুক্তিবাহিনী ঢাকার উপকণ্ঠে। গেরিলারা অভ্যন্তরে। বিজয় আসন্ন।

কিন্তু এরই মধ্যে হৃদয়বিদারক খবর এলো। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১৩ই ডিসেম্বর পাক সৈন্য ও তাদের অনুচরেরা হত্যা করেছে চল্লিশ জন বিশিষ্ট নাগরিককে। বিচলিত হয়ে পড়লাম, আশঙ্কা করলাম হয়ত— ঢাকাতেও অনুরূপ ঘটেছে বা ঘটতে চলেছে। কোলকাতায় মিত্রবাহিনীর সদর দপ্তরের সাথে, বি এস এফ-এর সাথে যোগাযোগ করে আবেদন জানালাম, যে করেই হোক, ঢাকাস্থ বুদ্ধিজীবীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জীবন রক্ষা করতে হবে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ঘনঘন আবেদন জানান হলো— নাগরিকদের নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার। কিন্তু আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। স্বাধীনতার প্রাক মুহূর্তে আমরা হারালাম শ্রেষ্ঠ সন্তানদের-—চরম মূল্য দিতে হলো স্বাধীনতার।

তবু এর মধ্য দিয়ে এলো স্বাধীনতা। মুক্তি। বিজয়। আত্মসমর্পন করলো পাকিস্তানী বাহিনী, বিনা শর্তে, যৌথ কম্যান্ডের কাছে। দিনটি ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১।

বিনা দ্বিধায় স্বীকার করব মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিই ছিল আমার জীবনের স্বর্ণোজ্জ্বল দিন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার যে সুযোগ ঈশ্বর আমায় দিয়েছিলেন সেজন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। নানা স্মৃতিতে ভাস্বর এই দিনগুলি— কখনও মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছি, কখনও হতাশায় ভুগেছি, আবার কখনও আনন্দ উদ্বেল চিত্তে শিহরিত হয়েছি। নানা জনের কাছে নানা ভাবে সহায়তা লাভ করেছি, এ জীবনের জন্য নানা জনের কাছে কৃতজ্ঞ। নাম করতে গেলে তালিকা হবে দীর্ঘ, তাই কারোও নাম করব না, সকলের কাছে ক্ষমা চাইবো। কিন্তু তবু চান্দিনার কাছে একটি ছোট খালের ধারে, ঝোপের আড়ালে অবস্থিত পর্ণকুটিরে যে বৃদ্ধা মহিলা আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন মায়ের স্নেহে, নিঃসঙ্কোচে, তাঁর কথা কি কোনদিন ভুলতে পারব?

কণিকা বিশ্বাস

২৫শে মার্চ, আমি গোপালগঞ্জ মহকুমার কাশীয়ানী থানার ওড়াকান্দি গ্রামে ছিলাম এবং সেখান থেকেই পাক বর্বরদের অমানুষিক নির্যাতনের সংবাদ জানতে পারি। জুলাই মাসের শেষ ভাগে ভারত আগমনের পূর্ব পর্যন্ত গোপালগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে

অবস্থান করি এবং আওয়ামী লীগ কর্মী ও যুবকদের সংগঠনের চেষ্টা করি। মে মাসের মধ্যেই আমরা বেশ শক্তিশালী হই এবং ৫ই মে গোপালগঞ্জ থানা ছাত্রলীগের নেতৃত্বে আমরা গোপালগঞ্জ থানা আক্রমণ করি। গোপালগঞ্জ থানা ইনচার্জ নিহত হয় এবং থানা থেকে বিরাশিটি রাইফেলসহ বহু গোলাবারুদ উদ্ধার করি। প্রথম দিকে গেরিলা যুদ্ধে আমরা সুবিধা করতে সক্ষম হলেও মে-র মাঝামাঝি প্রায় হাজার খানেক পাকসেনা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আমাদের এলাকায় প্রবেশ করলে আমাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। ১৬ই মে রবিবার পাক সৈন্যরা গোপালগঞ্জ থানার সাতপাড়া গ্রামে একাধারে পাঁচ ঘন্টা গুলি চালায় এবং অগ্নিসংযোগ করে। এখানে ১০৩ জন নিরীহ গ্রামবাসী পাকসেনা কর্তৃক নিহত হয়। ঠাকুরবাড়ির গর্তে একই পরিবারের আটজনকে পাকসেনারা গুলি করে হত্যা করে।

১৮ই মে মুকসুদপুর থানার ভেন্নাবাড়ি পাকসেনা কর্তৃক আক্রান্ত হয়। সমগ্র গ্রামে তারা আগুন ধরিয়ে দেয়। ছাত্রলীগ কর্মী অমলকে তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে হত্যা করা হয়। ভেন্নাবাড়ী ও রথবাড়ীর এই দুই গ্রামের মধ্যেই বিলি ছিল হত্যাকাণ্ডের কেন্দ্র। এখানে প্রায় ১৩২জনকে পাক বর্বররা হত্যা করে। এছাড়া কদমবাড়ি, আনন্দপুর, বেদভিটা, মাদুকান্দি, আড়ুয়াকান্দি, তৈলীভিটা, বৌলতলী, রঘুনাথপুর, গোলাবাড়িয়া এলাকায় পাক সেনারা গণহত্যা চালায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে কেবল সাতপাড়া গ্রামে ১০৩ জন, ভেন্নাবাড়ি গ্রামে ১৩২জন লোককে হত্যা করা হয়। তছাড়া কদম বাড়িতে আটজন, আনন্দপুরে পাঁচজন, বেদভিটায় বারজন, মাদুকান্দিতে পঁয়তাল্লিশজন, আড়ুয়াকান্দিতে দুইজন, তেলীভিটায় সাতজন, বৌলতলীতে দশজন, রঘুনাথপুর ১৪৪জন এবং গোলাবাড়িতে ১৫০ জনকে পাক সেনারা হত্যা করে। এদের অধিকাংশকে গুলি করে হত্যা করা হয়। বাচ্চাদের তারা আছাড় মেরে বা বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে।

দিন দিন আমাদের বাহিনীর অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকলে আমরা বেশ কয়েকজন উন্নত অস্ত্র এবং ভারতের সাহায্যের আশায় জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভারতাভিমুখে যাত্রা শুরু করি। ৭দিন পথ চলার পর অষ্টম দিনে ভারতে পৌঁছাই। ভারতের বালেশ্বরপুর, ব্যারাকপুর পলতাতে অবস্থান করি। কয়েকদিন পর মুজিবনগরে যাই এবং মুজিবনগরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। এরপর ঠাকুরনগর, সল্টলেক, হাসপুর, গয়া, হেলেঞ্চা, খড়ের মাঠ প্রভৃতি স্থানের শরণার্থী শিবিরে সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করি। উনিশশো বাহাত্তর-মার্চের দিকে দেশে ফিরে আসি।

জয়গোবিন্দ ভৌমিক

১৯৭১ সালের মার্চ মাস। আমি তখন ঢাকায় জেলা ও দায়রা জজের দায়িত্বে নিয়োজিত। আমার কোয়ার্টারটা ছিল পুরোনো সার্কিট হাউস চত্বরে। আমার বাসার কাছেই কাকরাইলে অবস্থিত সেন্ট্রাল সার্কিট হাউস। সেখানে স্থাপিত হল পাক বাহিনীর আঞ্চলিক হেড কোয়ার্টার। মিলিটারীর খটখট পায়ের শব্দে আর বন্দুকের আস্ফালনে বুক কেঁপে কেঁপে ওঠে।

২৬শে মার্চ রেডিও মারফৎ ফরমান এলো থানায় বন্দুক জমা দাও। পায়ে হেঁটে কাঁপতে কাঁপতে বন্দুক হাতে নিয়ে গেলাম রমনা থানায়।

২৮শে মার্চ সবাইকে দশটায় নিজ নিজ অফিসে অবশ্য হাজির হতে হবে। পুরোনো সার্কিট হাউস চত্বর থেকে ঢাকা কোর্টের দূরত্ব আনুমানিক ৪/৫ মাইল। গাড়িঘোড়া চলছে না। লোকজন প্রাণের ভয়ে গ্রামাঞ্চলে পায়ে হেঁটে চলেছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। পায়ে হেঁটে জীবনকে হাতে নিয়ে আমিও চললাম পুরোনো ঢাকার জর্জ কোর্ট চত্বরে অফিসিয়াল দায়িত্ব পালন করতে। আমার সঙ্গে ছিলেন আমারই ব্যাচমেট তৎকালীন ঢাকাস্থ এডিশনাল জেলা জজ, আতিয়ার রহমান সাহেব। আমরা আদালত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলাম বহু কষ্টে কারণ, দারোয়ান বা নাইটগার্ডরা প্রাণভয়ে কোথায় যে পালিয়েছে তার ঠিকানা নেই। তৎকালীন নেজারত থানায় আগুন লাগান হয়েছে। ফলে অনেক মূল্যবান দলিল পুড়ে গেছে। পশ্চিম দিকের তিনতলা ইমারতটি যেখানে কিছুদিন আগেও সাময়িক ভাবে জজ সাহেবের এজলাস বসত, সেখানে নীচ তলায় মিটিমিটি আগুন জ্বলছিল। আমরা বহু কষ্টে মূল্যবান মামলার রেকর্ডগুলি সরিয়ে এনে একটা টেবিলে জমা করি। কোন ঘরে আমরা প্রবেশ করতে পারিনি, কারণ দারোয়ানরা তালা লাগিয়ে পালিয়েছে। পরে বহু চেষ্টায় কাঁচের জানালা ভেঙে দু-একটি অফিসকক্ষে প্রবেশ করি। মুন্সেফ, সাবজজ, এডিশনাল জজ সাহেবরা সকালে একটি কাগজে তাদের নাম লিখে আমার হাতে দিয়ে অফিসে হাজিরার দায়িত্ব পালন করে।

এমনি ভাবে কয়েকদিন কাটিয়ে দিলাম। পথের হয়রানি লেগেই আছে। পাক সৈন্যরা সবার কাছে পরিচয়-পত্র চায়— আমরা পাকিস্তানের দুশমন কি না জানতে চায়। তাই সবার নামে একটি করে 'আইডেন্টিটি' কার্ড প্রদান করতে হলো যাতায়াতের যাতে করে বিঘ্ন না ঘটে। কিন্তু প্রধান হিসাবে আমার নাম দস্তখত করলাম অস্পষ্টভাবে। পাক সেনারা যাতে জানতে না পারে যে আমি একজন হিন্দু। কারণ তাদের ধারণা হিন্দুরা কাফের এবং তারাই যত অনিষ্টের মূল। কোর্টকাছারি তখন নামেই চলছিল। মক্কেল নেই, লোকজন প্রাণের ভয়ে কোর্টে আসত না। আমার ছোট একটা ফিয়েট মটোরকার ছিল।

ওটায় তখন কোনমতে কোর্টে আর বাসায় যাতায়াত করতাম। গাড়ির ভিতর রাখতাম 'জিন্নাহ ক্যাপ' যাতে করে কেউ টের না পায় আমি একজন হিন্দু জজ। আর কাগজে লিখে নিয়ে ৩-৪টা কলেমা মুখস্থ করে আওড়াতাম যাতে আমি পাক-সৈন্যদের বোঝাতে পারি একজন সাচ্চা মুসলিম।

পাক-সেনা পরিবেষ্টিত হয়ে প্রতিনিয়ত মৃত্যুভয়ে ভীত অবস্থায় কয়েকটি দিন কাটিয়ে দিলাম কোনমতে। এরমধ্যে একদিন তৎকালীন জুনিয়ার এডভোকেট জনাব জি.এ খান এসে বলেন, ''স্যার শীঘ্র ঢাকা থেকে অন্যত্র চলে যান। আপনার নাম মিলিটারী জান্তার তালিকায় ৩নং এ দেখলাম। ওরা ''কম্বিং অপারেশন'' শুরু করতে যাচ্ছে।

সংবাদটা বড়োই করুণ। বুকটা কেঁপে উঠলো। ঢাকা ছেড়ে কোথায় যাবো? ঢাকা জেলার না চিনি গ্রামগঞ্জ না চিনি পথঘাট। চারিদিকে মিলিটারী আর মিলিটারী। মৃত্যুর দিন গুনছিলাম। ঠিক এই সময়ে এডভোকেট আলী আমজাদ সাহেবের শ্যালক এম, এ সরোয়ার (খোকন) এসে হাজির। তিনি আমাদের অতি পরিচিত, ছেলেমেয়েদের খোকনভাই। তিনি বললেন কোন ভয় নেই গাড়ি রেডি আছে, পথঘাট সব ঠিক আছে, বৈদ্যের বাজার দিয়ে কুমিল্লা হয়ে আগরতলায় পৌঁছাতে মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যাপার, বেলা দশটায় রওনা হলে সন্ধ্যার আগেই আমরা পৌঁছে যাচ্ছি, অতি সহজ ভাষায় বলে ফেললেন। আমিও তার কথা সহজভাবেই বিশ্বাস করে মুক্তির পথ খুঁজে পেলাম।

কয়েকটা হাতব্যাগের মধ্যে সোনাদানা, টাকা-পয়সা, কয়েকটা মূল্যবান জামাকাপড় ভরে নিয়ে ২/৩ দিনের মধ্যে ঢাকা ছাড়ার সংকল্প করলাম। আশেপাশের অফিসাররা জানতে পারলে সমূহ বিপদ হবে। তাই কাউকে কিছু বলিনি। খোকন মিয়ার প্ল্যান অনুযায়ী আমি বেলা দশটার আগেই আমার মোটর কারে জজ কোর্টে চলে গেলাম। আমার পরিবারবর্গ খোকন মিয়ার কোন বন্ধুর গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। ১০/১৫ মিনিট-এর মধ্যে অপর একটি মোটরকার এসে হাজির যেটি তাদেরকে ডেমরা ঘাটের নিকট পৌঁছে দিল আর আমি ১০-৩০ মিনিটের মধ্যে ঢাকা জজ কোর্ট হয়ে রওনা হলাম ডেমরা ঘাটের দিকে। ড্রাইভার সাহাবুদ্দিনকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়ে খোকন মিয়ার সাহায্যে আমরা গাড়ি নিয়ে ডেমরার দিকে ছুটলাম। অফিসে রেখে গেলাম একটা ছ'দিনের ''ক্যাসুয়াল লীভ''-এর দরখাস্ত। প্ল্যানমত ডেমরায় গিয়ে পরিবারবর্গের সঙ্গে মিলিত হলাম। গাড়ি দুটিকেই ফিরিয়ে দিলাম।

বহু কষ্টে স্কুটার জোগাড় করে আমরা গিয়ে বৈদ্যের বাজার পৌঁছাই। তখন বেলা প্রায় চারটা। খোকন মিয়ার কথা অনুযায়ী কোথায় সন্ধ্যার আগে গিয়ে ভারতের আগরতলায় পৌঁছাব, তা না হয়ে বৈদ্যের বাজারেই পড়ে রইলাম বিকাল অবদি। চিন্তায় অধীর হয়ে পড়লাম। সমূহ বিপদের ঘনঘটা দেখতে পেলাম। এখন উপায়?

অসুস্থ স্ত্রীকে সঙ্গে এনেছি। প্রায় না খেয়েই রওনা দিয়েছি কোন সকালে। ছেলেমেয়েরা

ক্ষুধায় ছটফট করছে খাবার জিনিসের মধ্যে পেলাম কিছু লিচু তাই কিনে নিলাম। বেলা পাঁচটার দিকে দেখলাম, দূর থেকে একটা লঞ্চ আসছে তাতে লোক ভর্তি, স্থান হবে না। লঞ্চটি তীরে ভিড়লো না। আমরা একটা ছোট ডিঙ্গিতে উঠে আসতে আসতে লঞ্চের কাছে গিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে কোনমতে শরীরকে ঢুকিয়ে দিয়ে কেবিনের ভিতরে প্রবেশ করলাম। রাত ৮-৩০ মিনিট নাগাদ যখন কুমিল্লা জেলার রামচন্দ্রপুর আসলাম, তখন লঞ্চের সারেং বলে উঠলো, যারা হিন্দু আছেন তারা যেন সেখানে নেমে যান। তাদেরকে আর নেওয়া যাবে না। তখন অনেকে সেখানে নেমে গেল। আমরা নামলাম না। কারণ আমরা তো হিন্দুর পরিচয় দিচ্ছি না। যখন রামকৃষ্ণপুর পৌঁছালাম তখন রাত সাড়ে ন'টা। একটি বন্দরের মতো জায়গা। সর্বত্র গভীর নিঝুম অন্ধকার। দু'একটা কুপি বাতি দোকানের মাঝখান থেকে জ্বলছে। আমরা নেমে পড়লাম। খোকন মিয়া আমাদেরকে গাইড করছেন। আমরা সবাই ভয়ে কাঁপছি। কিন্তু খোকন মিয়া আশ্বাস দিয়ে বলে উঠলেন, কোন ভয় নেই। একটা বুড়ো মাঝিকে ডেকে বললেন "এই মাঝি, কামাল্যা গ্রাম চেনো? ঐ গ্রামের চৌধুরী বাড়িতে যাবো তাদের ইষ্টি কুটুম ঢাকা থেকে এসেছেন।" সে কুমিল্লা জেলার কামাল্যা গ্রামের চৌধুরী বাড়ি চেনে।

আমাদের নৌকার ছৈ-এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে মাঝি নৌকা বেয়ে চললো। সামনে একটা কুপি বাতি জ্বলছে টিপটিপ করে। ভয়ে আমরা জড়োসড়ো। কখন যেন ডাকাতের পাল্লায় পড়ি। দু-একটি হাকডাকও কানে গেল। কিন্তু আমরা নিশ্চুপ।

যখন কামাল্যা গ্রামে এসে পৌঁছালাম তখন রাত প্রায় একটা। ক্ষিদেয় আধমরা হয়ে গেছি। চৌধুরী বাড়ি গিয়ে উঠলাম। খোকন মিয়া কানে কানে বলে দিলো, ঢাকার জজ সাহেব। একটা অল্প বয়সী ভদ্রমহিলা সেই রাতেই আমাদের জন্য দুটো ডাল-ভাত রেঁধে দিলো। আমরা পরম তৃপ্তির সাথে তা খেলাম। রাত ভোর হতে বেশি বাকি ছিল না। আমরা একটা ভাঙা বেড়ার ঘরে আশ্রয় নিলাম এবং কোন মতে একটু চোখ বুজালাম। পর দিন যাবো কিন্তু কোন নৌকা মিলল না। তাই সেদিন কামাল্যা গ্রামে থাকতে হলো। খুব ভোরে রওনা হব কিন্তু খোকন মিয়ার তাগিদ নেই। তিনি গ্রামে কানাঘুষা শুনেছেন আমরা হিন্দু, কয়েক সের সোনাদানা এবং বহু টাকা-পয়সা নিয়ে ভারতে পাড়ি জমাচ্ছি। কিন্তু এ খবর তিনি চেপে গেছেন। যাতে আমরা ঘাবড়িয়ে না যাই। তিনি শুধু বলে উঠছেন চা-নাস্তা না খেয়ে যাচ্ছি না। যাক, বেলা ৭-৩০মিনিটের দিকে নৌকাযোগে রওনা হলাম আগরতলার দিকে। কিন্তু দুমাইল পথ না যেতেই আলগি গ্রামে একদল দুষ্কৃতীকারী শোরগোল করে ছুটে এলো নৌকার দিকে লাঠি হাতে। আমাদের কাছে যা কিছু টাকা-পয়সা সোনাদানা ছিল তা প্রায় লুট হয়ে গেল। এখন উপায়? ঢাকায় ফিরলেও মৃত্যু অবধারিত। তাই এগিয়ে চললাম, সামান্য কিছু পথের সম্বল নিয়ে। যা আমার স্ত্রীর কাছে একান্ত গোপনে রাখা ছিল।

নৌকার মাঝি ৪/৫ মাইল যাওয়ার পর আর এগোতে সাহস পেল না। সামনে নাকি পাক সেনার আস্তানা। কুমিল্লার একটা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার নিকট নামিয়ে দিল। কিছুই চিনি না। জানলাম, সেখান থেকে মুরাদনগর থানার অধীন বাংগুরা গ্রাম নাকি বেশি দূরে নয়। তখন খোকন মিয়া একই কায়দায় সাহস দিয়ে বলে দিল, কোন ভয় নেই। বাংগুরার চেয়ারম্যান যে তার এক আত্মীয় কথাটা আদৌ হয়তো সত্য নয়। তবু ভরসা পেলাম। তারপর সেখান থেকে ৩/৪ মাইল পথ বহু কষ্টে পায়ে হেঁটে গিয়ে উঠলাম বাংগুরা ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের বাসায়। সেখানে আমার পরিচয় গোপন রাখলাম। চেয়ারম্যান সাহেব বয়স্ক মুসলিম লীগ নেতা। তিনি সর্বদা পাকিস্তানের খবর শুনছেন। বিশিষ্ট ভদ্রলোক। আতিথেয়তার ত্রুটি করেননি বিন্দুমাত্র। তাঁর এক ছেলে সেখানকার হাইস্কুলের শিক্ষক। তিনি একটা নৌকা ঠিক করে দিলেন এবং একজন শ্মশ্রুমণ্ডিত মুরুব্বিমত লোককে সঙ্গে দিয়ে দিলেন যাতে পথে কোন অসুবিধে না হয়।

সেখানে রাত কাটিয়ে ভোরে রওয়ানা হলাম। কিছুদূর যাবার পর আবার একদল গুণ্ডা দ্বারা আক্রান্ত হলাম। কিন্তু ওই মুরুব্বি লোকটা, চেয়ারম্যানের লোক বলায় কোন মতে রক্ষা পেলাম। এমনিভাবে দুর্গম বিপদসংকুল পথ অতিক্রম করে আমরা কোনমতে পাহাড়ী পথ ধরে ভারত ভূমিতে প্রবেশ করলাম। দেখলাম বহুলোক পায়ে হেঁটে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান থেকে দলে দলে ভারতে প্রবেশ করছে। ভারত সীমান্তে আমার পরিচয় দিয়ে নাম শরণার্থীদের তালিকাভুক্ত করে জিপযোগে রওয়ানা হলাম আগরতলায়। সেখান থেকে ১০/১২ মাইল দূরে আগরতলায় বাংলাদেশী শরণার্থীদের জন্য ক্যাম্প খোলা হয়েছে। অনেক পরিচিত নেতা এবং অফিসারের সাথে দেখা হলো। মনে কিছুটা সান্ত্বনা অনুভব করলাম।

প্রায় তিনদিন তিনরাত আগরতলায় বিবেকানন্দ হোটেলে কাটিয়ে সকালে রওয়ানা হলাম ধর্মনগরের দিকে। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ধরে বাসযোগে প্রায় ১২৫ মাইল পথ অতিক্রম করে এসে পৌঁছালাম ধর্মনগর রেলষ্টেশনে। সেখানে জয়বাংলার লোকে লোকারণ্য। সবাই ট্রেনের অপেক্ষায় আছে। রাত আটটায় ট্রেন ছাড়ে। কোনমতে এক দালালের সাহায্যে জানালার ফাঁক দিয়ে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় প্রবেশ করলাম। বসবার কোন স্থান নেই। লোকের চাপে জীবন প্রায় যায় যায়। তবু জীবন যায়নি। ওই ট্রেনে চেপে এগোতে লাগলাম। 'জয়বাংলা'র কোন লোকই টিকিট কাটে না। আমরাও বিনা টিকিটেই রওয়ানা হলাম। কেউ আমাদের কাছে টিকিট চায়নি। লামডিং ও শিলিগুড়িতে ট্রেন বদল করলাম। ধর্মনগর রেলষ্টেশন থেকে রওনা হয়ে, তিন দিন তিন রাত ট্রেনে কাটিয়ে কাটিয়ে অবশেষে এসে পৌঁছালাম শিয়ালদহ রেলষ্টেশনে। মনে হলো জীবন ফিরে পেয়েছি। পরে লোকাল ট্রেন ধরে কৃষ্ণনগরে এক আত্মীয়ের বাসায় এসে আশ্রয় নিলাম।

কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে কোলকাতায় এসে আমাদের হাই কমিশন ভবনে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, জয়বাংলার লোকের সমাগম। একজন পরিচিত ভদ্রলোক বললেন, স্যার এসেছেন, শীঘ্র আপনার বায়োডাটা ফর্মটা পূরণ করুন। দেখলাম দলে দলে লোক বায়োডাটা ফর্ম পূরণে ব্যস্ত। আমিও আমার জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ঐ ফর্ম পূরণের মাধ্যমে রেকর্ড করলাম। পরে আমার পরিচিত খন্দকার আসাদুজামান (প্রাক্তন সি, এস, পি) ও আরো কয়েকজন পদস্থ অফিসার ও এম পি- এর সাথে দেখা হলো। তারা আমার আগেই এসে মুজিবনগর সরকারের কাজে নিয়োজিত হয়েছেন। আমাকে দেখে তারা খুব খুশী হলেন। আমিও তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণের সংকল্প দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করে সেদিনের মতো বিদায় নিলাম।

এক সপ্তাহ পর আবার কোলকাতায় আসলাম। বাংলাদেশ হাই কমিশন চত্বরে। অনেক চেনা মুখ পেলাম এবার। আমাদের দেশের অনেক অফিসার, ডাক্তার, উকিলের সমাগম। সবাই প্রাণের ভয়ে দেশ ত্যাগ করে এসেছেন, অনেকেই চাকুরীর আশায় সেখানে ঘোরাফেরা করছেন। একজন ভদ্রলোক আমাকে ডেকে বললেন, শীঘ্র আমাদের ট্রেজারী অফিসার জনাব মাখনলাল মাঝির (তৎকালীন ই, পি, সি, এস) সাথে দেখা করুন, আপনি কিছু এলাউন্স পাবেন। পকেট শূন্য। কিছু প্রাপ্তিযোগের কথা শুনে মনটা মেতে উঠলো। গেলাম মাখনলাল মাঝির সাথে দেখা করতে। তিনি বললেন, আমার নাকি আড়াই শো টাকা প্রাপ্য। যারা মুজিব নগরের সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত নাই অথচ 'পূর্ব পাকিস্তানী' সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন তারা সর্বোচ্চ পাঁচশো টাকার অর্ধেক (অথবা পূর্বে পাঁচশো টাকার কম বেতন পেলে তার অর্ধেক) এলাউন্স হিসেবে পাবেন। তাই তিনি ২৫০ টাকা গুনে আমার হাতে তুলে দিলেন। টাকাগুলি কিন্তু সব পাকিস্তানী মুদ্রায় দেয়া হলো। ওইগুলি ভারতীয় মুদ্রায় বদল করে নিতে হবে। পাকিস্তানী মুদ্রা ও ভারতীয় মুদ্রার হার তখন প্রায় এক পর্যায়েই ছিল। টাকাগুলি ভাঙিয়ে নিয়ে আনন্দিত মনে ফিরে এলাম কৃষ্ণনগরে, যেখানে আমরা আশ্রয় নিয়েছি।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, মুজিবনগর সরকারের হাতে অনেক পাকিস্তানী মুদ্রা জমা পড়েছিল মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য। অনেক অফিসার ও সংগ্রামী জনতা পূর্ব-পাকিস্তানের অনেক ব্যাংক, ট্রেজারী থেকে বেশ কিছু টাকা নিয়ে গিয়ে ওই সরকারের হাতে জমা দেয়। সেই জমাকৃত টাকা থেকে মুক্তিযুদ্ধের প্রথমদিকে কিছুদিন অফিসারদেরকে এলাউন্স হিসেবে দেওয়া হতো। তারপর মে মাসের মাঝামাঝি কি জুনের প্রথম দিকে, পাকিস্তান সরকার ১০০ ও ৫০০ টাকার পাকিস্তানী নোট অচল ঘোষণা করেন। ফলে মুজিবনগর সরকারের নিকট জমাকৃত প্রচুর নোট অকেজো হয়ে পড়ে।

১৯৭১ সনের মে মাসের শেষের দিক। মুজিবনগর সচিবালয় থেকে একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম এলো আমার নামে, বায়োডাটায় দেওয়া কৃষ্ণনগরের ঠিকানায়। আমাকে অতি

শীঘ্র সচিবালয়ে দেখা করতে বলা হয়েছে। সেই মতে পরের দিনই কোলকাতায় চলে আসলাম। ৮নং থিয়েটার রোডে অবস্থিত মুজিবনগর সচিবালয়। সেখানে গিয়ে দেখি তৎকালীন সচিবালয়ের সচিব জনাব নুরুল কাদের খান আগরতলায় ট্যুরে গেছেন এবং তার অবর্তমানে অর্থ ও স্বরাষ্ট্র (ইন্টিরিয়ার) সচিব খন্দকার আসাদুজ্জামান সাহেব সংস্থাপন বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। তার নিকট থেকে জানলাম তৎকালীন মন্ত্রীবর্গের ক্যাবিনেট মিটিং-এর সিদ্ধান্তের কথা। আমার মতামত পেলে তারা আমাকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে নিয়োগ দান করবেন। আমি এই সিদ্ধান্তের কথা জেনে, সানন্দে মত দান করলাম। কয়েকদিন পর, ভারতীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে এবং সমগ্র রিলিফ অপারেশন প্রত্যক্ষভাবে দেখাশোনার সুবিধার্থে পদটিকে সচিব হিসেবে আখ্যায়িত না করে রিলিফ কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দান করেন। ফলে রিলিফ কমিশনারকে একদিকে যেমন সচিবের দায়িত্ব পালন করতে হতো, অন্যদিকে আবার রিলিফ অপারেশনের দিকটাও দেখতে হতো।

পাকবাহিনীর নির্মম অত্যাচারে বাংলাদেশের এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল ভারতে। এই এক কোটি জনগোষ্ঠীর ত্রাণকার্য পরিচালনা করা সহজসাধ্য নয়। বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রচেষ্টায় এই লোকদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে খাদ্যবস্ত্র কম্বল প্রভৃতি ত্রাণসামগ্রী এসেছে। মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে রিলিফ কমিশনার হিসাবে আমার প্রধান দায়িত্ব ছিল ভারত সরকারের সাথে সংযোগ রক্ষা করা এবং ত্রাণসামগ্রী বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরগুলিতে যাতে যথাযথভাবে পৌঁছে যায় এবং তা সুষ্ঠুভাবে বণ্টিত হয় তার দিক থেকে লক্ষ্য রাখা। এই ব্যাপারে আমাকে বিভিন্ন ক্যাম্প (শিবির) পরিদর্শন করতে হয়েছে। তৎকালীন ত্রাণ ও পূনর্বাসিন সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যাবলী নিয়ে ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বৈঠকে বসতে হয়েছে। এক্ষেত্রে ভারত সরকারের ত্রাণ ও পূনর্বাসন দপ্তরে তৎকালীন কেন্দ্রসচিব মিঃ কলহান ও অতিরিক্ত সচিব মিঃ লুথরা-র নাম উল্লেখ করতে চাই।

অনেক মুক্তিযোদ্ধা ও অসহায় শরণার্থীকে তাৎক্ষণিক বিপদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তৎকালীন বিপ্লবী সরকারের মন্ত্রী জনাব এ. এইচ. এম, কামরুজ্জামানের পরামর্শ ক্রমে কিছু কিছু আর্থিক সাহায্যও দেওয়া হয়েছে।

জনাব মোহাম্মদ হোসেন আলী সাহেব ছিলেন তৎকালীন কলকাতাস্থ পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার। তিনি সর্বপ্রথম পাকিস্তান দ্যুতাবাস কর্মীদের মধ্যে তৎকালীন বাংলাদেশ বিপ্লবী সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন এবং তিনি বাংলাদেশের প্রথম হাই কমিশনার হিসাবে কলকাতায় নিয়োজিত হন।

প্রথম অবস্থায় তারই সহায়তায় মুজিবনগর সচিবালয়ের পত্তন হয়। কলকাতাস্থ

বাংলাদেশ হাইকমিশন ভবনে। অল্প কিছুদিন পরেই সচিবালয়টি স্থানান্তরিত করা হয়। ৮নং থিয়েটার রোডের একটা বড়ো বাড়িতে। প্রধানত এখান থেকেই মুজিবনগর সচিবালয়ের কাজ পরিচালিত হত। এখানেই বসতেন তৎকালীন বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ, অর্থমন্ত্রী সৈয়দ মনসুর আলী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক আহমেদ এবং ত্রাণ, পূণর্বাসন ও স্বরাষ্ট্র (ইন্টিরিয়ার) মন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামান সাহেব। শেষ পর্যায়ে সচিবালয়ের কর্মচারীর সংখ্যা বেশ কিছুটা বেড়ে যাওয়ায় স্থান সংকুলানের জন্য সচিবালয়ের অধিকাংশ বিভাগ স্থানান্তরিত করা হয় বালিগঞ্জ এলাকায় শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায় রোডে একটি বড়ো বাড়িতে।

মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বীর সন্তানদের প্রতিদিনের কৃতিত্বের কথা আমাদের সচিবালয়ে নিয়মিত সরবরাহ করা হতো। মাঝে মাঝেই ক্যাবিনেট মিটিং বসতো এবং মুক্তিযুদ্ধের ফলাফল নিয়ে আমরা পর্যালোচনা করতাম। এদিকে আমাদের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ওই সময় দিল্লীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধি ও অন্যান্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কয়েক দফা উচ্চপর্যায়ের আলোচনায় বসেন এবং পরে পরস্পরের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে চুক্তিতে উপনিত হন।

যখন ভারত সরকার ১৯৭১ সনের নভেম্বর মাসের মধ্যেও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল না তখন অনেকের মধ্যেই হতাশা ও বেদনার সুর লক্ষ্য করেছি। তার পর ৬ই ডিসেম্বর সত্য সত্যই যখন ভারত সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে তখন আমরা সবাই আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ি।

এরপর সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য ১৬ই ডিসেম্বর ভারত সরকারের পক্ষ থেকে একটা উচ্চ পর্যায়ের জরুরী বৈঠক ডাকা হয় সকাল দশটায়, কলকাতাতে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন একজন ঊর্ধ্বতন সিনিয়ার সিভিল সার্ভেন্ট মিঃ আর গুপ্ত। সেখানে আরও উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের বহু ঊর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সর্বজনাব রুহুল কুদ্দুস, নুরুল কাদের খান, খন্দকার আসাদুজ্জামান, আমি নিজে এবং আরও কয়েকজন। সভা চলাকালীন আনুমানিক বেলা বারোটার দিকে হঠাৎ বৈঠক কক্ষের টেলিফোনটি বেজে উঠলো।

মিঃ গুপ্ত টেলিফোনটি ধরলেন এবং সবার সামনে টেলিফোনের বার্তা জানিয়ে দিলেন— বললেন, আপনাদের জন্য শুভ সংবাদ, পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে। এই সংবাদে আমরা সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লাম। এই পরিস্থিতিতে আমরা বাংলাদেশে গিয়ে কি কার্যক্রম গ্রহণ করবো সেই বিষয় নিয়ে অল্প কিছু সময় আলোচনার পর বৈঠক সমাপ্ত হয়।

এই বৈঠকের পর পরই আমরা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ সাহেবের সঙ্গে সচিবালয়ে তার কক্ষে গিয়ে মিলিত হই। আমাদের পক্ষে পাক আর্মির আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য কাকে ঢাকায় পাঠানো যায় এই নিয়ে জল্পনা হলো। আমাদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলেন, স্যার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আপনারই উপস্থিত থাকা উচিত। পরে সিদ্ধান্ত হলো সেনাবাহিনীর এই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে আমাদের পক্ষে উপস্থিত থাকা উচিত একজন মিলিটারী অফিসারের। তখন জেনারেল ওসমানিকে পাঠানোর কথা উঠলো। কিন্তু তিনি যে তখন কলকাতার বাইরে। উপায়? তৎক্ষণাৎ আমাদের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সেকেণ্ড-ইন-কমান্ডার জনাব এ কে খন্দকার এয়ার ভাইস মার্শাল সাহেব বলে উঠলেন, "স্যার আমি প্রস্তুত আছি"।

তারপর তাকেই দুপুরের এক বিশেষ ফ্লাইটে ঢাকায় পাঠানো হলো আত্মসমর্পণের সে ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের যোগদানের জন্য। ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৭১। ভারতীয় একটি বিমান যোগে আমাদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী জনাব এ, এইচ, এম কামরুজ্জামান, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ-এর স্ত্রী জহুরা তাজউদ্দিন ও অন্যান্যসহ আমি দমদম বিমান বন্দর থেকে বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা হলাম।

১লা জানুয়ারী ১৯৭২ সনে আমি ঢাকায় এসে সচিবের মর্যাদায় বাংলাদেশের রিলিফ কমিশনার হিসেবেই কাজে যোগদান করি।

মুজিবনগর সচিবালয়ে যারা মুখ্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাদের প্রধান কয়েকজনের নাম হলো :

জনাব নুরুল কাদের খান, সেক্রেটারী জেনারেল, এডমিনিসট্রেশন; জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান; সচিব, অর্থ ও স্বরাষ্ট্র (ইন্টিরিয়ার) মন্ত্রণালয়; বাবু জয়গোবিন্দ ভৌমিক, রিলিফ কমিশনার; জনাব আবদুস সামাদ, সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়; জনাব তৌফিক ইমাম, সচিব, মন্ত্রী পরিষদ; জনাব, ডঃ টি হোসেন, সচিব, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়; জনাব হান্নান চৌধুরী, সচিব, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; জনাব আব্দুল খালেক, পুলিশের আই, জি; জনাব ওয়ালিউল ইসলাম, ডি এস, জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন; জনাব কামালউদ্দিন আহমেদ, ডি এস, জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন; জনাব মামুনুর রশিদ, ডেপুটি রিলিফ কমিশনার; জনাব সাদত হোসেন, পি এস, ফাইন্যান্স মিনিস্টার; জনাব কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী, পি এস, ফরেন মিনিস্টার; জনাব কাজি লুৎফুল হক, পি এস, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি; জনাব খায়রুজ্জামান চৌধুরী, ডি, এস, ফাইন্যান্স; জনাব আকবর আলী; ডি, এস; জনাব আহমদ আলী, ডি, এস, স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয়; জনাব মাখনলাল মাঝি, ট্রেজারী অফিসার; ধীরাজ নাথ, পি এস, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী; জনাব শিলাব্রত বড়ুয়া, অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি, (আরো অনেকে)।

শেষ পর্যায়ে জনাব রুহুল কুদ্দুস সাহেব (সিনিয়ার সি, এস, পি) মুজিবনগর সচিবালয়ে যোগদান করেন। কিছুদিনের মধ্যে সেক্রেটারী জেনারেল পদটি তুলে দিয়ে তাঁকে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। তখন নুরুল কাদের খান সাহেব শুধু সংস্থাপন বিভাগের সচিব থাকেন।

জোনাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যারা বিভিন্ন জোনে মুখ্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাদের প্রধান কয়েকজনের নাম হলো : জনাব ফয়েজ উদ্দিন আহমেদ, জনাব এস, এ , সামাদ, জনাব সামসুল হক, জনাব কাজি রফিকুদ্দিন, জনাব বিভুতিভূষণ বিশ্বাস, জনাব আব্দুল মোমেন, (আরও অনেকে)।

সবশেষে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি, অনেককেই মন্তব্য করতে শুনি যে, যারা মুজিবনগরে গিয়ে সরকারের চাকুরীতে নিয়োগ লাভ করেছেন তারা মহাসুখে দিন কাটিয়েছেন। কথাগুলি মোটেই সঠিক নয়। তাদের অধিকাংশই নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। তাদের না ছিল সুস্থ থাকার পরিবেশ, না ছিল আর্থিক সঙ্গতি। মন্ত্রী থেকে প্রথম শ্রেণীর অফিসার পর্যন্ত সবাইকে দেওয়া হতো সর্বমোট ৫০০ টাকা। মাসিক এলাউন্স হিসাবে। তাই দিয়ে অফিসারগণ কোনমতে তাদের পরিবারসহ থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিতেন। মন্ত্রীবর্গ ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির জন্য অবশ্য থাকা-খাওয়ার অন্য ব্যবস্থা ছিল। সবার সঠিক খবর বলা কঠিন। তবে একান্ত ব্যক্তিগত হলেও আমি বলতে চাই বাংলাদেশের রিলিফ কমিশনার হিসেবে নিয়োজিত থাকাকালীন আমি আমার এক পুত্র সমেত ৯৩/১এ বৈঠকখানা রোডে এক মেসে এক সিটে থাকতাম। মাসিক ভাড়া ৮ টাকা। কোনমতে কোলকাতার মত স্থানে নিজেকে চালিয়ে বাকি টাকা পরিবারের জন্য পাঠাতে হতো। কষ্ট করেছি কম নয়। তবু এ কথা বলবো, আমরা অনেকের চেয়েই ভালো ছিলাম। আমাদের মনে বুক ভরা আনন্দ ছিল। দেশকে স্বাধীন করবো। স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে আত্মনিয়োগ করবার সুযোগ কজনের ভাগ্যে জোটে। তাই আমরা ধন্য।

দেবব্রত দত্ত গুপ্ত

১৯৭১ সনে ২৩শে মার্চ পর্যন্ত আমি নোয়াখালি চৌমুহনী কলেজে অধ্যাপনা করেছি। ২৩শে মার্চ সন্ধ্যায় আমি তৎকালীন কিছু স্বাধীনতা সংগ্রামী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছ হতে জরুরী নির্দেশ পেয়ে কুমিল্লা শহরে চলে আসি এবং ২৫শে মার্চ স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়ার অব্যবহিত পরেই, শহর ছেড়ে কুমিল্লার মুরাদনগর থানার চুরুলিয়া গ্রামে চলে যাই। গ্রামে স্বাধীনতার স্বপক্ষে জনমত গঠন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাজ শেষ করে ১৫ই এপ্রিল '৭১-এ কুমিল্লার গ্রামাঞ্চলের বেশ কিছু সংখ্যক যুবক ও রাজনৈতিক

নেতৃবৃন্দসহ বুড়িচং থানায় নাইঘর নয়নপুর হয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বক্সনগরে গিয়ে পৌঁছাই। তারপর বক্সনগর হতে সোনামুড়া হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলাতে যাই এবং সেখানে যুদ্ধকালীন বাংলাদেশ মিশন ও প্রশাসনিক দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করি। সে সময় বাংলাদেশ সরকারের পূর্বাঞ্চলীয় বেসামরিক প্রশাসনিক দপ্তর ছিল আগরতলা কৃষ্ণনগর এলাকায় কয়েকটি বাড়িতে। অবশ্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তখন আগরতলা শহরের 'কুঞ্জবন' এলাকায় এবং ছাত্রনেতৃবৃন্দের অধিকাংশই অবস্থান করতেন আগরতলার গোলবাজারের "শ্রী ধর ভিলায়"।

যেহেতু আমি অধ্যাপনা জীবনে বাংলাদেশের ভাষা-সংস্কৃতি, জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে বিভিন্নভাবে জড়িত ছিলাম সুতরাং তৎকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক ও অন্যান্য পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ আমাকে ডঃ হাবিবুর রহমান সহ পূর্বাঞ্চলের যুব-প্রশিক্ষণ, সমন্বয় সাধন এবং পরিচালনার দায়িত্বের সাথে জড়িত থাকতে অনুরোধ করেন। আমিও এই ধরনের একটি পবিত্র সুযোগের সন্ধানেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। সুতরাং সুযোগ যখন এলো, তখন এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে সানন্দে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। সময়টা ছিল তখন ১৫ই মে ১৯৭১ ইং।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে, দেশের ভিতরে স্বাধীনতা সংগ্রাম তীব্র হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশের ছাত্র, শিক্ষক, যুবক, কৃষক রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে এবং বেঁচে থাকার তাগিদে, সীমান্ত অতিক্রম করে দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল দিয়ে, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে। বাংলাদেশের মানচিত্রের দিকে তাকালে এটা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায় যে, ভৌগোলিক দিক দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য ও বাংলাদেশের সীমান্তের অবস্থান অত্যন্ত সন্নিকটবর্তী এবং সহজগম্য। ফলে মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীগণ তুলনামূলকভাবে অন্যান্য অঞ্চল হতে এই অঞ্চল দিয়ে অতি সহজেই স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন বনাঞ্চলে এবং গ্রামে, আশ্রয় নিতে আরম্ভ করে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান, রাস্তা-ঘাটের দুর্গমতা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধা মুক্তিযোদ্ধা এবং শরণার্থীদেরকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় এই অঞ্চলে আগমন করতে উৎসাহিত করেছিল। তাই যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিত পরে অর্থাৎ ১৯৭১ সনের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় হতেই পূর্বাঞ্চলীয় বাংলাদেশ সরকার এবং তৎকালীন লিবারেশন কাউন্সিল ভারত সরকারের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনা করে শরণার্থীদের জন্য আশ্রয়শিবির স্থাপন করার সাথে সাথে বাংলাদেশের ভিতর হতে আগত বিভিন্ন পর্যায়ের অস্ত্র প্রশিক্ষণার্থী লক্ষ লক্ষ যুবকের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যুবক-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করে। এই সময় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক যুবকের জন্য তিন ধরনের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপন করা হয়েছিল। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১) অভ্যর্থনা কেন্দ্র, (Reception Camp)

২) যুব-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (Youth Training Camp)

৩) সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (Army Training Camp)

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক এবং প্রশিক্ষণার্থী বিভিন্ন শ্রেণীর যুবকদের মধ্যে যে সব যুবক সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেনি বা সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুকও নয়, সে সব যুবককে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে, যুদ্ধ চলাকালে ও পরবর্তী কালে যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশ গড়ার সৈনিক রূপে 'ভিত্তি ফৌজ' হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে, একটি স্কীম প্রণয়নের দায়িত্ব তৎকালীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল :

জনাব ডঃ হাবিবুর রহমান ওরফে ডঃ আবু ইউসুফ, জনাব মাহবুব আলম, জনাব তাহেরউদ্দীন ঠাকুর, অধ্যাপক দেবব্রত দত্তগুপ্ত।

উপরোক্ত এই কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে কাজ করেছেন ডঃ হাবিবুর রহমান। ডঃ রহমান স্বাধীনতা-পূর্ববর্তীকালে তিতাস গ্যাসের জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বাংলাদেশ সরকারের গ্যাস, ওয়েল ও মিনারেল রিসোর্সের ১৯৭৫ সন পর্যন্ত চেয়ারম্যান এবং সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। জনাব মাহবুব আলম যুদ্ধের সময় পররাষ্ট্র সচিব এবং পরবর্তী কালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ সচিব-স্বনির্ভর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জনাব ঠাকুর যুদ্ধের সময় এম, এন, এ এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন পরিচালক ছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী হিসাবে কাজ করেছেন।

যুবপ্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে পরিচালনার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর) একটি 'ইয়ুথ ট্রেনিং কন্ট্রোল বোর্ড' গঠন করেছিলেন। অধ্যাপক ইউসুফ আলী এই বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এই বোর্ডের তত্ত্বাবধানে মুজিবনগর, পূর্বাঞ্চল, (ত্রিপুরা রাজ্য কেন্দ্রিক) ও পশ্চিমাঞ্চলের (পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রিক) এই দুইটি ইয়ুথ ক্যাম্প ডাইরেক্টরেট গঠন করা হয়েছিল। তবে, এই সময়ের মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি বিভিন্ন কারণে তেমন 'শক্ত' এবং 'মজবুত' হয়ে গড়ে উঠতে পারেনি। পশ্চিম অঞ্চলের যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহের পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন জনাব আহমদ রেজা।

ইয়ুথ ট্রেনিং ক্যাম্পগুলো দৈনন্দিন কাজ সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্যে নিম্নে উল্লিখিত

পদগুলো সৃষ্টি করা হয়েছিল।

ক্যাম্প প্রধান (১) উপ-ক্যাম্পপ্রধান (১) ক্যাম্প তত্ত্বাবধায়ক (২) ছাত্র-প্রতিনিধি (২) স্বাস্থ্য-অফিসার(২) পলিটিকাল মটিভেটর (৪) ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকটর (৪)।

তাছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ে ইয়ুথ ক্যাম্প ডাইরেকটরেট যে সব ব্যক্তিকে নিয়ে গঠন করা হয়েছিল, তাঁদের নামও এখানে উল্লেখ করা হলো :

সর্বশ্রী জনাব মাহবুব আলম, প্রকল্প সমন্বয়কারী; ডঃ হাবিবুর রহমান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ); অধ্যাপক নুরুল ইসলাম চৌধুরী, এম, এন, এ; জনাব মুজাফফার আহমদ, এম, পি, এ; জনাব খালেদ মুহাম্মদ আলী, এম, এন, এ; জনাব বজলুর রহমান, রাজনৈতিক নেতা; অধ্যাপক দেবব্রত দত্তগুপ্ত, উপ-পরিচালক এবং প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী; জনাব মোশারফ হোসেন, হিসাব-রক্ষণ অফিসার।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, উপরোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা ব্যবস্থা ও আনুষঙ্গিক নীতি-পদ্ধতির মধ্যে পরবর্তীকালে কিছুটা পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করা হয়েছিল। কিন্তু সে সব পরিবর্তন তেমন উল্লেখযোগ্য নয় বলে এখানে উল্লেখ করা হলো না।

১। অভ্যর্থনা কেন্দ্র (Reception camp)

স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন নদী, নালা, খাল-বিল সহ দূর্গম রাস্তা-ঘাট পায়ে হেঁটে ও নৌকাযোগে অতিক্রম করে ক্লান্ত, শ্রান্ত ও অবসন্ন অবস্থায় যখন হাজার হাজার যুবক ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করতো, তখন এই সমস্ত রিসেপশন ক্যাম্পের মধ্যে যুবকদেরকে সাত দিনের জন্য ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হতো। এই সময় যুবকেরা বিশ্রাম, খাওয়া, সাধারণ পোশাক, চিকিৎসা ও নিরাপত্তার সুযোগ লাভ করতো। এই সব ক্যাম্পের পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়-দায়িত্ব সাধারণ বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের উপরই ন্যস্ত ছিল। তবে, অধিকাংশ দেশেই বাংলাদেশের পক্ষ হতে একজন এম, পি,এ/এম, এন, এ-কে ক্যাম্প প্রধান/উপ-প্রধান হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হতো।

২। যুব-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (Youth Training camp)

অভ্যর্থনা কেন্দ্রগুলোতে সাতদিনের বিশ্রাম, খাওয়া ও চিকিৎসার পর একটি সুনির্দিষ্ট প্রোফর্মার মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানে ইচ্ছুক যুবকদেরকে পঁয়তাল্লিশ দিনের প্রশিক্ষণের জন্য বাছাই করে, যুবপ্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে ভর্তি করা হতো। যুবপ্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে সাধারণত তিন ধরণের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। এই প্রশিক্ষণ কোর্সগুলো নিম্নরূপ ছিল :

ক। পলিটিক্যাল মটিভেশন (Political Motivation)

এই ধরনের প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল, যুদ্ধে অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক যুবকদেরকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলা এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদ, বাঙালী সংস্কৃতি ও

বাংলাদেশের স্বাধীনতার গুরত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করা।

খ। উৎপাদন ও উন্নয়নমূলক কাজে প্রশিক্ষণ (Base work Training)

এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল, স্থানীয় সম্পদ, শক্তি ও সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থাপনাসহ উৎপাদন এবং উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডে দেশের যুবশক্তি কি ভূমিকা পালন করতে পারে, সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দান করা। তাছাড়া, এই স্বাধীনতা সংগ্রাম যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে যাতে বাঙালী একটি জাতি হিসাবে টিঁকে থাকার জন্য নিজস্ব সম্পদ, শক্তি, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, নেতৃত্ব, কর্মপ্রচেষ্টা ও কঠোর শ্রমের দ্বারা আপাতত শহুরে অর্থনীতি বাদ দিয়ে (যেহেতু শহরগুলো শত্রুদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল) নিজেরাই নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বাবলম্বী হয়ে বেঁচে থাকার দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে উপযুক্ত করে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়, সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়াও এই ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

গ। হালকা অস্ত্রের প্রশিক্ষণ (Light arms Training)

এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল, এই প্রশিক্ষণার্থী যুবকদেরকে পি, টি, করানো, 'গ্রেনেড' নিক্ষেপ, দেশের ভিতরে শত্রুদের যাতায়াতে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে 'মাইন' পোঁতা, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী 'গেরিলা' সহ বিভিন্ন পর্যায়ের সংগ্রামী যুবক, সৈনিক, পুলিশ, আনসার ও অন্যান্য পর্যায়ের লোকদের সাথে গোপন এবং প্রয়োজনীয় যোগাযোগসহ তত্ত্ব এবং তথ্য সরবরাহের কাজে (রেকি এবং ওপি করা) সহযোগিতা করা ইত্যাদি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল একটা জনযুদ্ধ। সুতরাং এই জনযুদ্ধের প্রধান শক্তির উৎস ছিল দেশের আপামর সাধারণ মানুষ। যেহেতু এই স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা বিভিন্ন কারণে গেরিলা পদ্ধতির যুদ্ধকেই বেছে নিয়েছিলাম সুতরাং এই যুদ্ধে দেশের জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া জয়লাভ করা কোন অবস্থাতেই সম্ভবপর ছিল না। কারণ, জনতা হলো 'পানি' এবং গেরিলারা হলো 'মাছ' সুতরাং পানি দূষিত হলে যেমন মাছ বেঁচে থাকতে পারে না, তেমনি জনতার সহযোগিতা না পেলেও 'গেরিলা' পদ্ধতির জনযুদ্ধ কোন অবস্থাতেই সাফল্যমণ্ডিত হয় না। আমাদের পরম সৌভাগ্য এই যে, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দেশের সাধারণ মানুষ, যে কোন মূল্যের বিনিময়ে নিজেদের গেরিলারূপী দামাল ছেলেদেরকে আশ্রয়, প্রশ্রয়, খাদ্য ও বিভিন্নমুখী সহযোগিতা প্রদান করতে কখনও কুণ্ঠাবোধ করেনি। সুতরাং দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সবচেয়ে বড়ো শক্তি ও সম্পদ ছিল এই দেশের সাধারণ মানুষ।

ভিত্তি ফৌজ (V.F) এবং যুব প্রশিক্ষণ

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়, দেশের ভিতর হতে লক্ষ লক্ষ ছাত্র যুবক ও

কৃষকেরা যখন প্রয়োজনীয় অস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশগ্রহণ করার জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোতে উপস্থিত হচ্ছিল, তখন বিভিন্ন যুক্তিসঙ্গত কারণেই শিবিরে অবস্থানকারী সব শ্রেণীর লোকদেরকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। তাছাড়া বিদেশ থেকে যেমন এক বিপুল সংখ্যক অস্ত্রপ্রার্থীর জন্য তাদের ইচ্ছানুযায়ী প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ছিল, তেমনি Arms without command and control- অত্যন্ত বিপদজনক পরিস্থিতি এবং ঘটনার সৃষ্টি করতে পারে, এই ধারণায় ভাবান্বিত হয়ে সবাইকে 'অস্ত্র' প্রশিক্ষণ না দেওয়ারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, যেহেতু আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রাথমিক পর্যায়ে গেরিলা পদ্ধতির ছিল সুতরাং কোনো অবস্থাতেই Conventional army-র সাথে সরাসরি মোকাবিলা করা যুদ্ধ-বিজ্ঞানসম্মত হত না। দ্বিতীয়ত, একটি যুবককে হালকা (লাইট) এবং মাঝারি ধরনের অস্ত্র পরিচালনায় প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করতে হলে কমপক্ষে ছ'মাস সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু তৎকালীন পরিবেশ এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী সব যুবককে অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য এতো সময় দেওয়া আমাদের পক্ষে কোনো অবস্থাতেই সম্ভবপর ছিল না। তাছাড়া এখানে উল্লিখিত এই সব সমস্যা ব্যাতীত তৎকালে অন্যান্য বহুবিধ রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও আদর্শগত সমস্যা এবং কারণ ছিল, যার জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে অবস্থানকারী সব মানুষকে 'অস্ত্র' প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করা তৎকালীন নেতৃবৃন্দ এবং কর্মকর্তাগণ প্রয়োজন মনে করেননি। সুতরাং 'অভ্যর্থনা শিবির' হতে যে সমস্ত যুবককে ৪৫ দিনের প্রশিক্ষণের জন্য যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রিক্রুট করা হত, সে সব যুবকের মাঝ থেকে একমাত্র তাদেরকেই 'সামরিক' প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের বিভিন্ন সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রেরণ করা হত, যাদের শিক্ষাসহ শারীরিক, মানবিক ও প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক যোগ্যতা ছিল। এই পদ্ধতি ও ব্যবস্থার ফলে যুব-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর যে হাজার হাজার যুবকদের সরাসরি সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হত না, সে সব যুবকদের উপরে উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণ দিয়ে 'ভিত্তি ফৌজ' (সামরিক ও অর্থনৈতিক কর্মী) হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হত। এখানে 'ভিত্তি' বলতে মাটিকে এবং 'ফৌজ' বলতে সামাজিক চেতনাসম্পন্ন এবং উৎপাদন, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সমাজের সার্বিক কল্যাণে কাজে নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের বুঝানো হয়েছে। তৎকালে ভিত্তি ফৌজকে দেশের ভিতরে ও বাইরে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করার জন্যে যে আইডেন্টিটি কার্ড দেওয়া হত, তার একটি নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

বিপদ আশঙ্কায় নষ্ট করো
বাংলাদেশ ভিত্তি-ফৌজ বাহিনী নির্দেশপত্র

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নাম .... বয়স .... পিতা .... গ্রাম .... থানা .... জিলা .... কে বাংলাদেশ ভিত্তি-ফৌজবাহিনীর .... নং স্বেচ্ছাসেবক কর্মী হিসেবে গ্রহণ করা হল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অপর নির্দেশ অনুসারে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে স্বাবলম্বী-কর্মশৃঙ্খলার ভিত্তিতে এবং পঞ্চায়েতী শাসনের মাধ্যমে মুক্তিকামী জীবনযাপন (ও) সমাজ শৃঙ্খলার দুর্গ গঠনের প্রশিক্ষণ নির্দেশ এই কর্মীকে দেওয়া হল।

বাংলাদেশ মুক্তিপরিষদের পক্ষ হইতে

স্বাক্ষর ....

তারিখ ....

মোহর

যুব অভ্যর্থনা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর নাম ও স্থান

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর নাম	স্থান
১। ইছামতী ওয়াই/টি	দুর্গা চৌধুরী পাড়া অঞ্চল
২। একীনপুর ওয়াই/টি	ঐ
৩। বিলুনিয়া ওয়াই/টি	বিলুনিয়া মহকুমা
৪। সাবরুম ওয়াই/টি	সাবরুম
৫। সোনার বাংলা ওয়াই/টি	হাঁপানিয়া
৬। মড়াটিলা ওয়াই/টি	ঐ
৭। মাছিমা ওয়াই/টি	দুর্গাচৌধুরী পাড়া অঞ্চল
	সোনামুড়া মহকুমা
৮। বঙ্গবন্ধু ওয়াই/টি	হাঁপানিয়া
৯। কাঁঠালিয়া ওয়াই/টি	সোনামুড়া মহকুমা
১০। বঙ্গ শার্দুল ওয়াই/টি	হাঁপানিয়া
১১। কৈলাশহর ওয়াই/টি	কৈলাশপুর মহকুমা
১২। রাজনগর ওয়াই/টি	উদয়পুর মহকুমা
১৩ । যমুনা ওয়াই/টি	হাঁপানিয়া

১৪। বড়মুড়া ওয়াই/টি	সোনামুড়া মহকুমা
১৫। হাতিমারা ওয়াই/টি	ঐ
১৬। গোমতী ওয়াই/টি	দুর্গা চৌধুরী পাড়া
১৭। পালাটোনা ওয়াই/টি	উদয়পুর মহকুমা
১৮। শ্রীনগর ওয়াই/টি	বিলুনিয়া মহকুমা
১৯। শীলছড়া ওয়াই/টি	সাবরুম মহকুমা
২০। সোনাক্ষীরা ওয়াই/টি	করিমগঞ্জ মহকুমা
২১। হারিমা ওয়াই/টি	বেলুনিয়া মহকুমা
২২। বক্সনগর ওয়াই/টি	সোনামুড়া মহকুমা
২৩। তিতাস ওয়াই/টি	হাঁপানিয়া
২৪। বিজনা ওয়াই/টি	দুর্গা চৌধুরী পাড়া অঞ্চল
২৫। ব্রহ্মপুত্র ওয়াই/টি	ঐ
২৬। গোমতী ওয়াই/টি	ঐ
২৭। চড়াই লাল ওয়াই/টি	উদয়পুর মহকুমা
২৮। গোকুলনগর ওয়াই/টি	সদর মহকুমা
২৯। ১নং মিলিটারি হোল্ডিং ক্যাম্প	দুর্গা চৌধুরী পাড়া
৩০। ২নং মিলিটারি হোল্ডিং ক্যাম্প	ঐ
৩১। ৩নং মিলিটারি হোল্ডিং ক্যাম্প	ঐ

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সাথে সরাসরি জড়িত এম. পি. ও এম. এন. এদের নাম :

ক্রমিক ক্যাম্পের নাম **দায়িত্বপ্রাপ্ত এম. পি. এ এবং এম এন এ-দের নাম**	**স্থানের নাম**
১। গোমতী-২ জনাব আমির হোসেন, এম পি এ	দুর্গা চৌধুরী পাড়া
২। বিজনা জনাব সৈয়দ এমদাদুল বারী, এম পি এ	ঐ
৩। ইচ্ছামতী জনাব জামালউদ্দিন আহমেদ, এম পি এ	ঐ
৪। ব্রহ্মপুত্র জনাব আফতাব উদ্দিন ভুঁইয়া, এম এন এ	হাঁপানিয়া

৫। তিতাস	হাঁপানিয়া
জনাব কাজী আকবর উদ্দিন, এম পি এ	
৬। গোমতী-১	ঐ
জনাব আলী আজম, এম এন এ	
৭। মুনা	ঐ
জনাব সফিউদ্দিন, এম পি এ	
৮। সোনার বাংলা	ঐ
জনাব শামসুল হুদা, এম এন এ	
৯। বঙ্গ শার্দুল	ঐ
জনাব দেওয়ান আবুল আব্বাস, এম পি এ	
১০। এম. এ আজিজ	হরিনা
জনাব মির্জা আবুল মনসুর, এম পি এ	
১১। হরিনা ওয়াই/সি	ঐ
জনাব এম এ হান্নান, সাধারণ সম্পাদক চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ	
১২। পালাটোনা	উদয়পুর
ক্যাপ্টেন মুহম্মদ সুজাত আলী, এম এন এ	
১৩। রাজনগর	রাজনগর
অধ্যাপক এ হানিফ, এম এন এ	
১৪। বড়মুড়া	কাঁঠালিয়া
জনাব জালাল উদ্দিন আহমেন, এ পি এ	
১৫। চড়ুইলাম- ১	চড়ুইলাম
জনাব সাখাওয়াত উল্লাহ, এ পি এ	
১৬। চড়ুইলাম- ২	চড়ুইলাম
জনাব ওয়ালিউল্লাহ নওজোয়ান, এ পি এ	
১৭। পদ্মা	গোকুল নগর
জনাব এস হক, এ পি এ	
১৮। কৈলাশহর	কৈলাশপুর
জনাব তৈবুর রহিম, এ পি এ	
১৯। আশারামবাড়ি	খোয়াই
জনাব মোস্তাফা শহিদ, এ পি এ	
২০। ধর্মনগর	ধর্মনগর

জনাব তাইমুজ আলী, এ পি এ

২১। এম. এ আজিজ ওয়াই/সি-২	হরিনা
জনাব মোশাররফ হোসেন, এ পি এ	
২২। চোতাখোলা	বিলোনিয়া
জনাব এ বি এম তালেব আলী, এ পি এ	
২৩। মিলিটারী হোল্ডিং ক্যাম্প	ডি, সি, পাড়া
জনাব সিরাজুল ইসলাম, এ পি এ	
২৪। কাঁঠালিয়া	কাঁঠালিয়া
জনাব আলহাজ আলী আকবর, এ পি এ	
২৫। একিনপুর	একিনপুর
জনাব মোঃ আঃ সোবহান, এ পি এ	
২৬। পালাটোনা- ২	উদয়পুর
জনাব আব্দুল্লাহ আলহরুন, এ পি এ	
২৭। মনু	খোয়ায়
জনাব মোঃ ইলিয়াস, এ পি এ	
২৮। বাগাফা	বিলোনিয়া
জনাব আবু নাসের চৌধুরী, এম পি এ	

প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলোতে ব্যবহৃত 'ছদ্মনামের' তালিকা :

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে, বিশেষত অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে, এই যুব-প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলোর মধ্যে কয়েকটির নাম, অবস্থান, কর্মতৎপরতা এবং আনুষঙ্গিক ঘটনাবলি খবরাখবর কিছুটা শত্রুপক্ষের গোচরীভূত হয়ে পড়ে। ফলে কিছু সংখ্যক যুব-প্রশিক্ষণকেন্দ্রকে 'ছদ্মনাম' ধারণ করতে হয়। নিম্নে যেসব যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে 'ছদ্মনাম' ধারণ করতে হয়েছিল, সেগুলোর নাম উল্লেখ করা হল :

নতুন নাম	**পুরাতন নাম**
ক্রমিক	
১। পদ্মা	চড়ু ইলাম
ক্রিকেট	
২। মেঘনা	ঐ

গলফ

৩। গঙ্গা — গোকুলনগর

টেনিস

৪। যমুনা — ঐ

হকি

৫। মুহুড়ি — হরিনা

ফুটবল

৬। তিস্তা — বিজনা

পোলো

৭। কল্যাণপুর — খোয়াই

সুইমিং

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সাথে ভারতীয় সেনাবাহিনীর যেসব কর্মকর্তা সরাসরিভাবে জড়িত ছিলেন তাঁদের নাম

ব্রিগেডিয়ার মাস্টার— সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং সহযোগিতা; ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিং— সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং সহযোগিতা; মেজর সুব্রামনিয়াম— সহকারী পরিচালক, সেন্ট্রাল রিলিফ; ক্যাপ্টেন বিভুরঞ্জন চ্যাটার্জী— চড়ুইলাম যুব-প্রশিক্ষণকেন্দ্র; মেজর মিত্র— তত্ত্বাবধায়ক; ক্যাপ্টেন ডি পি ধর— কল্যাণপুর যুব প্রশিক্ষণকেন্দ্র; ক্যাপ্টেন আর পি সিংহ— গোকুলনগর যুব-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; ক্যাপ্টেন এস কে শর্মা— চড়ুইলাম যুব-প্রশিক্ষণকেন্দ্র; ক্যাপ্টেন ডি এস মঈনী- বাগাফা যুব প্রশিক্ষণকেন্দ্র; ক্যাপ্টেন জি এস রাওয়াত— গোকুলনগর যুব-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; ক্যাপ্টেন নাগ— চোতাখোলা যুব প্রশিক্ষণকেন্দ্র।

যুব-প্রশিক্ষণকেন্দ্রের সাথে জড়িত ভারত সরকারের বেসামরিক প্রতিনিধির নাম :

ড. শ্রী ত্রিগুণা সেন, শিক্ষামন্ত্রী (ভারত); শ্রী শচীন্দ্রলাল সিং, মুখ্যমন্ত্রী (ত্রিপুরা রাজ্য); শ্রী কে পি দত্ত, পরিচালক, শিক্ষাদপ্তর (ত্রিপুরা রাজ্য); শ্রী মনুভাই বিমানী, বাংলাদেশ অ্যাসিস্টেন্স কমিটি (ভারত)।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে এক সাথে সাধারণত পাঁচ শত থেকে আড়াই হাজার পর্যন্ত

যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই সময় বিভিন্ন অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও সর্বমোট প্রায় এক লক্ষ যুবককে প্রাথমিকভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু এদের মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ হাজার যুবককে 'ভিত্তি ফৌজের' উপযোগী করে, বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অবশিষ্ট যুবকদের প্রয়োজনীয় সময়, অর্থ, সম্পদ ও উপকরণের অভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়নি।

যুব-প্রশিক্ষণকেন্দ্রের সাথে জড়িত বাংলাদেশের সামরিক কর্মকর্তারদের নাম :

ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম— ১ নং সেক্টর; ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম— ১ নং সেক্টর; মেজর আবদুল মতিন— ১ নং সেক্টর; মেজর খালেদ মোশাররফ— ২ নং সেক্টর; মেজর সফিউল্লাহ— ৩ নং সেক্টর; ক্যাপ্টে ন নুরুজ্জামান— ৩ নং সেক্টর; মেজর সি আর দত্ত— ৪নং সেক্টর।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সাথে জড়িত ছাত্র ও যুব নেতৃবৃন্দ :

জনাব আ, স, ম, আব্দুর রব, প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়ন; জনাব শেখ ফজলুল হক মণি, তৎকালীন যুব-নেতা; জনাব আবদুল কুদ্দুস মাখন, প্রাক্তন যুব ও ছাত্রনেতা; জনাব নূরে আলম সিদ্দিকি, প্রাক্তন যুব ও ছাত্রনেতা; জনাব সৈয়দ রেজাউর রহমান, ছাত্রনেতা, কুমিল্লা; জনাব মইনুল হুদা, ছাত্রনেতা, কুমিল্লা; শহীদ স্বপন কুমার চৌধুরী, যুব-ছাত্রনেতা; জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, ছাত্রনেতা, নোয়াখালি।

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত বাংলাদেশের ব্যক্তিবর্গের নাম :

জনাব জহুর আহমেদ চৌধুরী, এম এন এ (চট্টগ্রাম); অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, এম এন এ (চট্টগ্রাম); অধ্যাপক ইউসুফ আলী, এম এন এ (দিনাজপুর), যুব-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর পরিচালক মণ্ডলীর সভাপতি; অধ্যাপক খোরশেদ আলম, এম এন এ (কুমিল্লা) ; অধ্যক্ষ আবুল কালাম মজুমদার, এম এন এ (কুমিল্লা); জনাব আহমদ আলী, এম এন এ (নোয়াখালি); জনাব নুরুল হক, এম এন এ (নোয়াখালি); জনাব খালেদ মোহাম্মদ আলী, এম এন এ (নোয়াখালি); জনাব লুৎফুল হাই সাচ্চু, এম পি এ, (ব্রাহ্মণবাড়িয়া); জনাব আলী আজম, এম এন এ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া); জনাব মুহাম্মদ রাজা মিয়া, এম পি এ (কুমিল্লা), জনাব মুহাম্মদ আউয়াল, এম এন এ (কুমিল্লা) জনাব হাজী আবুল হাসেম এম

পি এ (কুমিল্লা); জনাব আবদুর রউফ, রাজনৈতিক নেতা (কুমিল্লা); জনাব মুহাম্মদ আফজাল খান, রাজনৈতিক নেতা (কুমিল্লা); জনাব কাজী জহিরুল কাইয়ুম, এম এন এ (কুমিল্লা); ফ্লাইট লেফটেনান্ট এ বি সিদ্দিকি, এম পি এ (কুমিল্লা); জনাব খাজা আহমদ, এম এন এ (নোয়াখালি); জনাব আবদুল মালেক উকিল, এম এন এ (নোয়াখালি); জনাব আবদুল করিম ব্যাপারি, (মুন্সিগঞ্জ); এ্যাডভোকেট হামিদুর রহমান, রাজনৈতিক নেতা, (ব্রাহ্মণবাড়িয়া); কর্নেল আবদুর রব (পরে তিনি জেনারেল হয়েছেন); জনাব এইচ টি ইমাম, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, (রাঙামাটি); জনাব রকিব উদ্দিন আহমদ প্রাক্তন এস ডি ও (ব্রাহ্মণবাড়িয়া); জনাব এম আর সিদ্দিকি, এম এন এ (চট্টগ্রাম); জনাব সাইদুর রহমান, সমাজকর্মী (কুমিল্লা) জনাব আবু মিয়া সমাজকর্মী, পেনরমা (কুমিল্লা) শ্রী রাখাল ভট্টাচার্য, সরকারি কর্মচারী, বাংলাদেশ সরকার; ডঃ আবদুস সাত্তার; এম পি এ; জনাব জাবেদ আলী মোক্তার (চাঁদপুর) ; জনাব মকবুল আহমদ অ্যাডভোকেট (চাঁদপুর) জনাব মীর হোসেন চৌধুরী (কুমিল্লা) জনাব আমীর হোসেন এম পি এ (কুমিল্লা); জনাব বিস্‌মিল্লাহ্ মিঞা এম, পি, এ (নোয়াখালি) জনাব শহীদ উদ্দীন ইস্কান্দার এম, পি, এ (নোয়াখালি); জনাব জালাল আহমেদ এম পি এ (কুমিল্লা); অধ্যাপক মোঃ খালেদ এম পি এ, (চট্টগ্রাম) ক্যাপ্টেন আবুল কাশেম এম পি এ, (চট্টগ্রাম) জনাব মির্জা আবুল মনসুর এম পি এ (চট্টগ্রাম); জনাব আব্দুল রশিদ ইঞ্জিনিয়ার এম পি এ; ড. এ কে হাসান, আঞ্চলিক প্রশাসক, মুজিবনগর; জনাব মোশারফ হোসেন চৌধুরী, উপপরিচালক (অ্যাকাউস) জনাব গোলাম রফিক (শিল্প), জনাব শহিদ কাদরী, প্রোগ্রাম অফিসার, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; জনাব আনোয়ার হোসেন স্টাফ অফিসার, যুব-প্রশিক্ষণকেন্দ্র; জনাব মুকতুল হোসেন, পিয়ন, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; জনাব শাহাব উদ্দিন, ড্রাইভার, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; জনাব অজিত কুমার নন্দী, হিসাব-রক্ষক, যুব-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; জনাব সঞ্জীবকুমার রায়, স্টেনোগ্রাফার যুব প্রশিক্ষণকেন্দ্র; জনাব গাজি গোলাম মোস্তাফা, রাজনৈতিক নেতা; শ্রী সুখলাল সাহা (পলিটিক্যাল মটিভেটর) জনাব আজিজুল হক, সমাজকর্মী (কসবা); জনাব অহিদ মিঞা, ড্রাইভার; অধ্যক্ষ আবু আহমেদ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া); জনাব কুতুবুর রহমান ছাত্রনেতা।

আমাদের দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ বিভিন্ন কারণে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের মাটি থেকে আরম্ভ করা এবং সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহেরও অত্যন্ত অভাব ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও বীর বাঙালীরা এবং তাদের অকুতোভয় সন্তানেরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণকেন্দ্রে সামান্য কয়েকদিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশের আপামর জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ও প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় যেভাবে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেছে তা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ ঘটনা। সুতরাং বাঙালী জাতির এই ত্যাগ-তিতিক্ষা ও শ্রমের তাৎপর্যকে বেঁচে থাকা

দেশের অবশিষ্ট মানুষগুলো গভীর ভাবে উপলব্ধি করুক ইহাই বোধ হয় শহীদ দানের আত্মার একমাত্র আকুতি।

মণি সিং

নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত আমি কারাগারে বন্দী ছিলাম। দীর্ঘদিন আত্মগোপনে থেকে কাজ করার পর ১৯৬৭ সালে আমি গ্রেপ্তার হই এবং ১৯৬৯ সালে মহান গণঅভ্যুত্থানের সময়ে জনগণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আমার এবং অন্যান্য রাজবন্দীদের মুক্তির দাবি দেশের আনাচে-কানাচে ধ্বনিত করে তোলে, সেই পটভূমিতে ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা মুক্তি পাই। কিন্তু সামরিক শাসন জারী ও ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসার পর ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে আমাকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর রাজবন্দীরা রাজশাহী জেল ভেঙে আমাকে বের করে নেওয়ার আগে পর্যন্ত আমি আটক ছিলাম। কাজেই উল্লিখিত সময়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে পার্টি ও জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামের সরাসরি যোগ দিতে পারিনি। তবে আমাদের পার্টির তখনকার ভূমিকা, যা আমার জানা আছে, সেটা সংক্ষেপে বলছি।

১৯৭০ সালে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের বিশ্লেষণ ও পরিস্থিতি মূল্যায়ন আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে করা হয়। আমরা নির্বাচনের ফলাফলকে পূর্ব বাংলার জনগণের ঐক্যবদ্ধ অভ্যুত্থান এবং একটি আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ রূপে দেখি। আমাদের বিশ্লেষণে বলা হয়েছিল যে, নির্বাচনে আওয়ামি লীগের ৬ দফার পক্ষে রায়ের মধ্যে দিয়ে বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ লাভ করেছে এবং বাঙালী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের পার্টি নীতিগতভাবেই সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠাকে ন্যায্য মনে করে এবং প্রকৃতপক্ষে আমাদের পার্টি প্রথম বাংলাদেশের জনগণের পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি ধ্বনিত করে।

নির্বাচনের ফলাফল মূল্যায়ন করে আমরা আরও দেখিয়েছিলাম আওয়ামী লীগ কেবল "পূর্ব পাকিস্তানের" জনগণেরই সর্বাত্মক সমর্থন পায়নি, তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে গোটা পাকিস্তানের সরকার গঠনের অধিকারও লাভ করেছে। কিন্তু আমরা মূল্যায়নে বলেছিলাম যে, পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি এবং শাসকদের মদতকারী সাম্রাজ্যবাদ কিছুতেই নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেবেন না। এবং তা বানচাল করবার জন্য ষড়যন্ত্র করবে। বিশেষত ৬ দফার সঙ্গে ছাত্রসমাজের ১১ দফাও তখন জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল এবং বিজয়ী
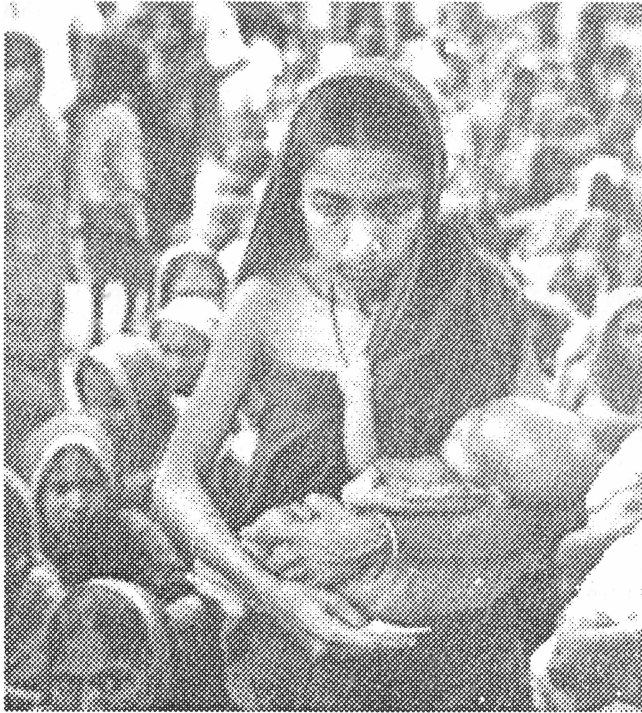
শরনার্থী শিবির, কলকাতা

কবে শেষ হবে যুদ্ধ?

সারেন্ডার, রেসক্রস ময়দান (রমনা), ঢাকা

১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ ঢাকায় পাকবাহিনীর সারেন্ডার

১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ ঢাকায় পাকবাহিনীর সারেন্ডার
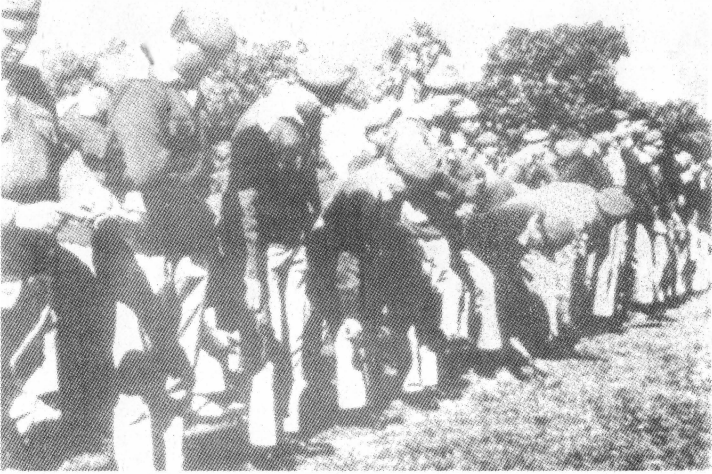
পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর অস্ত্র সর্মপণ

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ দিল্লী বিমানবন্দরে স্বদেশে ফেরার পথে
বঙ্গবন্ধু কর্মদন করছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে

দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১১ দফাকে সমার্থন দিয়েছিলেন। ১১ দফায় সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা হয়েছিল, ফলে তারা ঐ নির্বাচনের দাবী কিছুতেই মানতে পারে না। এই কারণেই পাকিস্তানী আওয়ামী লীগের সরকার গঠন ছিল অনিশ্চিত এবং এমত অবস্থায় বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হবে এবং সেই সংগ্রামের জন্য জনগণকে প্রস্তুত করা দরকার।

১৯৭০ সালের নির্বাচন সম্পর্কে আমাদের পার্টির এই বিশ্লেষণ পরবর্তী ঘটনাগুলিতে সঠিক বলেই প্রমাণিত হয়। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ নির্বাচনের ফলাফল বানচালের জন্য পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী এবং ভুট্টো প্রমুখের ষড়যন্ত্র পরিষ্কার হয়ে ওঠে এবং জাতীয় সংসদের যে অধিবেশন প্রেসিডেন্ট ইয়হিয়া খানের ঘোষণা অনুযায়ী ৩রা মার্চ হওয়ার কথা ছিল তা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ঐ সময় ২৫শে ফেব্রুয়ারী আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এক প্রস্তাবে রাজনৈতিক দাবী হিসাবে ঘোষণা মোতাবেক জাতীয় সংযদের অধিবেশন, সেখানে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি, সম্মিলিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ঐ শাসনতন্ত্র অনুমোদন ও ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবী উত্থাপন করে। সেই সঙ্গে ঐ প্রস্তাবে বলা হয় যে নির্বাচনের রায়কে কার্যকরী করতে না দেওয়া হলে বাংলাদেশের জনগণের আন্দোলন একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দিকে যেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য হবে বাঙালীদের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি অনুসারে ঐ সংগ্রামে শরিক থাকা এবং ঐ নীতি অনুসারে সমস্ত গণতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে এই সংগ্রামকে সঠিক পথে চালিত করতে চেষ্টা করা।

পয়লা মার্চ, ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় সংসদের অধিবেশন হবে না— এই ঘোষণার মধ্যে দিয়ে আমরা শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র কার্যকর হতে দেখলাম। ঐ দিন জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে স্বাধীনতার আওয়াজ তুলল। পরিস্থিতির সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন ছিল যে, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাঙালী জাতির এই অভ্যুত্থান দমন করার জন্য সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগ করবে এবং স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজন হবে। সেজন্য জনগণকে প্রস্তুত করা দরকার।

এ ছিল পরিস্থিতির সম্পর্কে আমাদের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ। কিন্তু এটা করেই আমরা বসে থাকিনি। আমাদের পার্টি বেআইনি এবং আত্মগোপনে ছিল। ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি গণসংগঠনের মাধ্যমে এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে আমাদের যতটুকু যোগাযোগ এবং সম্পর্ক ছিল তা কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রচারকার্য চালিয়েছি। পার্টির নাম উল্লেখ না করে আমরা **একতা** নামে যে সাপ্তহিক পত্রিকা প্রকাশের সুযোগ গ্রহণ করেছিলাম তার মাধ্যমে আমরা দেশপ্রেমিক শক্তি ও জনগণকে প্রস্তুত করার জন্য প্রচার চালিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আমরা

সম্ভাব্য স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সাধ্যমতো আমাদের পার্টি ও জনগণকে প্রস্তুত করে তুলছিলাম।

পয়লা মার্চের পর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সের জন সমাবেশ থেকে এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার ও মুক্তির সংগ্রাম বলে ঘোষণা দিয়ে যে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন, আমরা তার পুরোপুরি সমর্থক ছিলাম। ইয়াহিয়া খান যখন ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় বসেন, তখন আলোচনার বিরোধীতাকে আমরা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করিনি। কিন্তু আমাদের পার্টির মূল্যায়ন ছিল যে ঐ আলোচনায় কোন আপসরফা হবে না, কেননা জনগণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে এবং পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী এবং সাম্রাজ্যবাদীরা এটা মনে করে নিতে পারে না। আমাদের পার্টি তখন জনগণের সচেতনতা জাগরুক রাখার জন্য এবং আসন্ন যে কোন ধরনের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য জনগণকে মানসিক ভাবে প্রস্তুত করতে ঢাকা সহ সম্ভব মতো দেশের সব জায়গায় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠন, তাদের কুচকাওয়াজ ও ট্রেনিং ইত্যাদির ব্যবস্থা করে। তখন ছাত্রসমাজের শক্তিশালী প্রগতিশীল সংগঠন পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের আমাদের পার্টির প্রভাব থাকায় তাদের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউ ও টি সি সহায়তায় তরুণ-তরুণীদের রাইফেল ট্রেনিং ও কুচকাওয়াজে আয়োজন করা হয়েছিল। ডেমরা এলাকায় কিছু সংখ্যকশ্রমিককেও আমরা স্বেচ্ছাসেবক করে এ- ধরনের ট্রেনিং- এ যুক্ত করেছিলাম। এসব কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে দেখিয়ে উদ্বুদ্ধ ও তাদের মনোবল বৃদ্ধি করা এবং সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে মানসিক ভাবে সচেতন ও প্রস্তুত করে তোলা। এক কথায় ঐ সময়টাতে আমাদের পার্টির ভূমিকা ছিল অবশ্যম্ভাবী স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সাধ্যমতো সকল দেশপ্রেমিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ, জনগণকে সচেতন ও প্রস্তুত করে তোলা। আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ২৫শে মার্চের আগেই বুঝতে পেরেছিল যে, অবস্থা ক্রমেই স্বশস্ত্র সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ করা যায় যে, ৯ই মার্চ ঢাকায় উপস্থিত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের এক বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সশস্ত্র সংগ্রামের যথাসম্ভব প্রস্তুতির জন্য একটি সার্কুলার প্রচার করা হয়েছিল তবে তখনকার পরিস্থিতিতে কোন কোন জেলায় সার্কুলারটি বিলম্বে পৌঁছে এবং পার্টির তখনকার শক্তিসামর্থ সশস্ত্র সংগ্রামের ব্যাপক প্রস্তুতির উপযুক্তও ছিল না। সে পরিস্থিতিতে ২৫শে মার্চ জনগণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ শুরু হয়।

সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ছিল এই যে, জনগণ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে এবং বিশেষত সমগ্র পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন, পশ্চিম পাকিস্তানের ভুট্টোর দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন এবং বাঙালীদের জাতীয় অধিকারের দাবীর সঙ্গে ১১ দফায় সাম্রাজ্যবাদ- সামন্তবাদ-একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হওয়ায় পাকিস্তানের একটা সরকার গঠন এবং

বাঙালীদের দ্বারাই শাসিত হওয়ায় অবস্থা পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদ কিছুতেই মেনে নেবে না। কাজেই বাঙালীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম অনিবার্য এবং তা সশস্ত্র সংগ্রামের পথে যাবে। সেজন্য জণগণকে ঐক্যবদ্ধ ও প্রস্তুত করাই মুখ্য কাজ এবং তা দ্রুত, খুব দ্রুত করতে হবে।

সামগ্রিক অবস্থা মূল্যায়নের আর একটি দিক আমাদের পার্টির ছিল। তা হচ্ছে, আমরা সচেতন ছিলাম যে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কতকগুলি দুর্বলতা থাকবে। মধ্যস্তরে জনগণের যে দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল তাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ও তার বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের প্রয়োজনীতা সম্পর্কে চেতনার ঘাটতি ছিল। এবং শ্রমিক-কৃষক মেহনতি মানুষের সংগঠন শক্তি ছিল দূর্বল। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আওয়ামী লীগের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। আমরা অনিবার্য ঘটনা-ধারার পিছনে পড়ে না থেকে সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংগ্রামের গতিধারায় অন্যন্য দেশপ্রেমিক শক্তি ও জনগণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের সচেতন হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া গড়ে তোলা ও দূর্বলতাগুলো কাটানোর প্রয়োজন বলে তখন সিদ্ধান্ত করেছিলাম। তাছাড়া স্বাধীনতার সংগ্রামের জয়লাভের জন্য জাতীয় ঐক্য এবং জাতীয় মুক্তির সমর্থনে আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের সমর্থন সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তাও আমরা উপলব্ধি করেছি। উল্লেখ্য যে, ২৫শে মার্চের আগেই ঢাকায় উপস্থিত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিয়ে বিভিন্ন দেশে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে পত্র পাঠায়।

স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠিত করা ও প্রচার চালানোর মাধ্যমে প্রতিরোধের শক্তিগুলো প্রস্তুত করার চেষ্টার কথা আগেই বলেছি। ২৫শে মার্চ পাক বাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ শুরু হলে আমাদের পার্টির ছাত্র-যুবক শ্রেণীর স্বেচ্ছাসেবকরা যেখানে যতটুকু সম্ভব হয়েছে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ প্রভৃতি দেশপ্রেমিক শক্তির সঙ্গে মিলিত ভাবে প্রতিরোধে বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ই পি আর বাহিনীর সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এপ্রিলের মাঝামাঝি নাগাদ এই প্রাথমিক প্রতিরোধ ভেঙে পড়লে প্রথমে শহর থেকে গ্রামে এবং পরে বাধ্য হয়ে আমাদের কর্মীরা ভারতে চলে যায়। তারা আমাদের পার্টি ও সংগঠনের সমর্থক ও ইচ্ছুক তরুণদেরও সংগঠিত করে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং-এর জন্য ভারতে নিয়ে যেতে থাকেন। অনেক বিপন্ন পরিবার ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

সীমান্ত অতিক্রম করার প্রাক্কালে আমি রাজশাহী জেলে বন্দী ছিলাম। বাইরে সমগ্র জাতি যে মুক্তির জন্য উদ্বেল হয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারতাম। বুঝতে পারতাম সামনে অপেক্ষা করছে এক নিদারুণ রক্তাক্ত সংগ্রাম। রাজশাহী শহরে ই পি আর-এর ক্যাম্প ছিল। পাকবাহিনীর ক্যাম্পও ছিল। ২৫শে মার্চ পাকবাহিনী ই পি আর ক্যাম্প আক্রমণ করে। ই পি আর প্রতিরোধ করেন। আমি গোলাগুলির আওয়াজ শুনি এবং কিছু কিছু

গোলাগুলি জেলখানার কাছে এসে পড়তে থাকে। ফলে বন্দীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। গোলাগুলির মাঝে পড়ে বন্দী অবস্থায় মৃত্যু ঘটতে পারে। অন্য সকলে আমাকে এসে বলে যে, আপনি ডি আই জিকে বলুন জেলের গেট খুলে সকলকে মুক্ত করে দিতে। ডি আই জিকে বললাম কিন্তু তিনি রাজি হন না। তখন বন্দীরা সিদ্ধান্ত নেয় জেল ভেঙে বের হবে। বাইরে জনতাও জেল ভাঙা সমর্থন করে। বন্দী ও জনতা মিলে জেলের ময়লা ফেলার দরজা ভেঙে ফেলে। আমরাও বের হয়ে আসি। আমার সঙ্গে আরও কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন। জনতা আমাদের পদ্মা নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে নৌকায় উঠিয়ে দেয় এবং বলে যে, শহরে থাকা আপনাদের জন্য নিরাপদ নয়, আপনারা নদীর ওপারে চলে যান। নৌকাযোগে নদী পার হয়ে বুঝতে পারি যে আমরা ভারতের মাটিতে পা রেখে দিয়েছি। কারণ পদ্মার ওপারেই ভারত।

এই সময় জেলের ভিতরের কোন অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু মার্চ মাসের একটি অসাধারণ ঘটনা ছিল। ৯ই মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সে স্বাধীনতার সংগ্রাম বলে ডাক দেবার পর ঐ ভাষণ ঘোষণার জন্য বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দন ও সমর্থন জানিয়ে রাজশাহী জেল থেকে একটি টেলিফোন করতে চাই। জেল কর্তৃপক্ষ বলেন যে, আপনি তো টেলিফোন করতে পারবেন না, কারণ আপনি ডেটিনিউ। আপনার টেলিগ্রাফ পাঠাতে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের অনুমোদন লাগবে। আমি বললাম তবে অনুমোদন নিয়ে আসুন। তারা বললেন যে এখন অনুমোদন আনা যাবে না, কারণ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে কেউ কাজ করছে না, তারা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগও অসহযোগ আন্দোলনে শরিক হয়েছে এমন—অভিজ্ঞতা আমার রাজনৈতিক জীবনে ইতিপূর্বে আর ছিল না। তখন জেলের ভিতর থেকে আমি বুঝতে পারি যে সমগ্র জাতি স্বাধীনতার জন্য কতখানি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

প্রতিরোধ শুরু হওয়ার আগে থেকে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দলের সঙ্গে আমাদের আত্মগোপনরত পার্টির সম্পর্ক ছিল। বিশেষত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মোজাফর) সঙ্গে আমাদের পার্টিরঐতিহ্য গত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ন্যাপের অসাম্প্রদায়িক, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং সমাজতন্ত্রের সমর্থক ভূমিকার জন্য আমাদের পার্টির সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক ও নীতিগত মিল ছিল বেশি। অসহযোগ আন্দোলন, প্রতিরোধ ও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে এই দুটি পার্টি ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ন্যাপের (ছাত্র ইউনিয়নের) সঙ্গে মিলিত ভাবে আমাদের পার্টি গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলে। অনেক স্থানে একত্রে ক্যাম্প করা হয়।

আওয়ামী লীগের সাথে ১৯৬০-৬১ সাল অর্থাৎ আয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের সূচনা থেকেই আমাদের পার্টির সহযোগিতা মূলক সম্পর্ক ছিল। আমাদের পার্টি আত্মগোপনে থাকতে বাধ্য হলেও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধপূর্ব সময়টাতে আওয়ামী লীগের নেতা বঙ্গ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয়ে আমাদের মতবিনিময় ও পরামর্শ হয়েছে। ১৯৭০-এর নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানী শাসকরা যে মেনে নেবে না এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম অনিবার্য এবং তা সশস্ত্র সংগ্রাম হতে পারে এ বিষয় বঙ্গ বন্ধু এবং আমাদের পার্টি ঐক্যমতে পৌছে ছিল। বঙ্গবন্ধু আমাদের বলেছিলেন যে, সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে আর্ন্তজাতিক সমর্থনের জন্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতা তার জন্যই মূল্যবান হবে। কেননা আওয়ামী লীগের এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও যোগাযোগের অভাব রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু আজ বেঁচে নেই। তিনি ঘাতকের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। তার স্মৃতিকে স্মরণ করে বলতে চাই যে, কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্কে তিনি যে মূল্যায়ন ও প্রত্যাশা করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধে আমরা তা পূরণ করতে পেরেছি।

১৯৭১ সালের এপ্রিলে আওয়ামী লীগ প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ঘোষণা করার পরেই দেশের ভিতর আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর উপস্থিত সদস্যরা এক বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে স্বাগত জানায় এবং প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার কথা ঘোষণা করে। আমাদের পার্টির ঐ প্রথম প্রকাশ্য বিবৃতি বিদেশে সংবাদপত্র ও বেতারে প্রচারিত হয়েছিল। এর ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামে পার্টির ভূমিকা দেশ-বিদেশে জনগণ জানতে পারে এবং আমাদের পার্টির বহু, সদস্য সমর্থক বাংলাদেশের সরকারের অধীনে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং গ্রহণ করে। তবে এক্ষেত্রে সরকার ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের পার্টির কিছু কিছু দ্বিমত ও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল।

অন্যান্য দলের মধ্যে কাজী জাফর আহমদ ও রাশেদ খান মেমনদের দলের সঙ্গেও আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়। এরা মাওবাদী নীতি অনুসরণ করলেও ২৫ শে মার্চের পর সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে যায়। এরা স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন দিলেও আওয়ামী লীগের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, স্বাধীনতার শক্তিগুলোর ঐক্য এবং স্বাধীনতার আন্তর্জাতিক শক্র-মিত্র সম্পর্কে এদের নীতির সঙ্গে আমাদের প্রভূত পার্থক্য ছিল। মুক্তিযুদ্ধকালে এঁরা সহ কিছু মাওবাদী শক্তি আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে একটি 'বামপন্থী ফ্রন্ট' গঠনের যে প্রস্তাব দিয়েছিল তাকে আমরা বিভেদাত্মক ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে দুর্বল করার প্রয়াসী বলে ভ্রান্ত মনে করে প্রত্যাখ্যান করি এবং আওয়ামি লীগ সহ জাতীয় ঐক্য গঠনের নীতি অনুসরণ করি। স্বাধীনতার বিরোধীতাকারী দলগুলোকে আমরা শত্রু বলে চিহ্নিত করি।

২৫শে মার্চের পরে জেল ভেঙে মুক্ত হওয়ার পর কয়েকজন সহকর্মী সহ আমার নিরাপত্তা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজন উপলব্ধি করে জনতাই আমাদের ঠেলে নিয়ে পদ্মা পার করিয়ে দেয় একথা আগেই বলেছি। কাজেই দেশের ভিতরে আমাদের পার্টির সংগঠিত হওয়ার ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে জড়িত থাকতে পারিনি।

আমাদের পার্টির অন্য নেতারা ২৫শে মার্চের পর সঙ্গে সঙ্গে দেশত্যাগ করেননি। তারা পরিস্থিতি অনুযায়ী ভিতর থেকে প্রতিরোধ সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন। অচিরেই ঢাকায় থাকা অসম্ভব এবং সকলের থাকা অপ্রয়োজনীয় মনে হলে আমাদের পার্টি নেতৃবৃন্দ তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল সালাম, খোকা রায়, মোহাম্মদ ফরহাদ, জ্ঞান চক্রবর্তী, সাইফুদ্দিন মানিক, মঞ্জুরুল আহসান খান প্রমুখ ঢাকা জেলার বেলাবোও থানার রায়পুরায় ঘাটি করে অবস্থান করেন। কিছু কমরেডকে অধিকৃত রাজধানীতে রেখে যাওয়া হয়। রায়পুরা এলাকায় পাকবাহিনীর পদানত হলে আমাদের নেতৃবৃন্দ ভৈরবের দিকে আশুগঞ্জে সরে গিয়ে অবস্থান নেন। নেতৃবৃন্দ দেশে থেকে পার্টির বিভিন্ন পর্যায়ে সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃস্থাপন এবং পুনর্গঠিত হয়ে স্বশস্ত্র প্রতিরোধে ভূমিকা পালনের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। আশুগঞ্জে বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিরোধ ভেঙে পড়লে এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে নেতৃবৃন্দের থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং প্রকৃতপক্ষে এলাকার জনগণ তাদেরকে ক্রমে সীমান্তের দিকে নিয়ে যায়। সীমান্ত অতিক্রম করার আগে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিভিন্ন জেলা সংগঠনের জন্য নির্দেশ দিয়ে ক্যাডার পাঠাতে সক্ষম হন।

পাকবাহিনীর আক্রমণ, নির্বিচারে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ প্রভৃতির মুখে সীমান্ত এলাকার জেলাগুলো থেকে হাজার হাজার মানুষ ভারতে চলে যায়। আমাদের পার্টির বহু, কর্মী সমর্থক সপরিবারে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়। অন্যান্য দলের রাজনৈতিক কর্মীরাও চলে যায়। আমাদের হিসেবে আমাদের পার্টির নেতা, সমর্থক ও কর্মীগণ এবং তাদের পরিবারবর্গ মিলিয়ে প্রায় ছয় হাজার নরনারী পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও মেঘালয় এই তিনটি ভারতীয় রাজ্যে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময় গোটা পার্টির সংগঠন সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন এবং জেলায় দেশের মধ্যেও আমাদের কিছু কমরেড থেকে গিয়েছিলেন। প্রবাসে সকলের জন্য আশ্রয়, খাদ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করা এবং ভিতরে-বাইরে সকল পর্যায়ে পার্টির সংগঠনের সাথে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপন করা এবং সংগঠন গুছিয়ে নেওয়া এবং সর্বোপরি কালবিলম্ব না করে গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলা প্রভৃতি অত্যন্ত দুরূহ কাজ তখন পার্টির সামনে ছিল। আমাদের নেতাকর্মীদের সব কিছু দৃঢ়তার সাথে হাসিমুখে সহ্য করা, অসম সাহসিকতা এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি সহ অন্যান্য দেশপ্রেমিক শক্তির সাহায্যের অতি অল্প সময় আমরা কাজগুলো গুছিয়ে তুলি। এ পর্যায়ে আমাদের সংগঠিত হওয়ার কাজে ধারাগুলো ছিল সংক্ষেপে নিম্নরূপ : (ক) কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ ক্যাম্প স্থাপন-ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ও অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের সহায়তায় সীমন্তবর্তী ভারতের তিনটি রাজ্যে এবং তাদের আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থা। (খ) দু-ধরনের ক্যাম্প ছিল— পার্টির বয়স্ক সদস্যদের পরিবার বর্গসহ আশ্রয়ের জন্য এবং তরুণদের জন্য

যাদেরকে লড়াইয়ে উপযুক্ত মনে করা হবে ও ট্রেনিং দিয়ে পাঠানো হবে। (গ) ক্রমশ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সহায়তা গ্রহণ এবং আমাদের ক্যাম্পে সংগঠিত তরুণদের সরকারের মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং এ প্রেরণ (ঘ) আমাদের পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের মিলিত একটি নিজস্ব গেরিলা বাহিনীর গঠন। এতে প্রথমে ট্রেনিং দানের প্রভৃত ' টেকনিক্যাল' অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল কিন্তু পরে ভারত সরকারের অনুমতি নিয়ে তা গঠন করা সম্ভব হয় (ঙ) আগরতলায় এবং মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে কলকাতায়ও কেন্দ্রীয় কমিটি কার্যালয় গঠন করে কাজ করা। (চ) আমাদের নিজস্ব গেরিলা বাহিনীকে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে দেশের ভিতরে যুদ্ধ করতে পাঠানো। (ছ) দেশের ভিতরে কমরেডদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং অণুপ্রবিষ্ট গেরিলাদের তাদের সহয়তা গ্রহণ। (জ) আমাদের ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধা তরুণদের রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা। (ঝ) কেন্দ্রিয় কমিটির কর্তৃক 'মুক্তিযুদ্ধ' নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করে তা সকল ক্যাম্পে, শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ও দেশের ভিতরে প্রচারের ব্যবস্থা করা।

আমাদের পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র-ইউনিয়নের গেরিলা বাহিনীতে ৫ হাজার তরুণকে ট্রেনিং দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে পাঠানো হয়। এছাড়া আমাদের প্রচেষ্টায় আমরা ১২ হাজার তরুণ সংগ্রহ ও সমাবেশ করে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিবাহিনীতে পাঠাই। অর্থাৎ আমরা মোট ১৭ হাজার তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে ট্রেনিং ও যুদ্ধের জন্য সংগঠিত করি। তবে যুদ্ধের পরে এ তরুণরা অনেকে লেখাপড়া, অনেকে চাকুরী, কৃষিকাজ ও ব্যবসা প্রভৃতি নিজ নিজ পেশায় ফিরে যায় এবং রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত ছিল না।

ভারতে যাওয়ার পরই ১৯৭১ সালে মে মাসে কেন্দ্রীয় কমিটি মিলিত হয়ে এর প্রথম বৈঠকে স্বাধীনতা সংগ্রামের মৌলিক চরিত্র, সংগ্রামের শক্তি এবং শত্রুমিত্র প্রভৃতি সম্পর্কে মূল্যায়ন করে একটি দলিল গ্রহণ করেছিল। ঐ দলিলে পাকিস্তানের উপনিবেশিক ধরনের শাসন-শোষণের স্বরূপ নির্দেশ করে আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামকে জাতীয় স্বাধীনতা এবং মুক্তির সংগ্রাম বলে মূল্যায়ন করা হয়েছিল। মূল্যায়নে বলা হয়েছিল যে, স্বাধীনতার জন্য জনগণের দৃঢ় একতা এবং মুক্তিবাহিনীর বীরত্ব ও ত্যাগ আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রধান শক্তি এবং প্রতিবেশী ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সমাজতান্ত্রিক শিবির, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন ও দুনিয়ার শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও প্রগতিগামী শক্তি আমাদের স্বাধীনতার বন্ধু। অন্যদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, মাওবাদী চীন ও দুনিয়ার অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলরা পাকিস্তানের সমর্থক ও আমাদের স্বাধীনতার শত্রু বলে মূল্যায়ন করা হয়েছিল। এই মূল্যায়ন সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

মে মাসের পরে মাঝে মাঝে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা করা সম্ভব হয়েছে, যদিও আমাদের কমরেডরা ভারতের তিনটি রাজ্যে ও দেশের মধ্যে ছড়িয়ে থাকায় তা খুব কষ্টসাধ্য

ছিল।

ভারতের তিনটি রাজ্যের (পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয়) সীমান্তবর্তী শহরে আমাদের পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ ক্যাম্প ছিল। দু-ধরনের ক্যাম্প ছিল : পার্টির বয়স্ক সদস্যদের পরিবারবর্গ সহ এবং যুদ্ধে পাঠানোর জন্য তরুণদের 'ইয়ুথ ক্যাম্প।'

দেশ থেকে যাওয়ার সময় আমাদের কমরেডদের সঙ্গে যৎসামান্য অর্থসম্পদ যা ছিল তা-ই ছিল আমাদের প্রাথমিক সহায়। পরে ভারতীয় নাগরিকদের দ্বারা গঠিত সহায়ক সমিতি থেকে আমরা অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য পেয়েছি। আমাদের প্রতিষ্ঠিত কিছু ক্যাম্প আমরা বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় মিলিয়ে দিয়েছিলাম। পরে অল্প সংখ্যক ক্যাম্পই আমাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

এছাড়া ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকাপ্রবাসী আমাদের পার্টির সমর্থকরা অর্থসাহায্য সংগ্রহ করে পাঠাতেন। বাংলাদেশে পাকবাহিনীর নৃশংসতা ও বাঙালীদের সাহসী যুদ্ধের খবর বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে ছাপা হওয়ার পর সারা দুনিয়ায় একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এই পটভূমিতে মুক্তিযুদ্ধের শেষের মাসগুলোতে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে সাহায্য সংগ্রহের কাজটা লন্ডনে আমাদের কমরেড ও সমর্থকরা সমন্বিত করে আমাদের কাছে অর্থ পাঠাতেন।

আমাদের ক্যাম্পে সংগঠিত তরুণদের অধিকাংশ যেহেতু সরকারী মুক্তিবাহিনীতে পাঠিয়ে দেওয়া হতো তাই খুব বেশি খরচের বোঝা আমাদের বহন করতে হয়নি। আর আমাদের নিজস্ব গেরিলা বাহিনীর ছেলেরা দেশের ভিতরে এসে জনগণের সহায়তায় আহার, বাসস্থানের ব্যবস্থা করতো।

আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা আগেই কিছু বলেছি। সবচেয়ে বড়ো ঐক্যমত্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে; সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে তা অর্জনের প্রশ্নে আমরা একমত ছিলাম।

আমরা আওয়ামী লীগ সহ স্বাধীনতার পক্ষের সকল শক্তির বৃহত্তম জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলাম। এই প্রচেষ্টা তেমন সফল হয়নি। শেষের দিকে বাংলাদেশ সরকার 'পরামর্শ দাতা কমিটি' গঠিত হয় এবং তাতে আমাদের পার্টির প্রতিনিধি রূপে আমি ছিলাম। সশস্ত্র সংগ্রামের অগ্রগতির পর্যায়ে আমাদের উভয় দলের কিছু দৃষ্টিভঙ্গি গত পার্থক্য ছিল। আমরা মুক্ত এলাকা গড়ে তুলে সেখানে প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক নীতি গ্রহণ ও কার্যকর করার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের মডেল জনগণের কাছে তুলে ধরা প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতাম। এবং ঐরকম রণকৌশল গ্রহণের কথা বলতাম। আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়টাকে কেবল সাধারণ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতাম না। মেহনতি মানুষ শোষণ ও নির্যাতনমুক্ত সুখী জীবন গড়ার আকাঙ্ক্ষা

থেকে স্বাধীনতা চাইছে। আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের দৃঢ় ও শক্তিশালী রূপে সংগঠিত হয়ে ওঠার লক্ষ্য সামনে রেখেছিলাম। মুক্ত অঞ্চল গড়ে তুলে প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ কিছু নিতে পারলে সারা দেশে মেহনতি জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে আরও উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা নিয়ে এগিয়ে আসত। আমরা জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজস্ব শক্তির নির্ভর করার উপর জোর দিতাম। এই সকল বিষয়ে আওয়ামী লীগের স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

আওয়ামী লীগের একাংশে তরুণদের দ্বারা 'মুজিব বাহিনী' নামে একটি পৃথক বাহিনী হওয়ার পর তাদের সঙ্গে এবং বিশেষ করে আমাদের সমর্থক গেরিলাদের দেশের ভিতরে প্রেরণের প্রশ্নে সরকারের সঙ্গে আমাদের কিছু অসুবিধা দেখা দিত। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য পরে একটি কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠিত হয়েছিল।

তবে সার্বিকভাবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক বজায় ছিল। কমিউনিস্টরা সব সময় তাদের আন্তর্জাতিক কর্তব্য হিসাবে যে কোন জাতির ন্যায্য সংগ্রাম—জাতীয় স্বাধীনতা এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করে। এই নীতি থেকে বস্তুত আমাদের প্রচেষ্টায় ছড়ায়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের জাতীয় সংগ্রামে সমর্থনে এগিয়ে আসে এবং বাংলাদেশের পক্ষে ভারতের জনমত গঠনে প্রভূত সহায়তা করে। এজন্য তারা নিজেরাই প্রচার গড়ে তোলে। বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম, বিশেষত পাকবাহিনীর নিষ্ঠুর নির্যাতন ও গণহত্যা এবং প্রায় এক কোটি ছিন্নমূল নরনারী ও শিশুর ভারতে আশ্রয় গ্রহণ ইত্যাদি ভারতের জনগণের মধ্যে বাংলাদেশের জনগণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে গভীর আবেগ সৃষ্টি করেছিল। তারা, বিশেষত সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে বাংলাদেশের শরণার্থী ও উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিতে যে অসুবধার সম্মুখীন হয়েছিল তা হাসিমুখে সহ্য করেছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই জনমতকে আরো বিস্তৃত ও সংহত করার জন্য অবদান রেখেছে। ভারতের প্রতি দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রশ্নে কিছু কিছু বিভ্রান্তি ও বিরুদ্ধ মত ছিল। কোন কোন প্রশ্নে কংগ্রেসেরও দোদুল্যমানতা ছিল। এক্ষেত্রে ভারতের অভ্যন্তরে একটি রাজনৈতিক লড়াই ছিল। এই লড়াইয়ে বাংলাদেশের পক্ষে সি পি আই-র সুস্পষ্ট ভূমিকা দ্বারা আমাদের সংগ্রাম লাভবান হয়েছে।

আগেই বলেছি যে, ২৫ শে মার্চের আগেই ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলোকে আমাদের সম্ভাব্য স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তার জন্য পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে চিঠি পাঠাই। এরপর ভারতে যাওয়ার পর মে, মাসে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সদস্য ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রিয় কমিটির সঙ্গে এক বৈঠকে বসে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। সেপ্টে ম্বর মাসে ভারতে অনুষ্ঠিত ভারতের

কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে আমাদের পার্টির একটি প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়েছে এবং সেখানে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্পর্কে বিস্তৃত জানানো সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আগে থেকে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রচারের উদ্যেগ নিয়েছিল।

সকলে জানেন যে রণক্ষেত্র থেকে জাতির সঙ্গে নিরাপত্তা পরিশোধের টেবিল পর্যন্ত সর্বত্র প্রতিবেশী ভারত ব্যতীত সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ বিশ্বের সমাজতন্ত্রী শিবির এবং আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল শক্তিসমূহের সক্রিয় সমর্থন বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে বিজয়ের একটি অন্যতম প্রধান উপাদান। আমাদের পার্টি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক, প্রগতিশীল এবং শান্তির শক্তি সমূহের সমর্থন ও সাহায্য সমাবেশ করার কাজে উদ্যোগ নিয়েছিল। আমাদের পার্টি উদ্যোগী হয়ে এপ্রিল মাসে বিশ্ব শান্তি পরিষদে সাধারণ সম্পাদক রমেশচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার সহায়তায় তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বিদেশে পাঠায়। এই দলে সদস্য ছিলেন আওয়ামী লীগের আব্দুস সামাদ আজাদ, ন্যাপের দেওয়ান মাহবুব আলী (ফেরার পথে দিল্লীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন) এবং কমিউনিস্ট পার্টির ডাক্তার সারোয়ার আলী। এই "শান্তি প্রতিনিধি দল" ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানী সফর করে প্রগতিশীল শক্তি সমূহের কাছে বাংলাদেশে ইয়াহিয়া বাহিনীর ভয়াবহ গণহত্যা এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয় তুলে ধরেন। এটাই ছিল বিদেশে বাংলাদেশে প্রথম প্রতিনিধি দল। তখন পর্যন্ত কলকাতা ছাড়া বিদেশে কোথাও বাংলাদেশ সরকার মিশন সংগঠিত হয়নি।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরুতে বিদেশে এমনকি প্রগতিশীল মহলেও আমাদের সংগ্রাম সম্পর্কে নানারূপ প্রশ্ন বিদ্যামান ছিল। বিদেশে পাকিস্তানীদের মিথ্যে প্রচার খণ্ডন করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ১৯৭০-এর নির্বাচনে জনগণের রায়ের প্রকৃত তাৎপর্য এবং আমাদের সংগ্রাম যে "বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা" নয় ও জনগণের ব্যাপক সমর্থনপুষ্ট জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণে ন্যায্য সংগ্রাম, এ কথা বিদেশে প্রচার করা প্রয়োজন ছিল। অন্য দেশের মুসলমানদের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে "মুসলিম দেশ পাকিস্তান ভাঙার জন্য অন্য দেশের ষড়যন্ত্র" বলে একটা বিভ্রান্তি ছিল। আমরা চিঠিপত্র ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে বিদেশে এইসব ভ্রান্তিমোচনের চেষ্টা করেছি। সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়ার কিছুকাল আগে হতেই আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল শক্তি সমূহ, বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সমর্থন ও সাহায্য ব্যাতীত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও চীনের মাওবাদী নেতৃত্বের সমর্থনপুষ্ট বর্বর ইয়াহিয়ার চক্রকে পরাভূত করা ও স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভ করা সম্ভব হবে না। তাই পার্টি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থন ও সাহায্যের

আবেদন জানিয়ে দুনিয়ার ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টির কাছে বিশদ চিঠি পাঠানো এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে দুনিয়ার সমস্ত প্রগতিশীল জনমত সমবেত করার জন্য ও অন্য সকল সম্ভাব্যপন্থার জন্য চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত মতে প্রথমে পাক বাহিনীর গণহত্যা শুরু হওয়ার আগে ১৪ই মার্চ এবং সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হওয়ার পরে মে মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ হতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি সহ প্রায় সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টির কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। আমাদের পার্টি সে চিঠি হতে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন ও দুনিয়ার বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি এবং তাদের মাধ্যমে জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও মুক্তি সমর্থনকারী শান্তি ও প্রগতিশক্তি সমূহ এবং গণতান্ত্রিক জনগণ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেয়েছিল। একটি বিশ্ব জনমত গড়ে ওঠা আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্বের গণমাধ্যমে প্রচার সহায়ক হয়েছিল।

কোচিনে অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির যে কংগ্রেসের কথা আগেই বলেছি সেখানে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি দল বাইশটি ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে বিস্তৃত আলাপ-আলোচনা করেছিলেন, তাছাড়া শান্তি আন্দোলন ও অন্যান্য প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা আমাদের পার্টি করেছে। আমরা বলতে পারি যে আমাদের পার্টি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে দুনিয়ার সমাজতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহকে সমবেত করার ক্ষেত্রে আমাদের পার্টি যথোচিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল এবং এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে যথাসাধ্য অবদান রেখেছে। বিশ্ব-জনমত গঠনের ক্ষেত্রে এবং তার কার্যকর ভূমিকা সংহত করার ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির অবদান সবচেয়ে বেশি।

স্বাধীনতাযুদ্ধে শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত ছিল সমগ্র জাতির একতা এবং আরও সুনির্দিষ্টভাবে স্বাধীনতার সকল শক্তি বিশেষত আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যবদ্ধ কর্মতৎপরতার প্রয়োজন ছিল। আমাদের পার্টি স্পষ্টভাবে এই সব রাজনৈতিক দল সমবায়ে - জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের আওয়াজ তুলেছিল এবং সে ফ্রন্ট গঠনে অবিরাম প্রচেষ্টা নিয়েছিল। বিশ্বজনমত এবং ভারতের জনমতও বাংলাদেশের নিকট এরূপ জাতীয় ঐক্যর বহিঃপ্রকাশ দেখতে চাইছিল। আওয়ামী লীগ এ ধরনের জাতীয় ঐক্য গঠনের গুরুত্ব বিলম্বে উপলব্ধি করে। পাশে পাশে কয়েকটি মাওবাদী উপদল ও আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে তথাকথিত বামপন্থী ফ্রন্ট এর নামে এক বিভেদাত্মক আওয়াজ তুলেছিল। এই দুই মনোভাবের বিরুদ্ধে আমাদের পার্টির ঐক্যের নীতি তথা জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের নীতি স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রথমদিকে কার্যকর হয়নি। যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুকাল পরে আওয়ীম লীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশ কংগ্রেসের প্রতিনিধি এবং ব্যক্তিগতভাবে মাওলানা ভাসানিকে নিয়ে তদানীন্তন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের একটি পরামর্শদাতা কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই কমিটিতে আমাদের

পার্টির প্রতিনিধি ছিলাম আমি।

এই পরামর্শদাতা কমিটি গঠনের গুরুত্ব ছিল এই যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ এবং কমিউনিস্ট পার্টি সহ সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তি যে একতাবদ্ধ সেটা প্রত্যক্ষভাবে দুনিয়ার সামনে প্রকাশ করা গিয়েছিল। বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে ঐ কমিটি দেশের ভিতরে জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের মনে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। ঐ কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশপ্রেমিকের শক্তি আরও সমঝোতা ও ঐক্য গড়ার ভিত্তিও সৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের পার্টি পরামর্শদাতা কমিটি গঠনকে স্বাগত জানিয়েছিল। তবে ঐ কমিটি যেমন কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেনি এবং ঐক্যের উচ্চতর কোন বিকাশও ঘটেনি। এ বিষয়ে প্রধানত গুরুত্ব উপলব্ধিতে আওয়ামী লীগের দুর্বলতা ও অনুৎসাহ ছিল।

কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের সম্মিলিত চেষ্টায় প্রথমে একটি গেরিলা বাহিনী গড়ে উঠেছিল। এই বাহিনী গঠন, ব্যবস্থাপনা, ভারত সরকারের সঙ্গে এই বিষয়ে যোগাযোগ প্রভৃতি সামগ্রিক দায়িত্বে তখন ছিলেন আমাদের পার্টির মোঃ ফারহাদ। আমাদের গেরিলা টিম সকল জেলায় পাঠানো হয়েছিল। ঢাকার খোদ রাজধানী, নরসিংদী, রায়পুরা, কুমিল্লা, নোয়াখালিতে, চট্টগ্রাম, রংপুর সহ উত্তরবঙ্গের কয়েক স্থানে আমাদের পার্টির টিমগুলো গেরিলা এ্যাকশান করেছে এবং রণক্ষেত্রে আমাদের কমরেডরা প্রাণ দিয়েছেন। যারা ভারত যাননি, সেই কমবেরডরা দেশের ভিতরে থেকে যুদ্ধ সংগঠিত করে তুলছিলেন এবং এরাই ভারত থেকে আগত আমাদের গেরিলাদের এ্যাকশানে সাহায্য করেছেন। এখন বয়সের কারণে কোন সময় কোথায় কোথায় আমাদের টিম কিরূপ এ্যাকশান বা লড়াই করেছিল তা স্মৃতি থেকে আমার পক্ষে বিশদ বলা সম্ভব নয়। আমরা নিজেরা এবং বাংলাদেশের সরকার ও মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সাধ্যমত সারা দেশে যুদ্ধরত ছিলাম। যুদ্ধ ছাড়া সংবাদ বহন, রেকি করা প্রভৃতি যুদ্ধের সহায়ক ঝুকিপূর্ণ কাজ আমাদের কমরেডরা করেছেন। কেবল নিচু পর্যায়ে নয়, উচু পর্যায়েও যুদ্ধ সংগঠনে আমাদের ভূমিকা ছিল। যেমন অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম বিমান বাহিনী গঠনে আমাদের পার্টির অবদান ছিল। ছোটখাটো গেরিলা এ্যাকশান ছাড়া আমাদের গেরিলারা চট্টগ্রাম বন্দরে পাকিস্তানী জাহাজ ডুবিয়েছিল। কুমিল্লা জেলায় চৌদ্দ গ্রাম এলাকার ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে বেতিয়ারা নামক স্থানে আমাদের কমরেড আজাদ, মুনির প্রমুখ আমাদের গেরিলা বাহিনীর নয়জন সদস্য পাক বাহিনীর সঙ্গে এক লড়াইয়ে নভেম্বর মাসের ১১ তারিখে নিহত হন।

মুক্তিযুদ্ধের কালে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শহিদুল্লাহ কায়সার ঢাকায় আলবদর বাহিনীর হাতে নিহত হন।

বিক্রমপুরের দামলা গ্রামে ২৬ আষাঢ় ১৩৬৯ ১০ জুলাই ১৯৬৪ সালে সালাম আজাদ জন্মগ্রহণ করেন। বাবা আব্দুর রাজ্জাক এবং মা জসিমন নেসা পরলোকে। স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ইনস্টিটিউশনের কৃতী ছাত্র সালাম আজাদের পরবর্তী শিক্ষাজীবন কেটেছে গাইবান্ধা সরকারি কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধ মিলিয়ে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা একচল্লিশ। 'Contribution of India in the war of liberation of Bangladesh' শীর্ষক তাঁর এই গ্রন্থটি মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান বিষয়ক বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত এ পর্যন্ত প্রথম বই। তাঁর 'ভাঙামঠ' উপন্যাসটি খালেদা-নিজামী জোট সরকার ২০০৪ সালের ১৮ জুলাই নিষিদ্ধ করে এবং লেখক মৌলবাদীদের ফতোয়ার শিকার হন। বইটিতে বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ও ধর্মীয়-নিপীড়নের চিত্র তুলে ধরেছেন তিনি। বর্তমানে তিনি নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছেন দিল্লীতে। ২০০৩ সনের পৌষমেলায় বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হয় সালাম আজাদের 'রবীন্দ্রভুবনে বাংলাদেশ' গ্রন্থটি। এই প্রথম পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের কোনো লেখকের বই বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হল।

সালাম আজাদের বিভিন্ন বই ইংরেজি, ফরাসি, হিন্দী, অসমিয়া মারাঠি, পাঞ্জাবি (গুরুমুখী), মালয়ালাম, তামিল, গুজরাটি প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

সালাম আজাদ বিবাহিত। স্ত্রী মির্জা ফাহ্‌মিদা আজিম সহেলী।

আমরা ১৯৭১ সনের ২৮ মার্চ শাঁখারিবাজার থেকে প্রতিবারে একশত লাশ উঠিয়ে তৃতীয়বার ট্রাক বোঝাই করে তিনশত লাশ ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি। ১৯৭১ সনের ২৯ মার্চ সকাল থেকে আমরা মিডফোর্ড হাসপাতালের লাশঘর ও প্রবেশপথের দুপার্শ্ব থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিববাড়ি, রমনা কালীবাড়ি, রোকেয়া হল, মুসলিম হল, ঢাকা হল থেকে লাশ উঠিয়েছি। ২৯ মার্চ আমাদের ট্রাক প্রথম ঢাকা মিডফোর্ড হাসপাতালের প্রবেশপথে যায়। আমরা উক্ত পাঁচজন ডোম হাসপাতালের প্রবেশপথে নেমে একটি বাঙালি যুবকের পচা, ফুলা, বিকৃত লাশ দেখতে পেলাম। লাশ গলে যাওয়ায় লোহার কাঁটার সঙ্গে গেঁথে লাশ ট্রাকে তুলেছি। আমাদের ইন্সপেক্টর পঞ্চম আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এরপর আমরা লাশঘরে প্রবেশ করে বহু যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-কিশোর ও শিশুর স্তূপীকৃত লাশ দেখলাম। আমি এবং বদলু ডোম লাশঘর থেকে লাশের পা ধরে টেনে ট্রাকের সামনে জমা করেছি, আর গণেশ, রঞ্জিত (লাল বাহাদুর) এবং কানাই লোহার কাঁটা দিয়ে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে পচা, গলিত লাশ ট্রাকে তুলেছে। প্রতিটি লাশ গুলিতে ঝাঁঝরা দেখেছি। মেয়েদের লাশ দেখে মনে হয়েছে, তাদের হত্যা করার পূর্বে তাদের স্তন সজোরে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, যোনিপথে লোহার রড কিংবা বন্দুকের নল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যুবতী মেয়েদের যোনিপথের এবং পিছনের মাংস যেন ধারাল চাকু দিয়ে কেটে অ্যাসিড দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি যুবতী মেয়ের মাথায় খোঁপা খোঁপা চুল দেখলাম। মিডফোর্ড থেকে আমরা প্রতিবারে একশত লাশ নিয়ে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি।

—চুনুডোমের জবানবন্দির অংশবিশেষ।